আলোক-তীর্থ

(প্রথম খণ্ড)

শৈলেন্দ্রনারায়ন ঘোষাল

প্রকাশক ঃ—ডাঃ বঙ্কিম চৌধুরী।
সেক্রেটারী—
মেদিনীপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও
হাসপাতাল।
'সন্তধাম,' কর্ণেলগোলা—মেদিনীপুর।

প্রথম সংস্করণ
১৩৬৪

মূল্য—সাতটাকা

বেঁধেছেন—
কো-অপারেটিভ প্রেসের তত্ত্বাবধানে
এস, এম, আশরফ আলি,
বড়বাজার, —মেদিনীপুর।

ছেপেছেন—
কো-অপারেটিভ প্রেস,
মেদিনীপুর।
২৮শে ডিসেম্বর—১৯৫৭

উৎসর্গ

—*—

আলোক-তীর্থের প্রেরণাদাতা, আমার জীবনের ইষ্ট, উপাস্য, প্রিয়-পরম চিরআরাধ্যতম, অলখ্ লোকনিবাসী শ্রীশ্রীশশিভূষণ ঘোষাল পিতৃদেব শ্রীচরণ কমলেষু—

বাবা!

আলোক-স্বরূপ সদ্‌গুরুলাভ এবং সত্যানুসন্ধানের প্রেরণা তুমিই দিয়েছিলে। ভারতবর্ষের নানাস্থান ঘুরে ফিরে এসে সব কিছু তোমাকে শোনাতে হ'ত। তোমার দয়ায় আলোক-তীর্থের সন্ধান পেয়েছি, তাতে অবগাহন করে শান্তি পেয়েছি; "**অমৃত পিয়া গুরুনে দিয়া**"। কিন্তু সে অপূর্ব কথা তোমাকে শোনানোর সুযোগ হয়নি। তাই আমার সেই আলোক-তীর্থ পবিক্রমার অমৃত কথা, সত্যলাভে বাধা বিপত্তির কথা সব কিছু গ্রন্থাকারে রচনা করে তোমার চরণে নিবেদন করছি। তুমি দয়া করে গ্রহণ কর, আশীর্ব্বাদ কর, নতুনভাবে প্রেরণা দাও, আদর কর। তোমার এই স্নেহের-কাঙালটাকে কি আর ভুলতে পার? তাই সন্তসদ্‌গুরুরূপে এসে কোলে করেছ। সেই প্রেম চঞ্চল, স্নেহসজল, দয়ালমূর্ত্তি! তাই তো আমার দৌরাত্ম্য সহ্য করছো! সেই দয়া, সেই আদর, সেই মমতা! তোমার স্নেহঘন, ক্ষমাসুন্দর ভাব দেখেই চিনতে পেরেছি।

"হোম-আরতি ঘি এর বাতি তপ তপস্যার আড়ম্বর,
জপবো না নাম, ন্যাস প্রাণায়াম, করবো নাকো অতঃপর।
কাজ কি মিছা জঞ্জালে,
কি হবে মোর চক্ষু মুদে,
আসন পেতে বাঘ ছালে?
তুমিই আমার ইষ্ট পিতঃ! তুমিই আমার দয়াল গো!
দাও চরণের পুণ্যধুলি, আশীষ তোমার মহার্ঘ।"

স্নেহধন্য সেবক—
শৈলেন।

গ্রন্থাভাস

সর্ব্ব-আবরণ-মুক্ত-শুভ্র-নিরঞ্জন সত্যের আলোক সম্পাত যে গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য, ভূমিকার পর্দা ঝুলিয়ে গ্রন্থকারের বক্তব্যের আবেদনকে রহস্যময় করে তোলার প্রয়াস সেখানে নিষ্প্রয়োজন। তাই আমি যা লিখতে সুরু করেছি সেটা ঠিক গ্রন্থের ভূমিকা বা পরিচয় পত্র নয়, সাধারণ মানুষের মনের তন্ত্রীতে গ্রন্থকারের বাণী কোন সুরে সাড়া দেবে তারই আভাস মাত্র।

যে পথের বাঁকে বাঁকে যুগ যুগ ধরে মিথ্যা আর বঞ্চনার জঞ্জাল জমা হয়ে রয়েছে, ভিত্তিহীন বিশ্বাস ও যুক্তিহীন সংস্কারের অন্ধ আঁধিতে সত্য সাধনার দীপশিখা যেখানে পথ খুঁজে মরছে, সেই ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার চিরবন্ধুর পথে সাধারণ মানুষের কানে নতুন কথা শোনাতে আসা এক মহান দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। সেই দুঃসাহসিক সাধনাই এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে অপূর্ব্ব দীপ্তিতে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। প্রচলিত বদ্ধ বিশ্বাস ও অন্ধ সংস্কারের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ এবং আপাত সত্য-ভ্রান্ত-মত পথের নীতি খণ্ডনই মূলতঃ এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সংস্কার মুক্ত মন ছাড়া সত্য কখনও পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না। সেই সংস্কার মোচনের আদর্শে-রচিত "আলোক-তীর্থ" তাই সত্য প্রতিষ্ঠার আলোক-অভিযানে প্রথম পদক্ষেপ।

আমাদের এতকালের সযত্নলালিত ধারণা বিশ্বাসের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ভুল বোঝা আর মিথ্যার যে কত কীট বাসা বেঁধেছে তার ঠিক নেই। পুরাণ-পুঁথি শাস্ত্র বিধির প্রচলিত ভাবধারায় যে কত বিপুল বঞ্চনা জমা হয়ে আছে আমাদের অন্ধ চোখে তা ধরা পড়ে না। মানুষের সহজ বিশ্বাসপ্রবণতার রন্ধ্রপথে অজ্ঞানতা ও প্রবঞ্চনার বিষবাষ্পে ধর্ম্ম জগতে মিথ্যার রাজত্ব সুরু হয়ে গেছে; আর সেই মিথ্যাকেই পরম সত্যজ্ঞানে বুকে জড়িয়ে আমরা সত্য সাধনার নামে আত্মবঞ্চনা করে চলেছি,—বুঝতেও পারিনি আমার আরাধ্যমূর্ত্তি সরিয়ে স্বার্থ সন্ধানী লুব্ধ রাক্ষসের দল কখন শয়তানের মূর্ত্তি বসিয়ে গেছে। তাই আজ যদি কোন সত্য-সন্ধানী

ঐ শয়তানের মূর্ত্তি ভাঙ্গার মন্ত্র শোনাতে আসে, নিষ্ঠুর প্রতিঘাতে সে মন্ত্রকে হয়তো আমরা অস্বীকার করে বসবো, আত্ম পুরুষের অপমানে আপন আত্মার সমাধি রচনা করবো। আজ আবার তাই ঐ মনে-গাঁথা শিকড়-গাড়া প্রচলিত বিশ্বাসের মূলে নাড়া দিয়ে সব কিছুকে নতুন করে একবার যাচাই করা প্রয়োজন; যাচাই করা প্রয়োজন আমার শাস্ত্র পুরাণকে, যাচাই করা প্রয়োজন ঐ মঠ-মন্দিরে-অধিষ্ঠিত দেবতা মণ্ডলীকে, আমার ধর্ম্ম-মোক্ষ দাতা গুরু আচার্য্যকে, আমার ভক্তি বিশ্বাসকে। যুক্তি-বুদ্ধি বিচার-বিবেকের বিশ্লেষণী রশ্মি দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা প্রয়োজন, আমাদের এতদিনের মতপথের স্বার্থতাকে। জনমত, দেশাচার, অনুশাসন আর উপচারের আড়ালে সত্য কোথায় পথ খুঁজে মরছে তার সন্ধান আজ একান্ত প্রয়োজন। সস্তা দু'চারটে বুলি আর কল্পিত শাস্ত্রবাণীর ভেল্‌কি দেখিয়ে যারা আমাদের বিচার যুক্তি পঙ্গু করে দিয়েছে আমাদের চিন্তার স্বাধীনতাকে নিষেধের আফিম খাইয়ে যারা ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে, তাদের গড়া প্রক্ষিপ্ত পুরাণ-পুঁথির অনুশাসনকে একবার দিব্যতর মহত্তর জ্ঞানের আলোয়, বেদ-উপনিষদের সত্য দৃষ্টি দিয়ে বিচার করে দেখি না কেন, তাতে ভুল পাওয়া যায় কি না। সত্য-পথ-সন্ধানী গ্রন্থকার এই গ্রন্থে সেই দৃষ্টি প্রসারের আবাহনই জানিয়েছেন। একনিষ্ঠ শাস্ত্রচর্চ্চা, গভীর অনুশীলন ও স্বীয় অনুভূত উপলব্ধি দিয়ে যে সত্য তিনি সার বুঝেছেন সাধারণ মানুষের মনের দুয়ারে সেই সত্যকে পৌঁছে দেওয়াই তাঁর বাসনা। কাল্পনিক কাহিনী প্রক্ষিপ্ত করে করে যে সব অভিসন্ধিৎসু মূঢ় পুরাণকারেরা আমাদের মূল ধর্ম্মশাস্ত্রকে দূষিত কলুষিত করে গেছে, স্বার্থ-সিদ্ধির আশায় গুরুগিরিকে যারা আজ জঘন্য ব্যবসায়ে পরিণত করেছে, প্রজ্ঞাদীপ্ত যুক্তিশানিত কঠোর সমালোচনায় গ্রন্থকার তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিয়েছেন। আর সবচেয়ে বড় কথা, শাস্ত্রের জটিল সমালোচনা পাণ্ডিত্যের কুজ্ঝটিকায় তিনি মুষ্টিমেয় বিদগ্ধজনের মাঝে লুকিয়ে রাখেন নি, সকল শ্রেণীর সকল স্তরের মানুষের কাছে তাঁর বাণী পৌঁছে দেওয়ার বাসনায় তিনি জটিল যুক্তি তর্ক মনোরম প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সহজ করে পরিবেশন করেছেন। এ গ্রন্থের সব চেয়ে বড় সার্থকতা সেইখানে। এই নতুন বিশ্লেষণের হঠাৎ আলোর ঝলক সহ্য করতে না পেরে আমাদের দু' একজনের হয়তো এই গ্রন্থের মাঝে হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী মনোভাবের গন্ধ খুঁজে পাওয়ার ভয় আছে! কিন্তু পিছিয়ে না গিয়ে, আমার ধারণায় মিললো

না বলে, বা অহমিকায় আঘাত লাগলো বলে, অবহেলা না করে যদি ধীর বিচারে আমরা অগ্রসর হই, তাহলে সে ভুল আমাদের নিশ্চয়ই ভাঙ্গবে, সত্য তার আপন শুভ্র মহিমায় স্বপ্রকাশ হবেই।

"আলোক-তীর্থ" এর পাণ্ডুলিপি শুনতে শুনতে বারবার শুধু মনে হয়েছে আজকের দিনে ভারতে বিশেষ করে বাংলাদেশে এমনি একটি গ্রন্থের বড় প্রয়োজন। আজ শিক্ষিত বাঙ্গালীর বুদ্ধি বৃত্তিতে আবিলতা এসেছে। যুক্তি-বাদের সবল পটভূমিতে সব কিছু যাচাই করে দেখার প্রস্তুতি তার নেই, অথচ অতীতের অনায়াস লব্ধ প্রকৃতি প্রদত্ত অনুভূতি শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। দুর্ব্বল, অক্ষম-বিদ্যার প্রহরী বসিয়ে হৃদয়ের সহজ সম্পদ থেকে নিজেকে করছে বঞ্চিত আজ তার কাছে ধর্ম্ম শুধু অকারণ অর্থহীন মন্ত্রের আবৃত্তি আর যুক্তিহীন বুদ্ধিহীন Sentimentalism এ পরিণত। মঠ মন্দিরের ঠাকুরের কাছে তার ইষ্টকে খুঁজে পায় না, অথচ ও সব বাদ দিয়ে সার সত্য সন্ধানের শক্তিও তার নেই। তাই ধর্ম্ম আজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে একটা Routine bound-liability, কতক গুলো আচার-আচরণ অনুষ্ঠানের Formality মাত্র। একদিকে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই অবস্থা, আর অন্য দিকে যশ-অর্থ মান মোক্ষপ্রার্থী ভক্তি গদ্‌গদ্ অগনিত সাধারণ জনতার কাছে ধর্ম্ম সেই মধ্যযুগীয় এমন কি আদিম যুগোচিত কুসংস্কার ও অবিবেচনার মধ্য দিয়ে ঘট-পট-মঠের মাঝে লয় পেয়েছে। তারা প্রাণপণে বিশ্বাস করেছে তাদের ত্রাণকর্ত্তা ধর্ম্মবণিক গুরু আচার্য্যকে, বিশ্বাস করেছে যে ধর্ম্ম মানেই যুক্তিহীনতা, মেষপালের মত অনুসরণ পটুতা আর স্থানে অস্থানে গাছে পাথরে মাথা ঠোকা। বেদ-উপনিষদের সাথে পরিচয় নেই, তাই প্রক্ষিপ্ত পুরাণ-কথার কাব্য কাহিনীকেই তারা সার সত্য বলে জেনেছে। সন্দেহ সংশয়ের উৎস বিচার বিবেকের টুঁটি চেপে মেরেছে, কারণ তারা জানে বিশ্বাসেই সব হয়, পাথর প্রাণ পায়, মেষশাবক দেবতা সাজে, আর যুক্তি তর্কে সব দূর—দূর হয়ে যায়। তীর্থস্থানে পীঠস্থানে ভারতবর্ষ ছেয়ে গেছে, সাধু-সন্ন্যাসী-আচার্য্য-মোহান্ত তীর্থস্থান পীঠস্থান ভরে উঠেছে, লক্ষ লক্ষ শিষ্য-প্রশিষ্য-শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত মতপথে ধর্ম্মজগত কণ্টকিত হয়ে পড়েছে, কথার উপর কথার পাহাড়, পুঁথির উপর পুঁথির বোঝা ভারই হয়ে উঠেছে দিন দিন,—কিন্তু কই কি ফল পেলাম! প্রবঞ্চিত, আশাহত মানুষ কতকাল আর ঐ দুর্জ্ঞেয়

পরপারে অলক্ষ্য মুক্তির আশায় মিথ্যের মন্দিরে বারবার মাথা খুঁড়ে মরবে? গভীর বঞ্চনার ছিদ্রহীন আঁধারে শুধু 'পরপারে সব হবে' এই আশার ফুলকি দেখিয়ে, শুধু 'মা ফলেষু কদাচনের' ভেল্‌কি শুনিয়ে কতদিন আর মানুষকে ভুলিয়ে রাখবে? আজ তাই আমাদের নতুন কথা শোনার একান্ত প্রয়োজন। জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শনে বিংশ শতাব্দী অবিসম্বাদী অধিকার পেয়েছে। কিন্তু জীবনের সর্ব্বোত্তম প্রশ্নটী জড়িত যেখানে, যেখানে স্নায়ু-মজ্জা-হৃদয়-আত্মার সব কামনার অবসান, সেখানে মানুষের এত অপসরণ কেন? কেন জীবনের পরম প্রয়োজনে তার এই চরম পরাজয়! যে আনন্দের উৎস সন্ধানে মানুষের এই চিরন্তন পথ পরিক্রমা, যে উৎসের ঠিকানা হারিয়ে কোটি কোটি জীবনের ব্যর্থ বাসনা শূন্যে মিলিয়ে যায়, তার সন্ধান আশায় কতটুকু চেষ্টা আমাদের? দিন মাস বর্ষ যুগ কল্প পেরিয়ে যায় কিন্তু কই ঠিকানা তো আর খুঁজে পাইনা! আজ তাই ঐ পুরানো সমস্যার নতুন সমাধানের এই প্রথম ইঙ্গিতে আশা আশ্বাস খুঁজে পেয়েছি, বহুধা বিভক্ত জীবনের মাঝে এই নতুন সুরে আবার নব-অমৃত-আবাহনের সন্ধান পেয়েছি। মিথ্যার আঁধার মানুষের সম্মুখে যতই ঘন হয়ে আসুক না কেন, সত্য তার পথ খুঁজে পাবেই, মালিকের প্রেমের আলো ঠিকানা ঠিক দেখাবেই, ঐশী শক্তির জয় সুনিশ্চিত। সেই জয়ের পথ সুগম হবে মানুষেরই সাধনা দিয়ে, মানুষের রচা মিথ্যা মানুষকেই ভেঙ্গে দিতে হবে, মানুষের দেওয়া বঞ্চনা থেকে রক্ষা করবে মানুষেরই বিশুদ্ধ বোধি। সেই দিব্য সাধনার সার্থক সাথী স্বরূপ এই পরম-মূল্য গ্রন্থটিকে তাই সকলের মানুষের হয়ে স্বাগত জানাই, প্রণাম জানাই!!

কলিকাতা
২৭-১০-৫৭

শ্রীসুনীল কুমার রায়

প্রকাশকের নিবেদন—

—*—

আমাদের দেশের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতির মূলে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে; সর্ব্বাশ্রয়ী সত্যের উপর তা প্রতিষ্ঠিত—যুগ যুগ ধরে ঐ সকলকে প্রাণবন্ত, গতিশীল, ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ করে আসছেন তাঁরা—যাঁদের সত্ত্বা দিব্য বোধিতে প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, অপরোক্ষ উপলব্ধি এবং কালজয়ী প্রজ্ঞা প্রতিভায় যাঁদের জীবন ও বাণী ভাস্বর! প্রোজ্জ্বল! তাই দেখি, যুগ যুগ ধরে—কতো রাষ্ট্র বিপ্লব ধর্ম্ম বিপ্লব—কতো বিশৃঙ্খলা ঘটে গেছে; কতো মিথ্যার আবর্জ্জনা জমা হয়েছে; Negative Power বারবার ধরে— ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতির এবং ধর্ম্মকে পিষ্ট ও ধ্বংশ করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তবুও পারে নি। একটা উদার বিচারবুদ্ধি, নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা—সাম্য ও সমন্বয়ের ভাব বারবার জেগে উঠেছে—জাতির প্রাণ সত্ত্বায়। যখনই কোন কারণে জাতটা ঘুমিয়ে পড়েছে—তখনই এক একজন মহাপুরুষ তাঁর জীবনচর্য্যা এবং অভিজ্ঞতার অমোঘ বাণী শুনিয়ে-উদ্বোধনীর তড়িৎ সংঘাতে জাতটা জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন; আবার আমাদের জীবন সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠেছে—বাস্তবের সহজ স্বীকৃতিতে, প্রবৃত্তি ও হৃদয় দ্বন্দ্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে, সত্য ও অমৃতময় রূপের মোহন বিকাশে। কবীর নানক প্রভৃতি সন্তগণ ছিলেন ঠিক ঐ ধরণের মহাপুরুষ—অভেদ সাম্য ও সমন্বয় দৃষ্টির ধারক বাহক, ঈশ্বর প্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ। এরা মানুষকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন;—"সত্য দেবতা রয়েছেন অন্তরে—তাঁকে জানো, বোঝো, অনুভব করো। তোমরা সবাই একই পরম পিতার সন্তান। প্রেম ও মৈত্রীর রাখি বন্ধনে মিলিত হও। 'সব ঘট একই আত্মা ক্যা হিন্দু মুসলমান'। খোদা যদি মসজিদেই বাস করেন তবে আর সব মুলুক কাঁর? তীর্থে মূর্ত্তিতে রামের বাস এই দ্বৈতবোধের মধ্যে সত্য কোথায়? হায়, পূর্ব্বদিকে হরির বাস আর পশ্চিমে আল্লার মোকাম, এ ভ্রম তোমাদের কবে যাবে? আরে খুঁজে দেখো হৃদয়ের মধ্যে, সেখানেই রাম রহিমান্, ঈশ্বর, পরমেশ্বর!

জোর খুদাই মসীত বসত হৈঁ ঔর মুলিক কিসকেরা।
তীরথ মুরতি রাম নিবাসা দুহু মৈ কিন হুঁন হেরা।
পূরব দিশা হরী কা বাসা পছিম অলহ মুকামা।
দিল হী খোজি দেলৈ দিল ভীতরি ইহা রাম রহিমানা।।"

কিন্তু এই অভেদ দৃষ্টি ও বিশ্বমানবতাবোধ জাগতে পারে না--যদি না সকলের মধ্যেই একই পরম সত্য অনুভব করা যায়। কবীর নানক প্রভৃতি সন্তগণ সে জন্য একটি বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন—The Science of connecting the Soul with God who is All-Pervading, All-Love, All-Bliss এই বিজ্ঞান সাধনার Practical work অবশ্যই Spiritual Laboratory তে হয় Physical Laboratory তে নয় !

শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার এই গ্রন্থে সন্তদের উপলব্ধ সত্যই প্রকাশ করেছেন। এই সত্যকে—অভেদ সাম্য প্রেম ও সমন্বয়ের দৃষ্টিতে—ঈশ্বরোপলব্ধির Living, Exact-Science কে চেপে রেখেছে, যে সমস্ত ভ্রান্ত মত পথ, অন্ধ কুসংস্কার সাম্প্রদায়িক ভাষ্য টীকা টীপ্পনি—সে সকলের মূলে তিনি কঠোর কশাঘাত করেছেন—যুক্তিসিদ্ধ ওজস্বী ভাষায়। তাঁর প্রতিটি যুক্তিটি বেদ বেদান্ত উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের প্রচলিত সংস্কার এবং ধর্ম্মের ধারাকে বজায় রাখতে গিয়ে অনেক ওকালতি করেছি—বহু জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত আনিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করিয়েছি। কিন্তু তিনি বেদ বেদান্তের উপর ভিত্তি করেই ক্ষুরধার যুক্তিতে বিদ্যুদ্‌গর্ভ অগ্নিময় ভাষায় প্রচলিত সংস্কার ও ধারণা-ভাষ্য টীপ্পনির সমূহ যুক্তিকে তন্ন তন্ন করে খণ্ডন করে তা অসার প্রমাণ করে দিয়েছেন। তাঁর প্রতিটি কথা তিনি কবীর নানক প্রভৃতি সন্তদের বাণী এবং উপনিষদের যুক্তি দিয়ে সমর্থন করেছেন। সত্যের একটা নিজস্ব গতি সত্ত্বা আছে, তাই তাঁর এই বিশ্লেষণ (Analysis) পরিণত হয়েছে সংশ্লেষণে (Synthesis)।

ঐ সকল প্রশ্নোত্তরের সমষ্টি —এই "আলোক-তীর্থ"। তীর্থ কথাটি 'তৃ' ধাতু থেকে এসেছে, তৃ মানে ত্রাণ করা। এই বই এর পাণ্ডুলিপি শুনতে শুনতে বার-বার আমার মনে হয়েছে—এই "আলোক-তীর্থ" সত্যই সকলকে কুসংস্কার থেকে অজ্ঞতা থেকে ত্রাণ করবে। সত্য আনন্দ অমৃতের সন্ধান পেতে হলে—এই "আলোক-তীর্থ" এ সকলেরই অবগাহন স্নান আবশ্যক। তিনি এই গ্রন্থে এমন

সব আশ্চর্য্য নূতন সত্যে আলোকপাত করেছেন—যা থেকে Universityর ছাত্র-গণ, Research Scholar এবং সত্যানুসন্ধিৎসু গবেষকগণ অনেক উপাদান (Materials) পাবেন। তাই আমি এই বইটি প্রকাশ করবার জন্য দায়িত্ব নিয়েছি। কিন্তু একথা আমি সবিনয়ে স্বীকার করছি আমি মরণ-পণ পরিশ্রম করেও বইটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে ছাপাতে পারিনি। এই রকম একখানি গবেষণামূলক বই-যাতে সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী, উর্দ্দু, আরবী, ফারসী, গুরুমুখী পাঞ্জাবী বহু ভাষার অজস্র Quotation আছে—তা মফঃস্বল প্রেসে ছাপাতে গিয়ে Type এর অভাবে বিব্রত হয়েছি। গ্রন্থকার এবং পাঠকমণ্ডলীর মনোমত ছাপা না হওয়ায় আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং লজ্জিত। আমারই দোষে ১২৮ পৃষ্ঠার একটি 'প্রশ্নের' ভাষা অদলবদল হয়ে গেছে। এই জন্য একটি 'শুদ্ধিপত্র' দিয়েছি। পাঠক-গণ দয়া করে আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ক্ষমা করবেন আশা করি। প্রেসের কর্ম্মচারী বৃন্দের সহযোগিতার জন্য শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাই। তাঁরা যথেষ্ট যত্ন নিয়েছেন সাধ্যমত, সম্ভবমত। পরিশেষে জানাই, আমি একজন হোমিওপ্যাথির সেবকমাত্র। আমি সত্যের পূজারী। ' আলোক-তীর্থ ' এর মধ্যে আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি। সাধারণের নিকট এই সত্যের আলো পৌঁছে দেওয়ার জন্যই আমার এই চেষ্টা।

এই বই এ গ্রন্থকার, যেভাবে মিথ্যার মুখোস্ খুলে দিয়েছেন, বেদ উপনিষদের উপর ভিত্তি করে—যেভাবে অবতারবেশী ধূর্ত্তদের ভণ্ড গুরু এবং সম্প্রদায়ীদেরকে জনসাধারণের কাছে চিনিয়ে দিয়েছেন, তাতে আশঙ্কা করছি Negative Power এর Agentদের হাতে হয়ত তাঁকে লাঞ্ছিত হ'তে হবে ! এই আলোর দীপ্তি সহ্য করতে না পেরে অনেকেই হয়তো এই প্রদীপ্ত-প্রদীপ-শিখাকে নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু তাদের এ অপচেষ্টা ব্যর্থ হবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। কেননা, সত্য তার আপন-মহিমায় পথ করে নেবেই, বাইরের বাধা ঘরের বিরোধ মাঝে মাঝে পথ রোধ করবার চেষ্টা করলেও সত্যের অগ্রগতি কোনদিন রুদ্ধ হতে পারে না।

সত্যসন্ধানী গ্রন্থকার এ সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত। কারণ তিনি জানেন—

কবীর নিজ ঘর প্রেমকা সাগর অগম অগাধ।
সীস উতারি পগতলি ধরৈ তব নিকট প্রেমকা স্বাদ।

[কবীর]

প্রেমের ঘরে পেঁছিতে হলে অগম্য অগাধ পথে চলতে হয়। যে নিজের মাথাটা, প্রয়োজন হলে তাঁর চরণ তলে, সত্যের বেদীমূলে ডালি দিতে পারে, সেই পায় প্রেমের স্বাদ "।

যাঁরাই আজ পর্য্যন্ত সত্যকথা স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেছেন— তাঁদেরই কপালে জুটেছে দুঃখ, দুর্দ্দশা, লাঞ্ছনা। কিন্তু তাই বলে তো যথার্থ সত্যনিষ্ঠ তপস্বীর দল অন্যায়ের ভয়ে ভীত হন না। আমি জানি সত্যসন্ধানী গ্রন্থকার অজ্ঞের ভ্রূকুটিকে গ্রাহ্য করেন না। তাই তিনি নিজেই সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিযে এই বইটি ছাপিয়েছেন।

সূরা চড়ি সংগ্রাম কোঁ পাছা পগ ক্যোঁ দেই। [দাদূ]

বীর চলেছেন সংগ্রামে—তিনি কেন হবেন পশ্চাৎপদ ?

সন্তধাম—কর্ণেলগোলা।
মেদিনীপুর—২৫।১২।৫৭

বিনীত
ডাঃ—বঙ্কিম চৌধুরী

গ্রন্থ-সূচী

১। প্রথম অর্ঘ্য

তৃতীয় পুষ্প

গদ্‌গদানি ফেনা'; **শিষ্যদের দোষ, তাঁদের আত্মঘাতী সহজ বিশ্বাস প্রবণতা:**— বিচার বুদ্ধির অভাব, miracle-mongering এবং স্বার্থসিদ্ধির পাটোয়ারী প্যাঁচ; প্রকৃত সত্যসন্ধানীর লক্ষণ; ঝুটা গুরুগিরির পরিণাম; শিষ্যের পাপ গুরুতে বর্ত্তে; 'ঝুটা গুরুর গুরুগিরির মত আর মহাপাতক নেই;

চতুর্থ পুষ্প (৬০-৮৯)

ইহ জীবনেই ঈশ্বর দর্শন সম্ভব কি না? 'Dying while Living'. "ইহজন্মে না হইলে পরজন্মে হবে"—ভণ্ডদের এই মিথ্যা আশ্বাস খণ্ডন। 'যাঁরা তাঁকে জানেন তাঁরা অমৃত হন'। জিতাজিত মরনা হ'ল আলোক রাজ্যে নব-জন্ম; সন্তদের বিচিত্র অনুভূতির আলোক সম্পদ।

'সাধো ভাই! জীবত হি কর আশা'।

হাজার হাজার সাধু যে বিভিন্ন দেবদেবী মন্ত্রে লক্ষ লক্ষ লোককে দীক্ষা দেন তাতে ফল হয় কি না? 'মন্ত্র' কথাটির প্রকৃত অর্থ কি? বেদ এবং উপনিষদ্ দৃষ্টিতে 'মন্ত্র' কথাটির নিগূঢ় রহস্য। মন্ত্র মানে 'রাং, ক্লীং, দ্রং, তুং, টিং ঢ্যাং, ধরণের কিম্ভূত কিমাকার বচন বিন্যাস নয়। ঋষিরা মন্ত্র শক্তিতে অসাধ্য সাধন করতেন তার প্রকৃত significance কি? মন্ত্র মানে যুক্তি-বিচার-উপায়। কৃষ্ণনাম জপে ফল হয় কি না? কৃষ্ণ নামের শ্রেষ্ঠত্ব খণ্ডন : কৃষ্ণ সম্বন্ধে বিখ্যাত গবেষণাকারী পণ্ডিতদের গবেষণা; স্যার আর, জি, ভাণ্ডার কর, মেগাস্থিনিস এরিয়াণ, ম্যাকক্রিণ্ডেল ডাঃ এস, কে, দে, ডাঃ ব্রজেন শীল প্রভৃতি মনীষীর মতানুযায়ী কৃষ্ণের মানবীয় সত্ত্বার প্রমাণ; বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎপত্তি রহস্য; কৃষ্ণের "নরাকৃতি পরব্রহ্ম'ত্ব' বৈষ্ণব মান্য মহাভারত ভাগবতাদি শাস্ত্রের আলোকে খণ্ডন; কৃষ্ণনাম জপে পঞ্চপাণ্ডব, যদুপত্নী এবং তাঁর সমসাময়িক কারও উর্দ্ধগতি হয় নি, বরং নরকভোগ হয়েছিল—সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা। "সব নামই যখন তাঁর নাম, তখন যে কোন নামে ডাকলে অর্থাৎ গোপালকে টোপাল, হরেকৃষ্ণকে ফরেকুষ্ট বলে জপলে ফল হবে" যারা বলে তাদের সেই ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন। 'বর্ণাত্মক নাম জপে যদি কিছু না হয় তাহলে বাল্মীকি মরা মরা জপে সিদ্ধ হলেন কি করে,' এই ধরণের কল্পিত যুক্তি খণ্ডন।

২য় অর্ঘ্যের—দ্বিতীয় পুষ্প

সম্প্রদায়ীদের দ্বারা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিকৃতির নমুনা। 'হরতি ভূমি তৃণ সঙ্কুল সমুঝ পরে নহি পন্থ'! 'লক্ষ্মী,' 'শক্তি,' 'দেবী' কথার প্রকৃত অর্থ 'পরমাত্মা'। 'জিমি পাখণ্ড বিবাদতে...' দুর্গাপূজার উৎপত্তি রহস্য, মূল উৎস। কৃত্তিবাসাদি রামায়ণকারদের কল্পনার কুহেলি! বাল্মীকি Vs কৃত্তিবাস! বাল্মীকি রামায়ণ Vs কৃত্তিবাসী রামায়ণ। বহু প্রকারের কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

তৃতীয় পুষ্প (১৪৩—১৫৭)

'শ্রীবিগ্রহ অপ্রাকৃত চিন্ময়' এই অপ্রাকৃত তত্ত্ব খণ্ডন।

অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকূপ হত্যা। কৃষ্ণের প্রাকৃত দেহ প্রাকৃত জন্ম ও তপস্যার বিবরণ। ভাগবত মতেই কৃষ্ণের প্রাকৃত জন্ম কর্ম্ম! কৃষ্ণের প্রাকৃত দেহের অগ্নি সংস্কার। 'স কৃষ্ণঃ ··ত্যক্ত্বা দেহং দিবং গতঃ,' কৃষ্ণ যে পরমাত্মা ছিলেন না তার প্রমাণ। বৈষ্ণবদের 'নরাকৃতি পরব্রহ্মের' কিঞ্চিত স্মৃতিভ্রংশ! 'ধড়াচুড়া মূর্ত্তির চিন্ময়ত্ব' প্রচার সম্প্রদায় সৃষ্টির অপকৌশল। গীতোক্ত 'মম ময়ি মাম্' কথাগুলির ভাবার্থ। 'তদাদেশ' 'আত্মাদেশ' এবং অহংকারাদেশ'। সংঘাত দৃষ্টি Vs স্বরূপ দৃষ্টি। স্বরূপ বোধের পরিবর্ত্তে জড় মূর্ত্তি পূজা মূঢ়তা!

চতুর্থ পুষ্প (১৫৮—১৭১)

'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' সমালোচনা। শ্রীজীব গোস্বামীর ব্যাখা বিভ্রাট! শ্রীজীবীয় কসরৎ! মহাভারত মতে কৃষ্ণ অংশ 'পূর্ণ' নন। ভাগবতমতেও কৃষ্ণের পূর্ণত্ব টিকে না। শ্রীজীবের 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা !!

ভাগবতই বলছে—কৃষ্ণ ভূমাপুরুষের অংশ! মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ-মতে কৃষ্ণ 'কেশাবতার' মাত্র! 'মৎ কেশো ভবিতা সুবাঃ [ভাগবত]' শ্রীজীবের 'ভ্রম'। 'প্রমাদ' ও 'করনাপটব' !!
শ্রীজীবাদি গৌড়ীয়দের 'অপ্রাকৃত' ছলনা !!!

তৃতীয় অর্ঘ্যের--দ্বিতীয় পুষ্প

যৌন লীলাই বলতে হবে। প্রাক্ চৈতন্য যুগে বৈষ্ণব ধর্ম্মের রূপ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধুর ভাব সাধনার উৎস। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে বামাচারী তন্ত্রমতের প্রভাব। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা রাধাপ্রেম কল্পিত। কৃষ্ণ নিজের পরিচয় দিয়েছেন বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি, গোপিকাবল্লভ নয়! বলদেব বিদ্যাভূষণের প্রমেয় রত্নাবলী সাম্প্রদায়িক প্রচার মাত্র।

তৃতীয় পুষ্প (২১৮—২৩৩)

তন্ত্রমত quote করেই মূর্ত্তিপূজা খণ্ডন। 'স্তুতির্জপোঽহংমোভাবো বহিঃপূজাধমাধমা'। জড়ের পূজা করে কবে বুদ্ধিতে জড়ত্ব সঞ্চারিত। ৫১ পীঠস্থান কল্পিত, স্বার্থান্বেষীদের সৃষ্টি। সতীর দেহ বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত করা হয় নাই, যোগাগ্নিতে দগ্ধ হয়েছিল। ৫১ পীঠস্থানের কাহিনী রক্তপায়ী মৎকুনদেরই রটনা! শিব তন্ত্র শাস্ত্রের প্রবক্তা নন। শিব সম্বন্ধে তন্ত্রকার ও পুরাণকারদের কেচ্ছাকাহিনী। তন্ত্রের উৎপত্তি রহস্য। তন্ত্রমত খণ্ডন। সর্বনাশা তন্ত্রমত। তন্ত্রমত মিথ্যা ও কল্পিত। 'কারা ঐ ভ্রষ্টাচারী দুর্ভাগার দল?

চতুর্থ পুষ্প ২৩৪—২৪৯

রামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' theory খণ্ডন। মনোময় কোষ পর্যান্ত বহুমত হতে পারে, 'হিরন্ময়ে পরে কোষে' পথ একটাই। পরমাত্মাকে অনুভব করার পথ একটাই। রামকৃষ্ণ করে গেলেও তন্ত্রমত কুপথ ও বিপথ। রামপ্রসাদ তন্ত্র সাধনা করেন নি। ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে? মাটির মূর্ত্তি গড়ে রে মন করতে চাও তাঁর উপাসনা? তান্ত্রিকদের শিবের নামে গ্রন্থ রচনার কৌশল। তান্ত্রিকদের রুমালের বিড়াল ব্যাখ্যা। তন্ত্রমত পতনের ঘূর্ণাবর্ত্ত। Ramkrishna set a very bad example! তন্ত্র সাধনার নামে ক্লেদাক্ত যৌনলীলা।

পঞ্চম পুষ্প

(২৫০—২৬৩

কালীমূর্ত্তি পূজা করেই যে রামকৃষ্ণ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন—এ ধরণের ধারণা খণ্ডন :—

সাধনার শৈশব অবস্থায় রামকৃষ্ণের ঐ পুতুল খেলা—ধ্যানেই তাঁর সিদ্ধিলাভ, মূর্ত্তি পূজাতে নয়—কালীদর্শনেব পর ব্রহ্মদীক্ষা লাভ — তোতাপুরী কর্ত্তৃক রামকৃষ্ণকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ—তার পরেও তাঁকে কালীপূজক বললে ব্রহ্মদীক্ষা লাভ কি ব্যর্থ ? রামকৃষ্ণের সিদ্ধির মূলে প্রাণফাটা কান্না ও সদ্‌গুরু কৃপা—জড় মূর্ত্তিপূজা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের অগ্ন্যুদ্গীরণ—মূর্ত্তি—পূজা ও বহিরাচারের বিরুদ্ধে বেদান্ত কেশরীব হুঙ্কার—বেদান্তের দুন্দুভি ঘোষণা—আত্মজ্ঞ মহাপুরুষকে কালি কিঙ্কর ভাবলে হেয় করা হয়।

৪। চতুর্থ অর্ঘ্য

(২৬৪—২৮২

প্রথম পুষ্প

রামকৃষ্ণ যুগাবতার ছিলেন কি না :—এই প্রশ্নের সমীক্ষা, যুক্তিসিদ্ধ বিশ্লেষণ :— রামকৃষ্ণ অবতার ছিলেন না—তাঁর যুগবতারত্ব বিশেষ ভাবে বিচার ও খণ্ডন—সাধুর পরিত্রাণ দুর্জ্জনের বিনাশ কোন কিছুই তিনি করেন নি—পাপী ও পতিতকে তিনি ঘৃণা করতেন—সে যুগের মহাপুরুষদের কাছে তিনি ঋণী ছিলেন—সে যুগে তাঁর চেয়েও বহু শ্রেষ্ঠতর মহাপুরুষ ছিলেন—সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় একটা ক্লীবের আপোষ নয়! কবীরই ছিলেন প্রকৃত ধর্ম্মসমন্বয়কারী—সন্তদের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়—কবীরের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় অভেদ প্রেমদৃষ্টি— সবল ধর্ম্মমতের আচার ও সংস্কারের special mixture কে ধর্ম্ম সমন্বয় বলে না— বেদ উপনিষদের সমন্বয় বাণী—প্রাচীন যুগে সমন্বয় ও সমদৃষ্টির মহত্তম ভাব ধারা—শাঁস ও ছোবড়ার Equation কষে দিলে ধর্ম্ম সমন্বয় হয়ে যাবে না— সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ের credit রামকৃষ্ণের প্রাপ্য নয়—অমূলক প্রচার মাত্র! রামকৃষ্ণের Reduction ad-absurdum of Religious Loyalties.

চতুর্থ অর্ঘ্যের

দ্বিতীয় পুষ্প (২৮৩—২৯৯)

রামকৃষ্ণই জীবসেবা ও মানবতাবাদ প্রচার করেছেন—এ ধরণের ভ্রান্তি নিরসন :—
স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পরব্রহ্মলাভ ও জীবসেবার আদর্শ বহু প্রাচীন ঋষি করে গেছেন—ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানবতাবাদ প্রচারে পথিকৃৎ কে? কারা? ব্যক্তিবিশেষকে অবতার বলে প্রচার করার মূলে কি কি দুরভিসন্ধি থাকে—সে সম্বন্ধে বিবেকানন্দের উক্তি—

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে Touch করে কালীদর্শন বা নির্বিকল্প সমাধির আস্বাদন দিয়েছিলেন—এই ধরণের বহুল প্রচারিত ভ্রান্তির নিরসন :—

তিনি touch করেই কালী দেখিয়ে দেন নি—উপনিষদের দৃষ্টিতে স্বামীজীর অনুভূতি বিশ্লেষণ—রামকৃষ্ণের প্রতি স্বামীজির সংশয় বরাবর ছিল—পওহারীবাবার কাছে শান্তিলাভ ও দীক্ষা প্রার্থনা—নির্বিকল্প সমাধির লক্ষণ—প্রকৃত সমাধি কাকে বলে ?

'হ্যাঁ ভগবান দেখেছি তেকোই দেখাতে পারি"—রামকৃষ্ণের এই দৃঢ় প্রত্যয় অভিনব নূতন নয় :—অনুভবী পুরুষ মাত্রেরই ঐ কথা—'কহে কবীর নির্ভয় হো হংসা !' রাকৃষ্ণের সময়েই ঐরূপ দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণার বহু মহাপুরুষ ছিলেন—কাজেই—ঐ জন্যও রামকৃষ্ণের অবতারত্ব সিদ্ধ হয় না।

তৃতীয় পুষ্প (৩০০—৩১৩)

মহাবীরের সাধনায় ভ্রান্ত সংস্কার বশে রামকৃষ্ণের লেজ বৃদ্ধি—হনুমানজী মানুষ ছিলেন, রামকৃষ্ণের কুধারণানুযায়ী তাঁর লেজ ছিল না—বানরগণ মনুষ্যাকৃতি ছিলেন—বালী-সুগ্রীব হনুমানাদি যে মানুষ ছিলেন তার প্রমাণ—হনুমানের লাঙ্গুল শূন্যে গমনাগমনের জন্য ব্যোমযানের মত যন্ত্র

চতুর্থ অর্ঘ্য—তৃতীয় পুষ্প

বিশেষ—বালী সুগ্রীবাদি যে বন্যবানর ছিলেন না—চিকিৎসাশাস্ত্র ভাস্কর্য্য শিক্ষা-সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের সকল শাখায় সমুন্নত ছিলেন তার প্রমাণ—'বানরেন্দ্র গৃহং রম্যং মহেন্দ্র সদনোপমম্' বানরদের সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শিতা—বালীর অগ্নিহোত্রানুযায়ী প্রেতকার্য্য—**ঐ বানরগণ পুলস্ত্যঋষির পুত্র, মানুষই ছিলেন—**

চতুর্থ পুষ্প (৩১৪—৩২৬)

যক্ষরক্ষগন্ধর্ব্ব কিন্নরেরাও মানুষ ছিলেন কোন বিকটদর্শন জীব নয়—কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণার মূল কারণ কি. কি? পুরাণকার টীকাকার ও কোষকারদের বাখ্যা বিভ্রাট—গরুড় জটায়ু সম্পাতি সুপর্ণরা মানুষ ছিলেন, পাখী নন—তাঁদের মনুষ্যদেহ ছিল—খেচর পাখী ছিলেন না—তক্ষক বাসুকী প্রভৃতি নাগেরাও মানুষ ছিলেন—শেষ নাগের তপস্যা—নাগেরাও যে মানুষ ছিলেন তার অকাট্য প্রমাণ নাগপত্নীগণের কর্ণে স্বর্ণ কুণ্ডল মস্তকে দীর্ঘ বেনী—বানর সুপর্ণনাগ-কেউই মনুষ্যেতর প্রাণী নন।

চতুর্থ অর্ঘ্য

পঞ্চম পুষ্প (৩২৭—৩৫৩)

অবতারবাদ পরীক্ষা, নিরীক্ষা এবং খণ্ডন—অবতারবাদ বেদ বিরুদ্ধ, অসীম অনন্ত ভগবান জন্মান না, তিনি 'অমূর্ত্তঃ', অবতারবাদ দেশের কি ভাবে সর্ব্বনাশ করেছে—অবতার কল্পনার মূলে কতখানি মিথ্যা—ব্যক্তিগত অবতার সৃষ্টি এবং জঘন্য propaganda! অবতারবেশী ধূর্ত্তের দল, অবতারের অবতার Poeket Editions—মহাভারতের দৃষ্টিতে অবতারবাদ অসার—দেশে হাজার গণ্ডা অবতার-তবু কেন এই দুর্দ্দশা?

৫। পঞ্চম অর্ঘ্য

প্রথম পুষ্প (৩৫৪—৩৬০)

মূর্তিপূজা মূর্তিধ্যানে মূর্তি দর্শন মনেরই খেলা, Illusion :—এক ভাব পাগলিনী মায়ের গল্প, আর একটি বৈষ্ণবী মায়ের ভাবরস, Hallucination ! Hypersensitive brain এর প্রতিক্রিয়া !

দ্বিতীয় পুষ্প (৩৬১—৩৭১)

"শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত পাষণ্ডী"—চৈতন্যের উক্তি বলে প্রচারিত এইটির উপর ভিত্তি করে যারা মূর্তিপূজা সমর্থন করে - তাদের প্রলাপোক্তি খণ্ডন :— ন তস্য প্রতিমা অস্তি (বেদ) ভাগবত ও গীতাতে মূর্তিপূজককে কৃষ্ণ 'গোখরঃ' বা গাধা বলে (ধিককৃত) করেছেন !

শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ দেবের মূর্তির সঙ্গে মিশে গেছলেন এই বলে মূর্তি জীবন্ত বলে যারা প্রমাণ করতে চায় তাদের সেই ভ্রান্তি নিরসন :— ঐটি মিথ্যা রটনা, স্বাভাবিক ভাবে রোগে ভুগে চৈতন্যদেবের দেহাবসান—মূর্তিতে মিশে যান নি—সে সম্বন্ধে গবেষণামূলক তথ্য পরিবেশন।

তৃতীয় পুষ্প (৩৭২—৩৮৩)

'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং' গীতার এই শ্লোকটী অবলম্বন করে যারা বহিরাচার support করতে চায় তাদের ভ্রান্তি নিরসন :—ভগবান, ভক্তিচান, ফল জল কলা মুলা নয়, ঐ শ্লোকের Inner spirit ভক্তিভাব, বহিরাচার নয়।

পঞ্চম অর্ঘ্য—তৃতীয়পুষ্প

'যো যো যাং যাং তনুং' গীতার এই শ্লোক ভিত্তি করে যারা মূর্ত্তিপূজার স্বপক্ষে ওকালতি করে তাদেরও যুক্তি খণ্ডন ঃ—

চতুর্থ পুষ্প (৩৮৪—৩৯৮)

"আপনি মূর্ত্তিপূজা অবতারবাদ মানেন না, গুরুবাদ ত বেশ মানেন! আমারই মত একজন মানুষের কাছে নতি স্বীকারে Loss of personality হয়"— এই প্রশ্নের সদুত্তর ঃ— সদ্‌গুরুলাভ শ্রেয়লাভের পথ, সকলশাস্ত্রেই সদ্‌গুরুস্তুতি, সদ্‌গুরুর কাছে শিষ্য গোলাম নয়—দিব্য আনন্দে বিভোর, Personality টা মুখোস্ পাত্র, সদ্‌গুরু এই মুখোস খুলে স্বরূপ চিনিয়ে দেন, কাজেই তাঁর কাছে loss of personality এর বিনিময়ে মহাজীবন লাভ, সন্তসদ্‌গুরুর কাছে loss of self হয় না, Gain of Divine self, True self হয়।

পঞ্চম পুষ্প (৩৯৯—৪১২)

সচ্চিদানন্দ ভগবানকে পেলে কি রকম আনন্দ হয়—তুলনামূলকভাবে তার পরিমাণ নির্ণয় উপনিষদের দৃষ্টিতে ঃ—

ব্রহ্মানন্দলাভে কি রকম আনন্দ? তারও কোটি কোটি গুণ অসীম আনন্দ সেখানে হংস জঁহা আনন্দ করে......

"আমরা যদি ভগবানকে না ডাকি ক্ষতি কি'? এই প্রশ্নের উত্তর ঃ—

নাস্তিক কেউ নেই সবাই তাঁকে ডাকছে, প্রত্যেকের জীবন একটি সমগ্র ধ্যান তাঁকে না পেলে 'ব্রহ্মক্ষুধা' (Hunger for the Absolute মিটে না...)

গ্রন্থকারের নিবেদন

বাবা প্রায়ই আমাদেরকে একটি হিন্দী দোঁহা শোনাতেন—

সাধু এ্যায়সা চাহিয়ে সাঁচী কহে বনায়।
কৈ টুটে কৈ ফিরে জুড়ে, বিন্ কহে ভরম ন জায়॥

সত্যাশ্রয়ীর উচিত সত্য কথা বলা; সত্য কথা বলতে গিয়ে কারও তোয়াক্কা করার প্রয়োজন নেই, তাতে কারও সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় হবে। সত্য কথা না বললে ভুল ভাঙ্গে না ভ্রম ঘুঁচে না। বাবা বলতেন, "কোন জিনিষই নিজের বিবেক বুদ্ধি দিয়ে যাঁচাই না করে তা মেনে নিবি না। অন্তরস্থ বিবেকবাণীরই অনুসরণ করবি। সত্য এবং সদ্‌গুরু ছাড়া মানুষের জীবন পূর্ণ নয়।" এই সদ্‌গুরুর অন্বেষণে সারা ভারতবর্ষ আমি বার কয়েক পরিক্রমা করেছি। হোসিয়ারপুরের আর্য্য সমাজ, কাশী হরিদ্বারের বেদান্ত বিদ্যাপীঠগুলি, রমণ মহর্ষি, জ্যোতির্মঠাধীশ ব্রহ্মানন্দস্বামী এবং আরো অনেক সাধু মহাত্মার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছিল। এ বিষয়ে আমি দুজনের স্নেহ, সহায়তা, দয়া, সেবা এবং সাহায্য পেয়েছি—তাঁরা হলেন—আমার দাদা—শ্রীমৌলীন্দ্র নারায়ণ ঘোষাল এবং সন্তদাস—শ্রীনলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

সারাভারত পর্য্যটন করে—বহু শাস্ত্র—সাধু এবং মঠমিশনের সংস্পর্শে এসে লক্ষ্য করলাম— মনুষ্যত্বের অভাব, অভাব মানবিক মূল্য বোধের। ধর্ম্মের নামে চলেছে অনাচার। স্বাধীন চিন্তাশীলতার অভাব। মানুষ অন্ধবিশ্বাসের যুপকাষ্ঠে একরকম প্রায় বাঁধা! সম্প্রদায় আছে, সত্য নেই; অধীতি আছে বোধ নেই; বোধ আছে ত আচরণ নেই। পণ্ড করা পণ্ডিত আছে—কিন্তু পণ্ডা—বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি লোপ পেতে বসেছে! সন্ন্যাসী—সংস্কারত্যাগী সন্ন্যাসী চোখে পড়ে না—সৎ+নাশী=সন্ন্যাসী দল ভারতবর্ষ ছেয়ে আছে!!! কবীরের পুত্র

কমাল সাহেব সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন—"জীবনে গুরুর অগ্নি (সত্যকে) বহন কর। নিভানো মশাল আর নিভানো কাঠের টুকরা সংগ্রহ করে অন্ধকার ভাণ্ডারের (অজ্ঞানতার) বোঝা বাড়িও না। গুরুকে (তাঁর সত্যকে) মেরে ফেলে সম্প্রদায়ের মঠ বাড়ী গড়ে তুলবার গৌরব লুব্ধতা ছাড়।" দেখলাম, সর্বত্র এর বিপরীত আচরণ! মহাপুরুষদের জীবনাদর্শ এবং জীবনচর্য্যা অনুসরণ না করে, সত্যমিথ্যার রং এ কল্পনার তুলিতে ভক্তগণ তাঁদেরকে 'অবতার' 'ভগবান' বানিয়ে ছেড়েদিয়েছেন! তাঁদের 'উক্তি' বলে কল্পিত বাণীর পাহাড়-প্রমান পুঁথিরচনা করেছেন, চারিদিকে নিভানো মশাল আর নিভানো কাঠের টুকরা! প্রচারের ঢক্কা নিনাদ! মঠ বাড়ী গড়ে তুলবার সব গ্রাসী গৌরব লুব্ধতা !!

কোন এক শুভমুহূর্ত্তে, কাশ্মীরের পথে দাতাদয়াল সন্তসদ্‌গুরুর দর্শন লাভ করি। জীবন ধন্য হ'ল। কবীর নানকের বাণীবচন অনুশীলন করে নতুন সত্যের সন্ধান পেলাম। আমার এই অমৃত-তীর্থ পরিক্রমার কথা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা করেছি।– সেই আলোচনার ফল—এই "আলোক-তীর্থ"। এখানে আমি উপদেষ্টা নয়, আমার বাস্তব-অভিজ্ঞার ফল আমার শ্রদ্ধেয় প্রিয়-পরিজন-বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলোচনা করেছি মাত্র। আমাকে সব চেয়ে বেশী প্রশ্নবানে যাঁরা জর্জরিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে—শ্রদ্ধেয় সন্তদাস শ্রীনলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ বঙ্কিম চৌধুরী, অভিন্ন হৃদয় বন্ধু শ্রীঅসীমকুমার মল্লিক বি, এ, এল, এল, বি,; শ্রীগোবিন্দ বসু বি, এ, রাশিয়া হতে সদ্য প্রত্যাগত শ্রীকুমুদ ঘোষ এম, এ, অধ্যক্ষা শ্রীসুপ্তি সিন্‌হা এম, এ, পি, এইচ, ডি, ডাঃ শ্রী পি, এন মোহরা, শ্রীসুনীল কুমার রায় বি, ই, সি, ই, শ্রীনরেশ মৈত্র বি. এ. এবং শ্রীশরৎ চন্দ্র রায় বি. এ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের প্রত্যেকেই আমার শ্রদ্ধার পাত্র। বইটির পাণ্ডুলিপি শুনে দাদা বলেছিলেন—'আমি সর্ব্বস্ব বিক্রি করে হলেও এই বই ছাপাতে চাই। সত্য প্রকাশিত হোক। এই বই মানুষকে কুসংস্কার আর ভ্রান্তির নাগপাশ থেকে বাঁচাবে"। ডাঃ বঙ্কিম চৌধুরী বলেছিলেন— "এই বইটা" ছাপানো আমাদের একটা sacred duty এই বই ছাপিয়ে আপনাকে ধন্য করবো না আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের প্রতি কর্ত্তব্য করে যাবো। কেননা—"আলোক-তীর্থ" তাদেরকে যাবতীয় অনাচার, কদাচার, ধর্ম্মরাজ্যের বিভীষিকা এবং

ভণ্ড সাধু গুরুদের অক্টোপাশ-গ্রাস থেকে বাঁচাবে"। এই সকল প্রেরণা পেয়ে আমি শ্রদ্ধেয় সন্তদাস শ্রীনলিনীকান্ত বাবু এবং ডাক্তার চৌধুরীর হাতে পাণ্ডুলিপি দিয়েছিলাম। ডাঃ বঙ্কিম চৌধুরী যে বিপুল পরিশ্রম করে এই বইটি ছাপালেন—তাতে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই। সন্তদাসজী এবং ডাঃ চৌধুরী দুজনেই আমার সাথী, সখা, সুহৃদ পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র। এঁদের দুজনের ঋণমুক্ত হওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। যাঁর দয়ায় আমি তৃপ্ত এবং ধন্য হয়েছি—সেই অপার দয়ানিধির আশীষধারা এঁদের দুজনকে নিত্য অভিসিঞ্চিত করুক।

সত্যের খাতিরে এই বই এ অনেক লোকমান্য মহাপুরুষদের সমালোচনা করতে বাধ্য হয়েছি। কারণ, যে মানুষের নীতি বা উপদেশের প্রভাব সমগ্র দেশের উপর পড়ে তাঁর প্রবর্ত্তিত মত পথের সমর্থন বা প্রতিবাদ, খণ্ডন বা মণ্ডন করার অধিকার সকলেরই আছে বলে মনে করি। শ্রীচৈতন্য এবং রামকৃষ্ণের কথাই আমি বিশেষ করে বলছি। আমি মনে করি—সম্প্রদায়ের কবলে পড়ে প্রচারের ঘনঘটায় এঁদের মতবাদ বিকৃত হয়েছে। তাই পাঠক একটু ধৈর্য্য নিয়ে আমার যুক্তিগুলি অনুধাবন করলেই বুঝতে পারবেন—আমি বস্তুতঃ এঁদের মহিমা প্রকাশই করেছি; সমালোচনা করেছি অভেদদর্শী শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণকে নয়, সম্প্রদায়ীদের সৃষ্ট মন-গড়া চৈতন্য-রামকৃষ্ণদেরকেই বেদ উপনিষদের আলোক-যুক্তির Acid Test দিয়ে পরখ্ করবার চেষ্টা করেছি মাত্র! বলা বাহুল্য, বিবেক-অনল সংযোগে কৃত্রিম বস্তুর বিকৃতি ধরা পড়েছে কি না সুধী পাঠকগণের তা বিচার্য্য।

তবুও একথা সবিনয়ে জানিয়ে রাখি, ভয়ঙ্কর বিস্ফোটক হলে সামান্য অঙ্গুলি স্পর্শও যেমন অসহনীয় হয়, তেমনি অন্ধ বিশ্বাস এবং কুসংস্কারের দূষিত বীজাণু যাঁদের হৃদয়ে বিস্ফোটকাকার ধারণ করেছে—সেই সব স্পর্শকাতর, চঞ্চল সরল বিশ্বাসীরা এই "আলোক-তীর্থ" কিনে অর্থব্যয় করবেন না! যে সকল ভক্তের, প্রহ্লাদের ন্যায় "ক" অক্ষর দর্শন মাত্র নেত্র অশ্রুপূর্ণ হয়, "কৃষ্ণ" শব্দটি সম্পূর্ণভাবে পড়তেও পারেন না, 'বৎস', শকুন্ত লাবণ্য দেখ', এই বাক্য শুনে দুষ্মন্ত শিশুর যেমন মা শকুন্তলার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল, তেমনি 'যমুনা', কেলি, কদম্ব, রাধা' এই বাক্যগুলি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রই যাদের স্বেদ অশ্রু কম্পন দেখা দেয়, 'জ্ঞান-বিবেক-বিচার' এই তিনটি কথা শোনা মাত্রই

যাঁদেরকে কৃষ্ণনাম স্মরণ করতে হয়, তাঁদের জন্য এই বই নয়! **জ্ঞান-বিবেক-**বিচার -বিশ্লেষণের যাঁরা চিরশত্রু তারা এই বই হাতে করলে, ব্যথা পাবে। আমি অবশ্য স্বরূপ বর্ণনাই করেছি, **'স্বরূপ বর্ণনা ন তু নিন্দা ন চ স্তুতি।'**

"আলোকতীর্থ" এর উদ্দেশ্য—**স্বাধীন চিন্তার প্রসার, সত্যানুসন্ধান** এবং **সত্যোপলব্ধি।** এই বইএ যে পথের সন্ধান দেওয়া হয়েছে —**তাহ'ল বীরদের সাধনার পথ, এখানে কাপুরুষদের স্থান নেই। "কাইর কাম ন আবই যহু সুরে কা খেত।'** (দাদূ)

বীরদের জন্যই "আলোক-তীর্থ," কাপুরুষদের জন্য নয়।

সন্তধাম, পোঃ—জনার্দ্দনপুর
মেদিনীপুর
১৩, ৯, ৫৭

শ্রদ্ধাবনত ঃ—
শৈলেন্দ্র নারায়ণ ঘোষাল

প্রেরণা

(ক) 'আচার, বিচার, মন্দির, বিগ্রহ, জড়মূর্ত্তি, কর্ম্মকাণ্ড—এ সবই বাহ্যিক ; এগুলি ঠিক কাঁটার মত। এই কাঁটা মুক্ত হয়ে মিলিত হ'তে হবে, এই কাঁটায় কণ্টকিত হয়ে আলিঙ্গন করতে গেলে তা হবে সজারুর আলিঙ্গনের মত। ভেদ বিভেদ থেকে মুক্ত হও। সত্য দেবতা আছেন অন্তরে। অন্তরমুখী হও। অন্তরে মহাসত্যে ফিরে এসো, সেখানে বৈচিত্র আছে, বিরোধ নেই। এই অন্তরের মন্দিরে জ্বলছে মানব সাধনার নিত্য দীপ—সেই আলোকই আমাদের গুরু, সংস্কার মুক্ত হলে এই গুরুবাণী পাবে শুনতে'—(কবীর)

(খ) সন্তন কী গতি অগম সুনাউঁ। বারবার তুমকো সমঝাউঁ ॥
পঞ্চমচক্র জীবকা বাসা। ছট্‌বেঁ মেঁ হৈ সুরত নিবাসা ॥
এহাঁ সে রাহ্‌ সন্তমত জারী। নৈন নগর বিচ্‌ মারগধারী ॥
সহস্র কমল পরে তিন অস্থানা। ত্রিকুটি সুন্ন আর গুফাবখানা ॥
তাকে পরে ধাম সতনামা। সত্যলোক সদ্‌গুরুপদ জানা।
অলখ লোক তিস্‌ উপরে হোই। তাকে পরে অগম হৈ সোই ॥
তিসকে আগে ধুরপদ জানো। এহি পূরণ মুক্তিপদ মানো ॥
(পরমসন্ত শিবদয়াল সিং)

অর্থাৎ সন্তের কথা এবার তোমাকে শোনাই বার বার করে। তাঁর কথা অগম অর্থাৎ সহজলভ্য নয়। পঞ্চম চক্রের উপর ষট্‌চক্রে সুরত অর্থাৎ জীবাত্মার স্থিতি। এইখান থেকেই সন্তমতের ক্রিয়া আরম্ভ— পথ সুরু হয়েছে এইখানে। আর চক্ষুতারকার মধ্য দিয়ে এই পথ গেছে চলে। প্রথমে সহস্র দলকমল। তার উপরের তিনটি ধামের নাম ত্রিকুটী শূণ্য ও ভ্রমরগুফা। তারপরে যে ধাম

তা হ'ল সত্যলোক। এখানে সদ্‌গুরু সত্যপুরুষ অধিষ্ঠিত রয়েছেন, তার উপরে আছে অলখ লোক। তার উপরে অগম লোক। সর্বোপরি ধুরধাম—এইখানে পৌঁছালেই হয় পূর্ণ মুক্তিপদলাভ।

(গ) " Man is the top of all creation, the perfect handiwork of Nature in all respects. He contains within himself the key to unlock the Mystery of the Universe and contact the Creator. It is the greatest and the highest good fortune of any sentient being to be born in the form of a man. But his responsibilities are also correspondingly great. Having come up to the top of the evolutionary ladder, he should now step on the ladder of '**Nam**' and tread the Spiritual Path that would ultimately lead him to the Divine Home whence he came.

If he fails to do so, he slides down and according to his karmas, his desires and inclinations will have to sojourn in this world of change and go through the various forms of Creation. In the human body, eye-centre is the spot which represents the end of the one course and the beginning of the other. He may go up or he may slide down.

This is the Message which all Saints and Masters have in their time, given to the world. Our dearly Beloved Master S, Sawan Singhji in whose memory, we have gathered here to-day, preached this very Truth for 45 years and helped those who accepted. His teachings and is indeed helping all of us still ; and I can do no better than to call your attention to this Vital Message of our Great Master."

(Sardar Bahadoo Jagat Singhji)

(ঘ) "ইস গুফামে অখুট্ ভাণ্ডারা। তিস্ বিচ্ বসে হর্ অলখ অপারা।
আপে গুপত্ প্রগট্ হোয় আপে। গুরশ্বদি আপ বঁাজামানিয়া ॥
....
হমে মার্ বজ্র কপাট খোলায়া। নাম অমলোক গুর্-পরসাদি পায়া।
বিন্ শব্দে নাম না পাওয়ে কোঈ। গুর্-কৃপা মন বসামনায়া ॥
....
শরীরে ভাণ্ডন্ কো বাহর জায়ে। নাম না লেহে, বহুৎ বেগার দুঃখ পায়ে।
মনমুখ অন্ধে সুজে নাহি। ফির ফের আয়ে গুরুমুখ বথ্ পাওমানিয়া ॥
বিন্ শব্দে অন্তর আঁন্ধোরা। ন বস্তু লহে ন চুকে ফেরা।
সৎগুর হথে কুঞ্জি হোবদ দোর খোল্লে নেহি।
গুরুপূরে ভাগ্ মিলামেনিয়া ॥

(নানক, গ্রন্থ সাহেব)

এই দেহ-মন্দিরেই অপার সম্পদ আছে—স্বয়ং প্রভু এখানে বিরাজিত। গুরু কৃপায় শব্দের ধারার (নাম) সঙ্গে যুক্ত হলে অহংকারের আবরণ হয় উন্মোচিত, তাঁকে দেখা যায়। ঐ অমুল্য নামের ধারা ছাড়া অহংকারের বজ্রকপাট খুলে না, নাশ হয় না। মন মুখ অন্ধ যারা তারাই বাহিরের বস্তুতে (তীর্থে মঠে মন্দিরে মূর্ত্তিতে) তাঁকে খুঁজে বেড়ায়। পূরণ ধনী মহাত্মা সদ্‌গুরু কৃপাতেই গুরুমুখ ভক্ত নিজের মধ্যেই তাঁর সন্ধান পায়। শব্দের ধারা বা নাম ছাড়া অন্তর অন্ধকার—সদ্‌গুরুর হাতেই এই নামের চাবিকাঠি — অন্যের হাতে নাই। বহু ভাগ্যে শব্দ-ভেদী সদ্‌গুরু মিলে।

(ঙ) সংতন কা প্যারা ইয়ার ন্যারা ভাই
জঁহা নহি বৈরাট খোঁজ নিরগুন পাই ॥
ব্রহ্মা ঔর শেষ নহিঁ জানে ভেবা ॥
শংকর ঔর শেষ নহি জানেদেবা' ॥
.. ..
অজর অমর উহ্ লোক্ শোক সব দুর বহাবে।
ওরে হাঁরে তুলসী রামকৃষ্ণ অবতার দশো নহিঁ জানে পাবে ॥

(তুলসী সাহেব)

সন্তদের প্রিয় পরম ইষ্ট উপাস্য তিনি যাঁর খবর বিরাট পুরুষ ব্রহ্ম ও জানেন না অর্থাৎ ব্রহ্ম ভূমির অতীত নির্ম্মল চৈতন্য দেশের অধিপতি কুলমালিক পরম দয়ালই সন্তদের ইষ্ট। ব্রহ্মা শিব এবং ব্রহ্মের অবতার যাদেরকে তোমরা বল তাঁরা কেউ সেই পরম ভূমিতে যেতে পান না — সে এক অজর অমর নির্ম্মল চৈতন্যের দেশ [তুলসী সাহেব]

(চ) সন্তসদ্‌গুরু শিষ্যের কি করে দেন এ সম্বন্ধে একজন সন্ত বলছেন— "সন্তসদ্‌গুরু অভ্যাসীকা অন্দর্ উসকী স্বুরত কী বৈঠক কে স্থান পর অপনী চৈতন্য ধার প্রবাহিত করকে উস্‌কী চেতনতামে বৃদ্ধি কর দেতে হৈঁ। ঔর জৈসে স্থর্য্য কী কিরণ কিসী স্থর্য্যকান্ত কে দ্বারা একত্র করণে পর এক ছোটা সা স্থর্য্য পৃথ্বী পর বন জাতা হৈ, জো আকাশ মেঁ চমকনে বালে আস্‌লি স্থর্য্য কা নমুনা হোতা হৈ। ইসী প্রকার গুরুমহারাজজী চৈতন্যধারকে, অভ্যাসী কী স্বুরত কী বৈঠককে স্থান পর একত্র হোনে সে উসকে অন্তর মেঁ ছোটে পৈমানে পর উনকা দিব্য স্বরূপ প্রকট হো জাতা হৈ। উস স্বরূপকে প্রকট হোতে হী-ন কেবল অভ্যাসীকে মন ঔর স্বুরত আত্মাকী বৈঠক কে স্থান পর পুরে তৌর সে একত্র হো জাতা হৈঁ। কিন্তু উন্‌কা রুখ্ উস্ সে উপরকে স্থান কী ঔর হো জাতা হৈ। ঔর ইস প্রকার স্থান স্থান পর সহায়তা পাকর্ অভ্যাসীকে স্বুরত উঁচে চৈতন্য স্থানোঁ পর চড়তী জাতী হৈ। জব কিসী স্থান পর অভ্যাসী কী চেতনতামেঁ পর্য্যাপ্ত বৃদ্ধি হো জাতা হৈ তো উসকী স্বুরত্ উস্ স্থান পর জাগ্রত হো জাতী হৈ ঔর অন্তরী শব্দকী সহায়তা সে উহ্ ধীরে ধীরে উঁচে সে উঁচে চৈতন্য স্থান পর পহুঁচ্ কর্ সচ্চে কুলমালিক সে তদ্‌রূপতা প্রাপ্ত কর লেতী হৈ।"

আলোক-তীর্থ

প্রথম-অর্ঘ্য

(১ম পুষ্প)

প্রশ্ন ঃ— এই বই এর প্রেরণাতে আপনি আগ্রার পরমসন্ত শিবদয়াল সিংজী, কবীর সাহেব, গুরু নানক, হাথরাসের তুলসী সাহেব প্রভৃতি সন্তদের অনেক অমূল্য বাণী, বচন quote করেছেন। ভারত বিখ্যাত পণ্ডিত, আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীও এই সব সন্তদের বাণী বচন নিয়ে বহু গবেষণা করেছেন। "ভারতের সংস্কৃতি" নামক তাঁর একখানি বইএ, 'সন্তদের মত' এই অধ্যায়ে (৭৫ পৃঃ) ঐ সব আলোক-পুরুষ সন্তদের সম্বন্ধে লিখেছেন, —"......তাঁদের ছিল ধর্ম্মই আসল। মধ্যযুগে এই সব সাধক সন্তেরা ভগবানের সঙ্গে প্রেমের ব্যক্তিগত যোগই খুঁজেছেন। এই যোগের পথে বাহ্য আচার, শাস্ত্র, ভেখ প্রভৃতির প্রয়োজন তাঁরা মানেন নি; তাঁদের পক্ষে ভগবৎ-প্রেমের কাছে আর সবই তুচ্ছ। স্বর্গের লোভ বা নরকের ভয়ে তাঁরা ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা স্বীকার করেন নি। প্রেমের ধর্ম্মে ভগবানের সঙ্গে এমন একটি অভেদ ও সাম্য তাঁরা পেয়েছেন, যা বেদান্ত প্রতিপাদ্য অভেদের চেয়ে অনেক সরস। ......দেহকে তাঁরা দেবালয় মনে করেছেন। এই দেবালয়েই চিন্ময় ব্রহ্ম বিরাজিত। মাটি পাথরের দেবালয়ে যে সব মূর্ত্তি তার কোনো মূল্য নেই। বাহ্য উপচারের পূজা অর্থহীন। দয়া, অহিংসা, মৈত্রী, এই সবই হ'ল আসল সাধনা। শাস্ত্রে এই সব সাধনার তত্ত্ব মেলে না। দেহের মধ্যেই বিশ্ব। সেই পরমতত্ত্বটি দেখাতে পারেন গুরু, কাজেই গুরুর প্রতি তাঁদের অচলা ভক্তি।" আমিও ঐ সব সন্তদের বাণী বচন আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি তাঁরা ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণের সমবায়ে গঠিত যে বর্ণাত্মক নাম, যা আমরা বইএ লিখি, মুখে বলি, তা জপ করে, অর্থাৎ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কালী কালী, রাম রাম জপ

করে কিছু হবে না বলে গেছেন। তাঁরা বলেছেন ধ্বন্যাত্মক নাম অর্থাৎ কুল-মালিকের কাছ থেকে immanated হয়ে আসছে যে 'ডাক' বা 'ধুন' সেই দিব্য Sound Current ই মালিকের আসল নাম—এরই সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। (ক) "ধুন কী ডোর পকড় ঘট চড়তী" (খ) "সন্ত বিনা সব ভটকে ডোলেঁ, বিনা সন্ত নহিঁ শব্দ পিছান; শব্দ শব্দ মৈঁ শব্দ হি গাঁউ, তুভী সুরত লগাদে তান"।

(গ) "জপ মরে, অজপা মরে, অনহদ্ ভী মর জায়,
সুরত সমানি শব্দ মেঁ, তাঁহি কাল ন খায়" (কবীর)

—ইত্যাদি কথায় তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন যে, এই ঘটে অর্থাৎ দেহের মধ্যে যে ধুন বা শব্দ ঝঙ্কৃত হয় গুরু কৃপায়, সুরত অর্থাৎ জীবাত্মাকে সেই ধুনের ডুরি বা দিব্য শব্দ-ধারার সঙ্গে যুক্ত করলে, তবে সে অমৃতের সন্ধান পাবে। এই যদি তাঁদের উপলব্ধ সত্য হয় তাহলে শাস্ত্রে যে আছে রাম নাম তারকব্রহ্ম মুক্তিপ্রদ নাম, এ কথা কি মিথ্যা? আমাদের দেশে হাজার হাজার লোক যে রামমন্ত্রে দীক্ষা নিচ্ছে, তাতে কি কিছু হবে না?

উত্তর:— ভেবে দেখুন তো, 'ওঁ রাং রামায় নমঃ' এই মন্ত্রই যদি তারকব্রহ্ম নাম হয়, তাহলে রাম ত ত্রেতাযুগে এসেছিলেন, সত্যযুগের লোকেরা ভগবানকে কি নামে ডাকতো? আপনার নাম যেমন বিনোদ, আপনি তো আর গুরুর কাছ থেকে "ওঁ বিনোদায় নমঃ" মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে জপ করেন না? কাজেই রাম নিশ্চয়ই গুরুর কাছ থেকে "রাং রামায় নমঃ" এই মন্ত্র নিয়ে জপ করতে বসে যান নি! তাছাড়া রামের যিনি গুরু ছিলেন, তিনি কোন্ তারকব্রহ্ম নামে ভগবানকে ডাকতেন? বশিষ্ঠ নাকি যোগবলে, জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে 'রাম' এই নামকরণ করেছিলেন, তাহলে এই 'রাম' নাম আবিষ্কারের পূর্ব্বেও তো দশরথ কৌশল্যা ভগবানকে ডাকতেন, সেটা কি নামে? বা, এ কথাও রামায়ণে আছে যে, বহুজন্ম তপস্যার ফলে তবে নাকি পরব্রহ্ম রাম তাঁদের ঘরে পুত্ররূপে এসেছিলেন। তাহলে তাঁদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের তপস্যায় নিশ্চয়ই তাঁরা "রাম রাম" জপ করতেন না? কিংবা যে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি হোতারূপে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে কৌশল্যাকে চরু খাওয়ানোতে রামের আসার পথ প্রশস্ত হ'ল, সেই তপস্বীও নিশ্চয়ই তাঁর নির্জ্জন ভজন গুফাতে বসে 'রাম রাম' জপ করতেন না!

তারপর আপনাদেরই কথামত, যে 'রাম নাম' মুক্তি পথের তরণী হওয়ায় বহু সাধু ঋষি এই রাম নামের মহিমায় এত বই কেতাব লিখে গেলেন, যার ফলে আপনারা আজও রাম নাম করতে করতে দরবিগলিত অশ্রু হ'ন, নিজেদের মা বাপের অন্তিম সময়ে তাঁদের কর্ণ কুহরে উচ্চনাদে রাম নাম শুনিয়ে দিয়ে তাঁদের ভব সমুদ্রের মুক্তি-তরণীটি জুগিয়ে দেন একেবারে তাঁদের হাতের কাছে—অন্যান্য সম্প্রদায় আবার এই রাম নামকে মুক্তিপ্রদ নাম বলে স্বীকার করতে রাজী নন! এক সম্প্রদায় আবার ঢক্কানিনাদ সহ প্রচার করেছেন "কৃষ্ণ" নামই একমাত্র অভয় অমৃত মুক্তিপ্রদ "প্রেমদ" মন্ত্র! 'ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা' জপ করলে বিষ্ণু দূতরা মরণকালে পুষ্পকরথ সাজিয়ে এনে মৃত্যুপথ যাত্রীকে একেবারে গোলোকে নিয়ে যাবে, স্থান হবে, "অপ্রাকৃত নিত্যলোক রসভূমি বৃন্দাবনে!" যে পরমানন্দময় মুক্তির অবস্থার কথা উপনিষদের ঋষিরা বলে গেছেন, যে মোক্ষলাভের জন্য তাঁরা তাঁদের সমস্ত তপস্যা নিয়োজিত করেছিলেন, এবং মানুষ যাতে সেই 'পরম অবস্থা', 'Perfection', 'Cosmic consciousness' 'সচ্চিদানন্দময়ত্ব' লাভ করে পূর্ণ এবং আপ্তকাম হয় তার ব্যবস্থা করে গেলেন—ঐ কৃষ্ণভক্ত সম্প্রদায় আবার এহেন মুক্তিকেই "তুচ্ছ" বলেন, বলেন "প্রধান কৈতব"—ছলনা! "ধর্ম্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা যতেক কৈতব

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা প্রধান কৈতব"। (চৈ, চ)

এঁরা মুক্তিকে বলেন "পিশাচী"; "যাবৎ ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে,—যতক্ষণ হৃদয়ে ভুক্তি বা মুক্তিরূপ পিশাচী লাভের স্পৃহা থাকবে ততক্ষণ কৃষ্ণভক্তি জন্মাবে না"! আচ্ছা, বিচার করে দেখুন তো ভাই, কৃষ্ণতো দ্বাপরযুগে এসেছিলেন, 'কৃষ্ণ' এই কথাটাই যদি তাঁর 'নাম' হয় তাহ'লে সত্য ত্রেতার ভক্তরা তাঁকে কি 'নামে' ডাকতেন? ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য বলা হয়েছে, "তদ্ধৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকী পুত্রায়োক্ত্বোবাচা পিপাস এব স বভূব"......(৩, ১৭, ৪)। কৃষ্ণ নিশ্চয়ই গুরুর কাছে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা নেন্ নি! ঐ সম্প্রদায় আরও বলেন, রাম এবং কৃষ্ণে তত্ত্বতঃ ভেদ নাই, রসগত ভেদ আছে। তাহলে সত্য ত্রেতার প্রজ্ঞাবান ঋষিরা এই রসের ভিয়ান জানতেন না বুঝি? তাঁরা এই 'রসের আস্বাদন' থেকে বঞ্চিত ছিলেন? বেচারা ঋষিদের ভাগ্যে বুঝি তাহলে সে যুগে "রসভূমিতে নিবাস—

ব্রজবাস" ঘটে নি ? কৃষ্ণ-উপনিষদ এবং পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডে কৃষ্ণভক্তেরা এক অদ্ভুত রসালো বর্ণনা দিয়েছেন ; রাম যখন বনবাসে গেছলেন তখন তাঁর সেই নবদুর্ব্বাদলশ্যাম মূর্ত্তি এবং ভুবনভুলানো রূপ দেখে বনবাসী মুনি ঋষিরা মোহিত হয়ে পড়লেন, তাঁরা তাঁর অঙ্গসঙ্গ কামনা করলেন ! রামচন্দ্র তাঁদেরকে বললেন রামাবতারে তিনি তাঁদেরকে "রমন-সুখ" দিতে পারবেন না। দ্বাপরে তিনি যখন কৃষ্ণরূপে জন্মাবেন তখন এই মুনিরা গোপিনীরূপে জন্মগ্রহণ করে তাঁর 'অঙ্গসঙ্গ' লাভ করতে পারবেন ! "শ্রীমহাবিষ্ণু সচ্চিদানন্দ লক্ষণং রামচন্দ্রং দৃষ্ট্বা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরং মুনয়ো বনবাসিনো বিস্মিতা বভূবুঃ। তং হোচুর্ণোঽবদ্য-মবতারান্বৈ গণ্যন্তে আলিঙ্গামো ভবন্তমিতি। ভবান্তরে কৃষ্ণাবতারে যুয়ং গোপিকা ভূত্বা মামালিঙ্গথ।" (কৃষ্ণ উপনিষদ)

তাহলে ত্রেতাযুগের তপস্বী ঋষিরাই দ্বাপরের গোপবালিকা ! কৃষ্ণের রাস-ক্রীড়ার নর্ম্মসহচরী গোপিনী !! বাহবা ! কী উর্ব্বর মস্তিষ্ক, স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বজায় রাখবার জন্য কী অপূর্ব্ব, অভিনব রসতত্ত্বের উদ্ঘাটন ! জিতেন্দ্রিয় আপ্তকাম ঋষিরা তাঁদের ইষ্টের, 'সচ্চিদানন্দলক্ষণ' রামচন্দ্রের রূপ দেখে হলেন কামজর্জ্জর ! Cycle of birth and death এর কালচক্র থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য যাঁদের তপস্যা, ত্যাগ তিতিক্ষা দুঃখবরণের মধ্য দিয়ে মোক্ষলাভের জন্য যাঁদের উগ্র তপশ্চরণ,—যে অমৃত পদলাভের জন্য তাঁরা জগৎবরেণ্য—সেই সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা চাইলেন পুনরায় আসতে এই পৃথিবীতে—অঙ্গসঙ্গ আকাঙ্খা পরিপূর্ত্তির জন্য, কামনা করে বসলেন নারী জন্ম ! পুরুষকে দেখে পুরুষের যখন কাম সম্ভোগের ইচ্ছা জাগে তখন Freud এর ভাষায় তা কি ? নিজের প্রীতম্ প্রিয়তমকে দেখলে ভক্তের অন্তর্সত্ত্বা বহির্সত্ত্বায় অমৃত-আনন্দের প্লাবন জাগে সত্য তাই বলে কি জাগে কামক্রীড়ার ইচ্ছা ? এই সব সম্প্রদায়ী অবিদ্যান্ধ-যাঁরা উপনিষদের তত্ত্বকে বিকৃত করে, আপ্তকাম ঋষিদের নামে গালগল্প রচনা করে তাঁদের পুণ্য নামে কলঙ্ক লেপন করেছেন তাঁদেরকে 'ধর্ম্মধ্বজী' বললে কি বড় বেশী অপরাধ হবে ?

এই রামভক্ত কৃষ্ণভক্তের দল ছাড়াও আরও সহস্র সহস্র সম্প্রদায়ের সহস্র সহস্র Patent Registered করা মুক্তিপ্রদ 'নামের' ব্যবস্থা আছে। কেউ বলছেন—"ওঁ তারে তারে তত্তারে স্বাহা" এই জপলেই মুক্তি ; কেউ বলছেন 'হ্রীং শ্রীং ক্রীং' কেউ বলছেন 'দুং দুর্গায়ৈ স্বাহা' 'ওঁ সত্যং ক্রীং অমৃতম্' কেউ

বলছেন " ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় " মন্ত্র জপলেই ব্রহ্মকে রাতারাতি হাতের মুঠোয় টেনে আনতে পারা যাবে, ধ্রুব এই মন্ত্র জপেই নাকি পদ্মপলাশলোচন হরিকে পেয়েছিলেন, কেউ বা ' হাতুলহুত ' 'আল্লাহ্ রসুলাল্লা' 'রাধাস্বামী' জপের দ্বারাই বেহেস্তে আল্লার মঞ্জিলে যাওয়া যাবে, বলছেন। কোন কোন সম্প্রদায় আবার "বাহেগুরু" কিংবা "সত্যনাম কবীর" এই বর্ণাত্মক নামকে একমাত্র মুক্তিপ্রদ নাম বলে প্রচার করছেন।

অর্থাৎ জগতে যদি হাজারটা সম্প্রদায় থাকে তাহলে এক এক সম্প্রদায় বাকী ৯৯৯টা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তিত নাম বা যোগ প্রণালীকে হেয় করে, বেদ বেদান্ত কোরাণ বাইবেলের অর্থ নিজ প্রয়োজনে কোথাও বিকৃত, কোথাও বা twist করে নিজ সম্প্রদায়কে সমর্থন করে যাবে ; আর বাকী ৯৯৯টা সম্প্রদায় ঐ বিশেষ সম্প্রদায়টির বিরুদ্ধমত পোষণ করবে। As if, ঈশ্বর অনেকগুলো, আর তিনি খামখেয়ালি করে এক এক সম্প্রদায়ের আচার্য্যের কাছে এক একটা নামকে The only Liberating নাম বলে, The only panecia of all troubles বলে Licence দিয়ে বসে আছেন! যাতে তাঁর নিজের অগন্য সন্তানদের মধ্যে অগন্য মত পথ নিয়ে ভেদ বিবাদের সৃষ্টি হয়! তিনি যেন এক বিভেদকারী ঈশ্বর "divide & rule" এই British policy adopt করেই, এই আখণ্ড ভূমণ্ডলে তিনি স্বীয় আধিপত্য বজায় রেখেছেন!

ঐ সমস্ত স্বার্থসন্ধী সম্প্রদায়ীদের লীলাখেলার জন্যই, মত ও পথ নিয়ে ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নিয়ে দ্বন্দ্ব কোলাহলের অন্তঃ নেই, অমৃততীর্থ পরিক্রমায় বেরিয়ে তাই সত্যসন্ধানীকে হতে হয় বিভ্রান্ত। অনেক সময় এই নিয়ে কতো মানুষের জীবনে নেমে এসেছে হীন সংঘর্ষের বিষময় রক্তপাত—মানুষের সত্য শিব সুন্দরের বন্দনাগীতি হয়েছে মসীলিপ্ত ; ঐ সব সংস্কারাচ্ছন্ন সম্প্রদায়ীদের অজ্ঞতার নিরন্ধ্র মেঘ যুগে যুগে সভ্যতা-সূর্য্যকে আবৃত করে একদিকে প্রেম, সাম্য, দয়া, মানবিক মূল্যবোধকে যেমন করেছে হেয়, তেমনি অন্যদিকে মানুষের জীবনের অম্লান মঙ্গলশ্রীকেও দিয়েছে ঢেকে। উপনিষদ মানুষকে যে 'চরৈবেতি' মহামন্ত্রে ডাক দিয়েছিলো অমৃত-আনন্দের পথে, এদেরই biast ভাষ্য-টীকা-টীপ্পনীতে শৈবালাচ্ছাদিত হয়ে মানুষের ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাময় বলিষ্ঠ ও ভূয়িষ্ঠ চিন্তাধারার গতিপথ হয়েছে রুদ্ধ। মানুষ পথ বিভ্রান্ত

আজ—কোনমতে নিজেকে সে করবে প্রতিষ্ঠিত—কোন্ পথে করবে যাত্রা সুরু? কোন্ অজ্ঞান-অন্ধকারের সীমান্তপারে অপহৃত হয়ে আছে তার উর্দ্ধশীর্ষ প্রদীপ্ত জ্ঞানশিখা—অমৃত-আনন্দময় দয়ালদেশের Dynamic and Positive Path—সে তা জানে না। আমি মনে করি, এই আশাহত অবস্থার অবসানকল্পে, নিখিল মানবের অন্তর রাজ্য এবং বাহির রাজ্যে কবীর সাহেব, গুরু নানক দাদু দয়াল পরমসন্ত শিবদয়াল সিংজী প্রভৃতি সন্তসদ্‌গুরুদের অমৃতময় বাণী এনে দিয়েছে অযুত যুগের অপার ভরসা; বহু মতবাদের বিসম্বাদকে—নানা বিভেদে বিড়ম্বিত পন্থাকে পরিত্যাগ করে—এই জীবনেই দাতাদয়ালকে বুঝবার এবং জানবার এক অভিনব সহজ সুন্দর Positive এবং Dynamic পথের সন্ধান দিয়েছেন—এমন একটি পথ যে পথের মধ্যে শান্তির ও সাম্যের, প্রেম ও মিলনের —সমন্বয়ের—সুসমঞ্জস সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিধান আছে, আর আছে বহুর মধ্যে নিহিত সেই 'একম্' কে নিশ্চিতরূপে নিঃসংশয়রূপে, অন্তরতমরূপে অনুভব করবার এবং ভিতরকার সেই নিগূঢ় এক ধ্রুব সত্যকে জানবার অমোঘ উপায়।

সন্তরা বলেছেন (১) বর্ণাত্মক কোন রাম রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ কালী কালী বা সোহং সোহং জিহ্বাতে মনে মনে বা শ্বাসে শ্বাসে জপ করে করে কেউ সেই কুল-মালিক পরমদয়ালকে জানতে পারবে না। পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অতীত ভূমি নির্ম্মল চৈতন্যদেশ থেকে যে All-attractive Current আসছে—যা সন্তসদ্‌গুরু দীক্ষা-কালে জীবের সহস্রার চক্রে Connection দেন বা প্রকট করেন সেই ধ্বন্যাত্মক দিব্য Sound Current ই **নাম**। ঐ দিব্য লোকোত্তর সঙ্গীত—শব্দধারা—'ধুনের ডুরি'র সঙ্গে জীবাত্মাকে যুক্ত করাই হ'ল নাম প্রাপ্তি। এই নাম ... "লিখন পড়ন বোলন বিচ্চ নহীঁ আউন্দা, সারে খণ্ডাঁ-ব্রহ্মাণ্ডাঁ দী জানাঁ দী জান (সারসত্তা, True Essence of প্রাণধারা) হৈ। নাম ন সির্ফ নেক পুরুষাঁ দে (Pure souls) অন্দর হৈ, বল্কি চোরাঁ—ঠগ্‌গাঁ দে ভী অন্দর হৈ, মগর উন্‌হাঁনু পতা নহীঁ। ওহ্ নাম ন আরবী হৈ, ন ফারসী, ন তুর্কী, ন ইংরেজী ন হী কিসী হোর জবান্ বিচ্চ। চাহে কোই হিন্দু হৈ জাঁ মুসলমান, শিখ হৈ জাঁ ইসাই, মোমন হৈ জাঁ কাফির, য়হুদী হৈ জাঁ কিসি হোর মজহব দা! সচ্চা নাম হর এক এক আদমী দে অন্দর হৈ। জদ্ ইহদী রুহ্ (Spirit) উস্ সচ্চে নাম নাল জুড় জায়ে, ওহ্‌দী লজ্জত্ লৈ লয়ে তাঁ

ইহদা জম্মনা-মরণা মুক জান্দা ঔর সদা দা সুখ হো জান্দা এ।"

("রুহানী পৌড়ী"—পরমসন্ত বাবা শাবন সিংজী)

অর্থাৎ ঐ যে সাচ্চানাম তা কোন ইংরেজী আরবী ফারসী কোন ভাষার বর্ণাত্মক অক্ষর মাত্র নয়। সারা ব্রহ্মাণ্ডের সারসত্তা এই **নাম**—এরই চেতনধারায় সব কিছুই সঞ্জীবিত রয়েছে। পুণ্যশ্লোক মহাত্মা থেকে পাপী তাপীর মধ্যে ঐ বস্তু আছে—কিন্তু কেউ তা জানতে পারে না, যতক্ষণ না সন্তসদ্‌গুরু কৃপা করে "রুহ্" বা জীবাত্মাকে ঐ নামের ধারার সঙ্গে যুক্ত করে দেন। হিন্দু হোক মুসলমান খ্রীষ্টান হোক সব সম্প্রদায়ের জন্য পরমেশ্বর ঐ এক সাচ্চা নামের ব্যবস্থা রেখেছেন। কোন ভেদ বিভেদ নেই, জাতপাত, মতপথের অন্তরায় নেই। যে কেউ ঐ সাচ্চানামের সম্পদ লাভ করবে সেই মুক্ত হবে—দিব্য আনন্দলাভ করে বিভোর হবে।

যেমন ডাক্তারি শাস্ত্রে (Books on Medical Science) ঔষধের গুণাগুণ বর্ণনা থাকে, ঔষধ থাকে আলমারীতে বা আরও সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে ডাক্তারের মস্তিষ্কে—জ্ঞানে—তেমনি শাস্ত্রে নামের মহিমা আছে **নাম** আছে সন্তসদগুরুর (Living Adept) কাছে। ঐ দিব্য Sound current (Audible Life-stream) এর সঙ্গে সন্তের কৃপায় যুক্ত হতে পারলে মন diluted হয়ে dissolved হয়ে যায়, জীবাত্মা (সুরত বা রুহ্) মনের Power of Gravitation থেকে মুক্ত হয়ে সেই দয়াল দেশে পৌঁছতে পারে। (২) এতে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান — ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-শূদ্র — Catholic Protestant—কাফের সেখ-সিয়া-মৌলবীর কোন প্রশ্ন নেই। সবাই একই পরম পিতার সন্তান। যে হিন্দু ঘরে জন্মেছে, সে হিন্দুঘরের রীতিনীতি-আচারে অভ্যস্ত হয়ে, ধুতি চাদর-উত্তরীয় (নামাবলি) শিখা-পৈতা-তিলক, বারব্রত-একাদশী শ্রাদ্ধ-শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, পূর্ব্ব, উত্তর বা দক্ষিণমুখী হয়ে রাম-কৃষ্ণ-কালী জপকেই তার হিন্দুধর্ম্ম বলে বুঝে নিয়েছে। যে মুসলমান ঘরে জন্মেছে, সে লুঙ্গিপরা, নূর-দাড়ি রাখা, পাঁচবখৎ নামাজ করা, রোজা-রমজান-কেয়ামৎ-কোরবাণী নিয়ে পশ্চিমদিকে মুখ করে, লা-আল্লাহ্ রসুলাল্লা বলে আজান দিয়ে, অনেক সময় হিন্দুরা যা করে তার বিপরীত আচরণকেই ধর্ম্ম বলে বুঝে নিয়ে মুসলমান বলে পরিচয় দিচ্ছে, আর যারা খ্রীষ্টান মা বাবার ঘরে জন্মেছে—সে চার্চ্চে যাওয়া ক্রুশ ঝুলিয়ে

নিয়ে মেরী আর 'Son of God' যীশুতে বিশ্বাস করাকেই পরমপুরুষার্থ মনে করেই তৃপ্তি পাচ্ছে। হিন্দু যে সে বেদকে অপৌরুষেয়, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাণী বলে মানছে, তার বাইরে যা কিছু আছে তা তার কাছে অপূর্ণ, মিথ্যা! মুসলমান মানে পয়গম্বরের কাছে স্বয়ং আল্লা ২৩ বৎসরে খণ্ডে খণ্ডে কোরাণ-শরীফ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—কাজেই একমাত্র তা-ই অভ্রান্ত! আর খ্রীষ্টান জানে Bible ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট বাণী, একমাত্র 'Son of God' যীশুর কাছে-তা ব্যক্ত! আর সব মিথ্যা! যেন হিন্দুর ঈশ্বর, মুসলমানের আল্লা আর খ্রীষ্টানের God, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি! এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়ের ঈশ্বর আর তাঁর বাণীকে মানতে রাজী নয়। তারপর এই বিরোধ—পুরোহিত-সাধু—সন্ন্যাসী, মোল্লা মৌলানা এবং পোপ-পাদ্রীদের কেরামতিতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং হাজার কুসংস্কাররূপ হলাহলের দিয়েছে জন্ম। তাই সন্ত দাদুদয়াল দুঃখ করে বলছেন—

"খংড খংড করি ব্রহ্মকৌ পখি পখি লিয়া বাঁটি
দাদূ পূরণ ব্রহ্ম ত্যজি বংধে ভরম কী গাঁঠি।"

ব্রহ্মকে খণ্ড খণ্ড করে, দলে উপদলে নিয়েছে ভাগ করে; হে দাদূ! পূর্ণ ব্রহ্মকে ত্যাগ করে মানুষ বদ্ধ হয়েছে ভ্রমের গ্রন্থিতে।

দাদূ যে সব কিস্‌কে পন্থ মে ধরতি অরু অস্‌মান,
পানি পবন দিনরাত কা চন্দ সূরয, বহিমান।
ব্রহ্মা বিষ্ণু-মহেশকা, কৌন পন্থ গুরুদেব?
সাঁঈ! সিরজন হার তু, কহিয়ে অলখ অভেব।

মহম্মদ কিসকে দীনমেঁ? জব্রাইল্ কিস্ রাহ্?
ইনকে মুর্শীদ্ পীর কো? কহিয়ে এক অলাহ্।
দাদূ যে সব কিস্‌কে হবৈ রহে, য়হ মেরে মন মাঁহি,
অলখ্ ইলাহি জগদ্‌গুরু, দূজা কোঈ নাহি'।

হে দয়াল! বল এই যে ধরিত্রী ও আকাশ, এই যে জল বায়ু দিনরাত্রি, এই যে চন্দ্র সূর্য্য তোমার আদেশ মাথায় নিয়ে নিরন্তর সেবা করে চলেছে সকলের, এঁরা কোন সম্প্রদায়ী? ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের নামেই যদি বৈষ্ণব শৈব সৌর গাণপত্য বহুসম্প্রদায়—অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদ ভেদাভেদ বাদের এত বিসম্বাদ (বিষম-বাদ) তৈয়ারী হয়ে থাকে তাহলে বল গুরুদেব, এই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররা

কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন ? তুমি প্রভু, স্রষ্টা তুমি, ভেদাতীত জ্ঞানাতীত অলখ পুরুষ তুমি , তুমিই পারো এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে। হে আল্লা, তোমারই কাছে জানতে চাই—তুমি বল, মহম্মদ ছিলেন কোন্ ধর্ম্মে ? জেব্রাইল ছিলেন কোন পথাবলম্বী ? এঁদের মুর্শীদ অর্থাৎ গুরু বা ইষ্টই বা কে ? দাদূর মনে প্রশ্ন—যাঁদের নাম নিয়ে এত দল-উপদল,--মারামারি-কলহ-কোলাহল, তাঁরা নিজেরা ছিলেন কোন্ দলভুক্ত ? বুদ্ধ ত আর বৌদ্ধ ছিলেন না ? খ্রীষ্টও তো ছিলেন না খ্রীষ্টান ? মহম্মদও ইসলামী বা মহম্মদীয় ছিলেন না। —তাঁরা ছিলেন একই ভগবানের সেবক। দাদূ বলছেন—সেই অলখ ইলাহীই একমাত্র জগদ্গুরু—দ্বিতীয় আর কেউ নেই।

এই অলখ পুরুষ দাতাদয়ালকে বারব্রত-আচার-অনুষ্ঠান, প্রাণায়াম মুদ্রাদি External বা Internal exercise এ পাওয়া যাবে না। তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ, চাতুর্ম্মাস্য ব্রত বা মঠ মন্দিরে গিয়ে হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বলে, শঙ্খ ঘণ্টা খোল কর-তালের কলরোল সহ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করলেও হবে না। সন্তগণ বলেন—ঐ বাহ্যিক সংকীর্ত্তনে কোন পরমার্থ লাভ হবে না, ভেতরে যে 'অন্তরি সংকীর্ত্তন' হচ্ছে, গুরুকৃপায় যদি তার সঙ্গে যুক্ত হতে পার—তবেই মন যাবে গলে। ঐ 'Inward music' 'Heavenly Melody' শুনলে তবেই জীবাত্মা এই বহির্জগতের রূপ রস গন্ধ শব্দ-স্পর্শের মোহ ত্যাগ করে—অন্তরপথে তার প্রীতম্ এর অভিসারে এগোবে। সন্ধ্যাকালে শুধু বাহ্যিক মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে, শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি করে আরতি করলে কোন ফল হবে না। ভেতরে দীপ কলিকাকার আত্মা চিরদেদীপ্যমান,

উল্টা কুঁয়া গগনমেঁ তিস্ মে জ্বলে চিরাগ ॥
তিস্ মেঁ জ্বলে চিরাগ, বিণ্ রোগন্ বিন্ বাতি।
ছে রুত, বারহ মাস রহত জলতো দিন রাতি ॥
সৎগুরু মিলা জো হোয় তাঁহি কী নজরমেঁ আবে,
বিন্ সৎগুরু জো হোয় নহী তা কৌ দরশাবে। (পল্টুসাহেব)

চিদাকাশে একটি বিপরীত মুখী কুঁয়া (Inverted Well)—তার মধ্যে দিন রাত্রি ধরে বিনা তেল সল্‌তেতে এক অনির্ব্বাণ দীপ-জ্যোতি জলছে। যে সদ্গুরু পেয়েছে সেই এই দীপ কলিকাকার আত্মার দর্শন পাবে।

সন্তরা বলেন, সন্তসদ্‌গুরু কৃপায় এই আত্মা সেই দিব্য শব্দধারার সঙ্গে যুক্ত হলে 'Inward divine ear' দিয়ে শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করতে করতে এগোতে থাকবে পরমাত্মার আনন্দ নিকেতনে।

জীবাত্মা, যে—All-attractive, Divine Sound Current এর সঙ্গে যুক্ত হলে লোকোত্তর রাজ্যে 'সফর' কবতে পারে, দয়ালের দর্শন পেতে পারে—তাই হ'ল নাম—'আদিনাম'—'সাচ্চানাম', 'আওয়াজ গৈব'; পারস্য ভাষায় একেই বলা হয়েছে মালিকের 'হুকুম' 'কুদরত কুল', আরবীতে 'বাঁগি আস্‌মানি' 'কলামি—ইলাহি'।

"সাচ্চা নাম লফজ (mere words) নহিঁ, ন হী উথে কিসে মজহব জাঁ জবান্ দী রিয়ায়ত হৈ। হিন্দু হোকে অন্দর জাও, কিসী হোর কৌম-মজহব (যে কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের হও না কেন) দে হো কে জাও! পরমেশ্বর নে জেহ্‌ড়া নাম অন্দর রক্‌খ্যা হোয়া হৈ, **সভনেঁ ওয়াস্তে একো হৈ**। উসে দী মহিমা সন্ত-মহাত্মা করদে নে। ওহ্‌নু নাম কহ্ লো, কলমা কহ্ লো, বাঁগি-আসমানি, কলামি ইলাহি কহ্ লো, গরূজ কি ওহ্‌দা কোঈ নাম রাখ্ লো—ওহ্ শান্তি ঔর সুখ দে দেন বালা হৈ, জরেঁ জরেঁ বিচ্চ মৌজুদ হৈ। কোঈ শব্দভেদী গুরু মিল জায়, অসীঁ কমাই করকে অন্দর চড়্ জাইয়ে। বস্ ইন্না হী কম্ম হৈ॥"

(রুহানী পৌড়ী—বাবা শাবণ সিংজী)

পরমসন্ত কবীর সাহেব—এই নাম কে পরশমণি বলেছেন; মনরূপী ময়লা লৌহ এর সঙ্গেই যুক্ত হলেই সে সোণা হয়ে যাবে, খসে পড়বে তার সমস্ত কলুষতার আবরণ, ধুয়ে যাবে তার মোহ কালিমা। এই 'নিজনাম' না পেয়ে সংসার ভ্রমে ভুলে রয়েছে——

"আদি নাম পরশ হৈ মন হৈ মৈলা লোহ,
পরশত কাঞ্চন ভয়া ছুটা কজল মোহ।
আদি নাম নিজ মূল হৈ, ঔর সব মন্ত্র ডার
কহে কবীর নিজ নাম বিণু বুঢ়া মুয়া সংসার।
কোটি নাম সংসার মেঁ তাতেঁ ন মুক্তি হোয়
আদি নাম যো গুপত্ জপ বুঝে বিরলা কোঈ॥" (কবীর)

এক মুসলীম ফকীরও তাঁর উপলব্ধ সত্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন—

"ইসম রা খানী মুসম্মা রা খিজো।
বে মুসম্মা ইসম কৈ বাশদ নিকো॥"

যে "ইসম" অর্থাৎ বর্ণাত্মক নাম জপ করে মরবে তাকে সারা জীবনেও ধুরধামের (Abode of Highest Bliss) অনুভূতি পেতে হবেনা। সে যেমন খালি এসেছিল তাকে তেমনি খালিই (Vacant) চলে যেতে হবে। যতক্ষণ না "মুসম্মা" অর্থাৎ ধুন-আত্মক নাম সে লাভ করতে পারে ততক্ষন তার কোনই ফল হবে না।

বুঝে দেখুন, রাম রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ বা যে কোন বর্ণাত্মক নাম তো আপনি জপ করবেন মন দিয়ে, মন তো ইন্দ্রিয়, তিনি যে ইন্দ্রিয়াতীত! "যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। "ন যত্র বাক্ প্রভবতি।" তর্কের খাতিরে ধরে নিলুম আপনার একাগ্র নাম রটনার ফলে, Intense thinking এবং desire এর ফলে মন স্থির হ'ল, মন গলেও নাই তো গেল, মনের ত্রাণ হলো—কিন্তু আপনি তো মন নন। মন সেই চিণ্ময় পুরুষের ধামে যেতেও পারে না। তাহলে এখন খুঁজে দেখতে হবে এমন কিছু ইন্দ্রিযাতীত বস্তু আমাদের মধ্যে আছে কি না, যা সেই অতীন্দ্রিয় নির্ম্মল চৈতন্যের ধামে যেতে পারে। একটি বস্তু আছে সে হ'ল জীবাত্মা (সুরত বা রুহ্)। এই সুরত কুলমালিকের অংশ, যেমন সূর্য্যের অংশ সূর্যোর রশ্মি; সূর্য্যের রশ্মিটা যেমন সূর্য্য নয় অথচ সূর্য্য থেকে পৃথকও নয় inter-linked, inter-connected; তেমনি সুরতও তাঁর সঙ্গে নিত্যযুক্ত, এর উৎস বা ভাণ্ডার পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অতীত ভূমি দয়াল দেশে, (Purely Spiritual region) আদি শব্দের মধ্যে। পিণ্ডের (ষট্‌চক্র সমন্বিত দেহের) মধ্যে সুরতের আসল স্থান চক্ষুদ্বয়ের পশ্চাতে সুষুম্নার মধ্যে; সন্তমতে এর পারিভাষিক নাম (Tisra Til) তিস্‌রা তিল্। সুরতই দেহের "জান্" স্বরূপ— সার পদার্থ। এরই শক্তিদ্বারা সমূহ দেহ মন ইন্দ্রিয়াদি আপন আপন কাজ করে। এই জীবাত্মার (সুরতের) মধ্যেই জ্ঞান, বুদ্ধি, divinity, সমস্ত Potentiality latent হয়ে আছে। যেমন চার হাত দূরে একটা পিল্‌সুজের (Stand) উপর প্রদীপ আছে—কিন্তু তার দীপ্তি যেমন অনেকটা স্থান জুড়ে আভা দেয়, তেমনি তিস্‌রা তিলে ঐ জ্বলদর্চ্চিমান দীপশিখা সারা শরীর কে সঞ্জীবিত করে রাখে, এরই চৈতন্য শক্তিতে মন, বুদ্ধি, সমূহ ইন্দ্রিয বৃত্তি ক্রিয়াশীল থাকে। সুরতের

বৈঠক ঐ'তিস্‌রা তিল' ঠিক যেন একটি তার টানবার কল—বঁড়শীর wheel এর মত। wheel দিয়ে যেমন বহুদূর বিস্তৃত ডোরকে গুটিয়ে আনা যায় তেমনি এই তিস্‌রাতিলে--সারা শরীরের Spirit-Current কে Accumulate করে নেওয়া যায়।

একজন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে ভাল করে পর্যাবেক্ষণ করলে দেখা যায়, তার চোখের তারা দুটি যায় উল্টে। Spirit-Current যা সারা শরীরে প্রবাহিত থাকে তা মহাপ্রস্থানের জন্য ক্রমশঃই accumulated হতে থাকে উর্দ্ধভাগে; তাই পা থেকে দেহের উর্দ্ধভাগ ক্রমশঃই হতে থাকে শীতল। যখন 'রুহ্' একেবারেই দেহত্যাগ করে যায় তখন তাকে বলা হয় 'মৃত্যু'। ঐ রুহ (সুরত=জীবাত্মা) যতক্ষণ দেহে থাকে ততক্ষণ তার হিন্দু-মুসলমান-পার্শী-খ্রীষ্টান, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র-পারিয়া বিভিন্ন জাত-পাত, নামরূপ উপাধি, ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়। দেহ পিঞ্জর ছেড়ে গেলে সকল গণ্ডীর উর্দ্ধে, সকল সংকীর্ণতার অতীত হওয়া যায়। যতক্ষণ 'নবদ্বারে পূরে দেহী,' নয় (Nine) দরজার (২ চোখ+ ২ কান+নাকের ২টি ছিদ্র +মুখবিবর + পায়ু+উপস্থের ছিদ্র) মধ্যে কেউ থাকে ততক্ষণ দল, রং, বর্ণ, উপাধি, মত পথের সংস্কার আর আচারের অধীন থাকে। এখন, জীবিত-অবস্থায় কেউ যদি সন্তসদ্‌গুরুর কৃপায় সাচ্চানামের Connection পায়, দিব্য শব্দধারার সঙ্গে যুক্ত হয় তাহলে সেই 'ধুন-আত্মক' সাচ্চানাম জীবাত্মাকে 'তিসরাতিলের' মধ্য দিয়ে চিণ্ময়রাজ্যের তোরণ দ্বারে পৌঁছে দেবে, মৃত্যুর রাজ্য যাবে সে পেরিয়ে, আনন্দ-অমৃত জ্যোতির মন্দাকিনী ধারায় সে হবে অভিস্নাত। এই মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনার নামই সন্তমতের সাধনা।*

"সতগুরু সন্ত কহে বহুতেরা
রাহ বতাবেঁ দশ দ্ব'রা"। (গ্রন্থসাহেব)

স্ত্রীপুত্র পরিজনের মধ্যে থেকে সকল রকমের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেও কিভাবে নামের ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে "দশম দুয়ারের" তোরণ পথে "আলোক-

---

*এই সন্তমতের সাধনার বিস্তৃত আলোচনা এবং বিশ্লেষণ "আলোক-তীর্থের" দ্বিতীয় খণ্ডে করা হয়েছে।

তীর্থে" যাওয়া যায় সেই নিগূঢ়তম সাধন রহস্য সন্তরা প্রকাশ (Reveal) করে গেছেন।

"ন ঘর বার ছড়না এ, ন পুত্র-ধিয়াঁ ছডনে নে। ইন্ হা বিচ্চ রহিন্দে হোয়ে অপনী তবজ্জুহ্ অক্‌খাঁ (eyes) দে পিচ্ছে লে আও—নৌ দরবাজে বন্দ্ কর কে দশবঁাগলী (Tenth door) বিচ্চ আও, অগ্‌গে রস্তা খুল জায়েগা। **নাম** দা নাল, জদ মন নুঁ Motionless করোগে, পর্দ্দা খুল জায়েগা।"

("রুহানী পৌড়ী"—বাবা শাবন সিংজী)।

একেই সন্তেরা বলেছেন "জিতাজিত্ মুক্তি হাসিল।" এজন্য আমৃত্যু flimsy hope বা false promise এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে সারাজীবন কাটাতে হবে না, প্রথাজর্জ্জর সংস্কারের অনুসরণ বা অনুকরণ করে; করতে হবে না, তোতাপাখীর মত— রসঅমৃত আনন্দহীন, অনুভূতিহীন মন্ত্র জপ।

ভীতিবিহ্বল ত্রিতাপদগ্ধ জীবকে বৃথা আশ্বাসের বাণী শুনিয়ে ভ্রমে ভটকিয়ে রাখেন না সন্তসদ্‌গুরু; কিংবা, মরণের পর মুক্তি বা কোন অচীন্ দেশের অনন্ত ভোগসুখময় স্থানের প্রলোভন দেখিয়ে, মৃত্যুর পর ভগবানের "নিত্যলীলা পার্ষদ" হওয়ার কথাও দেন না সন্ত। "এখন তুমি বদ্ধ থাকো বহিরাচারের শৃঙ্খলে, 'অপোমার্জন' আর 'শঙ্খআপোধন্মনা' করে কাটাও সারাটা জীবন, শিব কালী হরি-মন্দিরে বৃথাই মাথা ঠুকে মরো, মৃত্যুর পর তো অপ্রাকৃত ধামে যাবে"—এ ধরণের কথাও সন্তেরা বলেন না। তাঁরা এ কথাও বলে যান নি যে 'এখন বস্তি ধৌতি কপাল ভাতি ন্যাস প্রাণায়াম নানা প্রক্রিয়ার প্রহেলিকায় মত্ত থাকো, অনুভূতি না হলে বোঝো আধার-অধিকার ঠিক নেই!"

সন্তদের অভয়বাণী—"কুলমালিক পরম দয়াল সর্ব্বব্যাপী হয়েও তোমার মধ্যে নিত্য বিরাজিত। এ দেহের মধ্যেই যদি আনন্দধাম থাকে, যদি থাকে অমৃত-সমুদ্র, কেন তবে সারাজীবন ভোর তুমি তৃষ্ণায় জ্বলিতকণ্ঠ থেকে যাবে? সাচ্চা প্রেম এবং অনুরাগের সঙ্গে দয়ালের কাছে অন্তরের আকুতি জানাও, খোঁজ করো সন্তসদ্‌গুরুর Perfect Living-Adept এর—যিনি তোমার সহস্রারে নামের ধারা প্রকট করে, দেবেন অমৃতের সন্ধান।"

গুটিপোকা যেমন নিজের লালায় নিজেই আবদ্ধ হয়ে যায়, তেমনি সুরত বা জীবাত্মাও বাসনার জালে বাঁধা। কোটি কোটি জন্ম cycle of birth and

death এর ভিতর দিয়ে আসতে আসতে মাকড়সার জালের মত তার উপর পড়েছে কর্ম্মের আবরণ; সে ভুলে গিয়েছে তার প্রীতম্‌কে। সুধাপাত্র ফেলে রেখে, নবদ্বার দিয়ে সে বিষয় ভোগ করে চলেছে। এই জগতের রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ সম্ভোগের মধ্য দিয়ে বৃথাই সে খুঁজে বেড়াচ্ছে- শান্তি-সুখ-তৃপ্তি! একমাত্র সন্তসদ্‌গুরুই পারেন—জীবের মধ্যে নামের ধারা প্রকট (Manifest) করে এই জীবনেই তাকে দিতে সেই আলোক তীর্থ, অক্ষয়্ শান্তির সন্ধান।

"নৌ দ্বারণমে নব কোঈ বরতে, দশবাঁ নিরখে বিরলা কোঈ
জিনকো মেহের সে সৎগুরু ভেটে, তিন্ জনা রহ্ মারগ্ গোয় ।"

(গুরু অর্জ্জুন সাহেব)

নবম দ্বারের মধ্যেই সবাই বর্ত্তমান থাকেন– দশম দ্বার খুব অল্প লোকেই দেখেছেন। যিনি সন্তসদ্‌গুরু পান—তিনিই জানতে পারেন এই মার্গ।

অন্যান্য যত মত পথের সাধনা সবই হয় মন নিয়ে, নয় প্রাণের ধারা নিয়ে; সন্তমতের সাধনা– জীবাত্মা দিয়ে পরমাত্মার সান্নিধ্যলাভ।

যতক্ষণ মনের রাজ্যে ততক্ষণ দ্বন্দ-কোলাহল, ভেদ-বিবাদ; যতক্ষণ ন-দরজার নিচে ততক্ষণই রাম রহিম, John-Thomas পরিচয়—সব কিছু সংকীর্ণতা। দশম দুয়ার দিয়ে অমৃতের রাজ্যে গেলে সবই সত্য, সবই শিব, সবই সুন্দর, সবই ভূমা।

জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ বলেই সবকিছুর মধ্য দিয়ে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাঁকে—এ তার এক Inherent attraction। কিন্তু বহিরাচারের মাধ্যমে, ইন্দ্রিয় দিয়ে ইন্দ্রিয়াতীতের সন্ধান করে বলে সারাজীবন হয় তার ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত; বুকে সাহারার জ্বালা নিয়ে তার ধেয়ে বেড়ানো হয় মৃগতৃষ্ণিকার পেছনে। তাই সন্তেরা জীবাত্মা দিয়ে সাধনার আলোক পথ দিয়ে গেছেন।

সূর্য্যমণ্ডলে কোন মানুষ যেতে পারে না, Chromosphere এ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কিন্তু সূর্য্যের অংশ বলে সূর্য্য রশ্মিটা অবহেলে অতিক্রম করে যায় সব Sphere-গুলো, পৌঁছতে সমর্থ হয় নিজ ভাণ্ডারে। তেমনি কুলমালিকের অংশ বলে জীবাত্মাই পারবে পৌঁছতে 'ধুরধামে'—নিজভাণ্ডারে।

"নদোর ঠাকে তাবদ্ রহায়ে, দশমে নিজ ঘর বাসা পাওয়ে,
ওথে অনহদ্ শব্দ বাজে দিনরাতি, গুরুমতি শব্দ শুনামনাইয়া।" (নানক)

ন-দরজা বন্ধ করে, মনোজগতের যত কিছু সংকীর্ণ সীমারেখাগণ্ডি ভুলে গিয়ে, উদার-উৎসর্পিনী দৃষ্টি নিয়ে, উর্দ্ধের অভীপ্সা নিয়ে 'দশমদুয়ারে' যাও, পাবে নিজ ঘরের সন্ধান; ওখানে অবিরাম ধারে প্রতিনিয়তই ঝঙ্কৃত হচ্ছে নামের ধারা। সন্তসদ্‌গুরুর কৃপাতেই এই **নাম** পাওয়া যায়। এই নাম—সার্ব্বভৌম-সার্ব্বজনীন। সবাই দয়ালের সন্তান—সবারই আছে এতে অধিকার। চাই কেবল Inner urge—স্বামী মিলনের প্রবল আকর্ষণ।

তুমি হিন্দু—গুরু কৃপায় এই নামের ধারার সঙ্গে যুক্ত হও—ভুলে যাবে তোমার সংস্কারের হীনতা; বৃথাই মঠ মন্দিরে মূর্ত্তিতে জীবনভোর ফুল জল নৈবেদ্য ডালি দিয়েও 'দেউলিয়া' হয়ে যেতে হবে না। শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে খোলকরতালের কলরোলে—বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানে বৃথা সময় নষ্ট হবে না। অন্তরে নামের মহিমা নিজেই অনুভব করতে পারবে। মুসলমান যে, তাকেও শরীয়তির শাসন-শৃঙ্খলে বৃথাই রোজা-কেয়ামত করে মরতে হবে না। পয়গম্বরের 'পয়গম্' সে নিজেই শুনবে—Internal আজানের পুণ্যডাকে তার 'রুহ্' হজ করবে চিন্ময় মক্কার পথে—আল্লার মঞ্জীলে। তুমি শিখ, তুমি যদি এই নামের ধারার সঙ্গে যুক্ত হতে পারো—ঘুচে যাবে তোমার মোহের কাজল।—চৈতন্যময় জীব হয়ে inanimate object—একটা গ্রন্থকে পূজা করে সারাটা জীবন বৃথা কাটবে না। "পঞ্চ ক" এর কপাট হবে উন্মোচিত—হিন্দু বিদ্বেষ আর মুসলমান-ঘৃণায় অন্তরস্থ আত্মা হবে না অধঃপতিত। তোমাদের প্রাণের বস্তু যিনি—সেই গুরু নানকের উপলব্ধ সত্য—

> "অন্তরজ্যোত নিরন্তর বাণী
> সাচ্চে সাহেব সি'ও লিবলাই হে"—

—তোমার জীবনেও জীবন্ত সত্য হয়ে দেখা দেবে।

ঐ "নিরন্তর বাণী"ই—হলো **নাম**। কেবল এই ধ্বন্যাত্মক নামের ধারার সাহায্যেই—'সাচ্চাসাহেব'—পরমদয়ালের সঙ্গে ঘটে মিলন। কোন বর্ণাত্মক নাম জপ নয়—দাতাদয়ালের সঙ্গে যুক্ত করে দেয় যে মিলন-রাখিটি—তাই হ'ল সাচ্চা নাম। তাই সন্তসদ্‌গুরু নানকজীর অভয়-অমৃত আহ্বান—

> "সন্তজন মিলো পাইয়ো! সচ্চা নাম সমাল
> তোষা বন্ধো জীওকা, এথে ওথে নাল।"

সন্তের সঙ্গে মিলিত হও ভাই! নামের ধারার সঙ্গে যুক্ত হও। উভয় লোকে পরমানন্দ পেতে হলে—সেই আলোক-তীর্থে আনন্দময় পরিভ্রমণ করতে হলে, সাচ্চা নামই একমাত্র সহায়।"

দ্বিতীয় পুষ্প

প্রশ্ন :— সন্তদের সাধন রহস্য এবং নামতত্ত্ব সম্বন্ধে যে নিগূঢ় তত্ত্ব বললেন তা অপূর্ব্ব। আচ্ছা দীক্ষালাভ কাকে বলে? গুরু শিষ্যের কি করে দেন? সাধারণ মানুষও যাতে সদ্‌গুরু চিনতে পাবে তার উপায় কি?

উত্তর :— বিনোদবাবুর পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তরে যে সাচ্চা নামের (দিব্য Sound Current) কথা বলেছি—নিজের সহস্রার চক্রে ঐ নামের Connection পাওয়াই দীক্ষা লাভ। সাচ্চা গুরু যিনি, পূরণধর্না মহাত্মা যিনি - তিনি দীক্ষা দান কালে সত্যসন্ধানী শিষ্যকে এই দিব্য সম্পদ দান করে—এই দেহের মধ্যেই যে আনন্দধাম আছে—তার সন্ধান দেন।

" শব্দ ভেদ তুম গুরু সে পাও
শব্দ মাহিঁ ফিব জায় সমাও।
... ...
শব্দ বুঝায়ে সো গুরু পূরা
উন্ চরণমে হো জা ধূরা॥" (পরমসন্ত শিবদয়াল সিংজী)

পিণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডদেশ অর্থাৎ দেবভূমি আর ব্রহ্মভূমিরও অতীত দয়াল দেশ থেকে যে নামের ধারা আসে জীবাত্মা তার সঙ্গে যুক্ত হলেই তার ভেতর-বাহির আলো হয়ে ওঠে—সব কিছু দিব্য আনন্দে ভরে ওঠে—সে কলকণ্ঠে আনন্দোচ্ছল হয়ে বলতে পারে—

" আজ সদ্‌গুরু কী শরণ ভাগ সে মৈঁনে পাই
শব্দ ধুন বাজ রহি, চাঁদনী ঘটমেঁ ছাই।
করম ঔর ধরম ভরম জানকে, সব ছোড়দিয়ে
টেক পিছলোঁ কী তজী, প্রেম-গুরু মেঁ লঈ॥"

প্রেমিক গুরুর কৃপায় তার প্রীতম্-প্রিয়তমের দরশ-পরশ পাওয়ায় তার সব কিছু বন্ধন—অতীতের যতো কিছু ভ্রান্ত সংস্কারের আবরণ যায় খসে। এক মুসলীম

সাধক তাঁর সাচ্চা গুরুর কাছে দীক্ষা পেয়ে—দীক্ষাতে তিনি কি লাভ করেছিলেন— তা অনবদ্য ভক্তি স্নিগ্ধ ভাষায় প্রকাশ করে গেছেন—

"হমনে দর্‌ পর্দা তুঝে শমশ্‌ রবী দেখ্‌ লিয়া,
অব ন কর্‌ পর্দা তু, এ পর্দা নশী ঁ দেখ লিয়া।
তেরে দীদার কী থী, মুঝকো তমন্না মো তুঝে
লোগ দেখেঙ্গে ওহাঁ, হমনে য়েহি দেখ্‌ লিয়া।
হম্‌ নজর বাজে ঁা মে তু, ছিপ্‌ ন মকা জানে জ ঁহা
তু জ ঁহা জাকে ছিপা, হমনে ওহঁী দেখ লিয়া॥"

'তোমায় দেখলুম আমি পর্দার মধ্যে—কোটি প্রকাশমান্‌ সূর্য্যের উজ্জ্বল দীপ্তি! আমায় আর পর্দা করো না, পর্দার মধ্যে যিনি বসে রয়েছেন তাঁকে আমি দেখে নিয়েছি। তোমাকে দেখবার ইচ্ছা ছিলো কী প্রবল! লোকেরা তোমাকে ওখানে দেখবে, আমি দেখে নিলুম এখানেই। আমার মতো নজর বাজের কাছে লুকোতেই পার নি কোন জায়গায়—যে জায়গায় তুমি গিয়ে লুকিয়ে আছ—আমি সেখানেই তোমায় দেখে নিয়েছি!—দেখে নিয়েছি!!'

সন্তদের বাণী-বচন-উপলব্ধির কথা বাদ দিয়ে—আরও সহজ করে বুঝতে হলে দীক্ষা মানে বোঝায় শিষ্যের হৃদয়ে গুরুর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। পূজাপদ্ধতিতে দেখ তো—বরণ, অধিবাস, প্রাণ-প্রতিষ্ঠাদির কথা থাকে? তুমি দাতাদয়ালকে মনে প্রাণে বরণ করে নিয়ে, হৃদয়ের আসন-বেদীতে তাঁকে 'অধিবাস' করালেই গুরু এসে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন; তার মানে এই নয় যে তুমি নিষ্প্রাণ ছিলে, তিনি এসে জীবন্ত করলেন। ভাবার্থ এই, তোমার মধ্যে Latent ছিলো যে চৈতন্যশক্তি তিনি তা Potent করে দেন, manifest করেন।

একই খনির মধ্যে কয়লাও থাকে, হীরাও থাকে। হীরা আর কয়লার মধ্যে তফাৎ শুধু atomic change এর, স্পন্দনাত্মিকা চেতন-শক্তির চাপে electron proton এর শুধু স্থিতির পার্থক্য। Systematic এবং scientific way-তে electron proton এর displacement হলেই কয়লাটা হবে হীরাতে রূপান্তরিত। সদ্‌গুরু শিষ্যের এই atomic change এনে দেন—তার সমস্ত system এ, Astral এবং causal plane এতেও ঘটে চৈতন্যময় পরিবর্ত্তন। রুদ্ধ মুখ গোমুখীর প্রবাহ যেন খুলে যায়, হয় বোধির বোধন, মরু-সাহারায় আসে

প্রাণগঙ্গার প্লাবন। তার ফলেই দেখা যায়—সাচ্চা গুরুর দীক্ষালাভের পর দুর্জ্জন হয় সজ্জন, কামুক হয় জিতেন্দ্রিয়।

"ভিখা ভূখা কোঈ নেহি সবকো মাহি লাল
গিরনা গাঁটরি ন খুলনে জানে, তায়সে কাঙ্গাল।" (ভিখাজী)

কেউ ভিখারি থাকার কথা নয় 'ভূখা' থাকার কথা নয়—সকলের মধ্যেই সেই 'রক্তরাগমণি' আছেন ; কেবল তালা খুলতে জানা নেই বলেই কাঙ্গাল। দীক্ষালাভে এই বদ্ধ তালা খুলে যায়, 'রক্তরাগমণির' দর্শন মেলে।

সাচ্চা গুরুর কাছে যে ভাগ্যবানের দীক্ষালাভের সুযোগ ঘটে—সেই আস্বাদন করে এই নিগূঢ় তত্ত্ব।

"দীক্ষা" কথাটি analysis করে দেখ এতে আছে—দুটো অক্ষর—'দী' আর 'ক্ষা'। 'দী'—দান করে—দীয়তে, ক্ষা—ক্ষীয়তে, ক্ষয় করে।

কিসের দান ? কিসের ক্ষয় ? 'দীয়তে পরমং জ্ঞানম্ ক্ষীয়তে পাপ কর্ম্মানি'—যা পরম জ্ঞান দান করে আর পাপ কর্ম্ম অর্থাৎ আত্মার আবরক অজ্ঞান-অন্ধকার ক্ষয় করে।—

জন্ম এবং কর্ম্মস্রোতে ভাসতে ভাসতে সুরতের উপর পড়ে কর্ম্মতন্তুর সূক্ষ্ম আচ্ছাদন ; তাই সে ভুলে যায় তার 'প্রীতম্ পিয়ারা' কে, 'ধুরধাম' (Abode of Eternal Bliss) দয়ালদেশের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সংসারের অনিত্য ভোগ সুখে সে হয়ে যায় লিপ্ত। 'আনন্দম্'এর অংশ, আনন্দ-দুলাল সে, কিন্তু কর্ম্মের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাকে দেয় বিপরীতমুখী গতি। একটু পেছন-ফিরে, উর্দ্ধপানে এগোলেই—যাঁকে পাওয়া যায়—যাঁকে পেলে নিভে যাবে তার ত্রিতাপের দাবদাহ—ঘুচে যাবে তার জন্ম-মৃত্যুর গোলকধাঁধা—তাঁকে ভুলে গিয়ে, তুচ্ছ ভোগ-সম্ভোগে মেতে থাকে, ঘুরতে থাকে সংস্কারের বেড়াপাকে। Negative Power—'কাল'—কর্ম্মানুযায়ী তাকে ফল দিয়ে যায়—প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগের জন্য তাকে বারবার আসতে হয়। কর্ম্ম থেকে হয় কর্ম্মের বৃদ্ধি—এই কর্ম্মচক্রই দেয় সৃষ্টি-অভিমুখী down-ward গতি—ফলে তার 'আবাগমন' আর শেষ হয় না।

দাতাদয়াল কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না—সন্তান তাঁকে ভুলে রয়েছে বলে এই অপরাধে ; তিনি সইতে পারেন না—তাঁর 'বাচ্চা'র উপর কালের

এই প্রচণ্ড শাসন। মর্ত্তের জীবকে অমৃত-জগতের সন্ধান দিতে তখন হয় দয়াল শক্তির (Positive Power) manifestation—ইনিই সন্তসদ্‌গুরু।

"বাদশাহে আজম্, তেরে বন্তা বুদ্ মোকম্
পশিদা দালকে আদম, ইয়ানিক বরদর আমদ্।" (শম্‌সের তবরেজ্)

সাচ্চা শাহন্‌শাহ আর জীবাত্মার মধ্যে রয়েছে শক্ত কপাট। যিনি দয়া করে আমাদের মত মূর্ত্তি ধরে এসে কালের ও মায়ার এই লৌহ-যবনিকা সরিয়ে দেন তিনিই গুরু।

গুরু তাঁর আশ্রিতকে—সত্যান্বেষী সাধককে, দীক্ষাকালে দেন, দয়াল দেশের সন্ধান—পরমজ্ঞান। আর যে সঞ্চিত কর্ম্মের আবরণ তার সত্ত্বাকে ভুলিয়ে রাখে—সেই কর্ম্মের জাল ছিন্নভিন্ন ক্ষয় করে দিয়ে প্রকট করে দেন নামের অমৃত-ঝঙ্কার। সহস্রারে প্রকট—এই দিব্য শব্দের অনুসরণ করে, শব্দের মধ্যে 'লবলীন' (absorbed) হয়ে সে তখন ফিরে যেতে পারে—দয়ালের শান্তিময় কোলে।

"প্রীতম্ প্যারে ক্যা দিয়া সন্দেশা
শব্দ পাকড়ো জায়ো উস্ দেশা।"

(রাধাস্বামী সাহেব)

সূচীভেদ্য অন্ধকারময় ঘোর দুর্য্যোগের রাতে—বনে জঙ্গলে—বেঘোরে যখন ঘুরতে থাকে পথিক, নির্ণয় করতে পারে না তার গন্তব্যস্থলের (Station এর) সঠিক পথ, ঘর্ম্মাক্ত শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে কণ্টকবিদ্ধ চরণে সে যেমন হোঁচট খেতে থাকে, সে সময় যদি Station থেকে Train এর Whistle শুনতে পেলে নিরাশ প্রাণে পায় আশার আলো, সেই শব্দ অনুসরণ করে সে যেমন পৌঁছতে পারে Station এ, তেমনি জীবও তার গন্তব্যস্থল দয়ালদেশের পথ ভুলে গিয়ে—ত্রিতাপ ক্লিষ্ট হয়ে সংসার-অরণ্যে দিশেহারা হয়ে পাচ্ছে অসহ্য যন্ত্রনা। অবিদ্যার সূচীভেদ্য অন্ধকার—তার সঞ্চিত কর্ম্মের জাল, রচনা করেছে এক দুর্ভেদ্য লৌহযবনিকা। কাতর প্রাণে কেউ দয়ালের শরণাগত হলে সন্তসদ্‌গুরু এসে ডাক দেন—দেন 'পয়গম' 'আজান', আবরণ ঘুচিয়ে মুমুক্ষুর সহস্রাব চক্রে প্রকট করে দেন নামের ধারা ; শব্দ ঝঙ্কারের দিব্য তানে সুরতকে যুক্ত করে, আনন্দধামের সন্ধান দিয়ে আশ্বাস শোনান—

"স্বরূপ হারানো জীব ! আনন্দ দুলাল !
এসো অনুসরি এই শব্দের ঝঙ্কারে
ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই আর,
আমি আছি, আমি আছি, আমি আছি ওরে"।

এই পরম মুহূর্ত্ত থেকেই—শব্দ-স্বরূপ হয়ে নিত্যকালের সাথী গুরু থাকেন সঙ্গে সঙ্গে, সঞ্চিত কর্ম্মকে করে দিলেন ক্ষয়, প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ হতে থাকে আর ক্রিয়মান্ কর্ম্মকে reguiate করতে থাকেন। সেই দিন থেকে শিষ্যের প্রতিটি মুহূর্ত্ত, প্রতিটি নিঃশ্বাস তাঁরই অদৃশ্য সঙ্কেতে হয় পরিচালিত। গুরু ধীরে ধীরে করেন শিষ্যকে আত্মসাৎ, তার আসে শরণাগতি, মালিকের "মৌজ" এর উপর নির্ভরতা, প্রিয় মিলনের তীব্র আকুলতা ; শব্দের ধারার দুর্নিবার আকর্ষণে সুরত আধ্যাত্মিক স্তরগুলি ধীরে ধীরে অতিক্রম করতে থাকে—প্রাণে আসে বিমল শান্তি। দীক্ষালাভের পর থেকে সাধক সর্ব্বভূতে দেখতে থাকেন তাঁর 'ইষ্টকে'—প্রতিঘটনার পশ্চাতে দেখেন তাঁর গুরুদেবেরই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ, সুখদুঃখ শোকতাপ—সব কিছু সম্পদ আর সংঘাতকে মালিকের 'মৌজ' ভেবে গ্রহণ করতে থাকেন প্রসন্নচিত্তে। ফলে, প্রত্যেক বস্তুতে প্রত্যেক কর্ম্মেই হয় তাঁর 'ভাগবত সত্ত্বা'র রসাস্বাদন ; সাধক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন সত্যে, প্রতিটি কর্ম্মই তাঁর পূজা হয়ে ফুটে ওঠে, প্রতি ধূলিকণা অণুপরমাণুটি পর্য্যন্ত তাঁর কাছে আনন্দেরই অভিব্যক্তি, আনন্দময় আনন্দ পরিপ্লুত বলে মনে হয়। একজন সন্ত এই অবস্থাটিকে এইভাবে প্রকাশ করেছেন—

"শব্দ-স্বরূপী সংগ হৈ, কভী ন হোতে দূর
ধীরজ রাখিও চিত্ত মে, দেখেগা সত নূর, (সত্যজ্যোতি)।
সত্যনাম সংপুরুষকা সত্যলোকমে পূর
সুরত চড়াও শব্দমে দর্শন হাল হুজুর'।

তাই সহজ কথায় বলতে গেলে দীক্ষা মানে 'দেখা', শিষ্য 'দেখেন', গুরু 'দেখান'। সদ্‌গুরু—সাচ্চানাম—আর দীক্ষালাভ সম্বন্ধে গুরু নানকের বাণী—

"ঘর মে ঘর দেখলায় দে সো সৎগুরু পুরুষ সুজান
পংচ শব্দ ধুনকার ধুন বাজে শব্দ নিশান।
দীপলবে পাতাল খান খংড মংডল হৈরাণ
তার ঘোর বাজন্তরা তঁহা সচ্ তখত্ সুলতান।

সুখমন্ (সুষুম্না) কে ঘর রাগ সুন সুন্ন মংডল লোলায়,
অকথ কথা বিচারকে মনসা মনহিঁ সমায়।
উলট কঁবল অমৃত ভরে য়হ্ মন কিত্‌হু ন জায়
অজপাজপ ন বিসরে' আদি জুগাদি সমায়
সব সখিয় া বিচে মিলৈ' গুরুমুখ নিজঘর বাস
শব্দ খোজ য়হ্‌ ঘর লহৈ নানক তাঁকো দাস।"

এই হ'ল সাচ্চা দীক্ষালাভ—সাচ্চানামপ্রাপ্তি—সাচ্চাগুরুর পরশলাভ।

প্রশ্ন :— (লাহিড়ীমা)— আমি বাবা মূর্খ মেয়ে। আপনার ঐ সব কথা শুনে সব ঘুলিয়ে ফেলছি—কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমাকে আর একটু সহজ করে অল্প কথায় বুঝিয়ে দিন—আমার কি হলে কিংবা কি পেলে বুঝবো সদ্‌গুরুর কাছেই আমার দীক্ষা নেওয়া হ'ল?

উত্তর :— আচ্ছা Line এর গোলমালের জন্য কাল পর্য্যন্ত তো এ ঘরে আলো জলতো না। আজ কি করে বুঝছেন মা যে এ ঘরে আলো জলছে?

লাহিড়ী মা :— বাঃ, অন্ধকার নেই যে! ইলেকট্রিক মিস্ত্রী এসে লাইন ঠিক করে দিয়ে গেল সকালে, সুইচ্ টিপতেই আলো জলছে।

উত্তর :— সাচ্চা গুরুও তেমনি দীক্ষাকালে আপনার অন্ধকার ঘরে আলো দেন, দেন দিব্য electric connection। Line গণ্ডগোল থাকার ফলে অর্থাৎ লয় বিক্ষেপের বেতালে পড়ে জীবাত্মা অন্ধকারে হাতড়াতে থাকে পথ, 'দয়াল' বলে জড়িয়ে ধরে 'কাল'কে—'বাপ' বলে 'সাপ'কে; ক্ষতবিক্ষত হয় বিষের জ্বালায়, পাথর নুড়ি পূজা করে বহিরাচারের অন্ধকারে ডুবে থাকে; সাচ্চা গুরু পারেন তার সে অন্ধকার ঘুচাতে—মনের কালো দূর করে জেলে দেন আলো। আর এই জন্যই তাঁর নাম গুরু। 'গুরু' কথাটির মধ্যে এই গভীর অর্থ নিহিত। ঋষিরা অজ্ঞ লোকের ভুল ভাঙ্গানোর জন্য—বিভ্রান্তি থেকে বাঁচাবার জন্য তাই স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন—

" 'গু' শব্দে অন্ধকারঃ স্যাৎ 'রু' শব্দঃ তন্নিরোধকঃ
অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ"

'গু' মানে অজ্ঞানতার অন্ধকার—'রু' অর্থে তন্নিরোধক বিমল চৈতন্য-জ্যোতিঃ। দীক্ষাকালে গুরু ঐ অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে, প্রকট করেন

চৈতন্যের ধারা, শিষ্যের মধ্যে ঘটে প্রজ্ঞার পরম প্রকাশ।

প্রশ্ন :—কী সব অদ্ভুত কথা! সাচ্চা গুরু দীক্ষা দিলেই এই রকম অবস্থা হয়? আমরা তো সবাই বুঝে এসেছি—দীক্ষা মানে কোন একটা মন্ত্র লাভ—নয়ত বা—কতকগুলো আসন-প্রাণায়াম মূদ্রা শিক্ষা! দীক্ষালাভের পরমমুহূর্তে ঐ সব অনুভূতি হবে সবারই?

উত্তর :—হ্যাঁ। দাতা দয়াল সদ্‌গুরু দয়া করে যাদেরকেই accept করবেন—যাদেরকেই দীক্ষা দেবেন—তাদেরই হবে। গুরু নানক কত স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন "ঘর মেঁ ঘর দেখলায় দে সো সৎগুরু পুরুষ সুজান"। "শব্দ বুঝায়ে সো গুরু পূরা"—(রাধাস্বামী সাহেব)। "খুলে কপাট শব্দ ঝন্‌কারী, পিণ্ড অণ্ড সে পার, সো দেশ হমারা হৈ"—(কবীর সাহেব)। সন্তদের আরও হাজার হাজার বাণী উদ্ধৃত করে আমি দেখাতে পারি, এ সম্বন্ধে সব সন্তরাই একমত। এ হচ্ছে উপলব্ধ সত্য।

আচ্ছা, অতশত সন্তবাণী বা শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম যদি সাধারণে নাও জানেন, গুরুর প্রণাম মন্ত্রটা অন্ততঃ সবাই ত জানেন? লাহিড়ী মা! আপনারও মনে হয় গুরুর প্রণাম মন্ত্রটা জানা আছে?

লাহিড়ী মা :—তা জানি বৈ কি বাবা। প্রতিদিন এই মন্ত্র বলে যে গুরুকে প্রণাম করি :—

(ক) অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

(খ) অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

উত্তর :—Class VII, VIII পর্য্যন্ত পড়লে যে সংস্কৃতজ্ঞান হয় তার দ্বারাই ঐ শ্লোক দুটির সাদা বাংলা মানে বোঝা যায়। শ্লোকদুটি সংস্কৃতে না বলে বাংলায় বললে কি বোঝায়—বল তো বিশ্বনাথ। B. A তে তো তোমার সংস্কৃত আছে।

বিশ্বনাথ :—এর মানে হ'ল—(ক) অখণ্ডমণ্ডল পরিব্যাপ্ত যে চৈতন্য সত্তা—তাঁর পরমপদ যিনি দেখিয়ে দিলেন বা যাঁহা কর্তৃক দৃষ্ট হইল, সে হেন গুরুকে প্রণাম করি। (খ অজ্ঞানতার অন্ধকারে অন্ধ ছিলাম। জ্ঞানাঞ্জনশলাকা

দ্বারা যিনি আমার দিব্যচক্ষু (জ্ঞানচক্ষু) ফুটিয়ে দিলেন, সেই গুরুকে প্রণাম করি।

উত্তর :—তোমরা দীক্ষালাভের পর, গুরু বরণ করার পরেই ঐ প্রণাম মন্ত্র বলে গুরুকে প্রণাম কর— না— অনাদ্যন্তকাল পরে, এ জন্মে না হয় পরজন্মে যখন ঐ পরমপদ দর্শন হবে, প্রজ্ঞাচক্ষুর উন্মীলন হবে, তখন ঐ মন্ত্র বলে প্রণাম করার অধিকার লাভ কর? মর্ম্মার্থ না জেনে বুঝে, বস্তু উপলব্ধি না করেই কি ঋষি ঐ শ্লোক দুটি রচনা করেছেন? দীক্ষা কালে দর্শন হয়, গুরু 'দেখিয়ে দেন' বলেই না ওতে আছে—"তৎপদং দর্শিতং যেন"? "তৎ মন্ত্র প্রদত্তং যেন—তাঁকে জানবার জন্য অং বং শং, হ্রীং ক্রীং বা হরে কৃষ্ণ রাম, এই রকম ধরণের একটা মন্ত্র যাঁহা কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল এ হেন গুরুকে প্রণাম করি"— এ ধরণের কোন কথা আছে কি? কিংবা "ন্যাস-প্রাণায়াম, যোনি-মুদ্রা খেচরীমুদ্রাদি যিনি শিখিয়ে দিলেন—তৎক্রিয়া প্রক্রিয়া প্রদর্শিতং যেন—সেই গুরুকে প্রণাম করি"— এ ধরণের কথাও কি ঋষি বলছেন?

সাচ্চাগুরু যিনি, তিনি দীক্ষাকালে "ঘর মেঁ ঘর দেখলায় দেয়", এই দেহের মধ্যেই যে আনন্দধাম আছে—তা দেখিয়ে দেন, তৃতীয়চক্ষু উন্মীলন করে দেন বলেই না—ঐ সত্য উপলব্ধি করে, ঐ শ্লোক রচনাকারী (তিনি ঋষিই হোন, আর যেই হোন) গুরুর প্রণাম মন্ত্রে ঐ কথা লিখেছেন?

কি লাহিড়ীমা, বিশ্বনাথ আপনার গুরু প্রণাম মন্ত্রের যে অর্থটা বলে দিল, তা বুঝতে পেরেছেন ত? আপনি সংস্কৃত জানেন না, আপনার গুরু আপনাকে দীক্ষার নামে যাই হোক্ একটা মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে, আপনার দুর্ব্বোধ্য, সংস্কৃতে রচিত ঐ দুটি প্রণাম মন্ত্র শিখিযে দিয়েছেন, আর আপনিও মানে না বুঝেই—তোতাপাখীর মতো বুলি আওড়িয়ে যাচ্ছেন! অর্থাৎ প্রতিদিন আপনি গুরুকে প্রণাম করবার সময় বলছেন—"হে গুরো! তুমি আমাকে সেই সর্ব্বব্যাপী দয়ালের পরমপদ দর্শন করিয়েছ, তুমি আমার অজ্ঞানতা দূর করে জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়ে দিয়েছ। তোমাকে প্রণাম"। কি মা, আপনার ঐ সব অবস্থা উপলব্ধি হয়েছে ত?

লাহিড়ী মা :—না বাবা! গুরুদেব আমাকে "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" মন্ত্র সব সময় জপ করতে বলে দিয়েছেন, প্রাণায়াম শিখিয়ে দিয়েছেন, আসনশুদ্ধি-

পুষ্পশুদ্ধি-জলশুদ্ধি করে, কোশাকুশিতে কিভাবে জল দিয়ে, কি মন্ত্রে নৈবেদ্য নিবেদন করে পঞ্চোপচারে পূজা করতে হয়, মাসে চারবার তাঁর জন্মদিনে হোম করতে হয়—তাও শিখিয়ে দিয়েছেন। আপনি দীক্ষা বলতে যা বোঝাচ্ছেন—সে সব তো কিছুই উপলব্ধি হয়নি! অথচ—আমার যা হয়নি তা হয়েছে বলে, যা পাই নি— তা পেয়েছি বলে, গুরুদেব যা করে দেন নি তা তিনি করে দিয়েছেন বলে বারবার চিৎকার করে প্রতিদিন বলে যাচ্ছি! হায় দয়াল! এত ভুলে রয়েছি!

উত্তর ঃ—হ্যাঁ মা, এই হ'ল কালের দালালদের, ধূর্ত্ত ধর্ম্ম ব্যবসায়ী গুরুদের চাতুরী! তোমরা সবাই চিন্তা করে দেখ—আমি কি ঐ দুটি শ্লোক রচনা করেছি—না—আমি—'তৎপদং দর্শিতং যেন', 'চক্ষুরুন্মীলিতং যেন'—কথা দুটির টেনে বুনে কোন অর্থ করেছি? আবাল বৃদ্ধবণিতা ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করে হাজার বার হয়ত গুরু প্রণাম করে, তবুও নিজের উপলব্ধির সঙ্গে ওর সাদা বাংলা মানেটা বিচার করে দেখে না। এই হ'ল মায়ার আজব খেল! 'মায়য়া অপহৃতং জ্ঞানং'—Negative Power এর কেরামতি! Negative power এর agent ভণ্ড গুরুরাও এর অর্থ বুঝিয়ে দেয় না। কারণ যদি কোন শিষ্য ঐ বস্তু চেয়ে বসে? তাহলে যে 'কারবার জল'!

তোমাদের অবস্থা মণ্টুর ছোট্ট বোন টিমির মত। মণ্টু টিমিকে মুখস্থ করিয়েছে—

"দাদা is a good boy
Very kind and gracious,
He has given me biscuits
And a necklace precious!"

টিমি সেটি যাই হোক করে, মুখস্থ করে, সকলের কাছে বলে বেড়ায়। ইংরাজী তার কাছে দুর্ব্বোধ্য--মানে বোঝে না, তোতাপাখীর মত মুখস্থ করেছে—সুর করে সকলকে শোনায়। তার বাবা ছুটিতে বাড়ী এসেছেন—তাঁকেও সে ইংরাজী কবিতাটা শুনিয়ে দিলে গর্ব্বভরে! দাদা তাকে শিখিয়েছে! বাবা শুনে বললেন—"হ্যাঁরে বোকা মেয়ে—ও কথার মানে কি জানিস্? তুই বলছিস্, 'দাদা একটি ভাল ছেলে বড় দয়ালু এবং মহৎ,

দাদা আমাকে একটি দামী হার আর বিস্কুট দিয়েছে'। কিরে, দাদা তোকে কোথায় হার দিয়েছে দেখি? তোর দাদা তোকে বিস্কুট খেতে দিয়েছিলো ত"? শুনে তো টিমির চক্ষু ছানাবড়া! দাদা তাকে দামী হার দেওয়া তো দূরের কথা—একটা বিস্কুটও কিনে দেয় নি। দাদা তার সঙ্গে দুষ্টুমি করেছে—ভুল শিখিয়েছে—অথচ সে কি না বলে বেড়াচ্ছে 'দাদা বড় ভাল ছেলে'!

বিচার করে দেখ—তোমাদের অবস্থাও টিমির মত কি না? বহিরাচার আর কুসংস্কারের জগদ্দল পাথর তোমার উপর চাপিয়ে দিয়ে, ঘোর অজ্ঞানতার গভীরতম পঙ্কে ডুবিয়ে রেখেছে যে, তাকেই প্রণাম করছো এই বলে—

... ... "চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ"!

কোনো অনুভূতিই যে দিতে পারলো না, আনন্দধামের কোনো সন্ধানই যে দিতে পারলো না তাকেই প্রণাম করছো এই বলে—

... ... "তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ"!!

তৃতীয় পুষ্প

প্রশ্ন :— আচ্ছা, যদি কোন গুরু বরণ করার পর দেখা যায় বহুদিনেও কিছু হলো না, তখন সে গুরু ত্যাগ করা যায় কি না? অনেকে তো বলেন গুরু ত্যাগ মহাপাতক—এতে নরকস্থ হতে হয়। "শিব রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরুরুষ্টে ন কশ্চনঃ"। বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে—'গুরুত্যজি গোবিন্দ ভজে, সে পাপী নরকে মজে'। 'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়'। কারও কারও ধারনা, 'অবিচার্য্যং গুরুকুলং'। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র এবং সন্তদের অভিমত কি?

উত্তর :— তার আগে তুমি বিচার করে বলতো ভাই, শিষ্য কি গুরুর কোন স্থাবর সম্পত্তি? মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত শিষ্যকুলের উপর গুরুর কি কোন মৌরসী পাট্টা আছে? এ পাট্টা টা দিলো কে? যদি বল শাস্ত্র—তাহলে তা মিথ্যা কথা। কারণ—শাস্ত্র এ কথা বলে না। যে ঈশ্বরলাভের জন্য, শাশ্বত আনন্দ লাভের জন্য গুরুর প্রয়োজন, যদি কোন গুরু সে অমৃতের সন্ধান না দিতে পারেন তাহলে তাঁকে ত্যাগ করায় কোন দোষ নেই; বরং সে হেন অক্ষম গুরুকে ত্যাগ না করে তাঁর অধীনস্থ গোলাম হয়ে পড়ে থাকাটাই অপরাধ। আর 'গুরু রুষ্টে ন কশ্চনঃ' যে কথাটা, ওটা হ'ল শিষ্য সম্প্রদায়ের উপর অধিকার কায়েম রাখার জন্য ভণ্ডদের threatening! ক্রোধ হচ্ছে একটা 'deadly poison—a disease of the soul', :মহাপুরুষের মধ্যে ক্রোধ থাকে না। সাচ্চাগুরু যিনি—তিনি দয়াল। মিছরির ভিতর-বাহির যেমন শুধু মিষ্টিময়, তেমনি সাচ্চাগুরুও দয়াময়—শিষ্য তাঁর প্রাণবন্ত, শিষ্যের উপর তাঁর ক্রোধের প্রশ্নই আসে না। আর ভণ্ড গুরু শত চেষ্টাতেও শিষ্যের কোন ক্ষতি করতে অক্ষম। আচার্য্য শঙ্কর বলেছেন—'শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ' (বিবেকচূড়ামণি)–যিনি বেদবিৎ শুদ্ধচেতা কামজয়ী-

ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনিই গুরুপদবাচ্য, অনভিজ্ঞ গুরুর দ্বারা উপদিষ্ট হলে আত্মাকে সম্যকরূপে জানা যায় না—এই হ'ল শ্রুতির উপদেশ—

'ন নরেনাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ' (কঠ ১।২।৮)

জ্ঞানের দ্বারাই জীবের হয় মোক্ষলাভ, জ্ঞানই পরাৎপর। অতএব যিনি এই পরম জ্ঞানদানে অসমর্থ সেই গুরুকে ত্যাগ করায় কোনও দোষ নেই। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর কেউ যেমন নিরন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে খাদ্য না পেলে, যার কাছে পাওয়া যায় তার কাছে immediate গিয়ে ক্ষুধার শান্তি করে, তেমনি মুমুক্ষুর উচিত, সত্যসন্ধানীর উচিত—যার কাছে সত্য ও অমৃতের সন্ধান পাওয়া যাবে না তাকে অবিলম্বে ত্যাগ করা।

সংশয় আর হতাশার আবর্তে পড়ে, ভণ্ড সাধুর মায়াজালে আচ্ছন্ন হ'য়ে যাতে কোনো সত্যসন্ধানীর জীবন ব্যর্থ না হয়, সাচ্চা মহাত্মার আশ্রয়লাভ করে যাতে এই জীবনেই কৃতকৃত্য হতে পারে, এ জন্য শাস্ত্র বজ্রনির্ঘোষে জানিয়েছে—"পূরণধণী মহাত্মার দর্শন লাভ করার সঙ্গে সঙ্গ, অক্ষম গুরুকে ত্যাগ করে, তৎক্ষণাৎ তাঁর শরণাগত হবে"। মনুভাষ্যে মেধাতিথি বলেছেন—

'মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ
জ্ঞানলুব্ধো তথা শিষ্যঃ গুরোগুর্বন্তরং ব্রজেৎ'

বিশ্ববরেণ্য পরমসন্ত কবীর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কি বলেছেন শোন—

'যব তক্ না দেখো নিজ নয়নি, তব তক্ না মানো গুরুকা বাণী'।

সাচ্চাগুরু কি—না—দীক্ষালাভের সময়েই তা বোঝা যায়। ঐ সময় তিনি 'ঘরমেঁ ঘর' দেখিয়ে দেবেন, বস্তু উপলব্ধি করিয়ে দেবেন। যদি না হয়—তাহলে সে গুরুর বাণী মানবার প্রয়োজন নেই; 'প্রত্যক্ষদর্শন' হ'ল না বলে সে গুরু ত্যাগ করতে হবে—এবং খুঁজতে হবে সাচ্চা গুরুকে।

'গুরু করো দশপাঁচা, যব তক্ ন মিলে গুরু সাঁচা,
কবীর কহে শোন লোঈ, সংশয় মিটে সদ্‌গুরু সোঈ'।

'অক্ষম গুরু ত্যাগ করলে মহাপাতক হয়'—এ সমস্ত ধর্মব্যবসায়ীদের অপপ্রচার মাত্র। 'দিব্যদর্শন' করাতে অক্ষম-গুরু ত্যাগে কোন দোষ স্পর্শ করবে না, এই বরং শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। মহাপুরুষের অভিমত—

'অনভিজ্ঞং গুরুং প্রাপ্য সংশয়চ্ছেদকারকম্
গুরুন্তরন্তু গত্বা স নৈতদ্দোষেণ লিপ্যতে।'

এর পূর্ব্বে—নির্ম্মলচৈতন্যদেশের যে শব্দধারার পরশ পাওয়াকে আমি সাচ্চা দীক্ষা বলেছি—ভণ্ড গুরুর ক্ষমতা নেই সহস্রার চক্রে ঐ দিব্য Sound Current এর connection দিতে। কাজেই ভণ্ড গুরুকে ত্যাগ করতে দ্বিধা করলে চলবে না—

"ঝুটা গুরু কী টেককো, তজত ন কীজে বার,
দ্বার না পাবে শব্দকা ভটকে বারংবার"। (রাধাস্বামী সাহেব)

আমার দাতাদয়াল বলেন—"জীব খঞ্জ হ্যায়, অন্ধা হ্যায়, উস্‌কা লাঠ্‌ঠি ভী ট্যারা হোয় তো ক্যায়সে উদ্ধার হো সক্‌তা"? —একে তো জীব খঞ্জ এবং অন্ধ, তায় আবার তার অবলম্বন লাঠিটি যদি বাঁকা ফাটা হয় অর্থাৎ তার গুরু যদি ঝুটা হয়, ভণ্ড হয়, (পূরণধণী না হয়)—তাহলে কি করে উদ্ধার সম্ভব?"

প্রশ্ন :—মধুলোভী ভ্রমরের একবার এ ফুলে, একবার ও ফুলে ঘুরে বেড়ানোর মত, একবার এই গুরু, পরক্ষণে অন্যগুরু করে বেড়ানোর যে উদাহরণ মেধাতিথি দিয়েছেন তাঁর একথা গ্রহণ করা অসম্ভব। গুরু গ্রহণ আর বর্জ্জন করতে করতেই তো তাহলে একজনের সারাজীবনটাই কেটে যাবে! কবীর সাহেবের ঐ 'গুরু করো দশ পাঁচা'·· ······কথাটাতেও মন সায় দিচ্ছে না। একজনের জলের প্রয়োজন, কুঁয়া খুললে জল পাওয়া যাবে—সে যদি আজ বৌবাজারে ১০ হাত মাটি খুঁড়ে কাল ওয়েলিংটনে খুলতে লাগে, তারপর সেখানেই ৫ হাত খোলা হতে না হতেই আবার দেশপ্রিয় পার্কে মাটি খুঁড়তে যায় তাহলে কি সে কোনদিনও জলের সন্ধান পাবে—না—তার পিপাসা মিটবে? কিন্তু যদি বিশ্বাস আর ধৈর্য্য নিয়ে এক জায়গাতেই মাটি খুঁড়তে লাগে তাহলে ১০ হাত মাটি খুললে না পাওয়া যায় ২০ হাত খুললে পেতে পারে, ২০ হাতেও না পাওয়া যায় ৫০ হাত খুললে নিশ্চয়ই পাবে।

উত্তর :—কুঁয়া খোলার যে analogyটি দিলে তা শুনতে বড় ভালো লাগলেও ও কথা যুক্তিসিদ্ধ নয়। জল এমন একটা বস্তু যা বৌবাজারেও আছে দেশপ্রিয় পার্কেও আছে, কাবুলেও আছে, আলজিরিয়াতেও আছে; কেবল Layer এর

তফাৎ—কোথাও ৫০ হাত নিচে কোথাও ৫০০০ ফুট নিচে। কাজেই নিষ্ঠা নিয়ে যে কোন স্থানে—অধ্যবসায় সহকারে, মাটি খুলে গেলে—জলের সন্ধান একদিন পাওয়া যাবেই ; কেবল সময়ের তারতম্য ঘটতে পারে—নিরাশ হওয়ার কিছু নেই।

কিন্তু সদ্‌গুরু (That Liberating Power) কি জলের মতোই—ঐ রকম একটা জিনিষ যে—যে-কোন একটা লোককে গুরু বলে পাকড়ে নিয়ে, বিশ্বাস করে তারই কাছে পড়ে থাকলে, Layer ভেদ করে যেমন জল ওঠে, তেমনি একদিন ঐ লোকটার ভেতর থেকেই সদ্‌গুরু শক্তি ফুটে বেরিয়ে পড়বে ? সদ্‌গুরুশক্তি হ'ল একটা 'তাগদ্'—আলোকদিশারী শক্তি ; ব্রহ্ম-পরব্রহ্ম region এরও অতীত ভূমি দয়ালদেশ পর্য্যন্ত যাঁর গতি হয়েছে, যাঁকে তিনি 'হুকুম' বা 'power' দিয়েছেন—তিনিই পাবেন সত্যসন্ধানী শিষ্যের মধ্যে সেই দিব্য নামের ধারা প্রকট করে অমৃতের পরশ দিতে—ইনিই সদ্‌গুরু পদবাচ্য। এ শক্তি সকলের মধ্যে থাকে না ; কাজেই যার মধ্যে যা নেই—যে ক্ষমতা ('তাগদ্') নেই, তার কাছে তাই পাবার আশা নিয়ে বসে থাকলে ফলং নৈরাশ্যং। ভাল করে ভেবে দেখ ভাই তোমার উদাহরণটি ভুল কি না ?

কবীর সাহেবের ঐ 'গুরু করো দশ পাঁচা......' কথাটির অর্থ তুমি ভাল বুঝতে পারনি। তিনি বলছেন ততদিন খোঁজ কর—'যব তক্ ন মিলে গুরু সাচা।' সাচ্চা গুরুর লক্ষণ তো পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যিনি দীক্ষাকালে অনুভূতি (Realization) দিতে—আনন্দ ধামের সন্ধান দিতে সমর্থ। সাচ্চা গুরু কখনও বলেন না—'মরণের পর মুক্তি হবে। এখন হাজার হাজার বার নাম জপ কর আর একটা মূর্ত্তি বা ফটোর অর্চ্চণ-বন্দন-কেলি পাদসেবন করে যাও ভোগ রাগ দিয়ে — মৃত্যুর পর অপ্রাকৃত ব্রজভূমে নিত্য-লীলার পার্ষদ হবে'। 'থাক্ বিড়াল তুই আমার আশে, ভাত দেব তোকে পৌষ মাসে !!' দীর্ঘ দিনেও কোন অনুভূতি না হলে, 'তোমার আধার-অধিকার ঠিক নয়, কয়েক জন্ম পরে হবে— এখন বংশের সবাই মিলে ইষ্ট-ভৃতি-গুরুপ্রণামী দিয়ে যাও' এমন কথাও সাচ্চা গুরু বলেন না।

গুরোর্যস্যৈব সংস্পর্শাৎ পরানন্দোঽভিজায়তে
গুরুং তমেব বৃণুয়াৎ নাপরঃ মতিমান্নরঃ।

যে গুরুর সংস্পর্শে পরমানন্দের সঞ্চার হয়, তাঁকেই গুরু বলে বরণ করবে, 'নাপরঃ'— অন্য কাউকে নয়। ইনিই 'গুরু সাঁচা'। আনন্দের সন্ধান পেলে —অমৃতের আস্বাদন পেলে—আর বর্জ্জনের প্রশ্ন আসে না। তাই কবীর সাহেব বলছেন, 'গুরু করো দশ পাঁচা,' দিব্য আনন্দের ধারায় অভিসিঞ্চিত করতে পারে—এমন মহাত্মা যতক্ষণ না জোটে।

আর সাচ্চা গুরু লাভ হ'লে শিষ্যের পক্ষেও যেমন ত্যাগ করা সম্ভব নয়, গুরুও তেমনি ত্যাগ করেন না। সাচ্চা গুরু ক্ষমাসুন্দর-আলোক পুরুষ। —তিনি তাঁর সন্তানকে বুকে করে রাখেন—নিয়ে চলেন জ্যোতিঃর পথে—অমৃতের পথে — আনন্দের পথে, 'তস্যৈব সংস্পর্শাৎ পরানন্দোঽভিজায়তে'। সাচ্চাগুরু লাভ হলে তো বর্জ্জনের প্রশ্নই আসে না; তাই, ভণ্ড ঝুটা গুরুর চক্রব্যূহে পড়ে যাতে কারও জীবন ব্যর্থ না হয় তাই কবীর সাহেব বলছেন— 'সজাগ দৃষ্টি এবং বুদ্ধি বিচার সহ গুরু নির্ব্বাচন কর—গুরু করো দশ পাঁচা, যব তক্ ন মিলে গুরু সাঁচা'।

সৎশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, যদি একজনকে গুরুরূপে বরণ করার পর—অনুভূতি-আলো-আনন্দ লাভ হোক্ আর না হোক্—তবুও তাকে ছেড়ে আসতে তোমার ভাব-পাগল মন না চায়, তাহলে **দীর্ঘ একটা বছর ধরে,** তুমি তোমার অত্যুগ্র নিষ্ঠাভক্তির পরিচয় দিতে পারো—কিন্তু তারপর আর একটা দিনও নয়।

অন্ধ বিশ্বাসের যুপকাষ্ঠে, কুসংস্কারের রজ্জুতে বদ্ধ হয়ে আর আশায় আশায় বসে থেকো না মাণিক, নষ্ট করে দিও না তোমার দুর্লভ মনুষ্য জন্মের অমূল্য সুযোগকে; আনন্দের আস্বাদন দিয়ে তোমাকে ত্রিতাপ মুক্ত করতে পারবেন—এমন সাচ্চা মহাত্মার খোঁজ তোমাকে করতেই হবে, সদ্‌গুরুর লক্ষণ সম্বন্ধে সন্তরা যা বলে গেছেন—সে হেন গুরু নির্ব্বাচন করে তাঁকেই নিত্যকালের সাথীরূপে বরণ করে নিতে হবে। —এ আমার কথা নয়, কবীর সাহেব বা অন্যান্য সন্তদের হিন্দীভাষার উপদেশ মাত্র নয়, বেদান্তেরও আদেশ, তোমাদের দেবভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃতে রচিত শ্রুতিবাক্য ঃ—

যত্রানন্দো প্রবোধো বা নাল্পমপ্যুপলভ্যতে
বৎসরাদপি শিষ্যেন সোঽন্যং গুরুমুপাশ্রয়েৎ ॥

প্রশ্ন ঃ—তাহলে আমাদের যতক্ষণ না পুরণধর্ণী সাচ্চাগুরু লাভ হয়, যস্যৈব সংস্পর্শাৎ পরানন্দোঽভিজায়তে—ততক্ষণ তাঁকে খুঁজতেই হবে? মনে প্রাণে তাঁকে চাইলেই পাওয়া যাবেই—এ পরম আশ্বাস শাস্ত্র আর মহাপুরুষরা দিয়ে গেছেন? কিন্তু এই অনুসন্ধানে তো অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ—হ্যাঁ ভাই, যতক্ষণ না সাচ্চাগুরু লাভ হয় ততক্ষণ তাঁর খোঁজ (searching) করতেই হবে। আর খোঁজ করলেই তাঁকে পাওয়া যাবেই। তুমি যেমন তাঁকে খুঁজবে আকুল হয়ে, তেমনি তিনিও যে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সাচ্চাগুরু যে জানেন প্রিয় মিলনের আকুলতায় কে অধীর হচ্ছে। He will come to you. কারণ, সদ্‌গুরুর advent যে এই জন্যেই হয়েছে, আনন্দলোকের—আনন্দময় পুরুষের সন্ধান দেওয়াব জন্যই। He has come for this. যে চায়, সে পায়—'যিন্ ঢুঁড়্যা তিন্ পায়্যা'। 'Seek and that shall be given unto you' (Bible)

কাশ্মীরে—অমরনাথের পথে এক মহাত্মা ঐ তত্ত্বটিকে গল্পচ্ছলে বলেছিলেন—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই একদিন কৃষ্ণ দর্শনের জন্য যুধিষ্ঠীর দ্বারকা গেলেন। গিয়ে শুনলেন কৃষ্ণ তখন ধ্যানের ঘরে—ধ্যানমগ্ন। যুধিষ্ঠির সেই ঘরের দরজায় অপেক্ষা করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে, কৃষ্ণ বেরিয়ে এসে কুশল প্রশ্ন করায় তিনি বললেন—'আপনি প্রথমে দয়া করে বলুন—আপনি স্বয়ং ভগবান হয়ে অপর কার ধ্যান করছেন'? কৃষ্ণ হাসিমুখে উত্তর দিলেন—'ভীষ্ম শরশয্যায় শুয়ে শুয়ে উত্তরায়ণের সেই বাঞ্ছিত দিনটির অপেক্ষায় প্রতিনিয়তই আমার ধ্যান করছেন। আরও কতো যোগী মুনি ভক্ত আমার ধ্যানে মগ্ন। আমি সেই সব প্রাণাধিক ভক্তের ধ্যান করছিলুম'। গল্পটির ঐতিহাসিক মূল্য যাই থাক, এর Inner significanceটি নাও—ভক্ত যেমন ভগবানের ধ্যান করে তাঁকে ধেয়ে বেড়ায়, ভগবানও তেমনি ভক্তকে ধেয়ে বেড়ান।

গিরণার পাহাড়ের আর এক মহাপুরুষ রহস্য করে বলেছিলেন—ভগবানের অবস্থা ঠিক যেন এক কলেরারোগে-আচ্ছন্ন-সন্তানের দুঃখিনী মায়ের মত। ছেলের কলেরা হয়েছে, অচৈতন্য। বাছার জ্ঞান ফিরে নি—রোগ যন্ত্রনা কমেনি বলে মাও কাতর। সারাদিন গেল, রাতও শেষ হ'তে যায়। বাড়ীর অন্যান্য

সবাই সেবা করতে করতে ঘুমে ঢুলছে। কিন্তু মায়ের চোখে ঘুম নেই। বিছানার কাছে বসে অতন্দ্র দৃষ্টিতে স্নেহের বাছনির দিকে তাকিয়ে আছেন—অপলক দৃষ্টিতে। কখন ছেলের জ্ঞান হয়, একটিবার মা, মা, বলে ডাকে। হয়তো বারেক ছেলেটি—'মা, মাগো! জল, জল' বলে ডেকে উঠলো, মা অমনি বুকের কাছে মুখ নিয়ে এসে, পরম সোহাগে জড়িয়ে ধরতে চাইলেন, এতক্ষণে বুঝি ছেলের রোগযন্ত্রণা কমলো, জ্ঞান ফিরেছে। কিন্তু, কৈ না তো! বিকারের ঘোরে একটিবার মা বলে ডেকে, আবার মুখ ফিরিয়ে পড়ে থাকলো—অজ্ঞান—অচৈতন্যভাবে। এখন যেমন মায়ের মনের অবস্থা, অব্যক্ত যন্ত্রণায়—নিরাশায় মায়ের মর্ম্মদেশ যেমন ছিঁড়ে যেতে চায়, দয়ালেরও অবস্থা ঠিক ঐ রকম দুঃখিনী মায়ের মতো। কেউ যদি একটিবারও তাঁকে ডাকে কাতর প্রাণে, তিনি ছুটে আসেন গুরুরূপে, পরম সোহাগে বুকে জড়িয়ে ধরতে! কিন্তু কৈ নাঃ! মানুষ ডাকে বটে — কিন্তু সেও বিকারের ঘোরে — ধনজন কামনা বাসনা পূরণের জন্য। তাতেও কিন্তু সাড়া দেন, কোলে তুলে নিতে চান। কিন্তু বিকারে আচ্ছন্ন ছেলে যেমন এক ঢোক জল গিলেই—আবার পাশ ফিরে, অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে থাকে, মায়ের দিকে ফিরেও তাকায় না, তেমনি 'পীত্বা মোহময়ী প্রমোদমদিরা উন্মত্তভূতো জগৎ'।—তাঁকে খুব কম লোকেই খোঁজে।

সাচ্চা গুরু হ'লেন, Physical Universe এ দয়ালেরই প্রতিরূপ। দেহধারী মানুষের যাতে easy approachable হয়, দুটি ছোট হাতে যাতে জড়িয়ে ধরতে পারে সুখে দুঃখে সমব্যথীরূপে, দরদী বন্ধুরূপে; সীমাবদ্ধ মন বুদ্ধি নিয়ে যাতে তাঁকে জানতে বুঝতে পারা যায় এজন্য প্রেমময় দয়াল মানুষীতনুর মধ্যেই সেই Liberating power—সদ্‌গুরুশক্তি প্রকট করে দিয়েছেন। দয়ালের জন্য প্রাণ কাঁদলেই এই সদ্‌গুরুই ছুটে আসেন আনন্দলোকের বার্ত্তা নিয়ে। ঈশ্বরের মতই ইনি All-love, All-Light. কেউ যদি এক পা তাঁর দিকে অগ্রসর হয়, সাচ্চাগুরু অমনি দশ পা এগিয়ে আসেন দুবাহু বাড়িয়ে—তাঁর উদার বিস্তৃত বক্ষপটে, স্নেহময় প্রসারিত কোলে তুলে নেওয়ার জন্য। সাচ্চাগুরুর মধ্যে—ঈশ্বরপ্রেমীর জন্য কী যে গভীর প্রেম, তা এক মুসলমান সাধক তাঁর অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন—

"মেস্তি আগাহে অজ লুৎফে খোদা
হামচু আঁশক হয়রোমা বিনত তেরা

—তাঁর যে কী গভীর প্রেম, তুমি তা জাননা। সর্ব্বক্ষণ তিনি প্রেমিকের মত তোমার দিকে তাকিয়ে আছেন"।

তাই বলছি ভাই, খুঁজলেই তাঁকে পাওয়া যাবেই। খোঁজা মানে স্থানে স্থানে অরণ্যে পর্ব্বতে গিরিগুহাতে নয়—অন্তরের খোঁজ— Searching from the innermost core of the heart. নীরবে তাঁর জন্য চোখের জল ফেলাও, সাচ্চাগুরু যিনি-তিনি পৃথিবীর যেখানে থাকুন—নিজে এসে ধরা দেবেন। এ আমার উপলব্ধ সত্য। থাক না, তুমি বাংলাদেশের অখ্যাত-অজ্ঞাত পল্লীর গৃহকোনটিতে—আর সাচ্চা গুরু যদি থাকেন বদরীনারাণে, হৃদবিহারীর জন্য প্রাণ কাঁদলেই He will come to you. কাস্পিযান সাগর আর আমাদের বালিআড়া গ্রাম—এ ব্যবধান তাঁর কাছে ব্যবধান নয়। সদ্‌গুরু শক্তি সাড়ে তিন হাত দেহের মধ্যে Physical Universe এ বিরাজমান থাকলেও, গুরুসত্ত্বা কখনই সাড়ে তিন হাত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়—He is beyond Time and Space. আমার দাতাদয়াল শ্রীগুরুমুখে যে নিগূঢ় সত্য শুনেছি—তা তোমায় বলছি শোন—**সত্তসদ্‌গুরু কখনও শিষ্য করেন না, তিনি গুরু করেন অর্থাৎ সত্যান্বেষী আকুলপ্রাণ শিষ্যের হৃদয়ে নিজের ইষ্টকে প্রতিষ্ঠা করেন**। কাজেই তাঁর নিজেরও কতকটা গরজ আছে বৈ কি!

তুমি শুধু হৃদয়ের নিভৃত বন্দরে তাঁকে জানা-পাওয়ার টানটুকু বাড়াও, এই কান্না, এই 'টান' এর জন্য সাচ্চাগুরুর দর্শন মিলে।

"সদগুরু পূবে মিলন মিলানি
তবতগ খোঁজত রহো জহানি" (কবীর)

তুমি যে প্রশ্ন করেছ, 'খুঁজতে খুঁজতে অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে যাবে', তোমার এ আশঙ্কা বৃথা। সাচ্চা গুরুর পরিবর্ত্তে ঝুটা, ভণ্ড গুরুর পাল্লায় পড়লে যে সারা জীবনটাই 'বরবাদ্' হয়ে যাবে! কাজেই পূর্ণকাম সাচ্চা গুরুর অনুসন্ধান করতেই হবে সত্যলাভের জন্য। তাছাড়া, অন্তরের অন্তঃস্থলে যেদিন থেকে তোমার সাচ্চা অনুরাগ আর খোঁজ সুরু হ'ল—সেদিন থেকে যে তোমার সাধনাও সুরু হয়ে গেল ভাই!

"খোঁজনমে ঁ যে দিবস বীতানি,
সো সাধনমে ঁ, বৃথা ন জানি"। (কবীর)

সত্যান্বেষণে যে সময় অতিবাহিত হয়, তা সাধনারই অংশ; বৃথা নয়, 'নষ্ট হয় না'।

আমাদের ভুল কোথায় হয় জানো ভাই? সকলেই চট্‌পট্‌ যে হোক একজনকে 'গুরু করা'র জন্য ব্যস্ত! তাই কতকগুলো মনগড়া ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী যাহোক একটা মন্ত্রতন্ত্র নিয়ে, না হয়, একটা কিছু যোগপ্রক্রিয়া নিয়ে ভাবলো দীক্ষালাভ হয়ে গেলো, গুরুলাভ হয়ে গেলো। তারপর যদি সেই সাধুর কোন 'সিদ্ধাই' থাকে, সংসারের কোন কামনাবাসনা যদি আংশিক ভাবেও—তার ঋদ্ধিসিদ্ধির জন্য পূরণ হয়ে যায়, তাহলে ব্যস্‌, There comes an end to all his searching and investigations! আর শিষ্যের এই অজ্ঞতা, weakness এবং shortcomings, exploit করে করেই বেড়ে চলেছে ধর্ম্মব্যবসায়ী গুরুদের পসার! তাই মঠ, মিশন, আশ্রম, সম্প্রদায়, সাধু সন্ন্যাসীর সংখ্যা যত বাড়ছে, মানুষ সত্য থেকে চলে যাচ্ছে ততদূরে!

সেই জন্যই আমি বলি, অঙ্ক শেখার দরকার হলে কেউ যেমন গানের মাষ্টারের কাছে যায় না, আবার ইংরেজী শেখার দরকার হ'লে, কেউ যেমন নাচের স্কুলে ভর্ত্তি হয় না, রেভিনিউ টিকিট কিনবার জন্য কেউ যেমন শাকের দোকানে যায় না, তেমনি যে ঈশ্বর লাভের জন্য, সত্যলাভের জন্য, গুরুর প্রয়োজন, আগে অন্তর খুঁজে দেখ ভাই—সেই ঈশ্বরলাভের জন্য প্রাণ কেঁদেছে কি না। তাঁর জন্য যদি প্রাণ কাঁদে তাহলে তিনি আসবেন, 'Sat Guru will appear'. তোমার সব তাপ দূরে যাবে, সব বিফলতা সফলতার গৌরবে হাস্যময় হ'য়ে উঠবে, সব কিছুই তখন তোমার হবে মধুময়, আনন্দময়।

এর জন্য বিত্তাপহারী ধোঁকাবাজ ভণ্ডগুরুর পাল্লায় পড়ে ধনে প্রাণে নষ্ট হতে হবে না, মৃত্যু পর্য্যন্ত আশায় আশায় বসে নিরাশ হতে হ'বে না। French Revolution এর পূর্ব্বে ফ্রান্সের পাদ্রীরা যেমন জনসাধারণের কাছ থেকে "টিথ" আদায় করতো, তেমনি সেই "টিথের" মত গুরুকে মাসে মাসে টাকা—"ইষ্টভৃতি"—জগিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হতে হবে না। শুধু কী মূল্য দিতে হবে জান? চাই শুধু প্রিয় মিলনের আকুতি-আকুলতা-খোঁজ-টান-চোখের জল। তাঁকে খোঁজা-

চাওয়ার নামে যেন অবচেতন মনের কোন সুপ্ত কামনা বা বৃত্তি, ছদ্মবেশে এসে তোমাকে না ভোলায়! খোঁজটা (searching, Inner urge) হওয়া চাই অকপট, সাচ্চা। তাহলেই সদ্‌গুরু আসবেন।

সাচ্চা গুরু চিনবো কি করে—খুঁজবো কোথায়, কি ভাবে তাঁকে বিচার করবো, এ সব বৃথা ভাবনায় অধীর বা বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই। সাত তাড়াতাড়ি গুরুবরণ করবার আগে—যে দাতাদয়ালের শ্রান্তিহর, ক্লান্তিহর বুকের পরশ পাওয়ার জন্য গুরুর প্রয়োজন, সেই তাঁর জন্য প্রাণ কেঁদেছে কিনা দেখতে হবে। তাঁকে ভুলিয়ে রাখে যে সুপ্ত কামনা বাসনা বৃত্তিগুলি, অন্তর পাঁতি পাঁতি করে খুঁজে সেই বৃত্তিগুলি দূরে হঠিয়ে তাঁকে অন্তরভরে চাইতে হবে।

মাছটাকে জল থেকে তুললে সে যেমন জলের জন্য ছট্‌পট্‌ করে, তেমনি তাঁর জন্য প্রাণ যেই মুহূর্ত্তে কাঁদবে, অমনি এসে পৌঁছাবেন সাচ্চাগুরুরূপে, তোমার অন্তর গৃহকোণ আলো হয়ে উঠবে।

আচ্ছা ভেবে দেখ তো ভাই ধ্রুব চৈতন্য রামকৃষ্ণের কথা। ধ্রুব আগে গুরু বরণ করে তারপর হরির জন্য আকুল কান্না কাঁদেন নি, তিনি প্রথমেই খুজেছেন পদ্মপলাশলোচন হরিকে, কেঁদেছেন হরির জন্য। হরির সঙ্গে মিলন ঘটাতে পারেন এমন ব্রহ্মজ্ঞ নারদ ঋষি এসে পৌঁছালেন।

রামকৃষ্ণ গুরুবরণ করে—ঈশ্বরলাভের জন্য দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে আসেন নি, তিনি এসেছিলেন জীবিকা অর্জ্জনকে নিমিত্ত করে। কিন্তু জন্মার্জ্জিত তপস্যার সংস্কারানুযায়ী যখন তিনি ঈশ্বরলাভের জন্য আকুল হলেন, জীবিকার বদলে জীবিতেশের চিন্তাই যখন তাঁকে কাতর করে তুললো Totapuri came to him. কোথায় হিমালয়—কোথায় দক্ষিণেশ্বর!

চৈতন্যদেব গিয়েছিলেন গয়া বাপের শ্রাদ্ধ করতে। গুরু বা ঈশ্বরানুসন্ধান মুখ্য ছিল না। কিন্তু সামান্য একটা আবরণ সরে গেলেই যেমন রুদ্ধ জলধারা উৎসারিত হয়ে ওঠে, তেমনি গয়াতে গিয়ে বিষ্ণুপূজা বিষ্ণুস্মরণাদির মধ্য দিয়ে তাঁর জন্মান্তরীণ তপস্যার সুপ্ত সংস্কারের যখন উদ্দীপন হ'ল—তিনি যখন আকুল হয়ে উঠলেন কৃষ্ণলাভের জন্য—তিনি পেলেন ঈশ্বরপুরীকে।

[পরমসন্ত কবীর সাহেব-গুরুনানক-বিশেষ করে রাধাস্বামী সাহেব সাচ্চাগুরু বলতে যে সন্তসদ্‌গুরুকে Mean করেছেন—তোতাপুরী ঈশ্বরপুরী প্রভৃতি সেইরূপ

সন্তসদ্‌গুরু ছিলেন না। এঁরা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ছিলেন—ব্রহ্মাণ্ড region পর্য্যন্ত এঁদের গতি ছিল। সন্তরা ব্রহ্মাণ্ড region এর অতীত আরও ছয়টি আধ্যাত্মিক স্তর বা নির্ম্মল চৈতন্যভূমির তত্ত্ব Reveal করেছেন। "আলোকতীর্থ" (দ্বিতীয় খণ্ড) এর 'সন্তদের সাধনতত্ত্ব' অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে]

কাজেই ধ্রুব চৈতন্য রামকৃষ্ণ যে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে গুরুরূপে পেয়েছিলেন তারও মূলে ছিলো কান্না-আকুলতা।

সেই জন্যই সন্তরা বলেগেছেন ভাই, যাঁর সন্ধান দেওয়ার জন্য সাচ্চাগুরুর (=সন্তসদ্‌গুরু) advent এই পৃথিবীতে, যে অক্ষয় আনন্দ ভাণ্ডার দয়ালদেশের বার্ত্তা নিয়ে আলোকপুরুষ রূপে এসেছেন তিনি মানুষের কাছে মানুষীতনু নিয়ে—সেই কুলমালিক পরমদয়ালের জন্য প্রাণ কাঁদলে **তিনি আসেন, অত্যাশ্চর্য্যভাবে সব যোগাযোগ হয়ে যায়।** কি ভাবে তিনি আসেন, কি ভাবে যে যোগাযোগ হয় তা বুদ্ধির অতীত হলেও, কিন্তু তবুও যোগাযোগ হয়, তিনি আসেন—এ কথা ধ্রুব সত্য। এইটেই দাতাদয়ালের দয়া।

সত্যই ভাই তাঁর দযার অন্তঃ নেই। জননী জঠরে আসতে না আসতেই তিনি মাতৃস্তন্যের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। প্রাত্যহিক জীবনেরও সব অভাব সব প্রযোজনও তিনি মিটিয়ে চলেছেন নানারূপে, নানাভাবে। তাহলে মানুষ এ কথা কেন ভুলে যায়—যে-অভাব আমাদেব জীবনের সব চেয়ে বড় অভাব, যে—প্রয়োজন আমাদের জীবনের পরমপ্রয়োজন, যে সত্যানুভূতি, আনন্দ-অমৃত আস্বাদন আমাদের সত্বার প্রকৃষ্ট উৎকর্ষ—যা না পেলে মানুষের জীবন অপূর্ণ থেকে যায়, হয়ে যায় ব্যর্থ বিড়ম্বিত, সে সম্বন্ধে কি তিনি উদাসীন থাকতে পারেন? বিশ্বপ্রকৃতির অন্যান্য ব্যবস্থার মত এই চরম ও পবম ব্যবস্থাটুকুও তিনি করে রেখেছেন বা ব্যবস্থা করে চলেছেন।

প্রাকৃত বুদ্ধির দোষে, Scepticism এর কুজ্ঝটিকায়, মলিন কামনা বাসনায় বিকারের ঘোরে আচ্ছন্ন থাকায়, মানুষ সহসা তা বুঝতে না পারলেও—সন্তরা যে Searching এবং আকুলতার কথা বলে গেছেন, তা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে এবং পরস্পরে মিলিত হয়, সেই রকম অলৌকিক ভাবেই ঘটে সদ্‌গুরু-দাতাদয়াল এবং সত্যান্বেষী শিষ্যের এই মহামিলন।

এই অপূর্ব্ব দিব্যঘটনা যার জীবনে ঘটেনি, তাকে এখন কিছুতেই বোঝানো যাবে না, বিশ্বাস করানোও শক্ত। কিন্তু সন্ত, মহাপুরুষ আর তাঁদের কৃপাপ্রাপ্ত হাজারও জীবনের এটি উপলব্ধ সত্য যে—কুলমালিক পরম দয়াল পরম পিতার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রাণ কাঁদলেই সাচ্চাগুরু নিজেই এসে ধরা দেন। সমর্থ পুরুষ সন্তসদ্‌গুরু সর্ব্বদাই জ্ঞাত আছেন—কোন জীবের হৃদয়ে তাঁর আবাহনী সুর ধ্বনিত হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ—শাস্ত্রে আছে— 'কি দুর্লভং সদ্‌গুরুরস্তি লোকে,' এ জগতে সদ্‌গুরু দুর্লভ। একটা পিঁপড়া যেমন পাহাড় মাপতে পারে না, তেমনি মোহান্ধ জীব কি করে চিনবে একজন সাচ্চাগুরু কি না। আপনি বলছেন দাতাদয়ালের জন্য প্রাণ কাঁদলে অলৌকিক উপায়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যাবে। আপনার একথা অস্বীকার করছি না, কিন্তু আপনি যে বলেন বিচার করে নিতে হবে — সেটা কি করে সম্ভব ? কারণ, যে বিচার করবে সে তার Relative out look অনুযায়ী মনের colouring মিশিয়ে ফেলবে ত ? যেখানে বা যার কাছে তার যত বেশী বৃত্তি (complex) চরিতার্থ হবে, তাকেই সে গুরুপদে বরণ করে নেবে ; এতে ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই দেখছি, গুরু নির্ণয় করা বড় কঠিন !

উত্তর ঃ— হাঁ ভাই, কঠিন শুধু নয় সুকঠিন, কিন্তু তাই বলে অসম্ভব নয়। বিচার আমাদেরকে করতেই হবে, সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে ; colour free মন। সামান্য একটা দু'পয়সার হাঁড়ি কিনতে গেলে, তা যখন বাজিয়ে নাও, তখন যাঁকে তুমি ইষ্টরূপে, আলোকপথের দিশারীরূপে, নিত্যকালের সাথীরূপে বরণ করে নেবে, জীবনের সেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সময় একেবারে ভক্ত-বিটেল সেজে যাবে। যাকেই দেখবে বেশ জটাজুট ভস্মবিমণ্ডিত, মালাতিলকধারী, চোখ কাণ বুজে advertisement আর আড়ম্বরের ঘনঘটায় ভুলে গিয়ে গুরুপদে বরণ করে নেবে, এ একেবারে বেকুবি ! আর মানুষের এই সহজ সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়েই না ভগবান পাইয়ে দেওয়ার বাজারে এত দালালি ! এক একজন ধর্ম্মের বিপনি সাজিয়ে বসেছে। গুরুগিরি একটা সুন্দর business, without investing any capital !

ভারতবর্ষে আজ লোকেদের গোয়ালের গরুর সংখ্যা একদিকে কর, আর

গুরুর সংখ্যা একদিকে কর, দেখবে গুরুর সংখ্যাই বেশী। তুমি কি বলবে এরা সবাই সাচ্চাগুরু ? গুরু মানে কি ? যিনি আলোকের সন্ধান দেন। আলোর ধর্ম্ম কি ? কালো দূর করা। কিন্তু তবুও কেন ভাই বলতে পারো, দেশে এত মঠ মিশন সাধু গুরু 'বাবা,' আর 'মহারাজদের' ভিড় সত্ত্বেও, অনাচার-ব্যাভিচারের আবিল স্রোতে দেশ গেছে ছেয়ে ? মানুষের জীবনে ক্ষমা দয়া মুদিতা মৈত্রী করুণার বদলে, দুর্ব্বার লোভ, হিংসা, ক্রোধ, বঞ্চনানীতি আর বীভৎস শোষণ কেন মানুষের জীবনকে করে তুলেছে নিঝুম শ্মশান ? খুঁজে দেখ, প্রায় প্রত্যেকেরই এক একজন গুরু আছেন আর সবাই দাবী করছেন, তাঁর গুরুই সদ্‌গুরু, তবু কেন মানুষ জীবনের প্রকৃত হ্রী শ্রীকে ভুলতে বসেছে ? জীবন থেকে কেন বাদ দিতে বসেছে প্রেম দয়া আর মৈত্রী ভাবনা ? কেন চারিদিকে অজ্ঞানের মহানিশা ? অন্ধ কুসংস্কারের পর্ব্বত প্রমাণ আবর্জ্জনা জাতির অগ্রগতিকে করেছে রুদ্ধ ? চারিদিকে এত জ্ঞানী গুরু তবুও কেন কি ব্যষ্টি জীবনে, কি জাতীয় জীবনে দেখি প্রজ্ঞার অভাব ? এই যে চারিদিকে শাসন-শোষণ, এর মূলে তো মানুষই আছে ? মানুষই তো মানুষের বুকে মারছে ছুরি, পরস্পরকে করছে বঞ্চনা, একে অপরকে ঠেলে দিচ্ছে দুঃখ দুর্দ্দশার পথে ! অথচ খুঁজে দেখ এঁদের majority of the numbers —গুরু পদাশ্রিত !!

মাতৃজাতির মর্য্যাদা ধুলায় লুটিয়ে দিচ্ছে যে লম্পট, জৈবলালসার পঙ্ক-কুণ্ডে যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, খাদ্য-ঔষধ-পথ্য ভেজাল করে মানুষের জীবনকে করে তুলেছে যারা দুর্বিষহ, জীবনের প্রতিটী ক্ষেত্রে যাদের চলছে পৈশাচিক শোষণ, তাদেরও দেখবে অনেকেরেই গুরু আছেন, অনেকেই প্রাতে গঙ্গাস্নান করে, কালীকৃষ্ণশিবঠাকুরের নির্ম্মাল্য না নিয়ে জলস্পর্শ করে না ! তীর্থ ভ্রমণ আর সাধু-গুরুতে দানধ্যানে তাদের কত ঘনঘটা ! এদের গুরু সম্বন্ধে কি ধারণাটা করতে হয় ? এদের পথপ্রদর্শকগুলি কি সবাই সাচ্চা গুরু ? এদেরই অর্থানুকুল্যে, মানুষের বুকের পাঁজর নিংড়ানো রক্তে যে মঠ মিশনের আকাশ-স্পর্শী অট্টালিকা উঠেছে, সেখানে কি বিরাজ করছেন মহাপুরুষ ?

'জীবে জীবে ব্রহ্মদর্শন' যে দেশের মহত্তম আদর্শ, চণ্ডালকেও ভাই বলে বুকে জড়িয়ে ধরা যে দেশের শিক্ষা, Diversityর মধ্যে unity উপলব্ধি করা যেখানের সংস্কৃতি, সত্যস্বরূপ চিৎস্বরূপ আনন্দস্বরূপ সেই 'একম্' কে

প্রিয়তমরূপে জানা বোঝাই যেখানে পরম পুরুষার্থ—সেখানে যখন দেখি, রামানন্দ শ্যামানন্দের দল মানুষে মানুষে ভেদবিচ্ছেদের প্রাচীর গড়ে তুলেছে, ছুঁৎমার্গ আর জাতিভেদের বেড়াপাকে মানুষের জীবনকে করছে জর্জ্জরিত, চিন্ময় সাধনার দেশে এনে দিচ্ছে মৃণ্ময় ধাতু শিলাপাথর পূজার জাঁকজমক, Realisation এর বদলে Ceremony আর Ritualsকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিচ্ছে ক্রমশঃ, 'জ্ঞানদণ্ড' অবলম্বনের পরিবর্ত্তে গৈরিক বস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি লাঠিকে পরম আদরে ধারণ করে রয়েছে, মুখে "নারায়ণ নারায়ণ"বলে প্রণাম নিচ্ছে অর্থাৎ সর্ব্বত্র নারায়ণ দর্শনের অভিনয় করছে কিন্তু কার্য্যকালে শূদ্রকে ক্ষুদ্র বলে ভাবছে, তপস্যার অগ্নি জ্বালবার পরিবর্ত্তে যখন আগুনের ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকছে, হৃদয়স্থ পরম চৈতন্য কে জানবার বোঝবার প্রেরণা না দিযে মালা ঝোলা তিলক-তুলসী খোলকীর্ত্তন, নয়ত বা কতকগুলো ন্যাস প্রাণাযামের প্রক্রিয়ার দিকে মানুষকে করছে পরিচালিত, তখনও কি বলবে এই সব 'দশ হাজারি মনসবদার', 'কুড়ি হাজারি মনসবদার' গুরুগণ সবাই সদ্‌গুরু ?

যাদের প্রেরণায় মানুষ চৈতন্য-উপাসনার পরিবর্ত্তে জড়োপাসনায় ডুবে থাকে, 'অন্তরি কীর্ত্তন' শোনার পরিবর্ত্তে বাহ্যিক কীর্ত্তনে মেতে থাকে, "হর মন্দির এহি শরীর হ্যায় জ্ঞানরতণ প্রগট্ হোয়ে" (নানক)—প্রকৃত হরিমন্দির এই শরীর, এর মধ্যে তাঁকে খোঁজবার শিক্ষা না দিয়ে, একটা মাটির ঢিপি—তাতে তুলসীগাছ —সেইটাকে হরিমন্দির বলে যারা প্রচার এবং পূজা করাচ্ছে—এরা 'গুরু' নামে পূজিত হলেও, তুমি বলভাই, এরা কি সত্যই গুরু ?

শিষ্যকে এই জীবনেই অমৃত-আলোক পথের সন্ধান দিয়ে কৃতকৃত্য করার পরিবর্ত্তে, শুশ্রূষা-পূজা-প্রতিগ্রহ-আর যশোলাভকেই যারা মুখ্যব্রত করেছে, শিষ্যের তাপ হরণের পরিবর্ত্তে বিত্তাপহরণের জন্যই যে সমস্ত পরান্নভোজী বঞ্চকের দল—দাড়ি চুলজটা—গেরুয়া—আলখাল্লার অন্তঃরালে—ধর্ম্মপ্রাণ সরল নরনারীকে অবাধলুণ্ঠন করে চলেছে, নিজেদের স্বার্থ এবং অভিসন্ধি পূরণের জন্য ঋষির বংশধরকে যারা জড়পূজায় ভুলিয়ে রেখেছে—আর তদনুযায়ী করে চলেছে শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা—ভালো করে বিচার না করে, পরীক্ষা না করে, এদেরকেই গুরু বলে ভাবা বা বরণ করা কি মানুষেব উচিত ? ঐ সমস্ত ভণ্ড গুরুদের কে লক্ষ্য করে তাই এক মহাপুরুষ বলে গেছেন—

'ফিকির সব কো খা লিয়া সব বন্ গয়া ফকির,
ফিকির কো যো খা লিয়া উস্‌কা নাম ফকির'।

এই সব সাধু-গুরু-ফকিরদের 'ফিকিরি'র (স্বার্থপূরণের নানা কূটকৌশল) অভাব নেই। ধরো যেমন, একজন শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবাদী, সে কিন্তু তার আশ্রমে দোল-দুর্গোৎসব কালীপূজা জন্মতিথি পালনের ঘনঘটা লাগিয়ে রেখেছে—কেননা, এই উৎসবকে কেন্দ্র করে হবে বহু শিষ্য-ভক্তের আমন্ত্রণ, উৎসব শেষে প্রণামীটা হবে উপার্জন ! হয়তো উৎসবে খরচ হ'লো ৫০০০৲ টাকা প্রণামী আর দক্ষিণা বাবদ আদায় হলো ১৫০০০৲ টাকা। সৎভাবে জীবনযাপন করতে চাইলে, বিদ্যার বহর অনুযায়ী, Jute Mill এ যার ১।০ সিকার দিনমজুরীও জুটতো না, সাধু সাজবার সঙ্গে সঙ্গে তারই চরণতলে অর্থ আর মর্য্যাদা। জীবনে যে কুলিগিরি কিংবা কেরাণী-গিরি করতো, সরলমতি ভাইদের অকৃত্রিম বিশ্বাস অন্ধ সংস্কার আর ধর্ম্মানুরাগের ফলে S. D. O , Judge, Barristerরাই করতে থাকেন তার পাদসংবাহন ! তারপর আবার আশ্রম থেকে বই লিখে প্রকাশ করা হবে ! সেই বইএর Literary Value বা originality কিছু থাক্ বা না থাক্—হাজার-লাখ যার যেমন ভক্ত বা followers আছে, তারা তো অন্ততঃ 'বাবার বাণী' বলে সসম্ভ্রমে সাদরে কিনবে ! গ্রন্থকার সাধুবাবার বিদ্যেটা হয়তো সংক্ষিপ্তসারের তিঙন্ত প্রকরণ অবধি—সাধুমা হয়তো একেবারেই নিরক্ষরা (নিরক্ষর রামকৃষ্ণের আবির্ভাবেরর পর থেকে এ লাইনে নিরক্ষরতাও একটা certificate !) কিন্তু তাদেরই বইএর ভূমিকা লিখানো হবে কোন দেশবিশ্রুত পণ্ডিতকে দিয়ে। তুমি হয়তো বলবে—না জেনে বুঝে বিখ্যাত পণ্ডিত কি ভূমিকা লিখবেন ? দেখ ভাই, যিনি যতো বড়-ই হোন—প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু Psychological weakness আছে। হয়তো সাধুবাবা-সাধুমায়ের কোন শিষ্য ঐ বিখ্যাত গুণীলোকের প্রিয়জন · নয়তো এমন—যার কাছে ঐ গুণী লোকটী জীবনে কোননা কোন ভাবে উপকৃত। এখন ঐ লোকটির মাধ্যমে সুকৌশলে চলবে তাঁকে অনুরোধ-উপরোধ। আশ্রমে কোন সভার আয়োজন করে তাঁকে করা হবে সভাপতিত্বে বরণ। তিনি যদি নির্লোভ না হ'ন তাহলে সুকৌশলে পণ্ডিত সম্বর্দ্ধনার নাম করে সাধুবাবা বা সাধুমায়ের আশীর্ব্বাদ বা প্রসাদরূপে দেওয়া হবে দামী উপঢৌকন ! অন্ততঃ দামী দামী বই উপহার ! এরই মাঝে মাঝে চলতে থাকবে বইএর ভূমিকা লিখবার

জন্য অনুরোধ। বহুলোকের মাঝখানে তাঁকে করা হবে কারণে—অকারণে প্রশংসা—নানাভাবে তাঁর অহং এর পরিতুষ্টি!

ব্যস্, ভূমিকা লিখানো হ'লে আর যায় কোথায়! "অমুক মহামহোপাধ্যায় বা M.A.P.R.S. যাঁর বইএর ভূমিকা লিখেছেন—তিনি কি সাধারণ"? "অমুক বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁকে মানেন, তিনি নিশ্চয়ই সদ্‌গুরু"? সরল লোকেদের এই সরলতার জন্যই ঐ সব সাধুবাবা সাধুমায়েদের গুরুগিরি ভালভাবেই চলতে থাকে। তার উপর শিষ্য প্রশিষ্য, 'ঋত্বিক—অধ্বর্য্যু' নামা Agent, Sub-agent দিয়ে নিজের সম্বন্ধে নানা আজগুবি miracles এর রটনা তো আছেই!! যদি News Paper এর কোন Reporter শিষ্য থাকে তাহলে তো কথাই নেই। একটি সম্বন্ধে আমি জানি, আশ্রমে হয়তো এসেছিলেন জাষ্টিস্ রেণুপদ মুখার্জ্জী, Reporter শিষ্য কাগজে ছাপিয়ে দেবে "আশ্রমে এসেছিলেন জাষ্টিস্ রমাপ্রসাদ মুখার্জ্জী, পুত্র শোকাতুরা শ্যামাপ্রসাদ জননীর শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ ইত্যাদি" (Vide 'শনিবারের চিঠি, ১৩৬০, পৌষ ৩২৭—৩৩১)। যখন ভারত-বরেণ্য নেতা শ্যামাপ্রসাদের দাদা জাষ্টিস্ মুখার্জ্জীর তরফ থেকে এই জঘন্য মিথ্যা রটনার প্রতিবাদ করা হলো—তখন apology চেয়ে নিল সপার্ষদ 'শ্রীশ্রীঠাকুর'! এতে এদের কোন লজ্জা নেই। এই apology চাওয়ার ঘটনাটা আর কাগজে ছাপানো হবে না। কিন্তু তাঁদের আসার মিথ্যা সংবাদটা রিপোর্টার শিষ্যের কেরামতিতে ছাপার অক্ষরে লক্ষ লোকের কাছে পৌঁছে যাবে! তারপর অনুগত agent এর দল ঐ বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম ছাপার অক্ষরে কাগজে দেখিয়ে শিষ্য সংগ্রহে মেতে যাবে। মানুষ এত সরল—যা ছাপার অক্ষরে দেখবে তাই ধ্রুব সত্য মনে করে ছুটে যাবে ঐ "শ্রীশ্রীঠাকুরের" (?) কাছে, পোকাগুলো যেমন ছুটে যায় আগুনের দিকে এক মারাত্মক আকর্ষণে! অবশ্য, কুসুমিত পল্লবিত আকারের প্রচারের এমন কলাকৌশল থাকে যে অজ্ঞ লোকে সহজেই সেই ফাঁদে পা বাড়ায়। কবীরসাহেব তাই দুঃখ করে বলেছেন—

"ঐ সী গতি সংসারমেঁ যা গাডর কা ঠাট্
এক ধর্ কূপমে পড়ে সব ধাওতো ঐ বাট্"!

ভণ্ড সাধুদের প্রচার কৌশল খুবই সুসজ্জবদ্ধ, সুপরিকল্পিত। আশ্রমে এসে কেউ এতটুকু বললেন তো তার শতগুণ অতিরঞ্জিত করে ছাপান হবে। এই তো

কিছুদিন আগেও কাগজে পড়েছি—এক সাম্যবাদী ভদ্রলোকের সম্বন্ধে ঐ সঙ্ঘেরই তরফ থেকে মিথ্যা প্রচার—পরে সাম্যবাদী ভদ্রলোকের প্রতিবাদ! (Vide 'শনিবারের চিঠি', বৈশাখ, ১৩৬৪। ৫পৃঃ—৬পৃঃ)।

" লোকৈষণা, বিত্তৈষণা, পুত্রৈষণা ' ত্যাগ করা যে সাধুদের ধর্ম্ম, আচ্ছা বলতো ভাই, এগুলি ওদের কি? গুরু-পূর্ণিমার সময় কাগজে 'সভাসমিতির বিজ্ঞপ্তি'টা পড়লেই দেখতে পাবে মণ্ডলেশ্বর, মহামণ্ডলেশ্বর, ব্রহ্মচারী, 'মহারাজে'র দল কোলকাতা বা বোম্বেতে গুরু-পূর্ণিমা উদ্‌যাপনের জন্য দল বেঁধে আসছেন—অবশ্যই "শিষ্যদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে"! একি শুধু জীবোদ্ধারের সাধু-সংকল্প না কোলকাতা বোম্বের Market টা ভাল বলে? ঐ সব বিখ্যাত মহাত্মাদের (!) গিরিগুহা, নির্জ্জন তপোবনের পরিবর্ত্তে বড় বড় সহরে থাকে মঠবাড়ী, প্রচারকেন্দ্র। যদি বল পতিত পাবন সাধুদের এটা জীব-তারণের কৌশল—তাহলে আমাদের দেশের হাজার হাজার ভাইদের জীবনে অমৃতের সন্ধান মিলেছে ত? মনকে আঁখি না ঠারিয়ে, ভাবের ঘরে চুরি না করে, যদি কেউ সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে সব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিচার করে দেখে—তাহলে দুই-একজন সাচ্চা মহাত্মা বাদে আর সবাইকেই দেখবে 'Spiritually stupidest, but Commercially sharpest' !! ওদের গুরুগিরিটা exploitation ছাড়া কিছুই নয়। শিষ্যদের brain power, manpower আর Money-power এর exploitation! ধর্ম্মলোভাতুর মানুষের—শোকার্ত্ত, বিপন্ন, শান্তিপ্রয়াসী মনে, ধর্ম্মের নামে, সাধু-মহাত্মাদের নামে যে Inherent weakness আছে, এখন গুরুগিরির নামে তারই exploitation চলছে। যে প্রতিষ্ঠাকে 'শূকরী বিষ্ঠা', গৌরবকে 'রৌরব নরকের' তুল্য জ্ঞান করা ত্যাগী সাধুগুরুর জীবনাদর্শ বলে এদেশেরই শাস্ত্র-নির্দ্দেশ—so called সাধুগুরুরা সেই প্রতিষ্ঠার জন্যই লালায়িত! কবীর সাহেব তাই দুঃখ করে বলেছেন—

"ঘর ছোড়কে কুঠী বান্ধি, তিলা ছোড়কে ফেরি
বাচ্চা ছোড়্‌কে চেলা কিতে, মুড়মড়্‌ মায়া ঘেরি।
টাঁড়া কর্‌ঁ চাপড়া করা, কর্‌ঁ নবাই বুটি
সহজে মহন্তাই মিল গয়া, হরসে প্রীত ছুটি"।

বাপের চালাঘর ত্যাগ করে শিষ্যের টাকায় প্রাসাদোপম অট্টালিকা

করে তার নাম দেওয়া হয় আশ্রম। হীরাকে লালকাঁচ বলে পরলে কি হীরা-ভোগ হ'ল না? কর্ম্মসংন্যাসের অজুহাতে বৃত্তিত্যাগ করে শিষ্যের টাকায় চলে দিন গুজরাণ! এ কি উঞ্ছবৃত্তি নয়? মা বাবা স্ত্রী পুত্র পরিজন সব মায়া! কাজেই ত্যাগ করে এসে হাজার হাজার শিষ্য করে তাদের সুখদুঃখের সঙ্গে জড়িত হওয়া কি রকম ত্যাগের পরকাষ্ঠা? মাতাপিতৃদত্ত নাম ত্যাগ করে রাম হ'ল রামানন্দ, যদু হ'ল যাদবানন্দ, ঘোষ বোস চ্যাটার্জ্জীর পরিবর্ত্তে হ'ল গিরি, পুরী, সরস্বতী—এ কি রকম উপাধিত্যাগ? যে বিভূতি-বিভুর প্রতি ইতি ঘটায়—সেই নিম্নস্তরের বিভূতির সাহায্যে, ঔষধ দিয়ে কারও রোগ ভাল করে, না হয় Thought-reading আর clairvoyancy দ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিয়ে লোক আকর্ষণ—এ কি রকম আচরণ? কবীর সাহেব বলছেন—ঐ ভাবে ওরা মহন্তগিরি পেয়ে ভগবৎপ্রেম থেকে হয়েছে বিচ্যুত।

Perfect Realisation এর পূর্ব্বেই ওরাই উপদেষ্টা হয় বলে শিষ্যদের অবস্থা? 'অন্ধেন নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ'!

এইভাবে ভণ্ড সাধুগুরুদের জন্যই যুগ যুগ ধরে সত্যধর্ম্ম হয়েছে পদ-দলিত, সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় রচনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে Inner spirit টাও নষ্ট হ'তে বসেছে। সারা ভারত ঘুরে দেখেছি ভাই, মহন্ত-সাধুদের মধ্যে—এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আর এক সম্প্রদায় যে কিভাবে কুৎসা ছড়ায়, গদীর উত্তরাধিকার নিয়ে কি পরিমাণ যে diplomacy আর হীন ষড়যন্ত্র চলে—তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। চার মঠে চার জন জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য আছেন—তাঁদের নিজেদের মধ্যেও নেই সদ্ভাব—সম্ভ্রমবোধ।

"জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ"—এই সত্যের উদ্গাতা যিনি তাঁরই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ আর সংকীর্ণতা; গিরিপুরী-তীর্থ বড়—না—আশ্রম সরস্বতী নামা সন্ন্যাসী বড় এই নিয়ে আছে পরস্পরের প্রতি এমন হেয়ভাব যা দেখলে যে কোন সংসারীলোক লজ্জায় অধোবদন হবে। যিনি গঙ্গা বলতে বুঝতেন "জ্ঞানগঙ্গা" মনিকর্ণিকা বলতে 'নিজবোধরূপা', পঞ্চক্রোশী কাশী বলতে এই 'পঞ্চ কোষাত্মক দেহ'কে—তাঁরই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা কাষ্ঠলোষ্ট্রপূজা, ফুল বেল-পাতা গঙ্গাজলের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে!

এমনি কি যে কবীর সাহেব বহিরাচার আর মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে আজীবন

আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন বললেই হয়, সেই কবীরেরই অনুবর্ত্তীদল বলে পরিচয় দেয়, উদাপন্থীরা, ভয়ানক বহিরাচারী। মালাতিলকের যিনি কোনও দিনই পক্ষপাতী ছিলেন না সেই কবীরের নাম নেয়—কবীর পন্থীরা—কবীরের মালাতিলক সহ ছবি আঁকিয়ে পূজা করে! আবার কবীর বাণীর তদনুকুলে বিকৃত টীকাও করেছে! যে বুদ্ধদেব বলেগেলেন—"অপ্পদীপোভব"—আত্মদীপ হও—সেই বুদ্ধের অনুচররা চৈত্যে স্তূপে দীপ জ্বালিয়ে পূজা করে! যে চিন্ময় মণিপাদমণ্ডলে উঠলে বোধিসত্ত্ব লাভ হয়—হওয়া যায় নির্ব্বাণ পদের অধিকারী—সেই অন্তর্মুখ সাধনা না করে—তাঁর সম্প্রদায়ীরা 'হুং মণিপদ্মায় ফট্" বলে চাকা ঘুরিয়েই ক্ষান্ত! ত্যাগের অবতার বুদ্ধের 'Modern Incarnation' এর তো পাঁচ লাখ টাকা ব্যয় হয় তিন দিনের হাত খরচ! কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের আদর্শ যিনি প্রচার করে গেলেন, তাঁর উত্তর-সাধকদের দুগ্ধফেননিভশয্যা আর বিলাসব্যসন দেখলে রাজা মহারাজাদের জীবনও অত্যন্ত সাদাসিধে বলে মনে হবে।

মহাপুরুষ বলে গেলেন—'জীবকে শিব জ্ঞানে সেবা করবি'—শিব অনুমানে নয়; জীবকে শিব-জ্ঞানে সেবা করতে হ'লে প্রথমে চাই আত্মজ্ঞান—কিন্তু তাঁর নামের সম্প্রদায় আত্মজ্ঞানলাভের সাধনাকে গৌণস্থান দিয়ে স্কুল কলেজ হাসপাতাল স্থাপনকেই মুখ্য স্থান দিয়েছে। বলতো ভাই, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কি স্কুল কলেজ হাসপাতাল নেই? কোন Social work কি সে সব দেশে হচ্ছে না? সে সব দেশে কি ত্যাগব্রতী আদর্শপ্রাণ লোকের অভাব? তারজন্য কি তাদেরকে সাধুগুরুর বেশে গেরুয়া পরতে হয়েছে?

একেশ্বরবাদী হজরত মোহাম্মদ—যিনি পৌত্তলিকতা এবং বহিরাচারের ছিলেন একান্ত বিরোধী, তাঁরই নাম নিয়ে সম্প্রদায়ীরা মুসলমান জন-সাধারণকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে দিয়েছে শরীয়তের শৃঙ্খলে, "লাশরীক্ আল্লাহ্" এর বেদীতে মোল্লা মৌলবী ভণ্ড ফকিরদের কৃপায় ঠাঁই করে নিয়েছে কত পীর, হাতি ঘোড়া! ছাগ (খাসি) বলি দিয়ে হয় এই সব পীরের সদ্‌গা। এই ভাবে সত্যদর্শী-মহাপুরুষরা যে সমস্ত সঙ্কীর্ণতা বহিরাচার দূর করার জন্য করে গেছেন জীবনব্যাপী সাধনা এবং সংগ্রাম—তাঁদের পর অনমুভবী ভণ্ড সাধুর দল তাঁদেরই নামিত সম্প্রদায়ে এনে দিয়েছে ভেদ বিভেদ আর বাহ্য পূজার অনুষ্ঠান। সর্ব্বত্র এদেরই দাপট! সত্য আদর্শকে এরা করে দিয়েছে বিকৃত। পূর্ব্বসূরী হয়তো বলে গেলেন 'রুমাল' এরা

তাকে বুঝে নিয়েছে বিড়াল। তারপর ব্যবসা আর ঠাট বজায় রাখবার জন্য, Pose এবং Form টা ঠিক রাখবার জন্য—'রুমালের বিড়াল বাখ্যা থেকে'ই বের করেছে এক একটা কেঁদো 'বাঘ'—অর্থাৎ মিথ্যা ভাষ্য, টীকা, টীপ্পনি—যা সত্যমত পথকে গ্রাস করে বসে আছে।

যদি এর মধ্যে কেউ চান সত্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে—এদের উদ্যত কৃপাণ নেমে আসবে তাঁর উপর। লোক চোক্ষে তাঁকে হেয় করবার জন্য ছল বল কৌশল কোনটারই তখন অভাব ঘটবে না। Inquisitionএর কথা তো ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জান। এদেরই জন্য মনসুরকে চড়তে হ'যেছিল শূলে, পল্টু সাহেবকে হতে হয়েছিল জীবন্ত দগ্ধ, নানক-কবীরকে হ'তে হয়েছিল দেশত্যাগী। এই সময় কিন্তু মৌলানা পুরোহিত মোল্লা সন্ন্যাসী সব এক হয়ে যায়। তুলসীদাস ঠিকই বলেছেন— "সচ্ কহো তো মারে লাঠ্ঠা ঝুটা জগৎ ভোলায়।"

এই 'ঝুটা'বাই জগৎকে ভুলিয়ে রেখেছে। True Seeker of Truth —তাই পায় না সত্যের সন্ধান; মিথ্যাকেই সত্য বলে, হলাহলকেই অমৃত ভেবে পান করে বসে থাকে। তাই সমাজে দেবতার চেয়ে অসুরেরই ভীড় বেশী।

একটি গল্প বলি শোন। কাশীতে এক সাধুর এক চেলা ছিল। তার নাম ছিল হাঁদারাম ভিখনদাস। সাধুর একজন গৃহীভক্তও ছিলেন। তাছাড়া তিনি বিশেষ একটা কারও সঙ্গে মিশতেন না, নিজের সাধনা নিয়েই মস্ত্ থাকতেন। বাইরের কোন আগন্তুক এলে সচবাচর ভীখন দাসের মারফৎই কথাবার্ত্তা হ'ত। একদিন ঐ মহাত্মা তাঁর গৃহীভক্তটিকে কোন বিশেষ কাজে আজমগড় পাঠিয়েছিলেন। বাড়ীতে কোন কিছু না জানিয়েই ভক্তটি আজম-গড় চলে গিয়েছিলেন। এদিকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঐ ভক্তটী বাড়ী না ফিরায় তার ছেলে খোঁজ করতে এল আশ্রমে। সাধু যখন ভক্তটীকে আজমগড় পাঠান—ভিখন-দাস তখন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলো—সে এ কথা জানতো না। কাজেই ছেলেটাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ভিখনদাস গেলো সাধন কুঠিরে সাধুকে জিজ্ঞেস করতে। সাধু সংক্ষেপে উত্তর দিলেন— 'আজমগড় গয়া'। ভিখনদাস গুরুর কথা ভুল শুনে উল্টো বুঝে বাইরে এসে ছেলেটিকে শুক্নো মুখে জবাব

দিলো—আজ-মর-গয়া। ছেলেটিও বুঝে নিল 'তার বাবা আজ মারা গেছেন।' বাড়ীতে কাঁদা কাটা, যথারীতি কুশপুত্তল দাহ-উত্তরীয়ধারণ শ্রাদ্ধ শান্তি সব চললো।

পূর্ব্বসূরীদের "আজমগড় গয়া" কে উত্তর সাধকরা বুঝে নিয়েছে—'আজ মর গয়া,' তদনুযায়ী আশ্রিত চেলারাও করে চলেছে ঠিক ঐ ভাবেই মিথ্যা-আচার-অনুষ্ঠান। প্রতিষ্ঠালিপ্সু-অননুভবী শিষ্য শিকারী সাধুদের হাতে পড়ে—এইভাবে হয়—আদর্শের বিনাশ, সম্প্রদায় এইভাবে দ্রষ্টা পুরুষের আধ্যাত্মিক স্বরূপকে করে হত্যা। এইজন্যই কবীরের পুত্র কমাল সাহেব বলেছেন—"মহাপুরুষরা আসেন মানব সাধনার বরিয়াত (শোভাযাত্রা) চালিয়ে নিয়ে যেতে। তাঁরা যদি দেখেন সবাই নিদ্রিত, তবে বজ্রের আঘাতে সকলকে জাগিয়ে তাদের হাতে দেন বজ্রাগ্নির মশাল। তাঁদের বাণী এবং মন্ত্রই এই মশাল। সেই সব জীবন্ত মন্ত্র এবং অগ্নিক্ষরা বাণী তো কেউ আর সঞ্চয় করে ভাণ্ডারে ভরতে পারে না। কাজেই যখন সঞ্চয়ব্রতী অনুবর্ত্তীর দল মঠ ও সম্প্রদায় স্থাপন করে, তখন তারা সেই সব জ্বলন্ত মশালকে নিভিয়ে নিরাপদ করে নেয়। ভাণ্ডারে নিরাপদে রাখবার জন্য তারা আগুন বাদ দিয়ে প্রাণহীন ন্যাকড়া আর কাঠের টুকরা সঞ্চিত করে।

সম্প্রদায় হ'ল সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষদের গোরস্থান আর চেলারা যেন গুরুর আদর্শের কবর রচনাকারী। তারা সেখানে গুরুর নামে চমৎকার মর্ম্মর অট্টালিকা গড়ে নেয়। গুরু যদি মরতে নাও চান, তবুও গুরুর পক্ষে এই গৌরবময় কবর-খানা রচনা করবার জন্য চেলারা গুরু এবং তাঁর সত্যকে বধ করে, সংকীর্ণতা সাধনার কবর রচে। এরই নাম হ'ল সম্প্রদায়"।

আমার সঙ্গে যেবারে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলে, সেবারে এক বাউল গেয়েছিলেন মনে আছে?

> "তোমার মন্দির ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে;
> তোমার ডাক শুনি সাই,
> কিন্তু চলতে না পাই,
> রুইখ্যা দাঁড়ায় গুরুতে মরশেদে।
> ডুইব্যা যাতে অঙ্গ জুড়ায়, তাতেই যদি জগৎ পুড়ায়,
> বলতো গুরু কোথায় দাঁড়াই?

তোমার অভেদ সাধন মরলো ভেদে।
তোর দুয়ারেই নানান্ তালা, পুরাণ-কোরাণ-তসবীমালা,
ভেল পথই তো প্রধানজ্বালা, কাইন্দে মদন মরে খেদে"।

এঁদের এইসব জ্ঞানগর্ভ সারকথাগুলি ভাল করে অনুধাবন করো ভাই। আজ চারিদিকে ঐ সব 'সম্প্রদায়ী' আর 'কবরদাতা চেলাদেরই' ভীড় বেশী।

হাঁদারাম ভিখনদাসরাই আজ অধিকাংশস্থলে গুরুর পুণ্য আসনে গুরু সেজে বসে আছে। তাই বলছি, গুরু নির্ব্বাচন করা যেহেতু অতি কঠিন, সেইজন্যই সত্যসন্ধানীর কর্ত্তব্য হ'ল—যেটুকু তার ভগবদ্-দত্ত বুদ্ধিবৃত্তি আছে, তাই দিয়ে জেনে বুঝে বিচার করে গুরুবরণ করা। সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের জীবনাদর্শ এবং তাদের ঋতম্ভরা উপদেশও (যা তাঁরা শাস্ত্রমুখে বলে গেছেন) এ বিষয়ে করবে সাহায্য। সর্ব্বোপরি দাতাদয়ালের দয়াই এ পথে একমাত্র পাথেয়। সত্য সন্ধানীকে সত্যই রক্ষা করেন।

প্রশ্ন :— ধর্ম্মের নামে যে সমস্ত মিথ্যাচার চলছে তা বুঝলাম, ভণ্ডগুরু আর ধূর্ত্ত সম্প্রদায়ীরা মানুষকে বঞ্চনা করে চলেছে—তারফলেই মানুষ ধীরে ধীরে হয়ে উঠছে বীতশ্রদ্ধ। এখন, এ বিষয়ে শিষ্য পদপ্রার্থী যারা—এই ধরুন আমরা—আমাদের এতে কতখানি দোষ আছে ?

উত্তর :— তোমাদের দোষও বহু। ভণ্ড সাধু গুরুরা যদি exploit করে চলে, তবে যারা exploited হয়, তাদের বেকুবিটা কি দোষের নয় ? একটি ক্ষেত্রে ভাল ফসল ফলাতে হ'লে তিনটি জিনিষের দরকার হয়—(১) অভিজ্ঞ পরিশ্রমী চাষী (২) ভাল বীজ (৩) এবং উত্তম কর্ষিত ক্ষেত্র। চাষী যদি অনভিজ্ঞ হয়, তার যদি না থাকে সততা এবং অধ্যবসায়, বীজও যদি হয় নিকৃষ্ট ধরণের, তখন ভালভাবে চষা-উর্ব্বর মাটিও যেমন কোন ফল দেয় না, তেমনি অনেক সময় এও তো দেখা যায়, চাষী উত্তম, বীজও উত্তম কিন্তু ক্ষেত্রটি যদি হয় উষর, অনুর্ব্বর, তৃণ লতাগুল্মে ভরা, তাহলে কি সুফল আশা করা যায় ? কাজেই বীজ, বীজবপনকারী আর ক্ষেত্র—এই তিনটিরই দোষগুণ বিচার্য্য।

ধর্ম্মজগতে অনেক অনাচার ঢুকেছে সত্য, ধর্ম্মব্যবসায়ীরা সাধুগুরু সেজে ভুল দীক্ষা শিক্ষা দেওয়ায় নানা বিষময় ফলও দেখা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে এতো কখনও হ'তে পারে না যে সাচ্চা মহাত্মা একেবারে দুর্লভ ?

এক কোটির মধ্যে এক জনও তো আছেন ? ম্যাট্রিকুলেটের সংখ্যা বেশী বলে যে দেশে দুই এক জনও ডি. এস. সি. নেই, এ কথা কে বললো ? আই. এস. সির First year অবধি পড়ে দু'একদিন Screw Gauge আর Test tube নিয়ে নাড়াচাড়া করে এসে Scientist বলে যদি অনেকেই বৃথা আড়ম্বর করেই থাকে—তাহলেও দেশে দু'এক জন সি. ভি. রমন, সত্যেনবসু বা ম্যাডাম কুরির কি অভাব আছে, না, এঁদের চিনতে ভুল হবে ? আইনষ্টাইনের মত যুগান্তকারী প্রতিভার অধিকারী বিজ্ঞানী কি জন্মাচ্ছেন না ? তেমনি দেশে সাচ্চামহাত্মার দুর্লভ হলেও একেবারে থাকবে না বা নাই, এ কখনও হ'তে পারে না। আমিও তা কখনও বলি নি, মহাত্মা আছেন। সাচ্চা গুরু-শক্তি সব সময় প্রকট আছেন। 'স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনাবচ্ছেদাৎ'—গুরু সত্ত্বা নিত্য বিরাজমান। একটা Bulb fuse হ'চ্ছে, Light আর একটা Bulb এর ভিতর দিয়ে আসছে—Bulbs may be different, but Light is the same ! পূর্ব্বেই যা সাচ্চা মহাত্মা ব্যাস বশিষ্ঠ, গুরু নানক কবীরের দল ছিলেন—এখন আর নেই—এ কখনও হতে পারে না। মানুষকে তমঃ থেকে জ্যোতিঃর পথে, অসত্য থেকে সত্যের পথে, মৃত্যু থেকে অমৃতের রাজ্যে নিয়ে যাবার সাচ্চাগুরু, সন্ত মহাত্মা এবং তাঁদের বিশুদ্ধ বোধি–সেই All-moving, all-shaking Cosmic power নিত্য প্রকট আছে।

পূর্ব্বে যেমন বলেছি — অভিজ্ঞ অধ্যবসায়ী, বীজ বপনকারী — উৎকৃষ্ট বীজ হলেও যেমন ঊষর-অনুর্ব্বর ক্ষেত্রের দোষে সুফসল ফলে না, তেমনি সাচ্চা-মহাত্মা থাকলেও ক্ষেত্রের দোষে—জ্ঞানান্বেষী সত্যসন্ধী শিষ্যের অভাবে অমৃতফল বেশী ফলছে না। এটা ঠিক মনে রেখো ভাই, "True Gurus, however, are rare in the world ; but they do exist. They are ever present. Only inner urge and searching are necessary."

সাচ্চা গুরুলাভ কোন হুজুগের বিষয় নয়, গোলেমালে হরিবোল বলা নয়, ক্ষণিক খেয়াল বা মনোবেগেরও কাজ নয় — এ হ'ল জীবনব্যাপী সাধনা এবং সাচ্চা ঈশ্বরানুরাগের অমৃতময় ফল।

সাধারণ মানুষের শিষ্যপদ প্রার্থীদের দোষ হ'ল — (১) বিচারশক্তির অভাব (২) অন্ধবিশ্বাস, (৩) "আলাদিনের প্রদীপের মত কোন আশ্চর্য্য

প্রদীপ দেবে সাধু, রাতারাতি তোমার ভাগ্য যাবে বদলে, বন্ধ্যার হবে পুত্রলাভ, গরীবের কুঁড়ে ঘর হয়ে উঠবে অট্টালিকা, রোগক্লিষ্ট মুমূর্ষুর প্রাণে সাধুর কৃপায় হ'বে নব যৌবনের সঞ্চার"—এই রকম নানাধরণের কামনা বাসনা (৪) miracle-mongering (৫) সহজ বিশ্বাস প্রবণতা (৬) তীব্র সাধন নিষ্ঠা এবং সাচ্চা ঈশ্বরানুরাগের অভাব।

সাধুগুরু বরণ করতে গেলে সাধারণ লোকে আজকাল কি করে? প্রথমেই দেখে তাঁর দিব্যকান্তি জটাজুট ভস্ম বিমণ্ডিত দেহটী। সেটি যদি নয়ন প্রীতিকর হ'ল—অমনি ভেবে বসে—'আহা! কী সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় শরীর—ইনি ঈশ্বরদর্শী না হয়ে যান না।' হয়তো তিনি রামকৃষ্ণের ঢং এ আধ আধ বুলি শিশুর মতো, জড়িয়ে বালকামি করছেন— অমনি তোমরা ভেবে বস, 'বাঃ শিশুর মত কী সরল'! যদি সে গান বা ভজন শুনতে শুনতে হাত পা খিঁচে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে ওঠে কিংবা নিপুন নটের মত চোখের জল ফেলিয়ে মাটিতে লম্বা হযে শুয়ে পড়তে পারে, তাহলে তাব সেই acting, posing দেখে ভেবে বস— 'কত বড় মহাপুরুষ দেখেছ—মুহুর্মুহু সমাধি হচ্ছে—অশ্রুস্বেদ পুলক কম্প — সারা গায়ে সাত্ত্বিকী বিকার! একেবারে শুদ্ধ বৈষ্ণব!!'

কোনটি যে সমাধি—সমাধি হলেও তা জড় সমাধি কিংবা ভাব সমাধি সম্প্রজ্ঞাত বা অসম্প্রজ্ঞাত—তা বোঝার ক্ষমতা সাধারণের নেই। বাহ্যিক ছলা-কলা ভাবভঙ্গী দেখেই তোমরা গলে যাও, করে ফেল গুরুবরণ. তার উপর যদি থাকে তার বাক-বৈদগ্ধ্য—তত্ত্বকথার চুবড়ি মিষ্টকথার প্রলেপে যদি সে পরিবেশন করে—তাহলে সে সাধুর ফাঁদ এড়ানো সাধারণের সহজসাধ্য নয়!

আমার একটি বন্ধুর কথা শোনাই শোন—সে খুব ব্যঙ্গরসিক। একবার তার সঙ্গে কালিঘাটে হালদার পাড়া রোডে দেখা। বললুম—'কিরে কালিঠাকুর দেখতে এসেছিলি?' সে বললে, 'দূর! কালিকে এখন মন্দিরে কোথায় পাবি? ভোর না হতেই তো কালীঠাকরুণ—উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে গঙ্গার ওপারে বসে থাকে—ফিরবে সেই রাত্রি বারটা-একটায় যখন মন্দিরে আর কেউ থাকবে না'।

'সে কি রে? —মন্দিরে এত ভক্তের ভীড়—আর ভক্তবৎসলা গেলেন পালিয়ে'? "আমি যদি বুঝি, এক কাপ চা খাইয়ে আমার আলোয়াণ-ঘড়ি-

আংটি-বোতাম তুই চেয়ে বসবি— তাহলে কি আমি এমন বেকুব যে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে না গিয়ে তোর সঙ্গে বসে মৌজ করে চা খাবো? মন্দিরে গিয়ে দেখবি যা, দেবীর ভক্তরাজদের হাতে আছে ফুলমালা আর সন্দেশ নিয়ে বড় জোর চার আনা পয়সার একটা ডালা—কিন্তু তার সঙ্গে রয়েছে এক ডোল কামনা বাসনা পূরণের আর্জ্জি—'মা, আমার ছেলের চাকরী করে দাও'—'ছোট ঠাকুরপো এবারে যেমন পাশ করে যায়', 'ওঁর যেমন পায়ের বাতটা সেরে যায়', 'পতিত পাবনী মা! তুমি তো সব পারো, Office এ আমার যে immediate senior আছে ও যেন অন্য অফিসে বদলি হয়ে যায়', 'মেয়েটার এখনো বিয়ে হ'চ্ছে না—একটু দেখো মা'! 'মা, মাগো—ত্বং কর্ত্রী পালয়িত্রী, জামাই এর দেশে যেন বেশ বৃষ্টি হয়, না হলে মেয়েটা খেতে পাবে না, গত বচ্ছর অজন্মা গেছে'!

তোমরাও তেমনি গুরু করতে যাও, ঈশ্বরলাভের জন্য নয়, অবচেতন মনে যত অপূর্ণ সাধসোহাগ কামনা বাসনা আছে—সাধুর যোগশক্তিতে—তা যেন পূর্ণ হয়—এই কামনায়। গুরু হবে তোমাদের জ্যোতিষ—ভাগ্যগণনা করে দেবে, —ডাক্তার—তুকতাক্ কবচ মাদুলী দিয়ে রোগ সারাবে,—মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরী সব বিষয়েই করবে অভ্রান্ত ভবিষ্যৎ বাণী—আর তাহলেই তোমরা ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ বলে মাথায় তুলে নাচবে!

গুরু যেন উকিল—জটিল মামলা মোকদ্দমাতেও গুরু কৃপাতে যেন তরে যেতে পার! গাঁজাকে মদ করেছে, মদকে এডোয়ার্ড টনিক, না হয়, অমাবস্থার রাত্রে চাঁদ দেখিয়েছে—Touch করে অমুকের রোগ সারিয়েছে—এ সব কথা যদি শোন তাহলে সত্য মিথ্যা যাচাই না করেই—ছুটে যাবে আগে ভাগে সেই সাধুর শিষ্যের খাতাতে নাম লিখাতে! Thought-reading কিংবা deep Psychological insight এর দ্বারা যদি সাধু মনের কথা বলে দিতে পারে বা কাকতালীয়বৎ একটা কিছু মিলিয়ে দিতে পাবে তাহলে তো তিনি তোমাদের কাছে অন্তর্য্যামী!

নিজে যদি তাঁর কোন অলৌকিকত্ব নাও দেখ, যদি নাও পাও কোন দিব্য-শক্তির পরিচয়—তবে মনকে এই বলে প্রবোধ দেবে—'আমার হয়ত আধার-অধিকার ঠিক নয়', 'চিত্তশুদ্ধি না হলে কি বাবার কৃপা পাওয়া যায়'? যদি সাধুবাবা বা সাধুমার ভবিষ্যৎ বাণীগুলি বারবার তোমার জীবনে মিথ্যা বলেও প্রমাণিত হয় তখনও মনকে এই বলে প্রবোধ দাও 'গুরু আমার নিষ্ঠা পরীক্ষা করছেন'!

যদি ঐ গুরুর মধ্যে কোন অনাচারও দেখ—তোমরা অমনি তার বাখ্যা করবে, 'অভক্ত আর অনধিকারীকে কাটাবার' জন্য বাবার এগুলি লীলা'! "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য যায় ত্যজি বিষ্ণুপ্রিয়া, বর্ত্তমানে সাধু ফিবে মাতাজী লইয়া" !! "এত কহি মহাপ্রভু দাঁড়ায়ে মুতিলা, ভক্তগণ কহে প্রভুর এও এক লীলা" !!!

যদি তুমি পণ্ডিত হও—পণ্ডিতরা অধিকাংশস্থলে যা করে থাকেন, টিক-টিকির গিরগিটি বাখ্যা করে, নানারকম অর্থ সংযোজন বিয়োজন করে, twist করে, কতক অর্থ insert করে, শাস্ত্রেব সঙ্গে মিলিয়ে প্রমাণ করে দেবে—সাধুবাবার হাবভাব হাসা হাগা-খাওয়া সবই শাস্ত্রানুমোদিত! মহাপুরুষজনোচিত! যদি অসংলগ্ন প্রলাপবাক্যও গুরুজীব মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়—যার উপযুক্ত বাখ্যা দিতে অসাধ্য কর্ম্মা পণ্ডিত-শিষ্যও পারবেন না—তখন ভেবে বসবে, "বাবা এখন ভাবারূঢ় অবস্থায় আছেন"!

গুরুবরণ করতে গিয়ে তোমবা দেখ কার দলে কত বড় বড় লোক জজ্ ব্যারিষ্টার শেঠ মাড়োয়ারী আছেন। অবশ্য এর মধ্যেও তোমাদেব সুপ্ত এবং গুপ্ত অভিসন্ধি থাকে; হয়তো ব্যক্তিগত জীবনে যাঁর সঙ্গে একাসনে বসবার অধিকারী তুমি নও, কথা বলারই সুযোগ পাও না, social status এর এত difference, একই গুরুর শিষ্য হ'লে গুরুভাই হিসেবে ঐ বাধাব প্রাচীরটা অনেকটা সরে যাবে। তাবপর গুরুভাই হিসেবে ভাব জমিয়ে, গুরুর প্রতি অহেতুক ভক্তি বিটলেমি দেখিয়ে 'গুরুগতপ্রাণ' সেজে—ঐ বিশিষ্ট লোকদের মন ভিজিয়ে—নতুবা গুরুর মাধ্যমেই অনুরোধ করে ছেলের চাকরী, মেয়েব বিয়ে, departmental শাস্তি মুকুব প্রভৃতি নানারকম সমস্যাব জন্য সুপারিশ ও নেকনজর লাভেব উদ্দেশ্যেই গুরু করতে ছোট। তাই দেখা যায় পুলিশ কমিশনারের গুরুব কাছে—কনেষ্টবল থেকে অফিসার পর্য্যন্ত পুলিশ ভক্তদেরই ভীড় বেশী! রেলওয়ে সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট বা D. T. O. এর গুরু, কেবিনম্যান ষ্টেশন মাষ্টার সব রেলকর্ম্মচারীরই গুরু!! সৈন্য বিভাগের একজন মেজর শিষ্য হ'লে, সামান্য সৈনিক থেকে হাবিলদার পর্য্যন্ত অধিকাংশই সেই একই গুরুর পদাশ্রিত !!!*

তীক্ষ্ণভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে দেখা যাবে ঐ সব বিশিষ্ট বাবুদেরও একাগ্রতার অভাব। এই মেদিনীপুর শহরেই একদল লোক আছেন তোমরা

* কেউ যেন দয়া করে ভুল না বোঝেন। সাচ্চাগুরুর সম্বন্ধে তো কোন কথাই

জান—যাঁদেরকে রমনানন্দ মহারাজজীর কাছে মাল্যহস্তে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাবে, ধলহারার পাগলীমায়ের চরণতলেও এঁদেরকে ভক্তরাজরূপে দেখা গিয়েছিল, শ্রী৪২০ ঘোতারাম দাস লুণ্ঠন নাথ বাবাজীর কীর্ত্তন সভাতেও মসগুল থাকেন! কোন কোনদিন সন্ধ্যাকালে সাধারণ লোকের ভীড় কমলে, আবাসের কালীবুড়ি যে গণনা করে তার সেখানেও এঁদের গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাবে!!

বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে অনেকেই আবার তাঁকেই শ্রেষ্ঠগুরু বলে বরণ করেন যাঁর কাছে তাঁদের ego-complexটা বেশী চরিতার্থ হয়। 'শ্রেষ্ঠ গুরুর শিষ্য' এই আত্মপ্রসাদ নিজেত ভোগ করেন-ই তাছাড়া স্ত্রীপুত্র পরিজন সহ নিজের সমস্ত পরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও নানারকম অলৌকিক গল্প করে—নিজের গুরুর চরণতলে নিয়ে এসে হাজির করেন! 'সকলেরই যে একটা পর-পারের ব্যবস্থা করে দিলেন'—এই প্রশংসাটুকু উপরিলাভ! 'আমি কখনও ভুল করতে পারি না, কতকষ্টে এতবড় মহাপুরুষ পেয়েছি'—এতো আছেই, তাছাড়াও 'তিনি এখন যে সাধনার উচ্চস্তরে উঠেছেন, তাঁর উপর গুরুর বড় কৃপা'—এইটে প্রমান করবার জন্য নানা সত্য মিথ্যা প্রচার করতে থাকেন গুরু সম্বন্ধে। পরে যদি বুঝতে পারেন গুরুর দ্বারা তাঁর পারমার্থিক কোন লাভই হয়নি, এমন কি যদি দোষনীয় কিছুও দেখতে পান—মনের আগুনে ধিকি ধিকি নিজেই পুড়তে থাকেন, প্রকাশ্যে গুরুত্যাগ করতে পারেন না।

বরং অপরে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও, তা নানাভাবে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কারণ এখন যে তা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই; গুরু ত্যাগে যতো না মনোবেদনা, সব চেয়ে ব্যথা স্ত্রী পুত্র পরি-জনদের কাছে, বন্ধুদের কাছে যে ছোট হয়ে যেতে হবে! এলাহাবাদের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জানি যাঁর গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা গেছে কমে, কিন্তু তবুও নিজের মুখ-রক্ষার জন্য, যাতে কেউ না ভাবে বাহাত্তরে পড়ে বুড়ো বাহাত্তুরে হয়েছে, নাস্তিক হয়ে গেছে—এজন্য বৈঠক-খানায় সেই ভণ্ড-গুরুর বড় oil paintingএর কাছে

নেই; অনেক অফিসারও আছেন Strict principleএর আমি তা জানি। আমি শুধু সাধারণতঃ যা ঘটে থাকে, যে সব রন্ধ্রপথে দোষ ত্রুটি ঢুকেছে—বিবেক বুদ্ধিমত সেইগুলি দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রকৃত সজ্জনকে হেয় করা আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

(যা প্রথমে আদরে টাঙ্গিয়ে ছিলেন) করজোড়ে প্রণামের অভিনয় করতেই হয়, মন দারুণ বিক্ষোভে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেও, সরলা স্ত্রী যখন ঠাকুর ঘরে ষোড়শোপচারে গুরুপূজার আয়োজন করেন তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রণাম ঠুকতে হয়, প্রসাদ নিতে হয়, মিথ্যা পূজার খরচটাও জোগান! হুজুগে মেতে, ভাল করে বিচার না করে, গুরু বরণের আক্কেল সেলামী !!

কর্ম্মজীবনে কারও হয়ত ইন্দ্রিয় দোষ, পান দোষ, কালোবাজারি, জালিয়াতির জন্য দুর্ণাম ছিল। ঐ দুর্ণাম, লোকনিন্দা ঘুচাবার জন্য, সাধুগুরু আশ্রয় করলে ধর্ম্ম হবে, পরজন্মে স্বর্গলাভ হবে, অপরের চোখের জলের বিনিময়ে যে অর্থ সঞ্চয় করেছে—তার কতকটা সাধু-গুরুতে দান করে দিলে পাপক্ষয় হবে —এই সব ভেবে চিন্তে (commercially একটা বাটা কষে!)—যে সাধুর বাজারে বেশ নাম-ডাক আছে— তারই কাছে দীক্ষা নিয়ে বসলো। লোকে বলবে, "হ্যাঁ আগে লোকটা খারাপ ছিলো বটে, কিন্তু এখন ধর্ম্মে কর্ম্মে মন দিয়েছে, নামে রুচি হয়েছে, দানধ্যানও করে বেশ!"

অনেক নব্য তরুণ-তরুণীর গুরু করণের মধ্যে তো রীতিমত নাটকীয় ব্যাপার থাকে, গোপন অভিসন্ধি থাকে। পরস্পরে মিলনের পথে হয়তো সামাজিক বাধা আছে— তাই একই গুরুমার শিষ্য-শিষ্যা হয়ে—আশ্রমে থেকে গুরু কৃপায় মিলিত হয়েছে! একটি সজ্যকে আর সজ্যনায়কের ঘটনা জানি, যেখানে দুইটি মেয়ে তাদের দয়িতকে পাওয়ায় পথে মা বাবা বাধা হওয়ায়, মা বাবা যে গুরুর কথায় উঠেন বসেন—তার কাছে গিয়ে—তার গলায় মালা দিয়ে এসে, মা বাবাকে জানিয়ে দিয়েছে—'বিবাহ আর করবে না, গুরুকে স্বয়ংবরা হয়েছে'! মাবাবাও মেয়েদের পরমার্থের প্রতি টান, গুরুপ্রেম দেখে গদগদ! বিবাহ করতেও হ'ল না, দয়িত মিলনের বাধাটাও সরে গেল! এই সব ভক্তদের শিষ্যপদপ্রার্থিনীদের দোষ কোথায় বুঝতে পারছো ত?

অনেকের আবার দীক্ষা নিয়ে পরমার্থের বহর দেখলে 'ঢেঁকি যে স্বর্গে গেলেও ধান ভানে' সেই প্রবাদবাক্য মনে পড়ে যায়। কর্ম্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে — ধর্ম্মজীবনে — কোন বিখ্যাত সাধু গুরুর মঠ মিশনে ঢুকে সাধুবাবা বা সাধু মায়ের Personal Assistant, Private Secretary, Secretary, Vice-President প্রভৃতি পদ অলঙ্কৃত করে বসে আছেন; প্রচার করা, organise

করা ; চাঁদা তোলা আর সভাসমিতি করে, টাইপ করে কলম পিষে সময় কাটাচ্ছেন ! এ সব কাজে যে দোষ আছে— এ আমার বলার উদ্দেশ্য নয়, ধর্ম্ম মানেই যে তুষ্ণীম্ভূত হ'য়ে বসে থাকা এও আমি বলছি না আমি কেবল বোঝাতে চাইছি— যে ঈশ্বর লাভের জন্য গুরু বরণ—সে factor টা গৌন হয়ে দাঁড়িয়েছে !

এইভাবে নাককাটা চেলার দোষে নাককাটা গুরুর শিষ্য সংখ্যা-কারবার বেশ জমজমাট চলেছে ভাই । নাককাটা গুরুর গল্প জান ত ? একজন কোন কুকাজ করার জন্য ভিন গাঁয়ের লোকে তার নাক কান কেটে দিয়েছিল। সেই লোক লজ্জায় পালিয়ে গিয়ে কয়েক মাস তীর্থে তীর্থে ঘুরে এসে, দাড়ি চুল রেখে দেশে ফিরে এসে গ্রামেব শিব মন্দিরে আস্তানা গাড়লো । লোকে যখন নানা কথা জিজ্ঞেস করে—নাক কাটার কারণ জানতে চায় তখন সে দাঁড়িয়ে ওঠে কখনও কাঁদতে কাঁদতে কখনও বা হাঁসতে হাঁসতে নেচে নেচে বলতে লাগলো, 'অহো ! প্রভুর কী লীলা ! কী মহিমা ! কী আনন্দ ! কী আরাম !' লোকে বুঝলো ইনি সিদ্ধ হয়ে গেছেন, নাক কাটাটা বোধ হয় একটা বিশেষ যোগ-ক্রিয়া, ভগবান লাভের উপায় ! একজন তো শিষ্য হওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। অনেকদিন ধবে অনেক মিনতি জানানোর পর তাকে বনের ধারে নিয়ে গিয়ে চট করে নাকটা কেটে দিয়ে বললো— "এখন আর উপায় নেই ; বলতে থাকো আমার মত, অহো ! প্রভুর কী লীলা ! কী মহিমা ! কী আনন্দ ! কী আরাম !" বেকুব আর করে কি ? এইভাবে নাক কাটাদেরই একটা সম্প্রদায় গড়ে উঠলো । ঐ চেলাটা যদি মিথ্যার মুখোস খুলে ধরতো তাহলে নাক কাটা গুরুর ভণ্ডামি 'সমূলেন বিনশ্যতি' হতো কি না ?

এই সব থেকে আশা করি বুঝতেই পারছো, বর্ত্তমান ধর্ম্মের এতখানি দুরবস্থার মূলে — ভগবানের প্রতি অনাস্থা আসার মূলে — ভণ্ড সাধুরা ছাড়াও শিষ্য নামা সরল প্রাণ অজ্ঞদের, so called ধর্ম্মধ্বজী ভক্তদের দোষ এবং দায়িত্ব কতখানি ? প্রকৃত মহাত্মাদের কাছে ঐ সব Undesirable elements so called ভক্তরাজরা ঠাঁই পাবে না। সাচ্চাগুরু তো আর শিষ্য সংখ্যা বাড়ানোর জন্য লালায়িত ন'ন। "গুরুকা দরবারমে ভক্তি পিয়ার" (পল্টুসাহেব) সাচ্চা অনুরাগ, তীব্র সাধন নিষ্ঠা, জীবন্ত সত্যের প্রতি জ্বলন্ত

প্রীতি (Burning love to living Truth), যাঁর হৃদয় ঈশ্বরলাভের ইচ্ছা ছাড়া, প্রিয়মিলনের আকুতি ছাড়া, অন্য কোন মলিন বৃত্তিতে, স্থূল কামনা-বাসনায় বিষদুষ্ট নয়, তিনিই সাচ্চাগুরুর শিষ্য হওয়ার অধিকারী। ঈশ্বরের জন্য প্রাণ কাঁদলে সাচ্চাগুরু আসেন—তিনি নিজেই খুঁজে নেন ভক্তকে—'when the chela is ready Sat Guru appears' তিনি নিজে এসে যেঁচে দেন অভয় অমৃত কোল।

ক্ষেত্রটি উর্ব্বর এবং উপযুক্তভাবে কর্ষিত না হলে, বিজ্ঞ চাষী যেমন বীজ বপন করেন না, তেমনি সাচ্চাগুরু, শিষ্য উপযুক্ত অধিকারী এবং মুমুক্ষু না হলে দীক্ষা দিয়ে দলভারী করবার কারবার খুলে বসেন না।

"ন মলিন চেতস্যুপদেশবীজ প্ররোহোঽজবৎ" (সাংখ্য দর্শন)

অর্থাৎ যাদের চিত্ত ধন জন পশু বিত্তের প্রতি আসক্ত, মলিন কামনাবাসনা দুষ্ট, সেই চিত্তভূমিতে উপদেশরূপ জ্ঞানবৃক্ষের বীজ অঙ্কুরিত হ'তে পারে না। যেমন প্রিয় পত্নী রাণী ইন্দুমতীর মৃত্যুতে শোক-বিহ্বল অজরাজাকে বশিষ্ঠ কতো উপদেশ দিয়েছিলেন—কিন্তু সব বৃথা! সেই রকম ঈশ্বরানুরাগের পরিবর্তে যাদের চিত্ত বিষয়ানুরাগে বদ্ধ, কোন উপদেশেই তাদের জ্ঞানোৎপত্তি হবার আশা নেই।

কাজেই গুরুরই শুধু বিচার আছে—শিষ্যের যোগ্যতা অযোগ্যতার কোন বিচার নেই—এমন নয়। গুরুশিষ্য উভয়কে উভয়ের জেনে-বুঝে-বাজিয়ে বিচার করে নিতে হবে। "সদ্‌গুরুঃ স্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ" (সারসংগ্রহ)

প্রথমতঃ দীক্ষা দেওয়া এবং নেওয়ার পূর্ব্বে অন্ততঃ একটিবৎসর কাল উভয়ে একসঙ্গে থেকে পরস্পরের চরিত্র বুঝে তবে গুরুশিষ্য সম্বন্ধ স্থাপন করবে, এই হ'ল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। শিষ্যের 'প্রতিপত্তি,' 'লোকমর্য্যাদা,' 'টাকা,' 'সেবা' 'দান' 'রসগোল্লা' 'পাহাত টেপার আগ্রহ' এবং 'ফুলের মালা' দেখেই অং বং শং যাহোক একটা মন্ত্র দিয়ে শিষ্য করলেই চলবে না, শিষ্যের জন্য গুরুর গুরুদায়িত্ব।

"রাজ্ঞি চামাত্যজো দোষঃ, পত্নী পাপং স্বভর্ত্তরি
তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্"

অমাত্যের পাপ রাজাতে লাগে, স্ত্রীর পাপ স্বামীতে আর শিষ্যকৃত পাপের বোঝা গুরুকে বইতে হয়।

কাশ্মীরে ক্ষীরভবানীতে এক মুস্লীম ফকীরের সঙ্গ করেছিলাম—তিনি বলতেন—"নরহত্যা প্রবঞ্চনা মাতৃপিতৃহত্যা ইত্যাদি জগতে যত রকম পাপ আছে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ পাপ হ'ল ভণ্ডদের গুরু গিরি। খোদাতালা যাকে Liberating Power দেয়নি সে যদি গুরুসেজে বসে তাহলে তার চেয়ে আর মহাপাতকী নেই।" এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর মুর্শীদের একটি গল্প বলেছিলেন—"আটা পিষার চাক্কিতে কাজ করতে করতে একদিন একটা এঁড়েগরু বসে পড়লো। গরুটার মাথা-চালা রোগ ছিলো। গরুটাকে যোধসিং মারধোর করেও কাজে লাগাতে পারলো না। হঠাৎ পীর সাহেব চাক্কির কাছে উঠে গিয়ে গরুটাকে আদর করে বললেন 'মহন্তজী! আউর দোঘণ্টা তো কর্ম্ম খতম্ করলো।' সবিস্ময়ে দেখলাম গরুটা উঠে কাজ করতে লাগলো। এই ঘটনাটা দুপুরের। বিকেলে সৎসঙ্গের সময় দেখি যোধসিং উসমান আলিকে নিয়ে গরুটাকে ফেলতে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম 'গরুটা মরলো কখন'? যোধসিং বললো 'পীর সাহেব যাওয়ার ঠিক দু'ঘণ্টা পরে'। পীর সাহেবকে অনুরোধ করলাম দয়া করে বলতেই হবে, এর রহস্যটা কি? অনেক আকুতি মিনতির পর তিনি জানিয়েছিলেন, 'গরুটা পূর্ব্বজন্মে একটা ভণ্ডগুরু ছিলো, আর তার স্বার্থপূরণের জন্য যারা মিথ্যা প্রচার করতো সেই agent sub-agent এর দলই ওর মাথার পোকা হয়ে ছিলো; তাই গরুটা মাথা চালতো! জীবের ক্লেশকর্ম্ম পাপতাপ absorb করবার যার তাগদ্ নেই, শিষ্যকে আলোকের সন্ধান দিতে যে অক্ষম সে যদি ভণ্ডামি করে, গুরু সাজে, তার চেয়ে আর মহাপাপ নেই"।

আমিও পুরাণে একটা গল্প পড়েছি। এক ব্রাহ্মণ পূজার ফুল নিয়ে যাচ্ছিল, রাস্তায় একটা কুকুরকে শুয়ে থাকতে দেখে তাকে একটা ইট মেরে সরাবার চেষ্টা করে। কুকুরটা রাজার কাছে গিয়ে ব্রাহ্মণের অন্যায় প্রহারের জন্য অভিযোগ করলো। রাজা সব শুনে কুকুরটাকে বললেন—"তুমিই বলো ব্রাহ্মণকে কী সাজা দিলে তুমি খুশী হও?" কুকুর উত্তর দিলো, "মহারাজ! আপনি ঐ ব্রাহ্মণকে একটা মঠ বাড়ী করে দিয়ে প্রচুর সম্পদ দিয়ে মহন্ত বা গুরু করে দিন"। সভাসদ্‌সহ রাজা হেঁসে বললেন, 'এটা ব্রাহ্মণকে সাজা দেওয়া হ'ল—না—পুরস্কার"? কুকুর বললো, 'আমার ঐ প্রার্থণা পুরণ

করলেই আমি খুশী হবো মহারাজ! কেননা, গতজন্মে আমিও এক মহন্ত ছিলাম কি না! কোন সাধনসম্পদ ছিল না, তবুও ঈশ্বরদর্শী বলে ভান করে শিষ্য করে বেড়াতাম”!

গল্পটির Inner spiritটি নাও। এখনকার শিষ্যরা যেমন বিচার করে নিতে জানে না তেমনি গুরুরাও পরিণাম ফল ভেবে দেখে না। ধর্ম্মের নামে সত্যের নামে তাদের কোন আশঙ্কাও নেই। ভণ্ড গুরুর লক্ষ্য—শিষ্য সংখ্যা আর লোকমর্য্যাদা বাড়লেই হ'ল—কালী ভক্ত গুরুর কাছে গিয়ে পায় কালীমন্ত্র, রামভক্ত পাবে রামের বীজ, কৃষ্ণভক্ত ও বিফল হবে না। 'হরেকৃষ্ণ বলতে পারো না, আচ্ছা ফরেকৃষ্ট ফরেকৃষ্ট বললেও হবে'! যার শুধু ছাগলের প্রতি টান—তার ঐ গুরু উপদেশ দেবে— "সব রূপই তো তাঁর রূপ মা, ছাগলের ধ্যান আর 'আয় ছাগলি পাতা খা' জপলেই তোর হবে"! যে যোগমার্গ অবলম্বন করতে চায় গুরু তাকে শিখিয়ে দেবে ধৌতিবস্তি কপালভাতি, ভস্ত্রায়ী উজ্জায়ী আসন প্রাণায়ামের প্যাঁচ; না হয়, খেচরী মুদ্রার নাম দিয়ে জিহ্বাকে তালুতে উঠানোর কৌশল। ডনবৈঠক জিমনেসিয়ামের প্যাঁচের মত শিষ্য এক একটা কৌশল অভ্যাস করতে থাকে আর ভাবে—ব্রহ্মের কাছে যাওয়ার দূরত্বটা বোধ হয় তার ধীরে ধীরে কমছে!

যদি শিষ্য একটু বিশেষ উৎসাহী হয় অং বং শং মন্ত্র নিয়ে তার মন না ভেজে, অপ্রাকৃত গোলকে গিয়ে নিত্যপার্ষদ হওয়ার সখে এখন যদি তুলসীদল সহ সেবা পূজা নাম জপে মেতে থাকতে না চায়, সিদ্ধাইএর ফাঁদেও যদি ধরা না দেয়, যদি চায় সে কিছু অনুভূতি তখন এক সম্প্রদায়ের গুরু আছে তারা যোণিমুদ্রা সহযোগে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে জ্যোতিঃ দেখিয়ে দিয়ে বলে 'এই হ'ল ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ! দিব্যচক্ষুদান!! যাও, ন্যাস প্রাণায়াম মহামুদ্রা সহযোগে এই ক্রিয়াটি অভ্যাস করোগে, অচিরাৎ ব্রহ্মদর্শন হবে'। ব্যস্ এতেই শিষ্য তৃপ্ত, কিছু না দেখলে বুঝলেও পাঁচজনের সঙ্গে দীক্ষা নিতে বসে, কিছু দেখতে পায় না বলে কি করে? তাহলে যে গুরুও বলবে আর পাঁচজনও ভেবে বসবে 'লোকটার কর্ম্মজঞ্জাল, পাপের ভার বেশী'! তাই অগত্যা সেও সায় দেয়, তৃপ্তির হাসি হাসে!

ভণ্ড গুরুর আশ্রমটি—ভগবানকে পাইয়ে দেওয়ার পণ্যশালাটি, যেন একটি

দশকর্ম্মের ভাণ্ডার—এ দোকানে সব পাওয়া যায়! 'কেহ যাবে না ফিরে'! হাসপাতালে যেমন এক একটা Mixture এর জার থাকে, প্যাঁচ খুলে শিশি ভরে ভরে এই সর্ব্বরোগহর ঔষধটি যেমন সবাইকে দেওয়া হয়, তেমনি ওখানে আছে সমন্বয়ের Mixture !

গুরু কাকে বলে? গুরুর লক্ষণ কি? গুরু শিষ্যের কি করে দেন? দীক্ষা কি? দীক্ষাতে কি লাভ হয়? ভগবানের স্বরূপ আর তাঁর সাচ্চানাম বলতেই বা কি বোঝায়?—এই সমস্ত জ্ঞানের অভাব, ভণ্ড গুরুদের লোভ আর শিষ্যদের বিচারহীনতাই ধর্ম্ম বিপর্য্যয়ের আসল কারণ।

কবীর সাহেব তাই দুঃখ করে বলেছেন—

"কবীর গুরুলোভী, শিখ্‌লালচী, দোনো খেলে দাঁও
দোনো বুড়ে বাপুরে, চড়ি পথল কী নাও"।

গুরু এবং শিষ্য যেখানে উভয়ে লোভী, উভয়েই 'দাঁও' মারার তালে, সেখানে উভয়েই পাথরের নৌকায় চড়ে সাগর পার হ'তে চাইছে—অর্থাৎ উভয়েই ডুবে মরবে।

"জাকো গুরু হ্যায় আঁধারা চেলা কঁহা করায়
অন্ধে অন্ধ চেলিয়া দোউ কূপ পরায়"। (কবীর)

গুরুও কানা, শিষ্যও কানা, কানা কানাকে পথ দেখাচ্ছে—ফলে, উভয়ে খানায় (গর্ত্তে) পড়ছে!

চতুর্থ পুষ্প

প্রশ্ন :— ভণ্ড সাধুগুরুদের পাল্লায় পড়ে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন যে বিপর্য্যস্ত হ'চ্ছে তা বুঝলাম। বিচার করে গুরুবরণ করতে হবে—আপনার এ কথাও যুক্তিসঙ্গত। ধরুন, কেউ যদি সাচ্চা গুরুই লাভ করে থাকেন—তাহলে কি এই দেহেই, ইহলোকেই ঈশ্বর দর্শন সম্ভব ?

উত্তর :— নিশ্চয়ই ; সাচ্চাগুরুর কাছ থেকে ঈশ্বর দর্শনের সঠিক পথ, সেই True, Positive, Dynamic এবং Practical পথটি জেনে নিতে পারলে যে এই জীবনেই ঈশ্বর দর্শন সম্ভব—এ একেবারে ধ্রুব সত্য—There is no least shadow of doubt about it. ঐ রকম একই ধরণের প্রশ্নের উত্তরে আমার দাতাদয়াল একবার এক ইংরাজকে বলেছিলেন—"Yes, God can be realised in this very life before you leave this mortal frame—only if you learn, how to die before your final death. Remember the words of Christ, 'Except ye born anew ye cannot see the kingdom of God."

ঈশ্বরদর্শী সাচ্চাগুরু এই 'Dying while living' এর art টা শিখিয়ে দেন ; সত্যান্বেষী শিষ্যকে দেন 'New birth.'

মৃত্যুকালে দেখা যায়—জীবাত্মা যতই উপর দিকে 'খিঁচা' হতে থাকে দেহপিঞ্জর থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, চেতন ধারা ততই ঊর্দ্ধে accumulated হতে থাকে, পা থেকে দেহের ঊর্দ্ধাংশ ক্রমশই হতে থাকে হিমশীতল। অবশেষে প্রাণবায়ু নবদ্বারের যে কোন একটা দরজা দিয়ে যায় বেরিয়ে, কর্ম্মানুসারী অন্য দেহে বা যোনিতে উৎক্রমন ঘটে ; সংক্ষেপে একেই আমরা বলি দেহত্যাগ।

জীবের সুরত তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই নবদ্বারের উর্দ্ধে উঠতে পারে না; যদি ওঠে, তাহলে সেও একরকমের মৃত্যু, কারণ জীবাত্মা তখন দেহের গণ্ডী পেরিয়ে দেহাতীত ভূমিতে আলোকদেশে বিচরণ করে। সন্তসদ্‌গুরু (সাচ্চাগুরু বলতে এঁকেই বোঝায়) দীক্ষাকালে শিষ্যের সুরতকে নামের ধারা, সেই Sound-Current, যা সৎপুরুষের কাছ থেকে immanated হচ্ছে, তার সঙ্গে যুক্ত করে দেন। শিষ্য যদি ঐ Sound Current এর সঙ্গে সুরতকে absorb ('লবলীন') করে, ইচ্ছামত জীবাত্মাকে নবদ্বারের উর্দ্ধে 'দশমি গলি' বা দশম দুয়ারে নিয়ে যেতে পারে, তখন সে দেখতে পায়, হৃদয় আলো করে আলোক পুরুষ বিরাজিত। 'ঘরকো মাঁহি ঘর দেখায়ে দেয় সো সদ্‌গুরু পুরুষ সুজান' (নানক)—এই জন্যই, এই দেহঘরের মধ্যে সেই আনন্দধাম দর্শন করিয়ে দেন বলেই সন্তসদ্‌গুরুকে সাচ্চাগুরু বলা হয়েছে। "It is not any particular mystic who can unite us with the Lord; any perfect adept of Surat Shabda Yogo, who is living now, can do that"—Guru Sahib.

অথচ ঐ আনন্দধামের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে না, সর্ব্বব্যাপী আনন্দ-পুরুষকে নিজের মধ্যে দেখে তৃপ্ত হওয়া যেতে পারে না, যতক্ষণ না জীবাত্মা নামের ধারা ধরে নবম দরজার উপরে দশম গলিতে (tenth door) প্রবেশ করে। এও এক রকমের মৃত্যু, কিন্তু এ মৃত্যু-অন্য যোনি গ্রহণ করবাব জন্য জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগের মত দেহ-ত্যাগ নয়, **এ হ'ল জীবাত্মার এক উর্দ্ধায়িত গতি, আলোকরাজ্যে এক অভিনব সমুত্থান, দিব্যজাগরণ। নামের ধারা ধরে, জীবাত্মার এই দেহ হ'তে দেহাতীত আলোক ভূমিতে উত্তরণ আবার দেহেতে সজ্ঞানে অবতরণকেই সন্তরা 'Dying while Living' এর art বলেছেন।**

"যে তুঁ মরেঁ মরণ তুম্ পয়লা
এহে মরণা ফল পাওয়েগা" —(নানক)

"If before thy death dost thou die, this dying shall bear fruit" ... (ঐ)

"খেঁজ্ বল্ ইয়ত্ স্ঁা বায়া পেস্ অজ্ আজল্
দর্ নগর্ শাহিওয়া মুলকে বেখলল" ('মসনবী'—মৌলভী কম)

"Rise thou, O Soul, and come thou up before thy death ; and behold thou thy kingdom and thy Eternal Home"

—(মৌলভী রুম)

' বম্ বরায়ে দোস্ত্ পেশজ্ মরগ্ গরমী জিন্দেগী ওহোয়াহি " (ঐ)

"If life dost thou desire, then before thy death do thou die, O, friend ! .. .. (ঐ)

"সর্ মুতোয়া কবল্ মোত্ ইঁ বুয়দ্
কর্ পয়ে মুর্দ্দন গনি মত্ হা বশদ্"

" of dying before death, the Secret is this that after such a dying, divine blessings dost thou receive" ... (ঐ)

তাই এই Dying, while Living—'জিতাজিত্ মর্ণা' প্রকৃত পক্ষে হ'ল আলোকরাজ্যে নবজন্ম ; এই New birth না হলে, এই দেহে, ইহলোকেই দয়ালকে জানা বোঝা যায় না। দেখা যায না বিন্দুর মাঝেই সিন্ধুর নাচন—

"দরিয়ায়ে মহিত দারগুবুয়ে।
দাব সুরতে থাক্ ইসমায়ে"

অর্থাৎ একটি কলসীতে বিশাল সমুদ্র বন্ধ থাকার মত, এই মনুষ্যদেহে তিনি গুপ্ত আছেন। এই গুপ্ত পরমপুরুষকে দর্শন করতে হলে, এই 'Dying while Living' এর যোগকৌশল আয়ত্ত করতে হ'বে।

"নানক জীবতিঁয়া মর্ রহিয়ে, এ্যায়সা যোগ কামাইয়ে"
"মোতু আকবল্ অন্ তমুতবা" — (কোরাণ্-শরীফ্)

"Before thy death do thou die" ... ... (ঐ)

সন্তসদ্গুরু ইহলোকেই ঈশ্বর দর্শনের জন্য এই যোগশিক্ষা দেন। ইহলোকে এই দেহে যদি ঈশ্বর দর্শন সম্ভব না হ'ত, তাহলে সেই "আলোক-তীর্থ"এর সংবাদ আমরা পেতাম কি করে ? বেদান্তের ঋষি বলেছেন 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্'।

আজ পর্য্যন্ত যাঁরাই ঈশ্বর দর্শন করেছেন—তাঁরা ইহলোকে, এই মনুষ্যদেহে বিরাজ করতে করতেই ঈশ্বরদর্শন করেছেন। প্রাচীনকালের ঋষি মুনি থেকে আরম্ভ করে বর্ত্তমান কালের কবীর সাহেব, গুরুনানক, পল্টুসাহেব, দাদুদয়াল, রাধাস্বামী সাহেব প্রভৃতির জীবন তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। শুধু তাই নয়, তাঁরা তা

স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করে গেছেন। বুদ্ধদেব বলেছেন,—"খীনা জাতি, বুসিতং ব্রহ্মচরিয়ং ; কতং করণীয়ং, না পরং ইত্থত্তা যাতি—(মজ্ঝিমণিকায়), পুনর্জন্ম রহিত হয়েছে, ধর্ম্মজীবন অবসিত হয়েছে, করণীয় সম্পূর্ণ হয়েছে, আর কোন কিছু অবশিষ্ট নেই।"

সন্তদের বর্ণনা আরও প্রত্যক্ষ, আরও জীবন্ত ; ব্রহ্ম পরব্রহ্মভূমির উপরেরও অলখ, অগম, অনামীলোকের সত্যপুরুষ, অলখ, অগম, অনামী পুরুষকে তাঁরা ইহজীবনেই দর্শন-স্পর্শন-উপলব্ধি করে কী অপূর্ব্ব ভাষায় তা প্রকাশ করে গেছেন—

(১) "কোটিন্ ভানু উদয় জো হোই, এতে হী পুনি চন্দ্র লখোই
পুরুষ রোম সম এক ন হোই, এইসে পুরুষ দরবারা হোই'

(কবীর)

—সেই পুরুষের এমনই দিব্য জ্যোতি এবং শোভা যে কোটি কোটি সূর্য্য চন্দ্রের দীপ্তিও তাঁর একটি রোমের দীপ্তির সমান নয়।

(২) "সৎপুরুষ চৌথে পদ বাসা, সন্তন্ কা উ'হা সদা বিলাসা
সো ঘর দর্শায়া গুরুপুরে, বীন্ বজে জহাঁ অচরজ্ তুরে"

(রাধাস্বামীসাহেব)

—স্থূল সূক্ষ্ম কারণ জগতেরও অতীত চতুর্থ দিব্যভূমিতে সৎপুরুষ বিরাজমান ; সন্তরা সেখানে দিব্য আনন্দে বিভোর থাকেন। আমার পূরণধনী সন্তসদ্‌গুরু আমার এই স্বধাম দেখিয়ে দিয়েছেন, কী অপূর্ব্ব পরমাশ্চর্য্য দিব্য বীণাধ্বনি ঝঙ্কৃত হচ্ছে এখানে। *

সত্যলোকেরও উপরে অলখ, অগম, অনামী পুরুষকেও তাঁরা উপলব্ধি করে কী অনবদ্য ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন—

(৩) "আগে অলখ পুরুষ দরবারা। দেখা যায় সুরত সে সারা"। (রাধাস্বামীসাহেব)

—তারও আগে অলখ পুরুষ বিরাজমান। মুক্ত সুরত (আত্মা) দিয়ে তা দর্শন হয়। তারও উপরের ধামে অগম পুরুষ—

(৪) "তিস্‌পর অগম লোক এক ন্যারা
সন্ত-সুরত কোঈ করত বিহারা" (ঐ)

---

* এই পরমতত্ত্ব "আলোক-তীর্থ"এর দ্বিতীয়খণ্ডে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

তারও উপরের ধামে অনামী পুরুষ।—

(৫) "অকহ লোক হৈ ভাই, পুরুষ অনামী তঁহা রহাই
জো পহুঁচা জানেগা ওহি, কহন্ শুনন্ সে ন্যারা হৈ"
(কবীর)

এইভাবে স্তরের পর স্তর, ধামের পর ধাম অতিক্রম করে সন্তরা সর্ব্বোচ্চধামের দয়াল পুরুষকে ইহজীবনেই অনুভব করে, যাতে অপরেও সেই অমৃত-তত্ত্ব জানতে পারে, এই জন্য প্রকাশ করে গেছেন।

ঐ সব সর্ব্বোচ্চ ধামের মালিক সন্তদের অনুভূতির কথা বাদ দিলেও বেদান্তের ঋষিরাও — যাঁরা ব্রহ্ম পরব্রহ্মতত্বের উপলব্ধি করেছিলেন—তাঁরাও তা ইহজীবনেই উপলব্ধি করেছিলেন বলেই স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে গেছেন — "উঠ, জাগ, প্রবুদ্ধ হয়ে সদ্‌গুরু সকাশে বোধি সঞ্চয় কর, তাঁকে জেনে নাও ; **যদি শরীর পাতের পুর্ব্বেই তাঁকে জেনে নিতে পার তবেই,—**

"প্রতিবোধবিদিতং মতম্ অমৃতত্বং হি বিন্দতে" (কেন-উপনিষদ ২।৪)

—প্রতিবোধবেদ্য সেই "তেজোময় অমৃতময় পুরুষ"কে জেনে অমৃতত্ত্বের অধিকারী হবে।

'জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্ব পাশাপহানিঃ' (শেতাশ্বতর, উপনিষদ্ ১।১১)
'জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্ব পাশৈঃ (ঐ ১।৮)

—এই দেহেই তাঁকে জেনেছিলেন বলেই তাঁকে জানলে যে সর্ব্ব বন্ধন হতে মুক্তি ঘটে—এই উপলব্ধ সত্য প্রকাশ করে গেছেন ?

"জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুম্ অত্যেতি, নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে" (কৈবল্য উপনিষদ্ ৯)

—তাঁকে জানলে তবে মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, বিমুক্তির দ্বিতীয় পন্থা নেই।

"তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" (শুক্লযজুর্ব্বেদ ৩১।১৮)

—তাঁকে জানলে তবে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, বিমুক্তি লাভে অন্য উপায় নেই, অন্য উপায় নেই।

"য এতদ্ বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি" (কঠোপনিষদ ২।৬)

—যাঁরা তাঁকে জানেন, তাঁরা অমৃত হ'ন।

ঐ সব শ্রুতিবাক্য থেকে আশা করি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো ঋষিরা

ইহলোকেই সত্য-উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তাঁদের উপলব্ধ সত্যকে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করে গেছেন ?

মানুষ 'ঝুটা' গুরুর পাল্লায় পড়ে পড়ে ভাবতে শিখেছে —'কোন এক জন্মে হবে'। কিছু অনুভূতি লাভ না হলে ভাবলো— 'আমার আধার-অধিকার ঠিক নেই, মৃত্যুর পর গুরু মুক্ত করে দেবেন'। এই জীবনে থাকতে থাকতেই যদি অমৃতের আস্বাদন না পেলে, আনন্দময় হ'তে না পারলে তা হলে মৃত্যুর পরে যে হবে তার guarantee কি ? আশ্চর্য্য, এমনিতে মানুষের মধ্যে বেশ চাতুরী দেখা যায়, পাটোয়ারী বুদ্ধিরও অভাব নেই, সামান্য দু'পয়সার একটা হাঁড়ি কিনতে গেলে তা বাজিয়ে নেয়, বাজারের দুর্গন্ধ মাছও টিপে টিপে বেছে নেয়, সব কিছুই চায় প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করতে, কিন্তু মনুষ্য জীবনের যা পরম ঈপ্সিত, সেই পরম বস্তুলাভের বেলা তাদের এক Peculiar ঔদাস্য আর মূঢ়তা দেখা যায়। আচ্ছা তোমাকে যদি Govt. বলে, এখন আমৃত্যু তুমি চাকরী করে যাও, মৃত্যুর পর তোমার প্রাপ্য বেতন with interest তোমার স্ত্রীপুত্রের হাতে দেওয়া যাবে তাতে কি তুমি রাজী হও ? নিশ্চয়ই রাজী হবে না, কিন্তু এই দেহে আনন্দবস্তু লাভ করে অমৃতত্ব অর্জ্জনের বেলাই যা তোমার প্রতীক্ষা—অপেক্ষা এবং উপেক্ষা দেখা যায় !

এ কথা তুমি ধ্রুব সত্য বলে জেনে রাখো ভাই, সাচ্চাগুরু এই জীবনেই অমৃতের আস্বাদন দিয়ে শিষ্যকে কৃতকৃত্য করতে সমর্থ। এবং এই জীবনে তা অর্জ্জন না করলে মৃত্যুব পর আশা নেই, আশা নেই। অনেকে আবার ভাবে, অতিমানব, মহামানব, মহাপুরুষদের পক্ষে ইহজীবনে ঈশ্বর দর্শন সম্ভব হয়েছে বলে কি আমারও হবে ? তোমার হবে না—এটা তুমি নির্ভুলভাবে জেনে নিয়েছ কোন্ যুক্তিতে ? তোমারও হতে পারে —এটা বিশ্বাস করতে কি কোন নিষেধ আছে ? অধিকাংশ ঈশ্বরদর্শী পুরুষের জীবনেই দেখা যায় তাঁরা সাধারণভাবে জন্মেছিলেন, সদ্‌গুরুকৃপায় তাঁদের জীবনে সেই পরম লগ্নটি আসার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁরাও তোমারি মত সাধারণ ছিলেন।

দুর্লভ মনুষ্য জন্ম, ঈশ্বর অমৃতময়, আনন্দময়, তাঁকে জানলে তবে অমৃত লাভ হয়, সদ্‌গুরু কৃপায় তাঁকে জানা যায়—এই জ্ঞানের যখন সঞ্চার হয়েছে তখন হবে না কে বললে ? প্রয়োজন আকুলতা, প্রয়োজন সাচ্চা গুরুলাভ। অকপট

ভালবাসায়, আকুলটানে সাচ্চাগুরু আসেন। তাঁর কৃপায় যদি ইহজীবনেই অমৃতলাভ না কর, তাহলে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চিত কর্ম্মের ভারে—ক্রিয়মান কর্ম্ম প্রারব্ধ হয়ে পুনরায় অন্য দেহ গ্রহণ করাবে। এই জীবনে তাঁকে জানলে তবে কর্ম্মক্ষয় হয়—'ক্ষীয়ন্তে সর্ব্বকর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে'। কর্ম্মক্ষয় হ'লে, অমৃতময় পুরুষকে পেয়ে পূর্ণত্ব অর্জ্জন করলে আর জন্মাতে হয় না, আর দগ্ধ হতে হয় না ত্রিতাপজ্বালায়। তাই ঋষিরা বলেছেন—

"ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং, ন চেদ্ অবেদীম হতীবিনষ্টিঃ
যে তদ্বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি, অথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি"।

(বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৪)

অর্থাৎ "ইহলোকেই থেকেই পরমাত্মাকে জানতে পারা যায়। যাঁরা জানতে পারেন তাঁরাই অমৃত হ'ন। যদি তা না হয় তাহলে মহতী বিনষ্টি। মৃত্যু এবং পুনর্জ্জন্মের ভিতর দিয়ে দুঃখ ভোগ হয়"।

"ইহ চেদ্ অবেদীদ্ অথ সত্যমস্তি
ন চেদ্ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ"। (কেনোপনিষদ্ ২।১৩)

—ইহলোকেই যদি সেই সত্যলাভ হয় তবেই মুক্তি—নতুবা মহতী বিনষ্টি অর্থাৎ পুনরায় মৃত্যুময় সংসারে গতায়াত"।

কঠোপনিষদেরও ঐ কথা—

"ইহ চেদ্ অশকোৎ বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু, শরীরত্বায় কল্পতে। (কঠ ৬।৪)

—'শরীর ভ্রংশের পূর্ব্বে যদি তাঁকে জানা না যায় তাহলে ভিন্ন ভিন্ন লোকে শরীর গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী'।

কাজেই বেদান্তবাক্য বিচার করে দেখ, ইহজীবনেই যদি দয়ালকে না জেনে যাও তাহলে মৃত্যুর পর তা আশা করা বৃথা। মৃত্যুর পর নতুবা কয়েক জন্ম পরে হবে বলে ঝুটা গুরুরা যে False Promise দেয়, তা প্রবঞ্চনা মাত্র! ভক্ত নাম দেবজী তাই বলছেন—

"মুয়েহুয়ে যব মুকত দেওগে
মুকত ন জানে কোয় লা।"

'মৃত্যুর পর যদি মুক্তি দাও তাহলে হে ঈশ্বর! মুক্তি কি বস্তু তা কেউ জানবে না।'

কবীর সাহেবেরও স্পষ্ট ঘোষণা শোন—

"সাধো ভাই! জীবত হী করো আশা

জীবত সমঝে, জীবত বুঝে, জীবত মুক্তি-নিবাসা।

... ...

অবহুঁ মিলা সো তবহুঁ মিলেগা,

নহি তো যমপুর বাসা।"

প্রশ্নঃ—সাচ্চাগুরুর লক্ষণ, দীক্ষালাভ, ইহজীবনেই ঈশ্বর দর্শনাদি বিষয়ে আপনি পূর্ব্বে যেমন বলেছেন—বেদান্তের সাহায্যে তা প্রমাণ করেছেন বলে তা স্বীকার করে নিচ্ছি। বিশ্ববন্দ্য কবীর নানক প্রভৃতি সন্তদের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই বল্‌ছি—'সেই দিব্য Sound-Currentএর সঙ্গে সুরতের যুক্ত হওয়াই সাচ্চানাম প্রাপ্তি—বর্ণাত্মক নাম জপে কিছু হবে না' বলে যে বলেছেন, সেটা স্বীকার করতে মন চাচ্ছে না। তাহলে আমরা যে বিভিন্ন দেবদেবীর মন্ত্র জপ করি, ওঁ জপ করি, হাজার হাজার সাধুরা তাঁদের লক্ষ লক্ষ ভক্তকে যে মন্ত্র দেন—ওতে কিছু হবে না—এ আপনার কেমন কথা? সন্তদের বাণী বচন বাদ দিয়ে আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত কি তা কি কিছু বলতে পারেন?

উত্তরঃ—আমি শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেই পূর্ব্বে বলেছি অং বং শং বা রাম রাম এগুলো কোন দিনই মন্ত্র নয়। ঋষিরা মন্ত্র বলতে বুঝতেন—

"মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসার বন্ধনাৎ

যতঃ করোতি সংসিদ্ধৈ মন্ত্রঃ ইত্যুচ্যতে ততঃ।" (ছন্দোমঞ্জরি)

যার দ্বারা বিশ্বের সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয় আর সংসার বন্ধন হতে মুক্ত হওয়া যায় তাকেই বলা হয় মন্ত্র। মন্ত্র বলতে কানে ফুঁ দিয়ে কোন বর্ণাত্মক কথা যা লেখা বা পড়ার সময় ব্যবহার করা হয়, যা বৈখরিতে অর্থাৎ জিহ্বাতে জিহ্বাতে উচ্চারণ করা যায়, তা কখনই মন্ত্র নয়। শাস্ত্রে নামের বা মন্ত্রের মহিমা আছে, নাম আছে সদ্‌গুরুর হাতে। এই নাম বা মন্ত্র দান কোন সোহং সোহং জপ কিংবা জিহ্বাতে, মনে মনে বারবার Repetition এর জন্য রাং রামায় নমঃ, হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কিংবা 'ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা' নয়।

যেমন ধর, যে জিনিষ পিপাসা দূর করে তার নাম জল। এখন পিপাসা দূর করে—এই গ্লাসে যে স্বচ্ছ Liquid টা আছে এই বস্তুটা—না—'জ''ল' তার

সঙ্গে 'অ'—এই সব ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণের সংযোগে যে 'জল' কথাটা হয়েছে এই 'জ-ল' কথাটা ? বস্তুটাই আসল, বর্ণগুলো নয়। ঐ Liquid পদার্থের গুণই পারে তোমার পিপাসা দূর করতে। কেউ বা ওকে 'জল' বলে, কেউ 'পানি' কেউ 'water'— যে যাই বলুক, যে কোন নিজেদের ভাষা দিক না কেন—ঐ বর্ণাত্মক words গুলোর বারবার Repetitionএ তোমার পিপাসা যাবে না !

অনেকে বলেন—গুরু নাকি ঐ সব বর্ণাত্মক নামে শক্তি সঞ্চার করে দেন !! ঐ ধরণের কোন গুরু নিজে কিংবা অপরে শক্তিপূত করে 'জল' wordটা পিপাসার সময় জপ করতে থাকুক দেখি—দেখতো পরীক্ষা করে পিপাসা নিবৃত্তি হয় নাকি ?

"ফলং কতকবৃক্ষস্য যদ্যপ্যম্বুপ্রসাদকম্। ন নাম গ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি—যেমন নির্ম্মলী গাছের ফল পেষণ করে জলে দিলে তবে তা পরিষ্কার হয়, জলে না দিয়ে শুধু ঐ ফলের নাম বারবার উচ্চারণ করলে কি জল পরিষ্কার হবে" ?

আরও বুঝে দেখ, যে জিনিষ অন্ধকার দূর করে তার নাম কেউ দিয়েছে আলো, কেউ বিজলি—কেউ বা Electricity। এখন একটা অন্ধকার-ময় ঘরে বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোক একত্রিত হয়ে যদি যে যার ভাষা অনুযায়ী কেউ আলো আলো, বিজলী বিজলী, কেউ Electricity Electricity আবার কেউ যদি ভক্তি ভরে "ওঁ নমো চৈতন্যাত্মকায় আলোকায় নমো নমঃ" বলে তারস্বরে চীৎকার করে করে কিংবা মনে মনে জপ করতে থাকে তাতে অন্ধকার দূর হবে কি ? অন্ধকার দূর করবে Electric Current, জল বলে যেমন ঐ তরল পদার্থটাকে mean করা হয়েছে, তেমনি আলো, বিজলী, electricity প্রভৃতি বর্ণাত্মক কথাগুলো দ্বারা ঐ তিমিরাপহারী আলোক ধারাকেই mean করা হয়েছে। ঐ বস্তুটাকে পাওয়া, electric connection পাওয়াটাই যেমন আসল কথা, সার-কথা, ঐ বুলিগুলো শেখা বা বলা নয়, তেমনি নাম বা মন্ত্র বলতে বলা হয় সেই চৈতন্যধারাকে যা পেলে জ্বলিতকণ্ঠ জীবের অমৃত পিপাসা মিটে, দূর হয় তার অজ্ঞানতার ঘনতমিস্র অন্ধকার। তোমরা তো কেবল form বা ছোবড়াটা নিয়ে পড়ে আছ, এইটেকেই মুখ্য বলে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, essence বা spirit টা গিয়েছ ভুলে। যেমন, অসীম কৃষ্ণ ভক্ত আর প্রাণকৃষ্ণ রামভক্ত।

অসীম গুরুর কাছে কৃষ্ণ মন্ত্র নিয়ে জপ করছে জীবন ভোর—ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা আর প্রাণকৃষ্ণ তার গুরুর কাছে রামমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে জপে মরছে—'ওঁ রামায় নমঃ'। ঐ মন্ত্রগুলির যে কী অর্থ তাও বোঝ না। সন্তদের কথা বাদ দিলেও, পুঁটিরাম তো তান্ত্রিকমতে দীক্ষা নিয়েছো—তোমাদের 'মহানির্ব্বানতন্ত্র' কী বলছে শোন—

'মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ
শত লক্ষ প্রজপ্তোঽপি তস্য মন্ত্রো ন সিধ্যতি'!

এখন রাম বা কৃষ্ণ বলতে ঋষি কী বুঝতেন, কেনই বা কৃষ্ণের বীজ ক্লীং আর রামের বীজ রাং, কেনই বা কৃষ্ণের অত নাম থাকতে ঐ মন্ত্রে 'গোবিন্দ' আর 'গোপীজনবল্লভ' এই দুটি কথা আছে, কেনই বা মন্ত্রটির প্রথমে 'ওঁ' পুটিত করা হয়েছে — সাধারণে তার কিছুই বোঝেনা — অনন্নুভবী গুরুর ফাঁদে পড়ে শুধুই জপে যায়।

বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন বীজ মন্ত্রের কি অর্থ, কোন দেবতা কোন region এর Presiding diety, তার মধ্যে কেউ আমাদের যথার্থ ই উপাস্য কিনা, কুলমালিক কে, কার কাছে গেলে আমাদের সাচ্চা মুক্তি লাভ হবে, প্রলয় মহাপ্রলয়ের পরেও এই cycle of birth and deathএ আসতে হবে না—সে সম্বন্ধে 'নাম' অধ্যায়ে যা বলেছি, তার সঙ্গে নিজেও বিচার করে দেখলে বুঝতে পারবে বর্ণাত্মক জপে কোন আধ্যাত্মিক উন্নতি হ'তে পারে না।

রাম বা কৃষ্ণ বলতে একই পরব্রহ্মকে বোঝায়। তিনি আকর্ষণ করেন, যো আকর্ষয়তি স কৃষ্ণঃ, এই attribute অনুযায়ী ঋষি পরব্রহ্মকে mean করছেন 'কৃষ্ণ' বলে ; অন্তিমকালে যোগীরা রমন করে (যুক্ত হয়) তাঁর সঙ্গে তাই এই সত্ত্বাকে তাঁর এই Special attribute অনুযায়ী বলা হয়েছে রাম ; 'রমন্তে যোগিনো অন্তে ব্রহ্মানন্দ-চিদাত্মনি, ইতি রাম পদেনাসৌ পরব্রহ্মাঽভিধীয়তে'। 'র'য়ে আকার 'ম' — 'রাম' পদটা দিয়ে তাহলে পরব্রহ্মকেই mean করা হয়েছে। **তুমি যদি এখন পরব্রহ্মের সেই আকর্ষণীধারার** সঙ্গে যুক্ত হও, তাহলে তোমার কৃষ্ণ মন্ত্র পাওয়া হ'ল ; যে উপায়ে বা যে ধারা ধরে পরব্রহ্ম-regionএ উঠে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে পারবে—'রাম' কথাটার দ্বারা সেই ধারাটাকে বা উপায়কেই mean করা হয়েছে—সেইটেই প্রকৃত রামমন্ত্র। কাজেই

কোন ছন্দোবদ্ধ সংস্কৃত শ্লোকের কথাটা মন্ত্র নয়। আগে কুলগুরু এসে হ্রীং ক্রীং বা রাম কৃষ্ণ যাই হোক একটা মন্ত্র দিয়ে বৎসরান্তে বার্ষিকী নিয়েই তৃপ্ত থাকতো।

'তোমার কানে মন্ত্র দিনু বাছা, বৎসরান্তে দিও মোরে অষ্টগণ্ডা পয়সা আর তিন হাত কাছা'। বর্ত্তমানে তার Modern সংস্করণ সাধু যোগী বেশধারী সন্ন্যাসী গুরুরা তাদের চেয়েও ভীষণ। এরা আর বৎসরান্তের অষ্টগণ্ডা পয়সা আর তিন হাত কাছায় তুষ্ট নয়, কয়েকটা ন্যাস প্রাণায়ামের প্যাঁচ শিখিয়ে নানারকম বুজরুকী দেখিয়ে, তোমার জন্য বৈকুণ্ঠে মৃত্যুর পর নিত্য পার্ষদ হওয়ার সব ব্যবস্থা করে রেখেছে — এই রকম আশ্বাস দিয়ে, অন্ধ বিশ্বাসের যূপকাষ্ঠে বেঁধে রাখে আর ছলে বলে কৌশলে শোষণ করে যায়— 'মন্ত্র দিলাম কানে, যা আছে তোমার সব দিয়ে যাও, যাবৎ জীবিতং প্রাণে'— তোমরাও এই ধোকাবাজীতে ভুলে আছ!

সন্তদের বাণী বচন স্বীকার করতে যদি নাও চাও—তবুও তো 'মন্ত্র' কথাটা analysis করলেও তো অনেক ধাঁধা কাটতে পারে। 'মননাৎ ত্রায়তে, যস্মাৎ —তৎ মন্ত্রঃ'। কৈ শাস্ত্র তো এখানে বলছে না—'জপনাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ··· '? তোমরা তো জপ কর, মনন কর কি?

মন্ত্র বলতে আরও বোঝায়— **বিচার-যুক্তি-উপায়**। নানা বিষয়ে মন্ত্রণা দেয় অর্থাৎ বিচার-যুক্তি-উপায় বলে দেয় বলেই 'মন্ত্রী' কথাটা এসেছে। রামায়ণ মহাভারতে পড়েছ তো— 'অর্জ্জুন মন্ত্রপূত করে পাশুপত অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন'। 'কর্ণ মন্ত্রপূত করে একঘ্নি বান ত্যাগ করলেন'। সাধারণকে যেমন গতানুগতিক ভাবে শেখান হয়েছে তেমনি সবাই নিজেদের বুদ্ধি মাফিক ঐ 'মন্ত্র' বলতেই বুঝে রেখেছে, নিশ্চয়ই খুব শক্তিশালী কোন 'কালী কপালী কাকতালী' 'দুং ক্রং ভুং' গোচের কোন একটা মন্ত্র !!!

এই সংস্কার তোমাদের মধ্যে চলে আসছে বলেই তোমরা বড় গলায় বল 'মন্ত্রের ভয়ানক শক্তি'! 'ঋষিরা মন্ত্র-বলে সব করতেন!' আর এই জন্যই সর্ব্বকার্য্যসাধিকা বর্ণাত্মক কোন একটা সিদ্ধ মন্ত্র লাভের জন্য সাধু সন্ন্যাসীর পেছনে ছুটে বেড়াও। তারাও তোমাদেরকে ক্রীং ক্রং Type একটা কিছু দিয়ে বুঝিয়ে দেয় সিদ্ধ মন্ত্রে দীক্ষা পেলে!' সরলমতি ভাই সব! ভাল করে

বুঝে রাখো, নিজেদের যে discriminating faculty আছে, তাই দিয়ে বুঝবার চেষ্টা কর, মন্ত্র মানে কোন ছুং ভং নয়। মন্ত্রপূত করে অস্ত্র ছাড়লেন মানে কি উপায়ে কি কৌশলে, কতখানা angle করে, কি পরিমাণ Speedএ ছাড়লে অব্যর্থ-লক্ষ্য-সন্ধান হবে, তাই। যেমন আজকাল Scientific Procedure অনুযায়ী কামান-বন্দুক-রকেট ছোঁড়া হচ্ছে। **এই কৌশল-বিচার-উপায়-যুক্তিই** হ'ল মন্ত্র; আর এই বিজ্ঞান বলেই অসম্ভবকে সম্ভব করতেন—যেমন আজকাল বৈজ্ঞানিকরা সাধারণের জ্ঞান বুদ্ধির অতীত উপায়ে অসাধ্য সাধন করছেন। যে কৌশলে, সামান্য পরমাণুর মধ্যে যে অনন্ত লোকক্ষয়ী ক্ষমতা আছে তা সংহত করে, সূর্য্যের বিশ্বধ্বংশী Cosmic ray—কে আকর্ষণ করে —সূর্য্য মণ্ডলে আলোড়ন তুলে Hydrogen Bomb আদি বৈজ্ঞানিক অস্ত্র নিক্ষেপ বা নির্ম্মাণ করা হয়, সেই Scientific Process যুক্তি বা বিচারই হ'ল ঐ সব বৈজ্ঞানিক অস্ত্রের মন্ত্র। তেমনি পাশুপত বা ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতির নির্ম্মাণ এবং নিক্ষেপ কৌশলকেই বলা হ'ত সেই সেই অস্ত্রের মন্ত্র। তোমাদের বা তোমাদের so colled গুরু সাধু পরমহংসনামা বকজ্ঞানীদের ধারণানুযায়ী, হ্রাং, ক্লী ছুং ভং ঢ়িং ঢ্যাং ধরণের কিম্ভুত কিমাকার অর্থহীন বচনবিন্যাস নয়।

ধরো, যেমন তুমি রাম মন্ত্রে দীক্ষা নিতে চাও, এখন যে উপায়, যে বিচার ধারা বা কৌশল অবলম্বন করে তুমি পরব্রহ্ম—Regionএ যেতে পারো, সেইটে লাভ করাই হ'ল রামমন্ত্র লাভ — রাং রামায় নমঃ — জপ করা নয়। সেই সঙ্গে সেই পরব্রহ্মের Incarnation বা পরব্রহ্মবিদ্ বলে যাঁকে বলা হয় সেই রামচন্দ্রের লোকপাবন চরিত্র এবং গুণেরও অনুশীলন তোমাকে করতে হবে; অর্থাৎ হতে হবে রামের মতই সত্যনিষ্ঠ, পিতৃভক্ত, সকলকে বুকে জড়িয়ে ধরার মতো সেই বিশ্বপ্রেম সর্ব্বজীবে সেই মৈত্রী ভাবনা, লোক হিতার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগের সেই দৃঢ়তাও তোমার থাকা চাই। ঐ সব গুণের অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে যদি কোন সদ্‌গুরুর সাহায্যে পরব্রহ্ম ধামের অনুভূতি পাওয়ার কোন উপায় বা যুক্তি পাও — তবেই তুমি নিজেকে 'রামভক্ত, রামমন্ত্রে দীক্ষিত' বলে বলতে পারো। নতুবা তুমি মাবাবাকে খেতে দিবে না, নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু বুঝবে না, অন্তরে থাকবে সব কলুষতা — আর কি না তুমি 'রাং রামায় নমঃ' জপে ভাবছো তরে যাবে? কেন না তুমি 'তারকব্রহ্মনাম' জপছো!!

লক্ষ্মীকে বলা হয়েছে ধনৈশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাই তোমরা বাড়ীতে কয়েকটা মাটির ভাঁড়-পুতুল রেখে সিন্দুর চর্চ্চিত করে ধানদুর্ব্বা পুষ্পদলে প্রতি বৃহস্পতিবার (লক্ষ্মীবার!) বামুন দিয়ে পূজা করাচ্ছো! অগ্রহায়ণ-পৌষের বৃহস্পতিবারে বাড়ীতে পিটুলি দিয়ে মালক্ষ্মী পদচিহ্ন এঁকে দিলে মা এসে তোমার গৃহখানি ধনধান্তে ভরে দিয়ে যাবেন! বামুন এসে পূজা করছেন—তাঁর ধ্যান আর পূজার মন্ত্রে লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠ থেকে ছুটে আসবেন, তোমার দারিদ্র্য ঘোচাতে! অথচ যাঁর পূজায় তুষ্ট হয়ে মাঠাকরুণ তোমাকে ধনী করবেন সেই পুরুতঠাকুর কিন্তু এসেছেন—তোমারই বাড়ী হ'তে দুই মুষ্ঠি চাল নিয়ে গিয়ে অন্নের সংস্থান করতে! তোমরা ধনদা কবচ ধারণ করছো আর জপ করছো 'শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমোনমঃ!' যারা এরকম করে তাদের দুঃখ ঘোচে কি? লক্ষ্মীর ঝাঁপি কি ভরে যায় মনি-মুক্তায়? লক্ষ্মীঠাকরুণের এধরণের ভক্তদের কোনদিনই নিরন্ন অবস্থা হাহাকার ঘোচে না। আর যারা ঐ সমস্ত কিছু না করে, যে **উপায়ে** লক্ষ্মীলাভ অর্থাৎ ধনাগম হতে পারে সেই ব্যবসা বানিজ্য কৃষি কাজ—ইত্যাদির কৌশল—বিচার বুঝে ধন অর্জনে মন দেয়, লক্ষ্মীবারে লক্ষ্মী পুজার নামে মাটির ডেলা পূজা না করেও, ধনদা কবচ না পরেও, লক্ষ্মী বীজ শ্রীং মন্ত্র না জপেও ধনী হতে পারে, গুণরাশিনাশী দারিদ্র্যের দুঃসহ যন্ত্রণা হতে পায় রক্ষা। এখন বিচার করে বল ভাই—"শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ" এইটি ধনাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীঠাকরুণের মন্ত্র—না—যে কৌশলে ধনবৃদ্ধি হয় সেই বিচার-যুক্তি বা উপায়টি?

তারপর এসো সরস্বতী পূজায়। একজন সরস্বতীকবচ মন্ত্রপূত করে হাতে ধারণ করে নিত্য সরস্বতীর পূজা করুক কলকোলাহলে, শ্বাসে শ্বাসে জপ করে চলুক সরস্বতীর 'ঐং' মন্ত্র—এতে কি সে বিদ্বান হবে? না—যে উপায়ে বা কৌশলে বিদ্যালাভ হয় তাই অবলম্বন করে স্কুল কলেজে পড়ে বিদ্বান হবে? আমার মতে ত বিদ্যার্জ্জনের সমগ্র কৌশল বা উপায়টিই হ'ল সরস্বতীর মন্ত্র। আমার ক্ষুদ্রজ্ঞানে মনে হয় আমি শাস্ত্রের বাইরে কিছু বলছি না। যাস্কাচার্য্য তাঁর 'নিরুক্তে' কি বলে গেছেন শোন—

> "মন জ্ঞানে + ষ্ট্রণ্ (উনাদি সূত্রেণ) মন্যন্তে জ্ঞায়ন্তে সর্ব্বৈঃ মনুষ্যৈঃ সত্যাঃ পদার্থাঃ যেন যস্মিন বা স মন্ত্রঃ। (নিরুক্ত)

—যে **উপায়** দ্বারা বা **যাতে** মানুষ সত্য বস্তু জ্ঞাত হতে পারে, তাহাই মন্ত্র"॥

প্রশ্নঃ— আপনি বলছেন বর্ণাত্মিক কোন নাম বা মন্ত্র জপে কিছু হবে না। শাস্ত্র বেদ উপনিষদ যাস্কাচার্য্যের নিরুক্ত আদি থেকে যে সব প্রমাণ প্রয়োগ দিচ্ছেন তাতে 'রাম রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ' জপে কিছু হবে না বলেই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু পুরাণ পুঁথিতে যে সব আছে, রামকৃষ্ণ চৈতন্যদেব প্রভৃতি যে মন্ত্র নাম জপের কথা বলে গেছেন—তাকে একেবারে উড়িয়ে দিই কি করে? দেখুন, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে শ্রীকৃষ্ণোত্তরশতনাম স্তোত্রে আছে—"পবিত্র সহস্র নাম সকল তিনবার আবৃত্তি করলে যে ফল হয়, শ্রীকৃষ্ণের কোন এক নাম একবার আবৃত্তি করলে সেই ফললাভ করা হয়"। প্রভাস পুরাণে শ্রীনারদ কুশধ্বজ সংবাদে ভগবদুক্তি—"নাম্নাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ!"—হে পরন্তপ! নাম সকলের মধ্যে আমার 'কৃষ্ণ' এই নাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম। কাজেই অন্য নামে হোক না হোক কৃষ্ণ নাম জপে ফল আছেই। কেন না, মহাপ্রভু এবং অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজনদের মতে কৃষ্ণ "নরাকৃতিপরব্রহ্ম" ছিলেন॥

উত্তরঃ-- ঐ সমস্ত পুরাণ কথা সাম্প্রদায়িক প্রচার মাত্র! তুমি শিবভক্তের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর তারা শিবপুরাণ, রুদ্রহৃদয় উপনিষদ্, অন্যান্য বহু শৈবশাস্ত্র থেকে অবিকল ঠিক ঐ ধরণের মন্ত্র quote করে, দরকার হলে ছাপার অক্ষরে বইএ দেখিয়ে তোমার কাছে প্রমাণ করে দেবে 'শিব'ই একমাত্র তারকমন্ত্র। একটিবার মাত্র 'শিব' উচ্চারণ—ত্রিলোকে যত মন্ত্র আছে—তাদের সকলের চেয়ে বেশী সিদ্ধিপ্রদ! একজন শাক্তকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর, সেও তার দেবী ভাগবত, দেবীপুরাণ, অন্নপূর্ণোপনিষদ্ আর বহু বহু তন্ত্র থেকে, ছাপার অক্ষরে লিখা, সংস্কৃত-শ্লোকবদ্ধ quotation দিয়ে প্রমাণ করবে, কালী তারা দুর্গা ইত্যাদি শক্তিমন্ত্র না জপলে ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার আর কোন উপায়ই নেই; কালী কৈবল্য দায়িনী ত্রিলোক তারিণী তারা। শিব ব্রহ্মা বিষ্ণু কৃষ্ণ ইত্যাদি দেবীর কাছে করজোড়ে স্তব করছে—বিশেষতঃ কলিকালে শক্তিমন্ত্র ছাড়া আর কোন মন্ত্রই জাগ্রত বা জীবন্ত নেই!! এইবার রামভক্তের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর, সে বাল্মীকি রামায়ণ থেকে রামের অবতারত্ব, পূর্ণভগবত্তা প্রমাণ করতে না পারলে, মূল বাল্মীকি রামায়ণ পড়া না থাকলে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব রামভক্তরা ভক্তির আতিশয্যে যে সমস্ত সুলভ রামায়ণ, অধ্যাত্মরামায়ণ, আনন্দ রামায়ণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, রামরসায়ণ, শ্রীরামগীত গোবিন্দ, পদ্মপুরাণ, শ্রীরাম পূর্ব্বতাপনী-উপনিষদ্—

ইত্যাদি স্ব সম্প্রদায়ের স্বার্থানুকুলে রচনা করে গেছেন, তার থেকেই with equal force and authoritative weight দিয়ে প্রমাণ ক'রে দেবে রামনামের তুলনায় অন্য নাম যেন চন্দ্রের তুলনায় খদ্যোৎ মাত্র! রামনামই একমাত্র তারকব্রহ্ম নাম—'সংসার সাগরতরীকৃত নাম ধেয়ং'—রামের নাম সংসার সাগরের তরণীস্বরূপ। তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' থেকে শুনিয়ে দেবে—'রামনাম মণিদীপ ধর, জীহ্ দেহরী দ্বার, তুলসী ভিতর বাহির হু জো চাহত উজিয়ার'। সর্ব্বশেষে সহজলভ্য কৃত্তিবাসের পয়ারটি শুনিয়ে দেবে—"যাও, যাও, রামনামের সঙ্গে অন্য নামের তুলনাই হয় না। সিন্ধু মুনি হত্যার পর দশরথকে একবারের পরিবর্ত্তে তিনবার রাম নাম করানোর জন্য বশিষ্ঠদেব ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্র বামদেবকে বললেন—'একবার রামনামে কোটি ব্রহ্ম হত্যাহরে, তিনবার রাম নাম বলালি রাজারে। —যাও চণ্ডাল হওগে" "অতকথা কি অন্য যে কোন নাম সোজাভাবে উচ্চারণ করলে ফল দেয়, আর আমাদের রাম নামের এমনই মহিমা যে উল্টা জপে 'মরা মরা' করেই দস্যু রত্নাকর মহামুনি বাল্মীকি হয়ে গেলেন!" মনে রাখবে, রত্নাকর যে বাল্মীকি হয়ে ছিলেন, বাল্মীকি যে পূর্ব্বজীবনে ঐরকম একজন ভীষণ দস্যু ছিলেন—এ ধরণের কোন কথা বাল্মীকির মূল রামায়ণে নেই!

এইবার কৃষ্ণ ভক্তের দল, এরা বেশভূষায় যেন দৈন্যের প্রতিমূর্ত্তি, কিন্তু স্ব সম্প্রদায়ের স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য অপর সম্প্রদায়কে 'মায়াবাদী, নাস্তিক, পাষণ্ড' প্রভৃতি বিশেষণে আপ্যায়ন করে, শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করে 'বৈষ্ণব ধর্ম্ম'ই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম তা প্রমাণ করবার সময় কোপন স্বভাব দুর্ব্বাশার worse সংস্করণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের সঙ্গে প্রাচীনতর মাধ্ব, রামানুজ-নিম্বার্কের অপর বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলির সিদ্ধান্ত মেলে না বলে তাঁদেরকেই 'অজ্ঞ' বলে প্রচার করেছে। নিজেদের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের অনুকুলে অন্য শাস্ত্র পায় না বলে এরা 'অসারের সার জলসার' শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদব্যাসের রচনা বলে মিথ্যা প্রচার করেছে; শ্রীমদ্ভাগবত নাকি 'সর্ব্বশাস্ত্রের প্রণম্য'! 'সর্ব্বশাস্ত্রের বিমর্দ্দক!'—'নিখিলেতর শাস্ত্রশত প্রণতচরণস্য শ্রীভাগবত স্যাভিপ্রায়েন' !!! ইত্যাদি (শ্রীজীব গোস্বামীর শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ) এদের প্রচার হল—"ভগবানের অন্যান্য স্বরূপের মধ্যে কোনটি এক কলা, কোনটি চার কলা, রামচন্দ্র বারশ কলা কিন্তু কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং (ভাগবত) রাম নামে 'তারকতা' আছে বটে কিন্তু কৃষ্ণনামে পারকতা বেশী!

বিশেষতঃ প্রেমদানে কৃষ্ণ নামই সমর্থ। কাজেই কৃষ্ণ নামই শ্রেষ্ঠ।" যদি কেউ বলে কৃষ্ণকে মানেন, কৃষ্ণের কথা মানবেন না? কৃষ্ণ যে নিজ মুখে গীতাতে বলেছেন —"সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনকে নিরুদ্ধ করে, মূর্দ্ধায় প্রাণকে স্থাপন করে— 'ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরণ্'—ওঁ এই ব্রহ্মরূপ একাক্ষর উচ্চারণ করতে করতে দেহত্যাগ করলে পরমগতি লাভ হয়"—কৈ তিনি তো 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করলে পরমগতি লাভ হয়, এ কথা তো বলছেন না? বৈষ্ণবদের ক্ষিপ্র উত্তর—"ওঁ বলতে 'কৃষ্ণ' এই অক্ষরকেই বোঝায়, কেন না, কৃষ্ণ আশ্রয় তত্ত্ব আর সব অবতার আশ্রিত তত্ত্ব, (অতএব তাঁদের নাম কৃষ্ণ নামের চেয়ে হেয়তর!) ব্রহ্ম তো কৃষ্ণতনুর আভা মাত্র!" পুনরায় যদি চেপে ধর—"কৃষ্ণ যে আশ্রয় তত্ত্ব, আর সব অবতার আশ্রিত তত্ত্ব—এতত্ত্ব বেদ-উপনিষদে কোথায় আছে?" তখন বলবে "এ আমরা জানি!"

অবিদ্যার আলো আঁধারিতে, অন্ধ বিশ্বাসের কামলা রোগে, ভাবক্লিন্ন নেত্রে কৃষ্ণই একমাত্র পরাৎপর তত্ত্ব, 'কৃষ্ণ' কথাটিই এক মাত্র শ্রেষ্ঠ বরিষ্ঠ নাম, এই ধরে নিয়ে যে সমস্ত অর্ব্বাচীন শাস্ত্র যথা ভাগবত, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণু-পুরাণ, গোপাল তাপণী-উপনিষদ্, কৃষ্ণোপনিষদ্, ঋষিমুনির নামে সম্প্রদায়ের স্বার্থে রচনা করে রাখা হয়েছে তাই থেকে প্রমাণ প্রয়োগপত্র দাখিল করবে!

এই ভাবেই পার্শী সম্প্রদায় 'জেন্দ্-অবেস্তা'—যা তারা 'ওর মাজদ্'—ঈশ্বরের সাক্ষাৎ-বাণী বলে মনে করে তাই থেকে প্রমাণ দেবে "যেরোষ্টার"ই একমাত্র মুক্তি-প্রদ নাম। ইহুদীদের 'যেহোভা,' মুসলমানদের কাছেই আল্লাই শ্রেষ্ঠ নাম। খ্রীষ্টানরা বলে বসবে 'যীশুখ্রীষ্ট' নাম জপের কথা যা তাঁর অন্তরঙ্গরা বলে গেছেন—তা না জপলে 'Thou shalt be burnt in Hell!' একই ঈশ্বরের 'প্রত্যাদেশ', 'বাণী', 'Gospel' 'ওরমাজদ' 'পয়গম' বলে কথিত বিভিন্ন শাস্ত্রের নানা ধরণের মত, পথ, তত্ত্ব এবং তথ্য নিয়ে কী আকাশ পাতাল তফাৎ!

যদি একটু বিবেক বিচার সহ ভাল করে চিন্তা করে দেখ তাহলে সহজেই বুঝতে পারবে—এ সমস্তই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর বিষময় ফল! যে সম্প্রদায়ে যে মহা-পুরুষই আসুন না কেন, তাঁদের যেমন যেমন গতি হয়েছিল, পিণ্ড (Material-region), ব্রহ্মাণ্ড (Materio-spiritual region) এবং দয়ালদেশের (Purely spiritual region) বিভিন্ন স্তরের যে সত্য যেমন ভাবে Revealed হয়েছিল তাঁরা তাঁদের লব্ধভূমির উপলব্ধ সত্যই প্রকাশ করে গেছেন। কিন্তু যিনি যে স্তরেই যান

না কেন, যাঁর যেমনই (আংশিক বা সামগ্রিক) অনুভূতি হোক না কেন—তাঁকে ধ্বন্যাত্মিক শব্দধারা ধরেই যেতে হয়েছে। বিভিন্ন Process, প্রণালী ধরে যখনই চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়েছে তখনই তাঁর কাছে যেমন যেমন Region এর sound manifested হয়েছে—তাঁর সুরত সেই Current এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে, সেই sound current টি যে স্তর থেকে এসেছে, তিনি সেই স্তরে গিয়ে সেখানকার Presiding Diety কেই চরম এবং পরম বলে ভেবেছেন এবং মানুষের প্রকাশ যোগ্য ভাষায় সেই সব Sound-Current এর একটা বর্ণাত্মক নাম প্রকাশ করে গেছেন। তাঁরা কিন্তু বর্ণাত্মক কোন নাম জপের দ্বারা কোন অনুভূতি লাভ করেন নি। কিন্তু পরবর্ত্তী দল তাঁদের নামে স্থাপন করেছে এক একটা সম্প্রদায় আর আন্তর-অনুভূতির অভাবে, spirit, essence বাদ দিয়ে form টা নিয়ে করেছে কোলাহল, লৌকিক পাণ্ডিত্যের মহিমায় রচনা করেছে নানা শাস্ত্র, আর এইভাবেই হয়েছে বিভিন্ন বর্ণাত্মক নামের প্রচার, তাই মতপথে এত প্রভেদ, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এত বিদ্বেষের বিষবাষ্প ধূমায়িত!

যাক্, এবার আমরা বৈষ্ণব আর কৃষ্ণনাম প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সংহিতা এবং ব্রাহ্মণের যুগে আমরা 'বৈষ্ণব' আখ্যাটির তো কোন পরিচয়ই পাই না (Vide—'Materials for the study of the Early History of the Vaisnava Sect'—by Dr. H. C. Roychowdhury M. A. Ph. D.)। ব্রাহ্মণ্যযুগে বিষ্ণু যজ্ঞের সহিত সংযুক্ত, অর্চ্চন বন্দন কেলি পাদসেবন তুলসীদান ইত্যাদি বিভ্রাট ছিল না। মহাভারতে 'বৈষ্ণব' কথাটির উল্লেখ পাই। কিন্তু 'বৈষ্ণব' বলতে আমরা মালা তিলকধারী যে কৃষ্ণভক্ত দেখি মহাভারতে সেই অর্থে বৈষ্ণব কথাটি ব্যবহৃত হয় নি। বিখ্যাত গবেষক পণ্ডিতরাও ঐ কথা স্বীকার করেন (Vide—'Early History of the Vaisnava faith and Movement in Bengal'—by Dr. S. K. De; 'Early Visnuism and Narayania worship'—by Sreemati Mrinal Das Gupta (I. H. D. Vol VII, 1931)। গুজরাটে এখনও যে সাত্বত বংশের পরিচয় পাওয়া যায় এই সাত্বত বংশের বিখ্যাত নায়ক ছিলেন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ! বাসুদেবের ভক্তদের 'ভাগবত' বলা হ'ত বৈষ্ণব নয়। গুপ্তসম্রাটগণ পর্য্যন্ত 'পরমভাগবত' এই উপাধি গ্রহণ করেছিলেন, 'পরমবৈষ্ণব' নয়। ডাঃ জে. এন. ব্যানার্জ্জীর

'Hindu Iconography' থেকে জানতে পারবে ব্রাহ্মণ্যযুগেও বিষ্ণুর কোন মূর্ত্তি বা পূজা প্রচলন ছিল না। সাত্বত বংশীয় বাসুদেব যে ধর্ম্ম প্রচলন করে ছিলেন তার নাম ছিল ভাগবত ধর্ম্ম,—"বৈষ্ণব ধর্ম্ম" নয়। কৃষ্ণ গীতাতে 'বৃষ্ণিনাম বাসুদেবোঽস্মি' বলে বাসুদেব এবং তিনি যে এক তাতো বলেই গেছেন। কাজেই কৃষ্ণ নিজে 'বৈষ্ণব ধর্ম্মের' কোন পত্তন করে যান নি। স্যার আর, জি, ভাণ্ডারকরের মতে কৃষ্ণ মানুষ ছিলেন; পরবর্ত্তীকালে তাঁকে 'দেবতা পরাৎপর ভগবান' বানানো হয়েছে। গ্রীক লেখক মেগাস্থিনিস্ এবং এরিয়ানের বই থেকে জানতে পারবে—শৌরশেনোই নামে ভারতীয় এক উপজাতি হেরাক্লাস নামে এক বীর ব্যক্তিকে খুব শ্রদ্ধা করতো। তাদের মেথোরা এবং ক্লেই শেবরা নামে দুটি নগর ছিল। ডাঃ ভাণ্ডারকর শৌরশেনোইদেরকে সাত্বত এবং হেরাক্লাসকে কৃষ্ণ বলে মনে করেন। —লাসেন, ম্যাকক্রিণ্ডেল এবং হপকিনস 'মেথোরা'কে মথুরা এবং ক্লেই শোবারা'কে কৃষ্ণপুর বলে মনে করেন (Vide—History of Sanskrit Literature—Macdonell) পূর্ব্ব মালবের বেসনগর (প্রাচীন বিদিশা) হতে যে শিলালিপি পাওয়া গেছে তাতেও বাসুদেব কৃষ্ণের মানবীয় সত্ত্বার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ শিলালিপি থেকে জানা গেছে যে খৃঃ পূঃ ২য় শতকে যবনরাজ এণ্টিয়ালকিডাসের রাজদূত হেলিওডোরা বাসুদেবের সম্মানার্থ একটি গরুড়ধ্বজ তৈরী করে দিয়েছিলেন। মোর নামক স্থানে কুঁয়ার মধ্য থেকে যে শিলালিপি পাওয়া গেছে তাতে জানা গেছে বৃষ্ণিবংশীয় পঞ্চবীরের জন্য পাথরের মন্দির প্রস্তুত হয়েছিল। ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জীর মতে ঐ পঞ্চবীরের নাম বলভদ্র, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব এবং অনিরুদ্ধ, ('Hindo Iconography')। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ঐ ৫ জনকে 'পঞ্চব্যূহ' 'পঞ্চতত্ত্ব' ইত্যাদি নানাকিছু বলে তাঁদের পূজা অর্চ্চনা নাম জপকেই পরমপুরুষার্থ বলে মনে করে। যাঁরা পূর্ব্বে আমাদেরই মত মানুষ হয়ে জন্মেছিলেন, তাঁদের নামজপে কী আধ্যাত্মিক কল্যাণ হতে পারে তা সুধীজনের বিচার্য্য!

কৃষ্ণ যে একজন ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন 'বৌদ্ধঘতজাতক' এবং জৈন 'উত্তরাধ্যায়ণ সূত্র' থেকেও আমরা তা জানতে পারি। ডাঃ ব্রজেন্দ্র নাথ শীলের মত বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিকও কৃষ্ণের মানবীয় সত্ত্বায় বিশ্বাস করতেন (Vide--Comparative studies in christianity and vaisnavism—

Dr. Brojendra Sil)। আমাদের দেশে কতো শৌর্য্যবীর্য্যশালী রাজা অতীতে জন্মেছেন। কৃষ্ণ সেই রকম একজন ছিলেন। কাজেই কৃষ্ণই 'পরাৎপর তত্ত্ব' এবং কৃষ্ণ নাম জপই 'পরম পুরুষার্থ' স্বীকার করা যায় কি করে ? কৃষ্ণের যে মানবীয় সত্তা ছিল—তিনি যে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ছিলেন না—তার পরিচয় মহাভারতে বহু স্থানে আছে। বিখ্যাত গবেষক পণ্ডিতদের গবেষণামূলক প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে যে কৃষ্ণের মানবীয় সত্তার পরিচয় পাই—তাঁকেই 'পরমতত্ত্ব' এবং তাঁর 'নাম' জপই শ্রেষ্ঠ সাধনা বলে যে আধুনিক বৈষ্ণবরা প্রচার করে তা কতটা অযৌক্তিক এবং অবাস্তব তা বিচার করে দেখ। এতৎ সত্ত্বেও ঐ সব প্রাজ্ঞ-গবেষণাকে যদি কোন মূল্য না দিয়ে বৈষ্ণবদের মত অনুযায়ী কৃষ্ণকে যদি 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম' কৃষ্ণ নামকেই যদি অমৃত মন্ত্র বলে ভাবতে চাও তাহলে, এস মহাভারত অনুযায়ী বিচার করে দেখি এই 'নরাকার পরব্রহ্ম' যখন এই ধরাধামে অবতীর্ণ ছিলেন এবং লক্ষ লক্ষ লোকের সঙ্গে মেলামেশা আহার বিহার যুদ্ধবিগ্রহলীলা, মহালীলা, রাসলীলাদি (বৈষ্ণবমান্য ভাগবত মতে) করেছিলেন তখন তাঁর নিত্যসঙ্গী পাণ্ডব এবং যাদব-গণের-নিত্য দর্শন স্পর্শন সত্ত্বেও কী গতি হয়েছিল !

তোমরা বেদব্যাস রচিত শাস্ত্র মহাভারত মন দিয়ে পড়লেই দেখতে পাবে তাঁদের পরমগতিলাভ তো দূরের কথা বৈষ্ণবমান্য 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম' শ্রীকৃষ্ণের 'অপ্রাকৃত' দর্শন স্পর্শনে তাদের লোভ হিংসা ছলনা, কাম, দুরাচারাদিও দুর হয় নি ! যদি বল কৃষ্ণের প্রতি তাঁর আত্মীয় স্বজনদের বর্ত্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মত (কারণ অপর বৈষ্ণব সম্প্রদায় কৃষ্ণকে পরতত্ত্ববলে মানে না) "নরাকার পরব্রহ্ম" বোধ বা বিশ্বাস ছিল না—তাও ঠিক নয়। বর্ত্তমান গৌড়ীয়দের মত হয়তো তাঁদের Special 'অপ্রোদচক্ষু' বা ভাব ক্লিন্ন নেত্র ছিলনা কিন্তু তাঁরা যে কৃষ্ণকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ-ই নেই। তাঁরা যদি তাঁকে ঈশ্বর বলে নাও জানতেন, তথাপিও যেমন কেউ 'জেনেই কুইনাইন খাক, আর না জেনেই খাক। জরঘ্ন বস্তুগুণেই যেমন জর যাবে, না জেনে গঙ্গাস্নান করলেও যেমন গঙ্গা-স্নানই হয়, তেমনি তাঁরা গৌড়িয়দের মত হয়তো তথাকথিত 'তৃণাদপি সুনীচ—ভাগবত' ছিলেন না কিন্তু এদের ইষ্ট 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম' তাঁর 'অপ্রাকৃত চিণ্ময দেহ' নিয়ে তাঁদের মধ্যেই বিরাজমান ছিলেন, তাঁদের প্রতি কৃষ্ণের, কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের গভীর প্রেমভাব ছিল, তা ছাড়া কৃষ্ণকেই তাঁরা তাঁদের একমাত্র গতি, ভর্ত্তা, প্রভু,

নিয়ন্তা, শরণ এবং সুহৃদ বলে জানতেন। মহাভারত খুলে দেখলেই বুঝতে পারবে —তবুও তাঁরা লোভ দ্বেষ হিংসা কাপট্য ছলনা কাম থেকে মুক্ত হ'ন নি কেন? পরমগতি লাভ তো দূরের কথা, কৃষ্ণের দেহান্তের পর অর্জ্জুন যখন বৃষ্ণিবংশীয় যদুপত্নীগণকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন দস্যুগণ অর্জ্জুনকে পর্য্যুদস্ত করে তাঁদেরকে হরণ করে নিয়ে গেল! কৃষ্ণগত প্রাণ অর্জ্জুনও কৃষ্ণনাম স্মরণ করে শত্রুজয় (কাল জয়ী হওয়া তো দূরের কথা!) করতে পারলেন না! অবলা নারীরা 'হা কৃষ্ণ! করুণাসিন্ধো!' বলে আর্ত্ত হয়ে কাঁদলেও গৌড়ীয়দের "নিত্যপ্রকট পরব্রহ্ম" নিজেও এলেন না, কিংবা ভক্তবৎসলের বর্ণাত্মক শ্রেষ্ঠ নাম মাহাত্ম্যে তাঁরা ভবসমুদ্র পার হওয়া তো দূরের কথা, আভীর দস্যুদের হাত থেকেও রক্ষা পেলেন না। অর্জ্জুনের উপর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে যদুপত্নীদেরকে হস্তিনাপুরে নিরাপদে নিয়ে যাবার ভার অর্পণ করেছিলেন তাঁরাকে দস্যুরা অপহরণ করে নিয়ে গেল! অর্জ্জুন এই ঘটনার পর ব্যথিত চিত্তে ব্যাসের কাছে গিয়ে কৃষ্ণের অন্তর্ধানের বিষয় নিবেদন করে বলছেন,—"কৃষ্ণের অন্তর্ধানের চেয়েও সব চেয়ে পরিতাপের বিষয় এই যে পথিমধ্যে আভীর দস্যুরা আমাকে পরাজিত করে হাজার হাজার যদুনারীগণকে হরণ করে নিয়ে গেল—

ইতঃ কষ্টতরং চান্যৎ শৃণু তন্বৈ তপোধন!
পশ্যতো বৃষ্ণি দারাশ্চ মম ব্রহ্মণ সহস্রশঃ
আভীরৈরভিভূয়াজৌ হৃতাঃ পঞ্চনদালয়ৈঃ।"

ঐ সমস্ত বৃষ্ণি-রমণীদের কি বর্ত্তমান বৈষ্ণবকুল চূড়ামণিদের মত শরণাগতি আর্ত্তি ছিল না? কিংবা, বর্ত্তমানের 'ওঁ নিত্যলীলা প্রবিষ্ট প্রভুপাদগণ' অনুভব করে কৃষ্ণ-নামের যে শ্রেষ্ঠ মাহাত্ম উদ্ভাবন করেছেন সে সময় কৃষ্ণ নামের এত শক্তি ছিল না বুঝি? দ্বাপরে যে শক্তি ছিল না, কলির কাল মাহাত্ম্যে 'কৃষ্ণ' এই কথাটীর সেই শক্তি বুঝি বেড়ে গেল to the 'n' power?

এইবার পাণ্ডবদের অবস্থা বিচার করা যাক্। বর্ত্তমানের প্রভুপাদরাও বোধ হয় একথা স্বীকার করবেন যে পাণ্ডবরা কৃষ্ণগত প্রাণ, ধার্ম্মিক', সত্যাশ্রয়ী এবং অন্যান্য দেবগুণেরই আধার ছিলেন? কৃষ্ণ সখী কৃষ্ণাসহ পঞ্চপাণ্ডব এবং মাতা কুন্তীর কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ নির্ভরতা জগতে অতুলনীয়! শোকে, দুঃখে, বনবাসে রাজ্যভোগে সম্পদে বিপদে এঁরা কায়মনবাক্যে কৃষ্ণার্পিত প্রাণ। কৃষ্ণ বাক্য,

কৃষ্ণের বিধান এঁরা বিনা দ্বিধায় বিনা সঙ্কোচে নতমস্তকে মেনে নিয়েছিলেন ; কৃষ্ণও ছিলেন এঁদের প্রেমে বাঁধা। কিন্তু এ হেন পঞ্চপাণ্ডবকেও নরকস্থ হতে হয়েছিল! এত কৃষ্ণগতপ্রাণতা, নিয়ত কৃষ্ণসঙ্গ, নিত্য কৃষ্ণস্মরণ, কৃষ্ণনাম—উচ্চারণ এঁদেরকে পরমগতি 'অপ্রাকৃত ব্রজভূমে নিত্য পার্ষদত্ব'দান করতে পারে নি। মহাভারত থেকে এঁদের দেহরক্ষা এবং তত্তৎ বিষয়ে যুধিষ্ঠিরের মন্তব্য নিম্নে দেওয়া গেলঃ -

(ক) প্রথমেই, "যাজ্ঞসেনী ভ্রষ্টযোগা নিপপাত মহীতলে।" ভীম দ্রৌপদীর এই যোগভ্রষ্ট হয়ে মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করলে যুধিষ্ঠির বললেন, "পক্ষপাতো মহান্ অস্যা বিশেষেণ ধনঞ্জয়ে!" পতিব্রতা দ্রৌপদীর পঞ্চপতির প্রতি সমদৃষ্টি-টুকুও নিয়ত কৃষ্ণ নাম স্মরণ, কৃষ্ণ নির্ভরতায় হয়নি!

(খ) তারপর সহদেবের পতন হ'ল ; ভীমের জিজ্ঞাসায় যুধিষ্ঠিরের উত্তর ঃ—

"আত্মনঃ সদৃশং প্রাজ্ঞং নৈষোঽমন্যত কঞ্চন।" কৃষ্ণ সঙ্গ, "নরাকৃতি পরব্রহ্ম" দর্শনে সহদেবের মলিন অহংকারটুকুও দূর হয় নি! নকুলেরও সেই দশা! কারণ, তাঁর দেহপতনের কারণস্বরূপ যুধিষ্ঠির বললেন—

(গ) "রূপেন মৎসমোনাস্তি কশ্চিদিত্যস্য দর্শনম্।" নকুল ভাবতেন তাঁর মত কেউ রূপবান নেই!

ঘ) মৃত্যুমুখে পতিত হলেন অর্জ্জুন, ভীম জিজ্ঞাসা করলেন –

"অথ কস্য বিকারোঽয়ং যেনায়ং পতিত ভুবি ?"

যুধিষ্ঠির ঃ— "একোঽহং নির্দহেয়ং বৈ শত্রূনিত্যর্জ্জুনোঽব্রবীৎ
ন চ তৎ কৃতবানেষ শূরমানী ততোঽপতৎ"

"একাকীই সমস্ত শত্রুকে ভস্মীভূত করবো"— একথা অর্জ্জুন বলেছিল কিন্তু তা সে করেনি, এই জন্যই সে পতিত হ'ল!"

যে অর্জ্জুনের সম্বন্ধে কৃষ্ণ বলেছিলেন—"মমৈব ত্বং তবৈবাহং যে মদীয়াস্তবৈব তে— তুমি আমারই এবং আমি তোমারই, যারা আমার তারাই তোমার" (মহাভারত) —সে হেন অর্জ্জুনেরও "নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব সুলভ দৈন্য" আসে নি, কৃষ্ণসঙ্গ আর কৃষ্ণনামের গুণে! পতনও হ'ল!!

(ঙ) তারপর ভীমের যখন দেহপাত হচ্ছে—যুধিষ্ঠির কারণ স্বরূপ বললেন —"অতিভুক্তং চ ভবতা প্রাণেন চ বিকত্থসে—অতিরিক্ত ভক্ষণ আর শক্তির দম্ভই তোমার পতনের কারণ!"

ভেবে দেখ ভাই, বিদ্বানের বিদ্যাভিমান, বীরের বীরত্বগর্ব্ব, রূপবানের রূপের অভিমান একটু থাকেই, আর তা থাকাটা এমন কিছু গুরুতর দোষের নয়। 'জীবন্ত কৃষ্ণ-ভগবানের একান্ত তদ্‌গত ভক্তদেরও নয়ত একটু ছিল। কিন্তু তাই বলে সেই সামান্য দোষের জন্যই কৃষ্ণসখা-সখীর পতন হ'ল, পাপের ফল স্বরূপ হল নরক ভোগ !! অথচ বৈষ্ণবদের এই "নরাকৃতি পরব্রহ্ম" প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন—"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" (গীতা) মহাভারতকার এঁদের নরক ভোগের কী নিদারুণ চিত্র দিয়েছেন দেখ:— নরকে পাপীদের নির্য্যাতন ভোগ এবং আর্ত্তনাদ শুনে জিজ্ঞেস করলেন—

"অহো! কৃচ্ছমিতিপ্রাহ তস্থৌ স চ যুধিষ্ঠির
উবাচ, কে ভবন্ত বৈ কিমর্থমিহ তিষ্ঠথ ? —(মহাভারত)

ওহো, কী নিদারুণ যন্ত্রণা ! কে তোমরা ? কেন এখানে আছ ?

"কর্ণোঽহং ভীমসেনোঽহমিত্যেব তে বিচুক্রুশুঃ —আমি কর্ণ, আমি ভীম এইভাবে তারা আর্ত্তনাদ করে উঠলো !"

আর যুধিষ্ঠিরেরও কিয়ৎকাল নরকদর্শন, নরকে স্থিতির কারণ স্বরূপ ইন্দ্র বললেন—"অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ —দ্রোণকে এই ছলনাবাক্য বলার জন্যই এই নরকভোগ ! ব্যাজেনৈব ততো রাজন ! দর্শিতো নরকস্তব।"

যুধিষ্ঠির জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেন নি। বারেক যে ঐ ছলবাক্যটি দ্রোণকে বলেছিলেন তাও কৃষ্ণের আদেশে ! আর শোনা যায় কর্ণ কৃষ্ণকে তুষ্ট করবার জন্য পুত্র বলিতেও পশ্চাৎপদ হন নি। কর্ণের দান এবং অতিথি-পরায়ণতা জগতে অতুলনীয় ! কিন্তু হায় ! এত দেবগুণের আধার হয়েও, কৃষ্ণদর্শন কৃষ্ণার্পিত প্রাণ হয়েও তাঁদের যদি মুক্তি না হয়ে থাকে, সামান্য সামান্য অভিমানের জন্য, কৃষ্ণ—আদেশে মিথ্যা বলে সেই মিথ্যাভাষণটুকুরও ফল যদি নিদারুণ নরক যন্ত্রণা ভোগ এবং নরকদর্শনের মধ্য দিয়ে ভোগ করতে হয়, "নরাকৃতি পরব্রহ্ম"কে প্রত্যক্ষ দর্শনেও যদি সামান্য অপরাধগুলি খণ্ডিত না হয়ে থাকে, কৃষ্ণ জীবিত অবস্থাতেই যদি পরমগতি দান করে যেতে না পারেন, তাহলে কৃষ্ণের দেহত্যাগের হাজার হাজার বছর পরে, যারা কৃষ্ণকে জীবনে দেখলো না, তারা মৃত কৃষ্ণের একটি কল্পিত মূর্ত্তি মাত্রকে "অপ্রাকৃত চিন্ময় জ্ঞানে" পূজা করে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" রবে গগনভেদী চিৎকার করলেই কি মুক্ত

হয়ে যাবে? "একবার কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে পাতকীর শক্তি নাই অত পাপ করে"—বৈষ্ণবদের এই কথানুযায়ী বর্ণাত্মক কৃষ্ণনামের যদি এতই মহিমা তাহলে পাণ্ডবদের এবং তাঁর পরিজনদের অত দুর্দ্দশা হ'ল কেন?

নিজেদের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার জন্য স্বকপোলকল্পিত, বেদশ্রুতি বিরুদ্ধ, নানা-রকম অর্ব্বাচীন গ্রন্থ রচনা করে, নিত্যনূতন এক একটা গোপালতাপনী উপনিষদ্, নৃসিংহতাপনী উপনিষদ্, রাধাউপনিষদ্, ললিতাসখীউপনিষদ্, নিত্যানন্দোপনিষদ্ বা চৈতন্যোপনিষদ্ নাম দিয়ে এগুলিকেই শ্রেষ্ঠগ্রন্থ বলে তাতে কৃষ্ণনামের ঢক্কানিনাদ করলেও, বেদ-উপনিষদাদি যে সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থে কৃষ্ণ-প্রশস্তি নেই সেগুলিকে, ঐ সমস্ত বৈষ্ণববাবাজীদের প্রণীত গ্রন্থের চরণে 'বিমর্দ্দিত' কিংবা 'প্রণত' বলে বালকোলাহল করলেও, মিথ্যা কোনদিন সত্য হবে না। সত্যও কোন-দিন ম্লান হবে না। ঐ সব সম্প্রদায়ের নিজেদের মধ্যে বিদ্বেষ, বৈরিতা, পরকীয়া প্রেমের অভিনয়ে নেড়ানেড়ির বৃদ্ধি দেখেই বিজ্ঞ বিবেকীজন বুঝতে পারবেন মিথ্যা প্রচারের অসারতা!

কৃষ্ণনাম সম্বন্ধে এত ঢক্কা নিনাদের আসারতা শ্রীজীবগোস্বামী এবং তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকজন মনে মনে বুঝতেন; মানুষের জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব অসার প্রচার তাদের চোখে পড়বে বুঝেই তদনুযায়ী অন্য ছলনা রচনা করে গেছেন। পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডের মহাদেব বাক্য উদ্ধৃত করে "শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে" শ্রীজীবগোস্বামী বলতে চেয়েছেন— "তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিস্তু পারকাদিতি," কৃষ্ণ নাম প্রেম ভক্তিদান করে, কাজেই মুক্তি দেওয়ার দায়িত্ব ('মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ' কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও)—কৃষ্ণ নামের নেই! কাজেই, যদুপত্নীগণের, পঞ্চপাণ্ডব এবং কর্ণের ক্ষেত্রে কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণসঙ্গের বৃথা যায় নি, তাঁদের প্রেমলাভ হয়েছিল!! কিন্তু কৃষ্ণনামকীর্ত্তন করে করেই যে তাঁদের কৃষ্ণ প্রেমের সঞ্চার হয়েছিল এমন কথাতো মহাভারতে নেই? নরকভোগ হোক্, তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নেই অর্থাৎ যেহেতু কৃষ্ণনাম 'পারক' 'প্রেমদ', তারক নয়, এজন্য ত্রাণ করার দায়িত্ব কৃষ্ণ নামের নেই!!! কিন্তু এও যে বাবাজীদের একটি 'ব্যাজ', বেগতিক দেখলে আসল প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল—তা আর একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে।

বৈষ্ণবরা "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর"কে প্রামাণ্য বলে মনে করেন; শ্রীজীবগোস্বামীও

তাঁর"শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে"যেখানেই কৃষ্ণের "নরাকারে পরব্রহ্মত্ব" এবং কৃষ্ণ নামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করতে গিয়ে বেদশ্রুতি শাস্ত্র সম্মত প্রমানের অভাবে দিশেহারা হয়েছেন সেখানেই বিষ্ণুপুরাণ থেকে একটা quotation দিয়েই বলেছেন "তদেবং গতিসামান্যেন নামমহিমাদ্বারা তন্মহিমাতিশয়ঃ সাধিতঃ— অতএব (বিষ্ণুপুরাণ বা প্রভাস পুরাণ যখন বলে গেছে!) শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের বা নামের মহিমাধিক্য হইতে গতি সামান্য হেতু স্বরূপের বা নামের শ্রীকৃষ্ণে মহিমাধিক্য সাধিত হইল!" বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে আছে—"যচ্ছক্তি নাম যৎ তস্য তস্মিন্নেব চ বস্তুনি, সাধকং পুরুষব্যাঘ্র! সৌম্য ক্রুরেষু বস্তুষিতি; - হে পুরুষব্যাঘ্র! তাঁহার যে নামের শক্তি, নামাশ্রিত জন শান্ত হউন আর খলই হউন, নাম নিজশক্ত্যনুরূপ প্রেমাদি দান করে থাকেন।" তাই যদি হয়, তাহলে কংস, শিশুপাল বা শাম্ব সব সময় কৃষ্ণস্মরণ কৃষ্ণচিন্তনে তো সর্ব্বত্র কৃষ্ণময় দেখতো,

"আসীনঃ সংবিশং তিষ্ঠন্ ভুঞ্জান্ পর্যটন মহীম্
চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ"

—শাম্ব তো কৃষ্ণের চিন্তায় কৃষ্ণের মত চতুর্ভূজই হয়ে গেল! হোক দ্বেষ বুদ্ধি, কিন্তু শান্ত হোক খলই হোক, কৃষ্ণ নাম যখন প্রেমভক্তি দান করে, তখন যারা এত চিন্তা করতো যে তদ্স্বারূপত্বই প্রাপ্ত হয়ে গেল, কৈ তবু তো নামমহিমায় তাদের হৃদয়ে প্রেমভক্তির সঞ্চার হয়েছিল বলে তো অন্ততঃ মহাভারতকার লেখেন নি? কিন্তু 'বৈষ্ণব' অত সহজে হঠেন না! অন্ধবিশ্বাসের যূপকাষ্ঠে বাঁধা থাকলেও তারস্বরে চিৎকার করতে বাধা দেয় কে? শিশুপালদের কথা আনলে অর্থাৎ এ সব ক্ষেত্রে কৃষ্ণ নামের 'প্রেমদ শক্তি' বন্ধ্যা বলে প্রমান করলে তখন এঁরা কৃষ্ণের 'হতারিগতিদায়কত্ব'-মহিমায় পঞ্চমুখ হ'ন। এঁরা বলেন, তাঁদের দ্বেষ বুদ্ধির জন্য প্রেমভক্তি না এলেও (অর্থাৎ কৃষ্ণনাম দ্বেষ বুদ্ধি দুর করতে পারে না!) তাদের মুক্তি হয়ে গিয়েছিল এবং শত্রুকে হত্যা করে মুক্তি দান যখন অন্য কোন অবতার পারেন না (বৈষ্ণবরা বিশ্বাস-রজ্জু-বদ্ধ অবস্থায় রজ্জুটির Length যতটুকু তার মধ্যে সর্ব্বজ্ঞ! এঁরা জানেন রাম, শিব, নৃসিংহ বা কূর্ম্ম কর্ত্তৃক নিহত, কেউ উদ্ধার লাভ করে নি! কারণ ধরে নাও এটা তাঁদের জানা আছে!) —এই বলে তখন বৈষ্ণবীয় সিদ্ধান্ত হ'ল — "অতএব, কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, কৃষ্ণ যখন শ্রেষ্ঠ, তার নামও

শ্রেষ্ঠ—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নাম্নো মাহাত্ম্যং নিগদেনৈব শ্রূয়তে—আর শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমাধিক্যের কথা নিগদে (সুস্পষ্ট উক্তি) শোনা যায়!" 'নিগদস্তু জনৈবেদ্যঃ'—কার সুস্পষ্ট উক্তি? কোন জনগণের কথা? কেন, বৈষ্ণব রচিত প্রভাস পুরাণ বিষ্ণু পুরাণে আছে যে!!

আচ্ছা, তর্কের খাতিরে ধরেই নিলাম কৃষ্ণের "হতারিগতি দায়কত্ব" আছে! তাহলে শত্রুভাবে দ্বেষ করায় শিশুপালাদির মুক্তি হ'ল আর কৃষ্ণগত-প্রাণ মিত্র হওয়ায় পাণ্ডবদেব পুরস্কার — নরকভোগ! নরক দর্শন! তা হলে কি বুঝতে হবে ভগবৎ-দ্বেষী হলে কৃষ্ণনামের 'তারকত্ব' এসে যায়? তা হলে কি বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভক্ত হয়ে ভীষণ নরক যন্ত্রণা ভোগের চেয়ে শিশুপাল-কংস-জরাসন্ধাদির মত করালকৃষ্ণদ্বেষী হওয়াই শ্রেয়তর?

কিন্তু এহো বাহ্য! ন্যায়ের ফাঁকির মত আরও বৈষ্ণবীয় যুক্তি আছে—শোন। কোন দিক দিয়ে বিবেকবিচারালয়ে মুখরক্ষা না হলে, শেষ যুক্তি—"শাস্ত্র খল উভয় অধিকারী সম্পূর্ণ ফললাভ করেন বলিলেও সমকালে উভয়ের ফলপ্রাপ্তি সম্ভাবনা করা যায় না, নিরপরাধে নামাশ্রয় মাত্রেই প্রেমলাভ করা যায়। সাপরাধ জনের নামাশ্রয়ে যখন অপরাধ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে তখন প্রেমভক্তি হইবেন — এই বিশেষ বুঝিতে হইবে" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, প্রাণগোপাল গোস্বামী সম্পাদিত, ১৫৬ পৃঃ)।

"এই বিশেষ বুঝিতে হইবে" বলে যে সিদ্ধান্ত তাঁরা টেনেছেন, তা মানতে হবে; কেন? না—ঐ "বিশেষ বুঝিতে হইবে!" এইবার বৈষ্ণব-শাস্ত্র ঘেঁটে দেখ "অপরাধ" বলতে কি বোঝায়, তাঁরা চৌষট্টি অপরাধের বিরাট List দিয়েছেন, যা মানুষের মুক্ত হওয়া কঠিন, কিছু না কিছু দোষ হয়ে যাবেই, আর কৃষ্ণ প্রেম সঞ্চার না হলে বৈষ্ণবীয় ফাঁকি, "অপরাধে নাম নিলে না উপজে প্রেম!" ধোঁকাবাজ জ্যোতিষী বা পাণ্ডাঠাকুর যেমন সরলা গ্রাম্য মেয়েকে কবচ মাদুলী বা শিকড়বুটি দিয়ে ২০।২৫টা নিয়ম কানুনে হাত পা বেঁধে দেয় 'আঁতুড় ঘরের ধোঁয়া লাগাবে না, শবদেহ যেন না দেখ, কারও ছায়া মাড়াবে না, সোমবারে পান খাবে না, মঙ্গলবারে শশা ইত্যাদি।' যদি কবচ-মাদুলি ঔষধে ফল না হয়, অভিযোগ যদি আসে, তখন সোজা আইনের ফাঁকি—"নিশ্চয়ই কারও ছায়া বা এঁটো (উচ্ছিষ্ট) মাড়িয়েছ, আঁতুড় ঘরের ধোঁয়া

লেগে গেছে—তুমি হয়ত তা জান না।" পরশুরামের ভাষায়, "হয়, হয়, তুমি তা Zানতি পার না!" সরল মানুষ এই সব কথা বিশ্বাস করে নিজের পোড়া কপালকে দোষ দেয়। যে কবচ মাদুলী লক্ষ মাইল দূরের গ্রহ-প্রভাব কাটাবে, সে কিন্তু আঁতুড় ঘরের ধোঁয়াটুকু থেকে আত্মরক্ষা করতে পারলো না! ঠিক এই রকমই "নিরপরাধে না নিলে প্রেম জন্মে" বলে যে বৈষ্ণব-শাস্ত্রে চৌষট্টি অপরাধের তালিকা আছে—তা মানুষের জীবনে পালন করা সহজ সাধ্য নয়, সম্ভব নয়; কাজেই একবার 'কৃষ্ণ' উচ্চারণ করা তে দূরের কথা লক্ষ লক্ষবারও কৃষ্ণ উচ্চারণ যখন "প্রেমদান" করে না, তখন নিশ্চয়ই চৌষট্টি অপরাধের মধ্যে কোন-না-কোন "অপরাধ" হয়ে গেছে ভেবে নিজের পোড়া কপালকেই দোষ দেয়, নিজেকে "অধম, পাতকী, মহাপাতকী, অধমাধম, দাসানুদাসতস্যদাস" ভেবে ভেবে "মিথ্যা জনম গোঁবায়।"

শত্রু হয়ে জরাসন্ধ-শিশুপাল-কংসের মত কৃষ্ণচন্দ্রকে ভীষণ নিপীড়ন নির্য্যাতন নিন্দাবাদ করে করে, যতক্ষণ না কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হওয়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত যে নামের (বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী!) 'গতিদায়কত্ব' আসে না, সর্ব্ব অপরাধ মুক্ত হয়ে নাম না করলে যে নামের 'প্রেমদ' শক্তিও বন্ধ্যা থেকে যায়, অর্থাৎ যে নামের 'তারকত্ব'ও নেই, 'পারকত্ব'ও নেই, সে নাম শ্রেষ্ঠ কিসে?

"এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে
আর নাম লৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে" (চৈ, চ)

চৈতন্যদেবের ঐ কথায় যদি বর্ণাত্মক কৃষ্ণনামকেই mean করা হয়ে থাকে, তাহলে প্রথমবার 'কৃষ্ণ' উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে চৌষট্টি অপরাধ অগ্নিতে শুষ্ক তৃণবৎ ভস্ম হয়ে যাবার কথা! দ্বিতীয়বার উচ্চারণে প্রেমভক্তির প্লাবন ভক্ত-চিত্তের তটভূমিকে বিপ্লাবিত করে নিয়ে যাবারই কথা! কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টে তার প্রমাণ মিলে কি? বাস্তবক্ষেত্রেও তা ঘটে কি?

রামভক্তরাও এই ধরণের অবাস্তব কথা বলে থাকে—

"রা শব্দ উচ্চারনাদেব বহির্নির্যান্তি পাতকাঃ
পুনঃ প্রবেশ কালেতু 'ম' কারস্তু কপাটবৎ"।

'রা' এই অক্ষরটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের সব পাপ দূরে যায়। তারপর পুনরায় যে তারা অন্দরে প্রবেশ করতে পারবে তা নয়! কেননা 'ম' বলবার

সঙ্গে সঙ্গেই যে কপাটবৎ! Gate বন্ধ! এইভাবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই প্রত্যেকের ইষ্টনামের অভিস্তুতি করে গেছে।

তাই বলছি ভাই বর্ণাত্মক কৃষ্ণনাম লক্ষ কোটি জপ নিষ্ফল। সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে আরও বিচার করে দেখ ভাই, বৈষ্ণবরা যে বলে কৃষ্ণনাম প্রেমভক্তি দান করে, সে কি রকম প্রেমভক্তি? তার বাহ্য প্রকাশ কিরূপ? কৃষ্ণগতপ্রাণ পাণ্ডব, ভীষ্ম বিদুর, রুক্মিণী সত্যভামাদির নিশ্চয়ই কৃষ্ণপ্রেম ছিল, কিন্তু তাঁদের কাউকে ত, শ্রীবিগ্রহ সেবা, গ্রন্থপূজা, তুলসীসেবন, দ্বাদশঅঙ্গে তিলকছাপ, উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন আদি করতে দেখা যায় নি? এমন কি কৃষ্ণের দেহান্তের পরও অর্জ্জুনাদি কোন কৃষ্ণগতপ্রাণ ভক্ত, ব্যাস নারদাদি ঋষি মুনি কাউকে ত 'শ্রীমুখ-সঙ্ঘর্ষণ করে করে 'নাকে মুখে গণ্ডে ক্ষত' হতে দেখা যায় নি?

প্রশ্ন ঃ—আচ্ছা, কেউ কেউ যে বলেন সব নামই তাঁর নাম; তিনি যখন সর্ব্ব-ব্যাপক তখন যে কোন নামেই যেমন ভাবেই তাঁকে ডাকা হোক না কেন তিনি শুনতে পাবেন। গোপালকে কেউ যদি 'টোপাল' বলে, হরেকৃষ্ণকে 'ফরেকৃষ্ট' তাতেও চলবে, কারণ ছোট্ট ছেলে বাবাকে 'টাবা' বলে ডাকলে কি বাবা বুঝতে পারেন না? না, সাড়া দেন না? আমাদের দেশের অনেক সাধু, পরমহংসরা তো নামের অক্ষর একটু এদিক-সেদিক হলেও কিছু দোষ হয় না বলে গেছেন।

উত্তর ঃ—ইতিপূর্ব্বে আমি সন্তদের বাণী বচন থেকে দেখিয়েছি বর্ণাত্মক কোন নামই সাচ্চানাম নয়। **নাম হচ্ছে** ধ্বন্যাত্মক চেতনধারা, যা নির্ম্মল চৈতন্য দেশ থেকে আসছে, তারই সঙ্গে যুক্ত হলে তবেই জীবের হয় মুক্তি, দয়ালদর্শন। ব্যঞ্জনবর্ণ আর স্বরবর্ণের সমবায়ে যে আক্ষরিক নাম তার দ্বারা সুরত কোনদিনই নিজভাণ্ডারে পৌঁছাতে পারবে না। বর্ণাত্মক কোন নামেরই যখন কোন Importance নেই, তখন তার অদল বদল সম্বন্ধে আর কি বলবো? তবুও তোমাকেই আমি জিজ্ঞেস করি, তিনটি অক্ষর G, O, আর D, একটু এদিক-সেদিক করে লিখলে হয় D—O—G! অর্থ এতে কিছু বদলালো কি না? 'God' কথাটিতেও d, g, o আছে, 'Dog' কথাটিতেও d, g, o আছে। কিন্তু অক্ষরের slight change এ একি হল? 'গোপাল' কথাটিরও অক্ষরগুলি একটু বদলে দিলে হয় পা—গো—ল, গো—ল—পা! ভাব, অর্থ আর তার ব্যঞ্জনা বদলাচ্ছে কি না? এ সম্বন্ধে, আশা করি, আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন!

তারপরে যারা বলে, সব নামই যখন তাঁর ন'ম, যে কোন নামে ডাকলেই তিনি আসবেন, তাদেরকে আমাদের প্রশ্ন—'আ—তু!' বলে ডাকলে কুকুর এসে দাঁড়ায়, কারও জ্যাঠামশাই আসেন কি? 'পুস্-পুস!' বলে ডাকলে মেঁওপুসি, খুকির বিড়াল ছানাটাই লেজ নাড়তে নাড়তে এসে পৌঁছাবে, মাসীমা এসে পৌঁছাবেন কি? আর 'চৈ! চৈ!' বলে ডাকলে ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করতে করতে হাঁস এসে পৌঁছবে, কারও পিশেমশাই এসে দাঁড়াবেন না! ঐ সব সাধু, পরমহংস হয়তো বলবেন। সবই যখন তিনি, সব রূপই যখন তাঁর রূপ, তখন হাঁসরূপেও তিনি, কুকুর রূপেও তিনি আর বিড়ালরূপেও তিনি!' হ্যাঁ, ঐ সব রূপের মধ্যেও তিনি আছেন, কাজেই ওঁরা ভগবানকে ঐ রূপে পেয়ে তৃপ্ত থাকতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত পরমার্থী, সাচ্চা প্রেমিক ভক্ত ওতে তৃপ্ত হবেন না। ছেলে যেমন মাকে বলে—"যেরূপেই, যেথায় ইচ্ছা তোমার, রওনা মা তোমার ইচ্ছা মত, আমি তেমন রূপে চাইনে মাগো, আমি চাই যে মায়ের মত।" তেমন ভক্তও তাঁর প্রিয়তমকে তাঁর ভুবনমনোহর বাঞ্ছিতরূপেই দেখতে চান, কুকুর বিড়ালরূপে নয়।

পরমহংসদের তৃতীয় যুক্তি—'টাবা' বলে ডাকলেও বাবা যেমন বুঝতে পারেন ছেলে তাঁকেই ডাকছে, তেমনি তিনি যখন সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বান্তর্য্যামী তখন জীব যে নামেই তাঁকে ডাকুক না কেন তিনি তা নিশ্চয়ই বুঝবেন।

ঐ কথাটার আপাতমধুর, বাহ্য চাকচিক্য দেখে বিভ্রান্ত হয়ো না, একটু গভীরভাবে পর্য্যালোচনা করে দেখ।

তুমি যে তাঁকে ডাক্‌ছো বা তাঁর কথা ভাবছো, এটা তাঁর বোঝা (understanding by Him) এক জিনিষ, আর তাঁকে তোমার বোঝা (To understand Him) আর এক জিনিষ। তুমি যে তাঁকে বাবার বদলে 'হাবা বা গাবা', 'হরেকৃষ্ণ' এর বদলে 'টরেকুষ্ট' বলে ডেকে ধন্য করছো বেচারার যখন সর্ব্বান্তর্য্যামিত্ব আর সর্ব্বব্যাপকত্ব আছে, তখন সেটা তাঁকে বুঝতেই হচ্ছে, তিনি তা নিশ্চয়ই বুঝছেন, কিন্তু বিচার করে দেখ ভাই, এই বোঝাটা (understanding by Him) তাঁর প্রয়োজন, না—তাঁকে বোঝা এবং জানাটাই (To realise Him) জীবের পরম প্রয়োজন? জীব তাঁকে না ডাকলেও তাঁর ক্ষতি বৃদ্ধি নেই, দয়াল তিনি, তাঁর দয়ার ধারা হ'তে কাউকে তিনি বঞ্চিত

করেন না, কিন্তু এই ত্রিতাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য শাশ্বত আনন্দলাভের জন্য, পূর্ণপ্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য, জীবেরই পরমপ্রয়োজন তাঁকে ডাকা—জানা আর বোঝা।

এই জানা বোঝাটা কি, এটা এখন আলোচনা করি এস। তিনি যখন সর্ব্বব্যাপক, তোমার অন্তর্সত্তা বহির্সত্তা ব্যেপে যখন তিনিই বিরাজ করেছেন, তবে ত তুমি তাঁর কোলেই আছ? তবুও তাঁকে তুমি দেখতে পাচ্ছ না কেন? কারণ, তোমার সুরত বাসনা কর্ম্ম অহং এর আবরণে, পঞ্চকোষের আচ্ছাদনে ঢাকা আছে বলে। পঞ্চকোষের আবরণ, অহংএর পর্দ্দা, বাসনার জাল ছিন্ন ভিন্ন হলেই না তুমি বুঝবে সর্ব্বব্যাপক দাতা দয়াল তোমার হৃদয় আলো করে আছেন, তুমি পরমানন্দ পুরুষের কোলেই আছ, এক পল, এক পলকও দূরে নেই। তখনই না তুমি হবে তৃপ্ত, দীপ্ত এবং আপ্তকাম? তার পূর্ব্বে, তিনি যে সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বান্তর্য্যামী, তিনি যে দাতাদয়াল—এ সব কথাতো তোমার শোনা কথা। যে সমস্ত মহাপুরুষ তাঁকে উপলব্ধি করে তাঁর সম্বন্ধে বলে গেছেন, তুমি তাঁদেরই কথা কপ্‌চাচ্ছ!

তুমি যখন সূর্য্যকে দেখতে পাওনা মেঘের জন্য, ঐ মেঘ সূর্য্যকে ঢাকে না, আচ্ছাদন করে তোমারই চোখ দুটো; মেঘের আবরণ তোমার চোখ থেকে সরে গেলেই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যকে দেখে তৃপ্ত হও। তুমি যখন মেঘের ঘন আবরণের জন্য সূর্য্যকে দেখতে পাও না, তখনও কিন্তু সূর্য্য তোমাকে দেখে, তোমার চোখে মুখে পড়ে তার রশ্মিচ্ছটা; একদেশী মেঘ কোনদিন স্বতঃ প্রকাশ, বিরাট ব্যাপক সূর্য্যকে ঢাকতে পারে না। Range of Eye-sight মেঘের ঘন আবরণ ভেদ করে যেতে পারে না বলেই—মেঘ হলে, দেখা যায় না সূর্য্যেরঅত্যুজ্জ্বল দীপ্তি। তারপর, প্রবলবেগে বাতাস বইলে মেঘ যায় সরে, সূর্য্যকে দেখা যায়। Self-Effulgent সূর্য্যকে প্রকাশ করবার জন্য বাতাসের প্রয়োজন নয়, বাতাস কেবল মেঘটাকেই সরিয়ে দেয়।

ভেবে দেখ, 'বা-তা-স' এই বর্ণাত্মক কথাটার Repeatition মাত্রেই মেঘ সরে যাবে না। মেঘ কে সরিয়ে দেয় যে প্রবল শক্তি—এটি প্রবাহিত হয় বলেই, একে বাতাস বলা হয়। 'বাতাস' এই বর্ণাত্মক কথাটার দ্বারা ঐ শক্তি-টাকেই mean করা হয়েছে।

যেমন, মনেকর, তোমার চোখের সামনে আছে অনেকগুলো পর পর কাপড়ের পর্দা, তার ওপারে আছেন তোমার বাবা। এখন আগুন বা Electric current যদি ঐ পর্দাগুলোর উপর ব:য় যায় তাহলে পর্দাগুলো ভস্মীভূত হয়ে যাবে, তুমি দেখে আনন্দ পাবে বাবাকে। ঐ পর্দাগুলো পুড়িয়ে দিলো আগুন বা Electricity এই কথাগুলো—না—current ? শক্তিটা ?

তেমনি যে শক্তি বা ধারা (Current) সুরতের সব আবরণ ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে দয়ালদেশে টেনে নিয়ে যায় তাকেই বলা হয় **নাম**। আদিভাণ্ডার থেকে নেমে এসে দেহের মধ্যে তিস্‌রাতিলে (Third Eye focus) সুরতের বৈঠক। তাঁর আর সুরতের মধ্যে রয়েছে কাল ও মায়ার শক্ত কপাট। পিণ্ড আর ব্রহ্মাণ্ড দেশের অতীত ভূমি দয়াল দেশ থেকে যে ধ্বন্যাত্মক শব্দের ধারা নেমে এসে এ কপাট খুলে দেয়, যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবাত্মা দয়ালকে জানতে বুঝতে পারে সন্তরা তাকেই বলেছেন **সাচ্চানাম**।

Electric Current এ যখন পাখা চলে, শক্তির প্রকাশ মাত্রেই স্পন্দনাত্মিকা বলে পাখাটা বন্‌বন্ শব্দ করে; তেমনি সন্তসদ্‌গুরু যখন ঐ আবরণ-উন্মোচনকারী চেতনধারা শিষ্যের সহস্রারে (Plexus of Thousand-petaled Lotus) manifest করেন, তখন তাও স্পন্দনাত্মিকা শক্তির মত শব্দের ঝঙ্কার-রূপে প্রকট হয়।

খুলে কপাট শব্দ ঝন্‌কারী   পিণ্ড অণ্ডকে পার, সো দেশ হমারা হৈ। (কবীর)

পরমসন্ত রাধাস্বামী সাহেব বলেগেছেন—

"শব্দ ঔর সুরত ভয়েএকা নাম ধুন্যাত্মক দেখা
গুরু বিন্ ঔর বিনা করনি, মিলে কস্ কহো য়হ রহনী।"

কাজেই, পরীক্ষার্থী ছাত্রদের সুবিধার জন্য যেমন 'Made Easy, Half-an-hour-Pıeparation' ইত্যাদি বই বেরোয়, তেমনি যারা, যে কোন নামে তাঁকে ডাকলে দর্শন হবে বলে একটা সহজ সরল Made Easy বর্ণাত্মক নামের উপর নির্ভর করে বসে আছে তাদের হবে না সাচ্চামুক্তি।

"কোটি নাম সংসারমে' তাতেঁ ন মুক্তি হোয়
আদি নাম জো গুপত্ জপ বুঝে বিরলা কোয়
জো জন হোয় জহরী রতন লেহি বিলগায়,
সোহং সোহং জপি মুয়া মিথ্যা জনম গোঁয়ায়।" (কবীর)

পঞ্চম পুষ্প

প্রশ্ন :— আপনি কোথা থেকে এক সন্তদের মত আব ধ্বন্যাত্মক নামের ঢেউ এনেছেন, কথায় কথায় কেবলই বলছেন—ধ্বন্যাত্মক নামই নাম ; বর্ণাত্মক নাম কিছু নয়। অথচ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মত লোকও কোন মূর্খ বুড়ী মেয়ে যদি 'হরেকৃষ্ণ' স্বামীর নাম বলে নাই উচ্চারণ করতো তাহলে তাকে 'ফরেকৃষ্ট ফরেকৃষ্ট' জপবারও নির্দেশ দিতেন। চৈতন্য রামকৃষ্ণ বর্ণাত্মক নাম হাততালি দিয়ে করতেন—তাঁরা কি সব ভুল? অতকথা বাদ দিন, বর্ণাত্মক কোন নাম যদি মোক্ষসাধক নয়, নামের অক্ষর একটু অদল বদল করে ডাকলে যদি কোন ফলই না হয়, তাহলে দস্যুরত্নাকর রাম না উচ্চারণ করতে পারায় শুধু 'মরা মরা' জপ করে কি করে বাল্মীকি হলেন? তুলসীদাসজীও বলেছেন—

"উলটা নাম জপং জগজানা, বাল্মীকি হুয়াব্রহ্ম সমানা"।

উত্তর :— সমাধিবান ঋষি তুলসীদাসজীর ঐ দোঁহাটির নিগূঢ় অর্থ ভণ্ডসাধু এবং সাধারণ মানুষ না বুঝতে পেরেই যত অনর্থ ঘটেছে। পুরাণকার এবং বাংলা রামায়ণ রচয়িতারাই দস্যুরত্নাকরের 'মরা মরা' জপের কল্পিত কাহিনীটি প্রচার করেছে। মূল বাল্মীকি রামায়ণে ও সব কথার বিন্দু বিসর্গও নেই। মূল বাল্মীকি রামায়ণে দেখি বাল্মীকি নারদকে জিজ্ঞেস করছেন ভূমণ্ডলের শ্রেষ্ঠরাজা কে? জ্ঞানেগুণে সত্যনিষ্ঠা এবং প্রজানুরঞ্জনে আদর্শ চরিত্র কার? রামায়ণের প্রথম শ্লোক আরম্ভ হয়েছে,

'তপঃ স্বাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগ্মিদাং বরং,
নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকিমুনি পুঙ্গবং। ১।'
"কোম্বাস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুনবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ।

ইত্যাদি (বালিকাণ্ড)

অর্থাৎ—তপঃপরায়ন্ বাল্মীকি, স্বাধ্যায়নিরত, তপোনিষ্ঠ বাগ্মী নারদ কে জিজ্ঞাসা করলেন"—কৈ বাল্মীকির বিশেষণ ত এখানে 'তপস্বী'; ('নরহন্তা দস্যু' এ সব কিছু নয়!) নারদ বললেন—

"ইক্ষাকু বংশ প্রভবো রাম নাম জনৈঃ শ্রুতঃ,
নিয়তাত্মা মহাবীর্য্যো দ্যুতিমান্ ধৃতিমান্ বশী।
বুদ্ধিমান্ নীতিমান্ বাগ্মী শ্রীমান্ শত্রুনিবর্হনঃ
ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ প্রজানাংচ হিতে রতাঃ। ইত্যাদি (বালকাণ্ড)

তদনুযায়ী বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করলেন। মিথুনরত এক ক্রৌঞ্চকে একটি নিষাদ তীর নিক্ষেপে হত্যা করায় ক্রৌঞ্চী অত্যন্ত শোকাতুর হয়ে ছটপট করে। তমসা নদীর তীরে এই বিষাদ-চিত্র দেখে মহামুনি বাল্মীকির কবিত্ব শক্তি উৎসারিত হয়ে উঠলো--এ কথারও উল্লেখ রামায়ণে দেখতে পাই। কিন্তু বাল্মীকি এক ভীষণ নরহন্তা দস্যু ছিলেন তারপর 'মরা মরা' জপে বাল্মীকি হলেন এ সব কথা তো রামায়ণে নেই। স্বয়ং বাল্মীকি তাঁর পূর্ব্ব জীবনের যে কথা মূল রামায়ণে লিখেন নি—তা আমি বিশ্বাস করি না। রাম নামের অতি মাহাত্ম্য দেখাবার জন্য ওটি রাম ভক্তের রটনা। পরে অর্ব্বাচীন পুরাণকার এবং বাংলা রামায়ণ লেখকদের কৃপায় ঐ মিথ্যা কাহিনীই অপামর জনসাধারণের মর্ম্মমূলে দৃঢ় বিশ্বাসরূপে বাসা বেঁধেছে। রামায়ণের প্রথম শ্লোকে দেখ, বাল্মীকির বিশেষণ আছে 'তপস্বী', নারদের সঙ্গে দেখা হ'ল যখন, তিনি তখন তপস্বী; দস্যু বলে কোন কথা নেই।

'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি' (শ্রুতি)। ব্রহ্ম-Region এ গেলে ব্রহ্মানুভূতি হলে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ 'ব্রহ্মৈব ভবতি!' তাই ঐ দোঁহাটিতে তুলসীদাসজী বলছেন—"বাল্মীকি ব্রহ্মভূমিতে গিয়ে 'ব্রহ্মসমানা' হয়ে গেলেন—কিন্তু জগৎ জেনে রেখেছে তিনি উল্টানাম জপতেন!" এই **উল্টানাম** জপের রহস্য বলবার পূর্ব্বে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি- যদি 'মরা মরা' জপের কাহিনী বিশ্বাসই কর—তাহলে

এখানে যারা বসে আছ, কেউ নিশ্চয়ই দস্যু রত্নাকরের যে সমস্ত দুষ্কার্য্যের বিবরণ পাই—সেই রকম দুর্জ্জন দস্যু বা পাপী নও! সবাই সত্যাশ্রয়ী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির না হলেও এ কথা তো সত্য যে সামান্য একখণ্ড বস্ত্রের জন্য, জীবিকার জন্য, নীরিহ পথচারী, তপস্বীদেরকে হত্যা করে ফেলতেন যে দস্যু রত্নাকর (তোমাদের কাহিনী অনুযায়ী) তারমত নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষ Hardened Criminal বা Scoundrel নয়! ও হেন মহাপাপিষ্ঠ যদি রামের পরিবর্ত্তে 'মরা মরা' জপ করে বাল্মীকি হয়ে থাকে, তাহলে লক্ষ লক্ষ লোক যে সৎভাবে জীবন যাপন করে রামনাম শুদ্ধভাবে লক্ষ লক্ষ বার উচ্চারণ করেও, ঋষিত্ব, বাল্মীকিত্ব অর্জ্জন ত দূরের কথা, অন্তর্জগতের সামান্য আধ্যাত্মিক অনুভূতিলাভেও বঞ্চিত কেন? ঋষি—সত্যকার দিব্যদর্শী পুরুষের সংখ্যা বাড়ছে কি? 'রাম রাম' করে চিত্তশুদ্ধিটুকুও হয়? কত শয়তানই তো রাম রাম করে অথচ মানুষের গলাতে ছুরিও বসায়। কৈ শুদ্ধভাবে রামনামের উচ্চারণে ত তাদের দেবভাবের বিকাশ হয় না? 'রামের' উল্টো 'মরা' জপে দস্যু রত্নাকর ঋষি হ'ল আর তুমি নিজেও দশ বছরে অন্ততঃ কয়েক লক্ষবার রামনাম জপে ফেললে, ফল কিছু হয়েছে কি? যদি বল, মানুষের নিষ্ঠা, একাগ্রতা, আর্ত্তির অভাব, কিন্তু একথা বিশ্বাস করা শক্ত। বহুলোক আছে নিষ্ঠা ভরে জপ করে, অন্ততঃ বিপদের সময় আর্ত্তভাবে 'রাম রাম' করে কাঁদে, কিন্তু তাতেও তাদের বিষয় বাসনা, অজ্ঞানতার অন্ধকার, পাপের কালিমা ধুয়ে মুছে যায় না। এর থেকেই তোমাদের বোঝা উচিত, রামনামের উল্টোজপ রত্নাকর নারদের নির্দ্দেশে যা করে ছিলো বলে প্রচারিত আছে তার নিশ্চয়ই অন্যকিছু Significance আছে। আমার দাতা দয়াল শ্রীগুরু এই উল্টাজপের রহস্য বলেছিলেন—"সাচ্চাগুরুসে রাহ্ (পথের ঠিকানা) লেকে রুহ্ যব নৌদ্বার ছোড়কে দশমি গলিসে উলট্ গতিমে রুহানিমণ্ডলমেঁ (আধ্যাত্মিক মণ্ডল) সফর করেগা—উহি সুরতকা (রুহ্কা) উল্টা জপ হৈ।" ব্রহ্মভূমি থেকে যে Sound Current আসে তারই সঙ্গে বাল্মীকির সুরত যুক্ত হয়ে উলট্ গতিতে ব্রহ্ম ভূমিতে উন্নীত হয়েছিল, প্রচেতা মুনির পুত্র বাল্মীকি এই ভাবেই ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছিলেন। এই রহস্য জগতের সাধারণে জানেনা, তারা উল্টা জপ বলতে রামের বিপরীত 'মরা' বুঝে রেখেছে; এদিকে কিন্তু উল্টা জপ করে যে বাল্মীকি 'ব্রহ্মসমানা'—ব্রহ্মবিদ্ হলেন—সেটা ভেবে দেখছে না; ভেবে দেখছে না "আমাদের এত রাম রাম করে কিছুই হচ্ছে না; কিন্তু, বাল্মীকি উল্টাজপ

করে যখন ঋষি হলেন—তাহলে সেই 'উল্টা নাম' নিশ্চয়ই অন্য কিছু!" সাধারণের এই ধারণা দেখে রহস্যবিদ্ তুলসীদাসজী বলছেন—"উল্টানাম জপৎ জগজানা, বাল্মীকি ভয়া ব্রহ্ম সমানা।"

জীবাত্মা পিণ্ডে (দেহে) তিসূরা তিলে বসে দাতা দয়ালের দিকে পেছন ফিরিয়ে—সৃষ্ট্যভিমুখী Repulsive force এর অধীন হয়ে, নবদ্বার দিয়ে বিষয় ভোগ করে চলেছে। নাম অর্থাৎ দিব্য Sound Current এর শক্তিতে তার উলট্ গতি হয়, Positive Force এর (Attractive power) অধীন হয়ে যখন সে দয়াল-অভিমুখী হয় তখন সেই হ'ল তার উল্টানামজপ; তখন আলোকের ঝর্ণাধারায় তা সব কালো কালিমা, সব কলুষতা যায় মুছে, নামরূপী পরশমনির স্পর্শে সে হয় সোনা; তার বল্মিকস্তূপ অর্থাৎ জড়ধর্ম্মী চিত্তভূমিতে হয় বাল্মীকির জন্ম অর্থাৎ চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা, বোধির বোধন।

উল্টানামজপের এই হ'ল Inner Significance. জড়বাদী মূর্ত্তিপূজক ভণ্ডের দল তোমাদেরকে 'রুমালে'র 'বিড়াল' অর্থ বুঝিয়ে রেখেছে!

প্রশ্ন :— উল্টানামের যে অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক রহস্য বললেন, তা শুনেও মনে প্রশ্ন জাগে, শাস্ত্রে যে "কলের্দোষ সমুদ্রস্য গুন এক মহান যতঃ, নাম-সংকীর্ত্তনাদেব বহির্নিযাস্তি পাতকাঃ" ইত্যাদি কথা আছে, সেগুলো কি সব ভুল? মহাপ্রভুও তো বলে গেছেন, "হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্ কলৌ নাস্তেব, নাস্তেব, নাস্তেব গতিরণ্যথা—হরিনাম ছাড়া কলির জীবের আর কোন গতি নেই"। আপনি কি বলতে চান, মহাপ্রভু বা অন্যান্য মহাপুরুষরা যাঁরা নামের এত মহিমা গেয়ে গেছেন, তাঁরা কিছুই বুঝতেন না?

উত্তর :— মহাপ্রভু এবং অন্যান্য অনুভবী নামানন্দী সাধকরা হয়তো ভুল বুঝিয়ে যান নি কিন্তু সমাধিবান্ মহাপুরুদের কথা অজ্ঞ জীবরা যে ভুল বুঝেছে, আর ভণ্ড সাধুরা ঐ সমস্ত মহাপুরুষদের কথার কদর্থ করে, উল্টোঅর্থ ক'রে ভুল বুঝিয়ে গেছে, এ আমি লক্ষবার বলবো। আচ্ছা ভাই, যে সমস্ত মহাপুরুষদের উপর তোমাদের অটুট শ্রদ্ধা, তাঁরা নামের যে সমস্ত মহিমা গেয়ে গেছেন, যেমন ধরো, (ক) 'একবার কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে, পাতকীর শক্তি নাই অত পাপ করে' কিংবা (খ) কৃষ্ণনামে, 'চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়, হৃদয়পদ্ম বিকশিত হয়, ভবমহাদাবাগ্নি হয় নির্ব্বাপিত, অপার-আনন্দ-সিন্ধু উথলে উঠে'

(চৈতন্যদেব)—ইত্যাদি, এগুলি নিশ্চয়ই তাহলে অতিস্তুতি নয় কিংবা সাধারণ মানুষকে নাম রটনা করাবার জন্য এই চাতুরি করে যান নি? নামে এ সমস্ত হয়, এটি উপলব্ধি করে তবেই না তাঁরা সত্য প্রকাশ করে গেছেন? কৈ, লক্ষ লক্ষ লোক তো দিন রাত নাম জপছে, তাদের 'ভবমহাদাবাগ্নি' নিভে গিয়ে, 'অপার-আনন্দ-সিন্ধু' উথলে উঠেছ কি? এমনও তো দেখা যায়, একজন ফোঁটা তিলক মালা চন্দনে সুশোভিত, মুখে সদৈব 'হরি হরি', অঙ্গুলিও বিদ্যুৎ-বেগে কাষ্ঠ মালার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ঘূর্ণমান, ত্রিশ বছর যাবৎ হরিনামাশ্রিত, কিন্তু কুটীলতায় Yago, অর্থলোলুপতায Shylock the Jew এদের কাছে নিতান্ত শিশু! লাম্পট্য, জালিয়াতি, পশুজনোচিত যে কোন অনাচারে এদের জুড়ি মেলা ভার! কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই বর্ণাত্মকনাম জপে যদি কোন ফল হতো তাহলে নিশ্চয়ই এদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ঘটতো। কিন্তু বাস্তবে তার প্রমান মিলে কি? তবে কি তোমরা বলবে মহাপ্রভু এবং প্রকৃত অনুভবী নামানন্দী সাধুরা সবাই মিথ্যা-বাদী? না, নিশ্চয়ই নয়। ভণ্ড সম্প্রদাযী সাধুবা 'নাম' বলতে তোমাদেরকে ভুল বুঝিয়েছে আর তোমরা'ও ভুল বুঝেছ বলেই যত অনর্থ। 'নাম সংকীর্ত্তনাদেব বহির্নির্যান্তি পাতকাঃ',—এই সংকীর্ত্তন খোল করতালসহ তাণ্ডব নর্ত্তন বা কর্ণপটহবিদারী কোন কলরোল নয়, এ হ'ল 'অন্তবি সংকীর্ত্তন', সেই 'Internal Melody', সেই "Song Celestial'—ব্রহ্ম-Region থেকে আসছে যে ধ্বনি, ক্লীং এর ঝঙ্কার, রাধা যা শুনে কৃষ্ণের বাঁশী বলে পাগল পারা হয়ে যেতো। রাধা যমুনাতীরে ছুটে যেত কদম্ববৃক্ষের উপব কৃষ্ণ যেখানে বাঁশী বাজাচ্ছে—বাঁশীর সেই মন মাতান সুরেব টানে; কুল, শীল, মান, ভয়, জুগুপ্সা, জটীলাকুটীলার ভ্রূকুটি, শাসন তর্জ্জন কিছুই সে গ্রাহ্য করেনি। অজ্ঞজীব তাদের সীমাবদ্ধ বুদ্ধি অনুযায়ী সাধিকা রাধিকার ঐ সব ঘটনার এক একটা মন-গড়া স্থূল অর্থ বুঝে নিয়েছে; যমুনা বলতে বুঝেছে যে যমুনা নদী, যমুনোত্রী থেকে বেরিয়ে বৃন্দাবন দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, ব্রজভূমি বৃন্দাবন বলতে বুঝেছে ঐ ভৌম বৃন্দাবন আর কদম্ববৃক্ষ বলতে বুঝেছে কদমগাছ! তাই বৈষ্ণব প্রভুরাকে দেখি ছুটে যায় বৃন্দাবনে, ব্রজধূলা বলতে মাটিতে গোড়ালুটি খায়! আমি এক বিখ্যাত বৈষ্ণব প্রভুপাদকে (যাঁর প্রায় কুড়ি হাজার শিষ্য) দেখেছি—ব্রজধূলি বলে ঐ বৃন্দাবনের মাটিকেই পরম পবিত্র জ্ঞানে ওয়াগন ভরে আশ্রমে নিয়ে যেতে।

অথচ মহাপ্রভু বারবার বলেছেন 'অপ্রাকৃত বৃন্দাবন', 'বিরজার পরপারে অপ্রাকৃত ব্রজভূমি'।

কিন্তু ভণ্ড সাধুদের Inter pretation এ, আর অনুভবী বহির্মুখী ভাষ্যকারদের বাহ্যিক ব্যাখ্যাতে মোহিত হয়ে তোমরা আজ Inner Spirit বাদ দিয়ে বহিরাচারের শত নাগপাশে বাঁধা। যে ব্রহ্মসংহিতার উপর ভিত্তি করে বৈষ্ণবধর্ম্ম, তাতে বৃন্দাবন এবং গোকুল সম্বন্ধে কি বলেছে দেখ,—

"সহস্র পত্র কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদং
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশ-সম্ভবং

—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে মহৎ ধাম তার নাম গোকুল, এটি সহস্রদল পদ্মবিশিষ্ট। এই পদ্মের কর্ণিকা সকল, অনন্তদেবের অংশভূত যে স্থান, তার নাম গোকুল"।

একজন মরমী বৈষ্ণব সাধক কী সুন্দরভাবে এই সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব একটি গানের মধ্যে প্রকাশ করে গেছেন শোন,—

"যদি বৃন্দাবন এত ভালবাস হৃদি বৃন্দাবন বিহারী,
আমার এ হৃদিবৃন্দাবনে (বল) কিসের অভাব আছে হরি?
রয়েছে সরল সুষুম্না-যমুনা, পঞ্চবিধা রসে রহিয়াছে পূর্ণা;
কেশীঘাট বংশীবট আদি করি, ষট্চক্রে ছ'টি কুঞ্জ আছে হরি,
মূলাধারে রাধা কুলকুণ্ডলিনী, তোমার বিরহে আছেন বিষাদিনী,
বিরহ-বিধুরা আছেন অচৈতন্য, রসিক-নাগর করহে চৈতন্য
বংশীগানামৃত বরিষণ করি।
হৃদয়কদম্ব অনাহতে বসি, 'রাধা রাধা' বলি বাজাও শ্যাম বাঁশী,
শুনি বংশীধ্বনি রাই উন্মাদিনী,
রসে রসবতী রসাপ্লুত হয়ে,
মহাভাবাবেশে দোলা খেয়ে খেয়ে,
ভেটিবেন তোমা সহস্রারোপরি।
শুনিয়া সে তান, হয়ে আনন্দে পূরিত
সহস্রারে কিবা তড়িত জড়িত,
অপূর্ব্ব আলোকে প্রাণ বিমোহিত,
সমাধিস্থ হবো সব পরিহরি।"

পরব্রহ্ম-Region এ যে অপ্রাকৃত বৃন্দাবন সেই চিন্ময় ভূমির Presiding Deityকে 'কৃষ্ণ' বলা হয়। ওখান থেকে যে sound-current আসে তার সঙ্গে জীব যুক্ত হলেই তা আকর্ষণ করে "কৃষ্ণভূমি সেই সহস্রার কর্ণিকোপরি গোকুলাখ্য মহাপুরী"তে নিয়ে যাবে। এটি আকর্ষণ করে বলে এর নাম, এই attribute অনুযায়ী 'কৃষ্ণনাম' দেওয়া হয়েছে। কাজেই কৃষ্ণনাম বলতে 'কৃ' 'ষ্ণ' এই অক্ষরগুলির সংযোগে বর্ণাত্মক নাম নয়; ঐ Current জীবের মন প্রাণকে অন্তরপথে হরণ করে নিয়ে যায় বলেই তা 'হরিনাম'; 'হরি' এই বর্ণাত্মক কথাটা নয়। যেমন আজকাল ঠাকুর-দেবতার নাম অনুযায়ী ইন্দ্র, চন্দ্র, রাম, নারায়ণ, কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, বাসুদেব ইত্যাদি রাখা হয় তাই বলে ইন্দ্র সান্যাল, হরি বসু, রাম চ্যাটার্জ্জী, বাসুদেব মিত্র—কেউ ঐ সব ঠাকুর দেবতা বা ঐতিহাসিক পুরুষ ন'ন, তেমনি ব্রহ্ম-পরব্রহ্মভূমির অধিষ্ঠাতা দেবতার নামানুযায়ী বাসুদেবের পুত্রের নাম কৃষ্ণ বা দশরথের পুত্রের নাম রাম রাখা হয়েছিল, **তাই বলে তাঁরা কেউ-ই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম পরব্রহ্ম বা ভগবান নন।**

যেমন এর পূর্ব্বে বলেছি, Electric Current ই অন্ধকার দূর করে, আলো, বিজলী কিংবা Electricity প্রভৃতি কথাগুলো নয়, ঐ সব শব্দের দ্বারা current টাকে, Light টাকেই mean করা হয়, তেমনি সহস্রার চক্র থেকে যে Current আসছে, মনুষ্যভাষায় প্রকাশ করলে যা ক্লীং ক্লীং বলে মনে হয়, যার সঙ্গে যুক্ত হলে জীবাত্মাকে সহস্রারে আকর্ষণ করে নিয়ে যাবে, ঐ আকর্ষণী শব্দধারাই হরিনাম কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণের বাঁশী। এই কৃষ্ণনাম একবার করলে অর্থাৎ বারেক ঐ ধারার সঙ্গে যুক্ত হলে সব পাপ তাপ দূরে যাবে; কারণ চেতন রাজ্যের অনুভূতি পেলে জীবের কামনা বাসনা রিপুর তাড়না কিছুই থাকবে না। এই কৃষ্ণের বাঁশী একমাত্র রাধা বা চৈতন্য প্রভৃতি সাধককে ডেকেই খতম হয়ে যায়নি, যে ঐ ধারার সঙ্গে আজও যুক্ত হতে পারবে, সেই হয়ে যাবে আনন্দে বিভোর। সদ্‌গুরুর কৃপাতেই এই Inward Music, ক্লীং—তান, manifested হয়। এই হ'ল যথার্থ 'শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন'; এই সংকীর্ত্তনেই মহাপ্রভু কথিত 'চেতোদর্পণমার্জ্জনম্' 'ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপনম্' হয়, হয় 'শ্রেয়োকৈরব চন্দ্রিকা বিতরণম্' আর 'সর্ব্ব স্নপনম্', বাহ্যিক 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে' বলে চিৎকার করলে নয়। তাই দেখা যায়, সন্তোপ করা যখন

খোলকরতাল সহ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বলে গগণবিদারী ধ্বনি করতো চৈতন্যদেব হয়ে যেতেন সমাধিস্থ। মানে কি ? গুহ্যতত্ত্ব হ'ল এই যে ঐ সমস্ত বাহ্যিক কীর্ত্তন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতো সেই অন্তরি-সংকীর্ত্তন, তিনি যুক্ত হতেন সেই কৃষ্ণ Current এর সঙ্গে। একথা এখানে মনে রাখা দরকার যে, **যার মধ্যে ঐ Sound manifested হয়নি, সে কিন্তু বাহ্যিক কীর্ত্তন করলে ঐ ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে না।** অনুভবী পুরুষ ঈশ্বর পুরীর কৃপায় চৈতন্যদেবের মধ্যে ঐ বাঁশীর তান Song celestial manifested হয়েছিল বলেই বাহ্যিক কীর্ত্তনে তাঁর উদ্দীপন হ'ত, তাতেই বিভোর হয়ে তিনি অর্দ্ধ-বাহ্যদশায় কাটাতেন, অন্যদের শুধু হাত পা ছোঁড়াছুঁড়ি, নর্ত্তনকুর্দ্দন ছাড়া কিছুই লাভ হয় না।

মহাপুরুষদের রূপক, সমাধির ভাষা, মর্ম্মকথা না জেনেই ভণ্ড আর অজ্ঞরা যত সব অনর্থ সৃষ্টি করে'ছ। তাই একজন বৈষ্ণব কবি সাধিকা রাধার মুখ দিয়ে কি ব্যক্ত করেছেন শোন,

"মরম না জানে, ধরম বাখানে, এমন আছয়ে যারা
কাজ নাই সখী তাদের কথায় বাহিরে রহুন তারা।
আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে, ভিতর দুয়ার খোলা
তোরা নিসাড়া হইয়া আয়লো সজনি, আঁধার পেরিয়ে আলা
আলার ভিতরে কালাটি রয়েছে, চৌকি রয়েছে সেথা
সে দেশের কথা এদেশে কহিলে মরমে লাগিবে ব্যথা।"

এর থেকেই আশা করি একটা ধারণা করতে পারবে **নাম** বলতে, **সংকীর্ত্তন** বলতে কোন 'বাহিরের' বস্তু কি না। 'বাহির দুয়ারে কপাট' লাগিয়ে ভিতর দুয়ার' খুললে তবে সে বস্তু লাভ হয়।

আরও ভেবে দেখ, চৈতন্যদেব বলেছেন, 'হরের্ণামৈব কেবলম্' 'হরি' এই 'কথাটি কেবলম্' তো বলেন নি ? হরের্ণাম অর্থাৎ হরির নাম—হরিনাম। পাছে, অজ্ঞরা তালগোল পাকায় এজন্য তিনি Clearly বলে গেছেন 'হরের্ণামৈব কেবলম্'। সপ্তম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়ে মাত্র মুনি শব্দের রূপটা পর্য্যন্ত পড়েছে যে ছাত্রটা সেও জানে মুনি শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে যেমন হয় মুনেঃ (মুনির) তেমনি হরি শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে হয় হরেঃ (হরির)। কাজেই 'হরের্নাম' বলতে

বোঝায় হরির নাম। মুনির কমণ্ডলু বলতে যেমন 'মুনি' এই কথাটা কমণ্ডলু নয়, তেমনি হরের্নাম, হরির নাম বলতে 'হরি' এই বর্ণাত্মক কথাটা নয়। তোমরা কি বলবে বিখ্যাত পণ্ডিত নিমাই এর বিভক্তি জ্ঞান ছিল না? শব্দরূপ জানতেন না? 'হরের্নাম' এই উক্তি কি তাঁর অর্দ্ধবাহ্যদশায় Slip of Tongue ?

শোন ভাই, সহস্রার ভূমি থেকে যে ক্লীং—Sound Current আসছে তার সঙ্গে সদ্‌গুরু কৃপায় যুক্ত হতে পারলে জীবাত্মাকে তা বাহ্যজগৎ থেকে অন্তর্জ্জগতে, তমঃ থেকে জ্যোতির পথে হরণ করে নিয়ে যায় বলেই তাকে এই attribute অনুযায়ী হরি বলা হয়েছে। কিংবা হরি বলতে মহাপ্রভু যে পুরুষোত্তম কে বুঝতেন, সেই পুরুষোত্তম ভূমি হ'তে আগত Current কে, শব্দের ধারাকে, বাঁশীর তানকে হরের্নাম বা **হরির নাম** বলে mean করে বলে গেছেন,

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'।

চৈতন্যদেব কয়েকটি শ্লোকে কতকগুলি উপদেশ দিয়ে গেছেন—নিজ হাতে কোন বই লিখে যান নি। তাঁর সমাধির ভাষা, অর্দ্ধবাহ্যদশার রূপক গূঢ় উপদেশ শিষ্য পরম্পরার মধ্য দিয়ে নানা Colouring মিশে বিকৃত হওয়াই স্বাভাবিক। চৈতন্য চরিতামৃত কৃষ্ণদাস কবিরাজের লিখা, ইনি চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ছিলেন না। শ্রীরূপ সনাতন শ্রীজীব গোস্বামী চৈতন্যদেবের উপদেশ যেমন যেমন নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুভূতিমত বুঝতেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ আবার তার সঙ্গে নিজের মনের Colouring মিশিয়ে চৈতন্যদেবের উক্তি বলে অনেক কথা লিখে গেছেন। তার পরবর্ত্তীকালের বহিরাচারী বৈষ্ণবদের হাতে পড়ে আবার 'সাত নকলে আসল খাস্তা' হয়ে গেছে। যেমন ধরো মহাপ্রভুর উক্তি বলে চৈতন্যচরিতামৃতের,

'এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে'।

এখানের নাম বলতে সবাই বর্ণাত্মক নাম বলে বুঝে রেখেছে। কিন্তু আমার মনে হয়, যদি ঐটিকে মহাপ্রভুরই উপদেশ বলা ধরা হয় তাহলে একটু বিচার করে দেখলেই বুঝতে পারবে এখানেও ধ্বন্যাত্মক নামেরই ইঙ্গিত আছে। 'এক নামাভাস'

বলতে কৃষ্ণ বলতে কি বোঝায়, কৃষ্ণ কে, সেই পরব্রহ্ম পুরুষের নাম মাহাত্ম্য স্মরণ মনন করতে করতে বিষয় বাসনা, ঈশ্বরানুরাগের অভাব ইত্যাদি 'পাপদোষ' যাবে এবং 'আর নাম' বলতে এখানে ঐ ব্রহ্মাণ্ডভূমি (Materio—Spiritual Region) হ'তে আগত 'হরের্নাম'— ক্লীং এই Sound Current কেই mean করা হয়েছে ; এই কৃষ্ণ নাম বাঁশীর তানই জীবকে পৌঁছিয়ে দেবে সহস্রার চক্রে, 'অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে' কৃষ্ণভূমিতে। তাই মহাপ্রভুর উক্তি, **"আর নাম** লইতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে"।

মহাপ্রভু এবং অন্যান্য সাধুরা নামের যে মহিমা গেয়ে গেছেন, সেই **নাম** বলতে প্রকৃতপক্ষে তাঁরা কিসের ইঙ্গিত করতেন, আশা করি এতক্ষণে তা বুঝতে পারছো।

প্রশ্ন :— তাহলে **নাম** বলতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এবং শ্রীমতী রাধিকা যা বুঝতেন, সন্তরাও **নাম** বলতে সেই একই Sound Current, দিব্য শব্দের ধারাকেই mean করতেন ত ?

উত্তর :— না। সন্তরা **সাচ্চানাম** বলতে যা বুঝতেন তা রাধা এবং চৈতন্যের কৃষ্ণ নাম হতে সম্পূর্ণ পৃথক। এই তত্ত্বটি ভাল করে বুঝতে হ'লে একটু বিস্তৃত আলোচনার দরকার। অনুভবী সিদ্ধ মহাত্মাগণ এবং কবীর, নানক, রাধাস্বামী সাহেব, ঘটরামায়ণ প্রণেতা তুলসী সাহেব প্রভৃতি সন্তগণ, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ভেদে এই সৃষ্টিকে তিন ভাগে বিভক্ত করে বর্ণনা করেছেন। সন্তদের অনুভবের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে—তাঁরা স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ভেদে এই তিনটে বিভাগকে (Grand Division) অন্তর পথে পিণ্ডদেশ, অণ্ডদেশ আর ব্রহ্মাণ্ডদেশ বলে বর্ণনা করেছেন। আমাদের মধ্যে তিনটে জিনিষ প্রধান—দেহ, মন, আত্মা। আত্মা ছাড়াও আছেন পরমাত্মা মূল মালিক। এই মূল মালিককে আত্মা দিয়েই অনুভব করা যায়। বৈজ্ঞানিকরা যেমন একটি তত্ত্ব বিশ্লেষণের জন্য স্থূল হতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, কারণের দিকে গবেষণা করে এগিয়ে যান, তেমনি যুগ যুগ ধরে সাধকগণ স্থূল থেকে আরম্ভ করে সূক্ষ্ম, কারণ এবং মহাকারণ তত্ত্বের দিকে এগিয়ে ছিলেন। যিনি যত মূলের দিকে এগুতে পেরেছেন তিনি ততবড় মহাত্মারূপে, প্রজ্ঞাবান ঋষিরূপে, সিদ্ধ, সিদ্ধের সিদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মবিদবরিয়ান, ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ, সাধ, সন্ত এবং পরমসন্তরূপে আখ্যাত হয়েছেন। সন্তরা মূলাধারাদি ষট্‌চক্র সমন্বিত দেবলোকাদিকে বলেছেন

পিণ্ডদেশ। এই ছয়টি স্তর সুষুম্নাতে অবস্থিত—এখানে মায়া এবং মলিনতা বেশী। প্রলয়ে এগুলি লয় হয়, এর উপরে অণ্ডদেশে ছয়টি স্তর আছে সেগুলি কাল রচিত, প্রলয়ে এই সব স্তর এবং এখানকার অধিষ্ঠিত Presiding Dieties লয় প্রাপ্ত হয়। পিণ্ড অণ্ডের অতীত ব্রহ্মাণ্ডদেশ মহাকাল রচিত, এখানে অপেক্ষাকৃত কম হলেও সূক্ষ্ম মায়া বর্ত্তমান আছে। সাধারণ প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডভূমির ছয়টি স্তরের লয় হয় না, কিন্তু মহাপ্রলয়ে লয় হয়! এই ব্রহ্মাণ্ডভূমির অতীত পরম ভূমিই নির্ম্মল চৈতন্যদেশ বা সন্তদের দয়ালদেশ, এখানে মায়ার লেশ মাত্রও নেই, প্রলয়ে বা মহাপ্রলয়ে এই পরমস্তর লয় প্রাপ্ত হয় না। সন্তদের মতে এই সর্ব্বোচ্চতম ধামে গেলে জীবের, সাধকের, তবে পরমগতি লাভ হয়। জীবের হয় সাচ্চামুক্তি। যাই হোক পিণ্ড, অণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড দেশের স্তরগুলির সন্তসদ্‌গুরুর শ্রীমুখ হতে যা শুনেছি— নিম্নদিক থেকে একটা বর্ণনা দিচ্ছি।—

পিণ্ডদেশ।—

১। মূলাধার চক্র, চতুর্দ্দল পদ্ম, Presiding Diety গণেশ ২। স্বাধিষ্ঠান চক্র, ষট্‌দলপদ্ম, Presiding Diety ব্রহ্মা। ৩। মণিপুর-অষ্টদল পদ্ম, Presiding Diety বিষ্ণু ৪। অনাহত-দ্বাদশদল পদ্ম, Presiding Diety কালী দুর্গা ইত্যাদি শক্তি ৫। বিশুদ্ধচক্র, ষোলদল পদ্ম, Presiding Diety শিব। যে স্তরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালী বা দুর্গা তারও উপরের স্তরের অধিপতি বলে শিবকে এঁদের স্বামীরূপে (Master, প্রভু) কল্পনা করা হয়েছে ;—অজ্ঞগণ তা না বুঝে শিবদুর্গার সম্বন্ধকে স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক বলে বুঝে ব.স আছে! এই শিবভূমির নিচে অন্যান্য দেবতাদের স্থান বলে এই কারণেই শিবকে দেবাদি-দেব মহাদেব বলা হয়। ৬। এর উপরের ভূমি আজ্ঞাচক্র-দ্বিদলপদ্ম, ব্রহ্ম-ভূমির অন্তর্গত।

এই ছয়টি ভূমি অণ্ডদেশের অনুকরণে মায়া রচনা করেছে, যাতে সাধক প্রকৃত তত্ত্বের সন্ধান না পায়। "This is the trick of Maya ; She has made in the lower Material Creation an imitation of Kala's Centres ; so that people who really aim at reaching those higher centres, may be deceived by these copies of

Maya and kept in these lowest stages" (Baba Sáwan Singhji)

"আদি মায়া কীন্‌হী চতুরাই, ঝূটবাজী পিংড দেখাই
অবগতি রচন রচী অংড মাহী, তা কা প্রতিবিম্ব ডারা হৈ"

(কবীর)

"এটি হ'ল মায়ার চাতুরী, মিথ্যা পিণ্ডদেশ দেবভূমি সে অণ্ডদেশের অনুকরণে রচনা করে রেখেছে—সাধককে বিভ্রান্ত করার জন্য"

এইবার নিচের দিক থেকে অণ্ডদেশের বর্ণনা দিচ্ছি। এই অণ্ডদেশের নকল উপরে বর্ণিত ঐ পিণ্ডদেশঃ—

১। চতুর্দল কমল, মনবুদ্ধিচিত্ত অহংকার—এই অন্তকরণের centre এটি
২। ষটদল কমল— তিস্‌রা তিলের নিচে। এইখানের শক্তিপ্রবাহ থেকেই জন্ম, অস্তি, পরিণাম, বৃদ্ধি, ক্ষয় এবং মৃত্যুর কার্য্য regulated হয়।
৩। অষ্টদল পদ্ম, তিস্‌রা তিলের (Third Eye Focus) মধ্যে—পঞ্চ তত্ত্ব এবং ত্রিগুণের উৎপত্তি স্থান এটি। ৪। দ্বাদশদল পদ্ম, সহস্রদল কমলের অন্তর্গত ; ৫। শ্বেত শূন্য—এর প্রতিবিম্ব পিণ্ডদেশের বিশুদ্ধচক্রে শ্বেতাম্বর শিবস্থানে পড়েছে ৬। দ্বাদশদল পদ্ম—ত্রিকুটীর নিম্নভাগে। "This is a trick played by Kala ; He has made in the lower planes a copy of the higher centres of Brahmanda Desh, so that people aiming at those higher centres may be deceived by these lower copies and kept there" (Baba Sawan Singhji)

এইবার এই অণ্ডদেশ যে ভূমির প্রতিবিম্ব মাত্র সেই ব্রহ্মাণ্ডদেশ আজ্ঞাচক্র থেকে সহস্রার চক্রের মধ্যে। সহস্রার ভূমির Presiding Diety হলেন নিরঞ্জন পুরুষ, এখান থেকে দশটি ধুন বা নাদ (প্রণবধ্বনি ওঙ্কারও এখান হতে) প্রকট হয়েছে। আসল বিষ্ণুভূমি শিবভূমি এবং ব্রহ্মভূমি (সহস্রদল কমল, এই সহস্রদল কমলের উপরিভাগে পরব্রহ্ম—Region সুরু) এখানে, পিণ্ডদেশে অণ্ডদেশে এগুলির নকল তৈরি করে রেখেছে কাল এবং মায়া সত্যসন্ধানী সাধককে বিভ্রান্ত করার জন্য।

যাক পিণ্ড-অণ্ডদেশের original centre ব্রহ্মাণ্ডভূমির (যেখানকার

Sovereign Lord হলেন পরব্রহ্ম পুরুষ) বর্ণনা দিচ্ছি সংক্ষেপে, নিচের দিক থেকে।—

১। চতুর্দ্দল পদ্ম, ত্রিকুটীর উপরিভাগ ২। ষট্‌দলপদ্ম—পরব্রহ্মভূমির নিচের অংশে ৩। অষ্টদলপদ্ম, পরব্রহ্মভূমির উপরিভাগে ৪। দ্বাদশদলপদ্ম—সহজদ্বীপ ৫। ষোড়শদলপদ্ম. মহাশূন্যমণ্ডল—বুদ্ধদেবের অনুভূত মণিপাদমণ্ডল, বোধিসত্ত্বভূমি এখানে। ৬। দ্বিদলপদ্ম—এটি ভ্রমরগুফার অন্তর্গত—এখানকার Presiding Diety পরব্রহ্ম—এখানেই বংশীধ্বনির মত শব্দ ধারা ঝঙ্কৃত হচ্ছে; এই ধারার সঙ্গে যুক্ত হলে তা আকর্ষণ করে নিম্নতর-পিণ্ড অণ্ডদেশ অর্থাৎ দেবভূমির উপরে আকর্ষণ করে নিয়ে যায় তাই এই ধারাকে কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণের বাঁশী বলা হয়; এই ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তবে যোগেশ্বরগণ পরব্রহ্মে লীন হ'ন (রমন করেন) তাই এই ধারার নাম রামনাম। আর এই কারণেই রহস্যবেত্তা মরমী যোগেশ্বরগণ পরব্রহ্মপুরুষকে কৃষ্ণ বা রাম বলে বলে গেছেন। এখনকার রাম বসু বা কৃষ্ণ চৌধুরীকে যেমন ঐতিহাসিক রাম বা কৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম বলে, অভিন্ন বলে, মনে করা ভ্রম তেমনি ঐ ঐতিহাসিক দশরথ রাজার পুত্র রামচন্দ্র এবং বসুদেব পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকেও সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম পুরুষ বলে স্বয়ং ভগবানরূপে "নরাকৃতি পরব্রহ্ম"জ্ঞানে মনে করাও ভ্রমাত্মক! আবার নরাকৃতি-পরব্রহ্ম জ্ঞানে কৃষ্ণের ধড়াচূড়া অর্চ্চা শ্রীবিগ্রহ পূজা মহাভ্রমাত্মক!!

এই পিণ্ড অণ্ড ব্রহ্মাণ্ডভূমির অতীত নির্ম্মল চৈতন্য ভূমিই হ'ল সন্তদের দয়াল দেশ—এই দয়ালদেশ প্রলয় মহাপ্রলয়ে লয় হয় না; এখানে সূক্ষ্ম মায়া মহামায়ার লেশ মাত্রও নেই। এই দয়ালদেশে গতিলাভই সন্তদের মতে পরম-গতি; কিন্তু অন্যান্য সকলে কেউ পিণ্ড দেশের সর্ব্বোচ্চভূমি কেউ বা ব্রহ্মাণ্ড-দেশের সর্ব্বোচ্চভূমি পর্য্যন্ত অনুভব করে শান্তিলাভকেই পরমগতি বলে বর্ণনা করে গেছেন। এইরূপে সাধকদের শক্তির তারতম্য অনুসারে যিনি যতখানি কাল এবং মায়ার চাতুরী এড়িয়ে অগ্রসর হতে পেরেছিলেন তিনি সেই স্তরকে এবং সেই স্তরের Presiding Diety কেই চরম এবং পরম দেবতা বলে বলে গেছেন। আর এই জন্যই যাঁরা মণিপুর চক্র পর্য্যন্ত অনুভব করেছেন তাঁরা সেখানকার অধিষ্ঠাতা দেবতা বিষ্ণুকেই চরমতত্ত্ব বলে মনে করেছেন; যাঁদের অনাহত চক্র পর্য্যন্ত গতি তাঁদের কাছে কালী তত্ত্বই চরম তত্ত্ব; যাঁদের শিবভূমি পর্য্যন্ত গতি তাঁদের

কাছে শিবই সব ; আর এই অনুভূতির তারতম্য অনুযায়ী, অনুভবী মহাপুরুষদের এক এক জনের অন্তর্ধ্যানের পর তাঁদের নাম নিয়ে স্বার্থপর ভণ্ডগণ সৌর গাণপত্য বৈষ্ণব শাক্ত শৈব ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায় রচনা করে অমৃতের বদলে দিয়েছে হলাহলের জন্ম !

যাই হোক যাঁরা ব্রহ্মভূমি পর্য্যন্ত গতিলাভ করেছিলেন তাঁরা ব্রহ্মতত্ত্ব পরব্রহ্মতত্ত্ব প্রকট করে গেছেন। কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডদেশও beyond Time and Relativity নয় বলে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদেরও অনুভূতির গভীরতা এবং তারতম্য অনুযায়ী—সম্প্রদায়ীদের হাতে পড়ে অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ইত্যাদির বিসম্বাদ চলেছে। নির্ম্মল চৈতন্যদেশ অর্থাৎ সন্তদের সেই 'চৌথেপদ' beyond these three Dimensional Universe, beyond all Decay, Dissolution and Relativity—সেই Absolute Realityর দয়ালদেশ পর্য্যন্ত যাঁরা যাঁরা অনুভব করেছেন সেই কবীর, নানক, রাধাস্বামী সাহেব, তুলসী সাহেব প্রভৃতির পরম অনুভূতিতে কোন ভেদ দেখা যায় না। **এই পরম-ধামের মালিকই হলেন কুল মালিক—সন্তদের দয়াল। ইনিই জীবের মূল ইষ্ট, প্রকৃত উপাস্য।** এঁরই অংশ সুরত ; এই দয়ালধাম থেকে যে দিব্যধারা আসছে—সন্তদের মতে তাই সাচ্চানাম। এরই সঙ্গে সুরত যুক্ত হলে তবে সে কাল মায়ার ফাঁদ এড়িয়ে পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডভূমি অতিক্রম করে প্রকৃত কুল-মালিকের দরবারে পৌঁছাতে পারবে। একমাত্র সন্তসদ্‌গুরুই পারেন এই নামের ধারার সঙ্গে যুক্ত করতে। তাই তিনিই সন্তমতে সাচ্চা গুরু।

সন্তদের এই পরম ধামে পৌঁছবার বহু পূর্ব্বেই কাল আর মায়ার চাতুরীতে অনেক সাধকই বিভ্রান্ত হ'ন, স্থানে স্থানে লয়ও আসে ; এবং যেখানে যেখানে লয় আসে সেই স্থানকেই চরম বলে বোধ হয় ; লয় না আসলে তার পরেও যে আরও আছে তা জানবার জন্য চেষ্টা আসে—এইরূপে সেই এক পরমতত্ত্ব লাভের সন্ধানে সকলেই অমৃতলোকের অভিযাত্রী হয়েছিলেন বটে কিন্তু শক্তির প্রভেদ অনুযায়ী প্রাপ্তিরও প্রভেদ ঘটেছে। পিণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডদেশ অতিক্রম না করতে পারলে কাল এবং মায়ার ফাঁদ অতিক্রম করা যায় না ; মহাপ্রলয়ের পরে পুনরায় জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসতে হয়।

আশা করি আমার ঐ সব বর্ণনা থেকেই মহাপ্রভু বর্ণিত কৃষ্ণনাম বা

Sound current আর সন্তদের বর্ণিত Sound current এর তফাৎ টা বুঝতে পারছো। তবুও আর একটু clearly আলোচনা করা যাক্।

ব্রহ্মাণ্ডদেশের সর্ব্বোচ্চতম ধাম থেকে পরব্রহ্ম-Region থেকে যে Sound current আসছে, তা পিণ্ডদেশের মূলাধার পর্য্যন্ত প্রবাহিত। যেমন একই নদীর শব্দ কোথাও কলকল্, কোথাও গোঁ গোঁ, গমগম্ কোথাও বা কুলুকুলুধ্বনি তেমনি ব্রহ্মাণ্ডভূমির Presiding Dietyর কাছ হতে Immanated হয়ে যে current আসছে, ঐ current ব্রহ্মভূমিতে ঝঙ্কৃত হ'চ্ছে রাং বা ক্লীং রূপে (=কৃষ্ণের বাঁশী =কৃষ্ণনাম) দ্বিদলপদ্মে ওঁঙ্কার প্রণবরূপে (=অনাহত নাদ), ত্রিকুটীমণ্ডলে বেদের চারি মহাবাক্য রূপে চারিধারার প্রকাশ, বিশুদ্ধচক্র শিবভূমিতে বম্‌বম্ ববম্ রূপে (ভণ্ড সম্প্রদায়ী সাধু আর তার চেলারা এই ধারার সঙ্গে যুক্ত হতে না পেরে এই তত্ত্ব না জেনে বম্ বম্ করে গাল বাজিয়ে শিবপূজা সারে !!), অনাহতচক্রে ক্রীং রূপে······মূলাধারচক্রে গাং গাং রূপে। আর এই জন্যই কৃষ্ণের বীজ ক্লীং, রামের বীজ রাং, ব্রহ্মের বীজ ওঁ, কালীর বীজ ক্রীং গণেশের বীজ গাং বলে মুনিঋষি-গণ সমাধির ভাষায় বর্ণনা করে গেছেন।

যে কোন দেবতাকে পেতে হলে সেই সেই দেবভূমি হতে আগত current এর সঙ্গে যুক্ত হ'তে হবে। এই তত্ত্ব অনুভব করতে না পেরে ভণ্ড গুরুরা তাদের চেলাদেরকে বর্ণাত্মক বীজ মন্ত্র জপ করতে দেয় !!!

একটা শাঁক বাজলে একটা ধ্বনি ওঠে, ধ্বনিটাই আসল ; সেই ধ্বনিটাকে মানুষের প্রকাশ যোগ্য ভাষায় প্রকাশ করতে গিযে আমরা বলি 'পোঁ পোঁ' করে শাঁক বাজছে, কখনই বলিনা, ঝুন্ ঝুন্ রবে শাঁক বাজে ! আবার ঘুঙুরের শব্দকে তার ধ্বনিটাকে ভাষার প্রকাশ করতে গেলে বলি ঝুম্‌ঝুম্ শব্দে ঘুঙুর বাজছে ; টং টং রবে নয় ! এইভাবে ঘণ্টাধ্বনিকে প্রকাশ করি টং টং বলে। এখন ধ্বনিটাই আসল ; মুখে আমরা যদি 'পোঁ পোঁ, ঝুম্‌ঝুম্, টং টং' বলি যেমন ধ্বনির ঝঙ্কার উঠবে না, তেমনি ব্রহ্মাণ্ডভূমি থেকে ঐ শব্দের ধারা (Sound Current of the ParBrahm Region) বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্নরূপে অনুরণিত হচ্ছে বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন চক্রে।

ঐ Current এর, মানুষের প্রকাশ যোগ্য ভাষায় বিভিন্ন বর্ণাত্মক নাম দিয়ে তা বারবার জপ বা Repetition করলে কিছুই ফল হবে না। ঐ ধ্বনির

সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ তুমি যদি কালীকে পেতে চাও, তাহলে ক্রীং ক্রীং জপ করলে হবে না, অনাহতচক্রে ক্রীং ক্রীং রূপে ঝঙ্কৃত হচ্ছে যে current, তারই সঙ্গে যুক্ত হতে হবে; ঐ currentই তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে অনাহতচক্রের Presiding Diety কালীর কাছে। রামকৃষ্ণদেব এই ক্রীং-current এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন বলেই মা কালীর দর্শন পেয়েছিলেন। তাই পূর্ব্বেই বলেছি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে অপরে সংকীর্ত্তন করলে, মহাপ্রভুর যেমন ভাবের উদ্দীপন হতো, তিনি 'ক্লীং' ঐ সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মাণ্ডভূমির Sound current এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন, হয়ে যেতেন কৃষ্ণময়, তেমনি রামকৃষ্ণের কাছে কেউ কালীকীর্ত্তন করলে তাঁরও ভাবের উদ্দীপন হ'ত, তিনি তাঁর ইষ্টদেবীর ভূমি থেকে আসছে, যে 'ক্রীং' এই Sound Current তাতে যুক্ত হয়ে কালীময় হয়ে যেতেন। সাধারণ অজ্ঞ জীব ভণ্ড সম্প্রদায়ী সাধু আর ঝুটা মিশনারী গুরু, প্রভুপাদ বাবাজীদের ফাঁদে পড়ে এই তত্ত্ব বোঝে না বলেই কেবল ক্রীং ক্রীং, ক্লীং বা বম্ বম্ জপ করে অন্ধকারে পড়ে রয়েছে।

যাক্ সে কথা; যা বলতে চাইছিলুম, তা এই যে মহাপ্রভু বা বৈষ্ণবদের শ্রীমতী রাধিকা ব্রহ্মাণ্ডভূমির ঐ sound current কেই নাম বলতেন, ঐ ধারাই ছিল তাঁদের কাছে কৃষ্ণের বাঁশী, হরিনাম, 'হরের্ণামৈব কেবলম্'। ব্রহ্মাণ্ডভূমির সর্ব্বোচ্চভূমি পর্য্যন্ত তাঁদের গতি ছিল, ঐ ধামের নামের ভেদ (Inner Secret) তাঁরা জানতেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, সন্তদের মতে ঐ ব্রহ্মাণ্ডভূমি পর্য্যন্ত গতিলাভ করলেও সাচ্চামুক্তি হয় না। কারণ Par-Brahm Region পিণ্ডদেশ, অণ্ডদেশ, দেবভূমি আদির মত প্রলয়ে লয় না পেলেও মহাপ্রলয়ে লয় প্রাপ্ত হয়। কাজেই মহাপ্রলয়ের পর আবার যখন সৃষ্টি আরম্ভ হবে, তখন আবার আসতে হবে। জীবের কিন্তু লক্ষ্য হওয়া উচিত, যাতে না আর Cycle of birth and death এ আসতে হয়। নিম্নতর স্তরগুলির তুলনায় দেবভূমির তুলনায় ParBrahm Region অধিকতর চৈতন্যময়, অক্ষয় অব্যয় আনন্দভূমি বলে প্রতিভাত হলেও সন্তদের দৃষ্টিতে এটি নির্ম্মল চৈতন্যদেশ বা প্রকৃতপক্ষে অক্ষয়—অব্যয়—আনন্দধাম নয়। পরব্রহ্মপুরুষ এই এই পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডভূমির বিভিন্ন স্তরের সাধক সিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞদের কাছে চরমতত্ত্ব, পরমপুরুষ বলে প্রতিভাত হলেও, In relative to নির্ম্মলচৈতন্যদেশ,

সন্তদের মতে ইনি কুল মালিক নন। দয়ালদেশের অধিপতিই প্রকৃত কুলমালিক, জীবের ইষ্ট এবং উপাস্য তিনিই। দয়াল দেশ থেকে, ঐ কুলমালিক পরম-দয়ালের কাছ হতে Immanated হয়ে আসছে যে দিব্য Sound-current সুরত তার সঙ্গে যুক্ত হলে তবে দয়ালদেশে গতি হ'তে পারে, তবেই হবে কুলমালিকের দর্শন লাভ। জীবের এটিই পরমপুরুষার্থ। সন্তমতে ঐ ধারাই সাচ্চানাম।

যাঁর ঐ নির্ম্মলচৈতন্যভূমির সর্ব্বোচ্চতম পরমধাম পর্য্যন্ত গতি হয়েছে, কুল-মালিকের দর্শন লাভ হয়েছে—কেবলমাত্র সেই সাচ্চাগুরু, সন্তসদ্‌গুরুই পারেন রুহ্‌কে (জীবাত্মাকে) এই সাচ্চানাম বা শব্দের ধারার সঙ্গে যুক্ত করে দিতে।

কাজেই সন্তমতে সাচ্চানাম, সারনাম বা সংক্ষেপে নাম বলতে যে নির্ম্মলচৈতন্যভূমির দিব্য Sound-current কে mean করা হয়, তা অন্যান্য মতের, নিম্নতর Region এর Sound-current থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

আলোক-তীর্থ

দ্বিতীয় অর্ঘ্য

প্রথম পুষ্প

প্রশ্ন :— তোমার সব কথাই অদ্ভুত! আশ্চর্য্যজনক! দেব ভূমি লয় পেয়ে যাবে, ব্রহ্মভূমিও লয়প্রাপ্ত হবে, এ কি রকম কথা? যোগি বাঞ্ছিত দেবলোকে বা তদুর্দ্ধে ব্রহ্মভূমিতে গেলেও জীবের সাচ্চামুক্তি হবে না, এসব ত একেবারে আজগুবি বলে মনে হচ্ছে!

উত্তর :— যা সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধির বাইরে, সীমায়িত বুদ্ধি দিয়ে যা বোঝা যায় না, তা আজগুবি বলে মনে হবেই ত! যখন মানুষ কাঠে কাঠে ঘসে আগুন জেলে রান্না করতো, তখন যদি কোন বৈজ্ঞানিক Electric Heater এ electricity দিয়ে রান্না করার অভিনব তত্ত্ব বলতেন, তখন হয়ত তাঁর কথাকে আজগুবি বলে উপহাস করে মানুষ তাঁকে মারতেই আসতো! পাযান ছাড়া যখন কোন গতি ছিলনা, তখন যদি কেউ হেলিকেপ্‌টারের কথা শোনাতো, তখন তাও অজ্ঞদের কাছে আজগুবি বলেই মনে হ'ত! এ সব তো ভাই আমার কথা নয়, আমি কোন নূতন তত্ত্বও শোনাচ্ছি না, কবীর, নানক, শমসেরতবরেজ, দাদু, তুলসী সাহেব প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত বিশ্ববন্দিত সন্ত-পরমসন্তদের উপলব্ধ সত্য। আজও যাঁরা তাঁদের সাধন পথে চলেছেন, সাচ্চানামের সন্ধান পেয়েছেন, তাঁরাও জানেন, এ কথা কতো ধ্রুব সত্য। সন্তদের বাণী বচন থেকে হাজার হাজার quotations দিয়ে ঐ কথার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারি, কিন্তু তার পূর্ব্বে তোমার পরম আদরের গীতাখানি যদি একটু খুলে দেখ তাহলে তোমার সংশয় থাকবে না। যে দেবভূমি

বা ব্রহ্মভূমির লয় শুনে তুমি চমকে উঠছো, গীতাতে তোমার ইষ্ট কৃষ্ণচন্দ্র কিন্তু ঐ চমকপ্রদ, তোমার ভাষায় "আজগুবি" কথা বেশ দ্বর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করে গেছেন—

(১) তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে, মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। [গীতা ৯।২১]

অর্থাৎ বিশাল স্বর্গভোগের পর পুণ্যটুকু ক্ষয় হলেই তাদেরকে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আসতে হয়।

(২) আ ব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জুন। [গীতা ৮।১৬]

এই শ্লোকের শঙ্কর ভাষ্য এবং শ্রীধর স্বামীর টীকা দেখলেই, দেবলোক প্রাপ্তি তো দূরের কথা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হলেও পুনর্জন্ম বন্ধ হবে না।

"আব্রহ্ম ভুবনাৎসহ ব্রহ্ম ভুবনেন লোকাঃ সর্ব্বে পুনরাবর্ত্তিনঃ পুনরাবর্ত্তন স্বভাবাঃ"...ইত্যাদি
(ঐ শ্লোকের শঙ্করভাষ্য)

তুমি বৈষ্ণব, কাজেই বৈষ্ণবমান্য শ্রীধরস্বামী ঐ শ্লোকের টীকাতে কি বলছেন দয়া করে দেখ—"ব্রহ্মণো ভুবনং বাসস্থানং ব্রহ্মলোকস্তমভিব্যাপ্য সর্ব্বে-লোকাঃ পুনরাবর্ত্তনশীলাং **ব্রহ্মলোকস্যাপি বিনাশিত্বাৎ** তৎ প্রাপ্তানাম্ অনুৎপন্ন-জ্ঞানানামবশ্যং ভাবি পুনর্জন্ম—"...ইত্যাদি

"যজ্ঞ দেবতারাধন এবং বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা যদিও ইন্দ্রলোক, বরুণলোক, সূর্য্যলোক এবং বেশী হয়তো ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাপি পুণ্যাংশের সমাপ্তি হইলেই সেই স্থান হইতে পুনরায় এইলোকে জন্ম লইতে হয় (বৃহদারণ্যক ৪-৪-৬), অথবা অন্ততঃ **ব্রহ্মলোকের নাশ হইলেপর পুনর্জ্জন্ম-চক্রে তো নিশ্চয়ই পড়িতে হয়**" [বালগঙ্গাধর তিলককৃত ভাষ্য]

কি হে দেবলোক বা ব্রহ্মলোকে গেলে জীবের সাচ্চামুক্তি হয়ে যাবে, আবাগমন বন্ধ হয়ে যাবে, এ সব কথা কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন কি ?

অবশ্য একথা ঠিক, দেবলোক বা ব্রহ্মলোকে এই পৃথিবীর তুলনায় [In relative to this Physical universe] অধিকতর আনন্দ এবং চেতনতা প্রলয় মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত জীব ভোগ করতে পারে ; কিন্তু এ সব সাচ্চামুক্তি নয়। ঐ সব স্থানের আপেক্ষিক মুক্তির আনন্দ ঠিক কুঁড়েঘর থেকে পাকা বাড়ীতে, পাকা বাড়ী থেকে মার্ব্বেল প্যালেসে, জলাভূমির দেশ থেকে অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ভূমি

কাশ্মীরে যাওয়া বা থাকার আনন্দ বলতে পারো, 'C' class Prisoner's cell থেকে 'A' class Prisoner's cell এ যাওয়ার মতো। But still within the Prison House !

তাই সন্তরা এসবকে মুক্তি বলছেন না। প্রলয় মহাপ্রলয়েরও অতীত ভূমি নির্ম্মল চৈতন্যের দেশে গেলে যে মুক্তি হয়, সন্তদের মতে তাহাই সঠিক মুক্তি, সাচ্চা মুক্তি।

প্রশ্ন :—তোমার মতে তাহলে স্বর্গে যে সুখ তা আপেক্ষিক মাত্র! স্বর্গসুখেও বুঝি ইতরবিশেষ আছে? কোন দেবতার আরাধনা করে তাঁর মাধ্যমে তাহলে অমৃতত্ব লাভ হবে না? তাহলে, "স লোকমাগচ্ছতি অশোকম্ অহিমম্, তস্মিন্ বসতি শাশ্বতী সমাঃ—অর্থাৎ তিনি সেই লোকে উপনীত হ'ন যে লোক অশোক, অহিম; সে লোকে শাশ্বতী সমা বসতি করেন"—ইত্যাদি কথায় শাশ্বতী কথাটি আছে কেন? কেন তাহলে, সোম অগ্নি মিত্রাবরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের নিকট বৈদিক ঋষি প্রার্থনা করেছিলেন (ক) "যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিন্ লোকে স্বহিতং তস্মিন্ মাং ধেহি পবমান্! অমৃত লোকে অক্ষিত। [ঋগ্বেদ ৯. ১১৩. ৭] —যে লোকে অজস্র জ্যোতিঃ, যে জ্যোতিতে সূর্য্য জ্যোতিষ্মান্ সেই অমৃত অক্ষিতলোকে আমাকে উন্নীত কর"। (খ) "ত্বং তম্ অগ্নে অমৃতত্ব উত্তমে মর্ত্ত্যং দধাসি; হে অগ্নি! তুমি মর্ত্ত মানুষকে উত্তম অমৃতত্বে স্থাপন কর" [ঋ ১. ৩১. ৭]" (গ) "হে মিত্রাবরুণ! বৃষ্টিং বাং রাধো অমৃতত্বম্ ঈমহে—তোমাদের ধন বর্ষণ কর, আমরা অমৃতত্বের ভাগী হতে পারি। [ঋ ৫. ৬৩. ১২]"

আর ঐ সব দেবতাদের মাধ্যমে অমরত্ব লাভ হয় বলেই বৈদিক ঋষিরা বলে গেছেন—"অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম অগন্ম জ্যোতিঃ অবিদাম দেবান্; সোমপান করেছি, জ্যোতিঃ দর্শন করেছি, দেবতাদি'কে জেনেছি আর ভয় কি? আমরা অমর হলাম"। তুমি শুধু দেবতার মাধ্যমে কিছু হবে না বললেই হল? 'তে তং ভূক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি', গীতার এই বাক্যটিকে সম্বল করে তুমি স্বর্গকে তুচ্ছ দেবতা পূজা তুচ্ছ বললেই আমরা তা মানবো কেন?

উত্তর :— বাহবাঃ, তোমার যুক্তি! তোমাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তোমরা কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে কেঁদে কেঁদে ধূলিধূসরিত হও, কিন্তু কৃষ্ণবাক্য যেখানে তোমাদের স্বার্থ বিরোধী

বা মত বিরোধী হয়, অমনি তখন আর কৃষ্ণ বাক্য মানতে রাজী হও না! কৃষ্ণকে তোমরা পূর্ণ ভগবান বলে মনে কর, তাই গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণ যে স্বর্গ ভোগকে তুচ্ছ করেছেন, তা তোমাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছি। কিন্তু শুধু ঐ গীতা বাক্যটিকে "সম্বল" করে আমি বলি নি। বেদে উপনিষদে বহু বহু স্থানে স্বর্গভোগ যে তুচ্ছ, স্বর্গেরও যে লয় আছে, তার উল্লেখ আছে, আমি একে একে তা বলছি।

বেদ উপনিষদ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে গেছেন যে, অমৃতত্বে উপনীত হওয়ার পন্থা দেবতা ধরে নয় (তোমরা যে আকারে দেবতা পূজা কর মূর্ত্তি গড়ে, সেই জড়োপাসনাতে ত নয়ই!), দেবতা হয়েও নয়, কারণ দেবতার সঙ্গে সারূপ্য সাযুজ্য হলেও কি হবে! মানুষ তপস্যাবলে দেবত্ব অর্জ্জন করতে পারে, 'যে কর্ম্মনা দেবত্বম্ অভিসম্পদ্যন্তে [বৃহদারণ্যক ৪.৩.৩৩] কিন্তু প্রলয়ের পর আবার যখন সৃষ্টি ক্রীড়া সুরু হবে, দেবলোকের অধিবাসীদেরকে পুনরায় জন্মমৃত্যুর চক্রে দাবার ঘুঁটি হতে হবে! কিন্তু অমৃতের সন্তান অমৃত হতে চায়, যে লোকের ক্ষয় ব্যয় চ্যুতি আছে তা সে চায় না। তুমি বৃহদারণ্যক উপনিষদের যে শ্লোকটি quote করে দেখাতে চেয়েছ সেই লোক অশোকম্ অহিমম্, শাশ্বতী সমা লাভ হয় ওখানে শাশ্বতী সমার অর্থ সুদীর্ঘকাল, শাশ্বতী বলতে ওখানে কালজয়ী অনন্ত অর্থে নয়। মর্ত্ত্যলোকের আনন্দের তুলনায়, Astral Region, স্বর্গরাজ্যের সুখ সুদীর্ঘকাল সন্দেহ নেই, কিন্তু মনে রেখো in relative to that of ব্রহ্মলোক, তা আবার অল্পকাল মাত্র!

তুমি যে সমস্ত ঋগ্ মন্ত্র উদ্ধৃত করে দেখাতে চেয়েছ যে, অমৃত লাভের জন্য ঋষিরা অগ্নি মিত্রাবরুণ ইন্দ্রাদি দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করতেন, ওখানে অগ্নি মিত্র বরুণ ইন্দ্রাদির অর্থ তুমি ঠিক ঠিক বুঝতে না পেরে অর্থ বিভ্রাট ঘটিয়েছ। ঐ গুলি সবই পরমাত্মাবাচক শব্দ; এক একটা attribute অনুযায়ী পরমেশ্বরেরই নাম।

অঞ্চু গতি পূজনয়োঃ—অগ্, অগি ইন্ গত্যর্থক ধাতু; এই সব হতে 'অগ্নি' শব্দ সিদ্ধ হয়। "যোঽঞ্চতি অচ্যতেঽগত্যঙ্গত্যেতি বা সোঽয়মগ্নিঃ", যিনি জ্ঞানস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, জানবার এবং পূজা করবার যোগ্য সেই **পরমেশ্বরের** নাম অগ্নি।

ঞি মিদা স্নেহনে—এই ধাতুর সঙ্গে ঔণাদিক 'ক্ত্রঃ' প্রত্যয় যোগে 'মিত্র' শব্দ সিদ্ধ হয়। "মেদ্যতি স্নিহ্যতি স্নিহ্যতে বা স মিত্রঃ", যিনি সকলকেই স্নেহ করেন

এবং যিনি সকলেরই প্রীতির যোগ্য সেই **পরমেশ্বরের** নাম **মিত্র**।

বৃঞ্ বরণে বর ঈপ্সায়াম ; এই সকল ধাতুর সঙ্গে 'উণাদি' 'উণন' প্রত্যয় যোগে 'বরুণ' শব্দ সিদ্ধ হয়। "যঃ সর্ব্বান্ শিষ্টান্ মুমুক্ষুন্ ধর্ম্মাত্মনো বৃনোত্যথবা যঃ শিষ্টৈর্মুমুক্ষুভির্ধর্ম্মাত্মভির্ব্রিয়তে বর্যাতে বা স বরুণঃ পরমেশ্বরঃ" ; যিনি ধর্ম্মাত্মা বিদ্বান মুক্তিকামী এবং মুক্তকে স্বীকার করেন অথবা যিনি শিষ্ঠ, মুমুক্ষু, মুক্ত এবং ধর্ম্মাত্মাদিগের দ্বারা (বরুণো নামঃ বরঃ শ্রেষ্ঠঃ) শ্রেষ্ঠপুরুষ পরমপুরুষরূপে পূজিত হ'ন, সেই **পরমেশ্বরের** নাম **বরুণ**।

ইদি পরমৈশ্বর্য্যেঃ —এই ধাতুর উত্তর 'রণ্' প্রত্যয় যোগে 'ইন্দ্র' শব্দ সিদ্ধ হয়। "য ইন্দতি পরমৈশ্বর্য্যবান্ ভবতি স ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ", যিনি নিখিল ঐশ্বর্য্যশালী এই জন্য সেই **পরমেশ্বরের** নাম **ইন্দ্র**।

ঐ সব ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং নিগূঢ় মর্ম্মার্থ বাদ দিলেও মিত্র, বরুণ, অগ্নি ইন্দ্রাদি অর্থে যে পরমেশ্বর ধরতে হবে তা ঐ ঋঙ্মন্ত্রগুলির মর্ম্মকথা আরও গভীর ভাবে অনুধাবন করলেই বোঝা যায়। কারণ ভেবে দেখ, ঋষিরা প্রার্থনা করছেন 'অমৃতত্বে', 'উত্তম অমৃতত্বে' প্রতিষ্ঠিত কর। সেই পরমেশ্বরের ধামই অমৃতলোক অক্ষিতলোক, ঐ লোকেরই কোন ক্ষয় ব্যয় নেই বলা যেতে পারে। তাঁরই ধাম জ্যোতির্ম্ময়, পরমপুরুষ পরমাত্মার জ্যোতিতেই সূর্য্য জ্যোতিষ্মান। মিত্র বরুণ অগ্নি আদির ওখানে দেববাচক অর্থ করলে সঙ্গত হয় না। কারণ মিত্র বরুণ অগ্নি আদি দেবতাদের কিংবা কোন Particular দেবতার জ্যোতিতে সূর্য্য তো আর জ্যোতিষ্মান্ নয় ? তাছাড়া ঐ সব দেবতাদের Region, Subtle Universe—স্বর্গলোক "অক্ষিত অমৃতলোক" হতে পারে না। স্বর্গলোকে গেলেও যে "অমৃতত্বে" কিংবা "উত্তম অমৃতত্বে" প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না, তা বেদ উপনিষদের মন্ত্রগুলি পারম্পর্যভাবে বিচার করলে বোঝা যায়। ঋষিরা সেই অজর, অমর, অক্ষর অব্যয় অক্ষয় অদ্বয় পুরুষকে জেনে 'উত্তম অমৃতত্ব' লাভ করেছিলেন, তাকেই শাশ্বত অমৃতত্ব বলা যেতে পারে যে অমৃতত্বে ক্ষয় ব্যয় নেই, অপচয় উপচয় নেই, যে অমৃতত্বের অস্তিকে পুনর্জন্ম ও পুনর্মৃত্যু কোনদিনই অগ্রসর হ'তে পারবে না। তাই ঋষিরা ঐ সব ঋঙ্মন্ত্রে পরমেশ্বরের কাছেই প্রার্থনা করেছেন ; যাঁর জ্যোতিতে সূর্য্য দেদীপ্যমান সেই পরমেশ্বরেরই 'অজিত অমিত অক্ষিত লোকে'

যাওয়ার প্রার্থনা জানিয়েছেন; তোমার Idea মত তুচ্ছ স্বর্গভোগের জন্য নয়, কিংবা স্বর্গস্থ দেবতার মাধ্যমে ক্ষয়শীল স্বর্গলোকে যাওয়ার জন্যও নয়। কারণ স্বর্গভোগ আর স্বর্গস্থ দেবতারা যে তুচ্ছ, তা তাঁরা জানতেন। যা তুচ্ছ তা তাঁদের ঈপ্সিত হবে কেন?

স্বর্গ-সুখ-ভোগেরও যে ইতর বিশেষ আছে, শতপথের ঐ মন্ত্রটি লক্ষ্য করলেই তা বুঝতে পারবে। "স যদ্ বৈশ্বদেবেন যজতে, অগ্নিরেব . তর্হি ভবতি, অগ্নেরেব সাযুজ্যং স লোকতাং জয়তি। অথ যদ্ বরুণ প্রঘাসৈর্যজতে বরুণ এব তর্হি ভবতি, বরুণস্যৈব সাযুজ্যং স লোকতাং জয়তি। অথ যৎ সাকমেধৈর্যজতে ইন্দ্র এব তর্হি ভবতি, ইন্দ্রস্যৈব সাযুজ্যং স লোকতাং জয়তি"। [শতপথ ২. ৬. ৪. ৮.] "তিনি যদি বিশ্বদৈব অনুষ্ঠান করেন তবে তিনি অগ্নি হ'ন, অগ্নির সঙ্গে সাযুজ্য সালোক্য লাভ করেন। তিনি যদি বরুণ প্রঘাস অনুষ্ঠান করেন, তবে তিনি বরুণ হ'ন, বরুণের সঙ্গে সাযুজ্য সালোক্য লাভ করেন। তিনি যদি সাকমেধ অনুষ্ঠান করেন, তবে তিনি ইন্দ্র হ'ন এবং ইন্দ্রের সঙ্গে সাযুজ্য ও সালোক্যলাভ করেন। এখানের মন্ত্রটিতে বরুণ অগ্নি ইন্দ্র বলতে Subtle Universe এর Presiding Dieties কেই mean করা হয়েছে; এদের সঙ্গে পূর্ব্বের ঋক্ মন্ত্রগুলিতে বা বৃহদারণ্যক উপনিষদাদির পরমাত্মাবাচক মিত্র বরুণ ইন্দ্র অগ্নি শব্দগুলিকে confuse করো না।

Subtle Universeএর পতনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব Dietiesও মৃত্যু মুখে পতিত হ'ন; কাজেই এঁদের সঙ্গে পুণ্যফলে যাঁরা সাযুজ্য সালোক্য লাভ করেন, তাঁদেরকেও আবার Cycle of brith and death এ আসতে হয়!

তাই কঠোপনিষদে দেখি নাচিকেতা এই রকম একজন দেবতা যমকে বলছেন—"যম তুমি আমাকে 'চিরজীবিকা' (অমৃতত্ব) দিবে বললে, কিন্তু তোমার সহিত সাযুজ্যে—মাত্র জীবিষ্যামি, যাবদ্ ঈশিষ্যসি ত্বম্ (১-২৭) তুমি নিজেই যখন চিরজীবি নও, তখন আমাকে চিরজীবিকা দিবে কি করে?

ঐ সব দেবতারা মানুষের তুলনায় দীর্ঘজীবি বটে কিন্তু চিরজীবি ন'ন। মনুষ্যলোকের তুলনায় স্বর্গলোক অধিকতর সুখকর স্থান হলেও তা ঋষিদের উদ্দিষ্ট "অক্ষিত অমৃতলোক" নয়। কাজেই তুমি ভাই প্রশ্নচ্ছলে যে সব ঋক্ মন্ত্র quote করেছে, সেখানে ঋষিরা চাচ্ছেন 'উত্তম অমৃতত্ব' 'অক্ষিত' লোকে স্থিতি,

যেখানে 'অজস্র জ্যোতিঃ'; অতএব মিত্র বরুণ ইন্দ্র অগ্নি শব্দগুলি ওখানে পরমাত্মা-বাচক। বৈদিক ঋষিরা পরব্রহ্মকেই পরমেশ্বর বলে বুঝেছিলেন, তাঁদের পরব্রহ্মধাম পর্য্যন্ত গতি হয়েছিল, এই ধামকেই তাঁরা সর্ব্বোচ্চ ধাম বলে জানতেন। এই পরমব্রহ্ম পুরুষের তুলনায় দেবতারা আর তাঁদের ধাম যে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর তা তাঁরা জানতেন।

"বহুনীন্দ্রসহস্রানি দেবানাঞ্চ যুগে যুগে, কালেন সমতীতানি কালোহি দুরতিক্রমঃ" —কত সহস্র ইন্দ্রের কত লক্ষ দেবতার কালের গতিতে পতন হয়েছে, কাজেই কালের গতিকে অতিক্রম করবে?

স্বর্গলোক পতনশীল, স্বর্গস্থ দেবতার উপাসনায় অমৃতত্ব লাভ হবে না, তুচ্ছ দেবতারা মানুষের ইষ্ট বা উপাস্য হতে পারে না এই সব কথা শুনে যে মর্ম্মযাতনা বোধ করছো, গীতাবাক্যও সর্ব্বান্তঃকরণে মানতে চাচ্ছ না, আমার কথাকে "আজগুবি" বলে উপহাস করেছ, শাস্ত্রের কিন্তু বহু বহু স্থানে তোমাদের অতি প্রিয় স্বর্গ আর স্বর্গস্থ দেবতাদের পতনের কথা আছে। গীতা বাক্য ছাড়াও আরও যে কিছু কিছু আমার 'সম্বল' আছে তা একটু দয়া করে দেখ।—

উপনিষদগুলির বজ্র ঘোষণা

যে পুণ্যফলে স্বর্গলাভ হয়, সেই পুণ্যফল যে অনিত্য, যে যে অনুষ্ঠানে স্বর্গগতি হয়, সেই সেই অনিত্য অনুষ্ঠানে যে অমৃতলাভ হবে না, যমরাজ নচিকেতার কাছে তা স্বীকার করছেন—

"জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং, নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং যৎ" [কঠ ২,১০]

'শেবধি' (পুণ্যফল) কখনও নিত্য হয় না, অধ্রুব (অনিত্য) দ্বারা ধ্রুব (নিত্যফল) পাওয়ার সম্ভাবনা কোথায়?

তাইতো মুণ্ডকোপনিষদে দেখতে পাই, ঋষি তাঁর পরীক্ষালব্ধ সত্যকে এই ভাবে প্রকাশ করছেন,

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্বেদম্ আয়ান্ নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। [মুণ্ডক ১,২.১২]

'কর্ম্মার্জ্জিত স্বর্গাদি অস্থায়ী লোকের পরীক্ষান্তে নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে বুঝেছি কৃতের দ্বারা কখনও অকৃতকে, অনিত্যের দ্বারা কখনও নিত্যকে অর্জ্জন করা যায় না'। সেই জন্যই বৃহদারণ্যক উপনিষদেও দেখি, যাজ্ঞবল্ক্য সুকৃতকারীর পিতৃলোকের

উপযোগী, দেবলোকের উপযোগী, প্রজাপতিলোকের উপযোগী, ব্রহ্মলোকের উপযোগী নবতর কল্যাণতর রূপের প্রসঙ্গ করে শেষে বলছেন,

প্রাপ্যান্তং কর্ম্মনস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্

তস্মাৎ লোকাৎ পুনরেতি অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে। [বৃহদারণ্যক ৪,৪,৬]

'ইহলোকে কৃতকর্ম্মের ভোগ দ্বারা অন্ত বা অবসান হলে জীব পরলোক হতে ইহলোকে ফিরে আসে—কর্ম্মণে—আবার কর্ম্ম করবার জন্য'।

ঐ সব থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে স্বর্গ পতনশীল। দেবতার পূজায় দেবতা হয়ে গেলেও এই পতন এড়ানো যায় না। পরলোক থেকে এই অবশ্যম্ভাবী পতনকে বৈদিক ঋষিরা নাম দিয়েছেন 'পুনর্মৃত্যু', Dying over again. কিন্তু জীবের কাছে এই পুনর্মৃত্যুময় ক্ষয়শীল স্বর্গস্থিতি কোন দিনই শ্লাঘনীয় নয়। সে চায় অমৃতত্ব, অক্ষয় অব্যয় আনন্দে নিত্যস্থিতি; যেখানে গেলে তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ, আর জন্মমৃত্যুর চক্রে আবর্ত্তিত হতে হবে না। স্বর্গ বা স্বর্গস্থ দেবতার দ্বারা জীবের অভীপ্সা মেটে না, লাভ হয় না তার শ্রেয়বস্তু। ঋষিরা এই গুহ্যতত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন— তেনাতুরাঃ ক্ষীণালোকাঃ চ্যবন্তে। [মুণ্ডক ১.২-৯] 'এই চ্যুতি বা স্বর্গ হতে পতন পুণ্যক্ষয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।' ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন— এবমেবায়ং পুরুষঃ এভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ সংপ্রমুচ্য পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোনি আদ্রবতি প্রাণায়। [বৃহদারণ্যক ৪৩. ৩৬] 'জীব এই দেহ হ'তে প্রচ্যুত হয়ে পরলোকে কর্ম্মভোগান্তে বিলোম গতিতে ফিরে আসে—প্রাণায়—নূতন প্রাণলাভ করার জন্য।

বেদ উপনিষদের ছায়াবলম্বনে রচিত গীতাতে আছে, জীব অশ্বমেধাদি সোমযাগাদি তপস্যা বলে স্বর্গে যান বটে, প্রচুর স্বর্গভোগও করেন বটে,—তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্র লোকম্ অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ [৯. ২০], কিন্তু সেই বিশাল স্বর্গভোগের পর, ভোগদ্বারা পুণ্যটুকু ক্ষয় হলেই আবার মর্ত্ত্যলোকে তাকে জন্মাতে হয়;—তুমি এই গীতাবাক্য শুনে আঁতকে উঠলেও বেদ উপনিষদ কিন্তু বারবার কি রকম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তোমাদের অতিসাধের স্বর্গলোকের আর স্বর্গস্থ দেবতাদের পতন, জন্ম, মরণ, পুনরাবর্ত্তনের কথা স্পষ্টকরে বলছেন বিচার করে দেখ— স্বর্গলোকম্ অভিবহতি, অহোরাত্রৈর্বা ইদং স যুগভিঃ ক্রিয়তে।

[তৈত্তীরিয় ব্রাহ্মণ ৩ ১০ ১১.২]

'(পুণ্য দ্বারা) জীব স্বর্গলোকে বাহিত হয় বটে কিন্তু অহোরাত্রি তার সুকৃত ভক্ষণ করে'। মর্ম্মার্থ এই যে প্রতি মুহূর্ত্তে সেখানে at the cost of পুণ্য, সুখ সম্ভোগ হয়, পরে অর্জ্জিত পুণ্যের ক্ষয় হলে পুনরায় 'আবাগমন'।

তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতম্ উষিত্বা .... পুনর্নিবর্ত্তন্তে। [ছান্দোগ্য ৫. ১০] 'সম্পাৎ অর্থাৎ পতন পর্য্যন্ত স্বর্গে বাস করে জীব আবার এখানে ফিরে আসে'। মুণ্ডকোপনিষদেরও ঐ বজ্রঘোষণা,

নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্ব
ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি। [১. ২. ১০]

'স্বর্গলোকে ভোগের দ্বারা পুণ্যক্ষয় হলে জীব ইহলোকে বা নিম্নতর লোকে প্রবেশ করে'।

প্রশ্ন ঃ—আপনি দেবতা পূজা মানেন না, দেবতা পূজায় মোক্ষ লাভ হবে না বলে মনে করেন তাই মিত্র বরুণ ইন্দ্রাদি কথার আধ্যাত্মিক অর্থ করে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করে দেখিয়ে দিলেন যে ওগুলি আসলে বিভিন্ন attribute অনুযায়ী পরমাত্মারই নাম। কিন্তু আমার মনে হয় বৈদিক ঋষিরা আমাদের মতই দেবতা-বিশ্বাসী ছিলেন, সরল অর্থেই মিত্র বরুণ ইন্দ্র সূর্য্য আদি ব্যক্তিগত দেবতার পূজা করতেন। "ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রান্যগ্নি ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্য্যন্" [ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ৫২. ৬. সূক্ত]। বেদে এই দেবতাদের কথা তো উল্লেখ আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও 'যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ'—ইত্যাদি শ্লোকে দেবতাদের উল্লেখ আছে, তাহলে দেবতা পূজা মানবেন না কেন? 'অমরাঃ নির্জরাঃ দেবাঃ' অমরকোষের এই কথাতেও দেবতাদের অমরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়; দেবতারা যে সবাই অমর, তাঁরা যে-স্বর্গবাসী সেই স্বর্গে কোন রোগ শোক জরা নাই—একথার উল্লেখ বৈদিক ঋষিরা করে গেছেন।

উত্তর ঃ—আমি যথার্থ অর্থই বলেছি; বেদ কোন হরে নরে তরের লেখা স্থূল অর্থের জড়বাদের গ্রন্থ নয়; বেদ হ'ল আধ্যাত্মিক শাস্ত্র। অধ্যাত্মপুরুষ, ঋষিগণ কূটস্থ হয়ে বেদবাণীর অপরোক্ষানুভূতি লাভ করেছিলেন; কাজেই সমাধিবান ঋষিগণ যোগস্থ হয়ে যে তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করে গেছেন সেই তত্ত্বের 'water মানে জল, সবিতা মানে সূর্য্য' এই ধরণের তথাকথিত "সরল-অর্থ" করলে চলবে কেন? তর্কের খাতিরে তোমার কথামত যদি "সরল অর্থ"ই করি তাহলেও

স্পষ্ট প্রমানিত হয়ে যাবে যে দেবতারা অমর ত নয়ই বরং তাঁদের মানবীয় সত্তাই ছিল, তাঁরা রোগ শোক জরা ব্যাধি হিংসা দ্বেষ রিপুর তাড়নার অধীন ছিলেন!

যাক্ তোমার উদ্ধৃতি ঐ ঋগ্বেদের [১০ম, ৫২, ৬] সূক্ত অনুযায়ী তিন হাজার তিনশত উনচল্লিশ জন দেবতা, পুরাণকারদের হাতে পড়ে পরে তিন কোটি আর তোমাদের মত ধর্ম্মপ্রাণদের হাতে পড়ে তেত্রিশ কোটিতে দাঁড়িয়েছে! কিন্তু ঋগ্বেদ ভাল করে অধ্যয়ন করা থাকলে বুঝতে পারবে তাঁরা দেবতা বলতে তোমাদের মত ঐ সব শীতলা মনসা কালী কাকতালী ষষ্ঠী সুবচনী সত্যপীর ইত্যাদিকে দেবতা বলে মানতেন না; বা ঘটস্থাপনা করে মূর্ত্তিগড়ে ফুলজলনৈবেদ্য পশুবলি দিয়ে বৈদিক যুগের কেউ কখনও পূজার নামে ছেলে-খেলা বা বর্ব্বরতা করে যান নি।

হ্যাঁ সত্য বটে, ঋগ্বেদে তেত্রিশ জন দেবতার উল্লেখ আছে; বৃহদা-রণ্যক উপনিষদেরও তৃতীয় অধ্যায়ে যেখানে জনকের রাজসভায় ব্রাহ্মণগণ ও গার্গীর সঙ্গে ব্রহ্মিষ্ঠ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের তর্কযুদ্ধের বিবরণ আছে, সেখানেও যাজ্ঞবল্ক্য ঋগ্বেদের উল্লিখিত তেত্রিশ জন দেবতার প্রথমে নাম করে, তারমধ্যে প্রধান তিনজন, তারপর সেই একজন, সেই পরব্রহ্ম পুরুষের উল্লেখ করেছেন।

ঋগ্বেদের ঋষি ঐ তেত্রিশ জন দেবতা বলতে কী বা কাকে কাকে mean করেছেন তা "সরল অর্থে" যদি গ্রহণ কর তাহলে সরলপ্রাণ ভাই আমার, তোমার "অমরাঃ নির্জরাঃ দেবাঃ"র ধাঁধাটুকু কেটে যাবে!

অদিতির গর্ভজাত ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু—এই দ্বাদশ আদিত্য; প্রজাপতি পুত্র ধব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাব—এই অষ্টবসু; মৃগ, ব্যাধ, সর্প, নিঋতি, অজৈকপাৎ, অহিবুধ্ন, পিনাকী, ঈশ্বর, দহন, কপালী, স্থানু এবং ভগ—এই একাদশ রুদ্র; আর দ্যু এবং ভূ—এই মোট তেত্রিশ জনকে ঋগ্বেদের ঋষি দেবতা বলেছেন [ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ৩৪, ৩৫ সূক্ত]

শতপথ ব্রাহ্মণ এবং তৈত্তীরিয় সংহিতাতেও এই তেত্রিশ জন দেবতার নাম উল্লেখ আছে।—

আদিতি র্হি অজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব
তাং দেবা অন্বজায়ং ত ভদ্রা অমৃতবং ধব। [ঋগ্বেদ ৫ম]

'হে দক্ষ প্রজাপতে! তোমা হ'তেই তোমার কন্যা অদিতি জন্মগ্রহণ করলেন। তারপর সেই অদিতির গর্ভে যে দেবতারা জন্মগ্রহণ করলেন তাঁরা ভদ্র এবং স্বর্গবাসীর বন্ধু'।

'দেবানাং নু বয়ং জানা ... . (ঋগ্বেদ)'

দেবানাং নু বয়ং জানা প্রবোচাম বিপন্যয়া
উক্‌থেষু শস্যমানেষু যঃ পশ্যাদুত্তরে যুগে॥ [ঋগ্বেদ ১০ম, ১, ৭২ সূক্ত]

'আমরা এই সূক্তে দেবগণের জন্মকথা অতি বিশদভাবে বর্ণনা করবো। কেন না, ইহা উক্‌থ সকলে বর্ণিত থাকলে পরবর্ত্তী লোকেরা তা দেখতে ও জানতে পারবে'।

ঐ ভাবে বৈদিক ঋষিগণ ঐ তেত্রিশ জন দেবতার নাম বর্ণনা করলেও পরবর্ত্তী লোকেরা পুরাণকারদের বিভ্রান্তিকর প্রচারে মুগ্ধ হ'য়ে, সেই এক পরম দয়ালের আরাধনা বাদ দিয়ে কি ভাবে লক্ষ কোটি মনগড়া দেবতাদের মনগড়া মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে পূজা করে চলেছে ভেবে দেখ। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১ এবং ৩৪ সূক্তের মন্ত্রটিতে আছে—

"আ না সত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ
দেবেভির্য্যাতং মধুপেয়মশ্বিনা।"

'হে নাসত্য-অশ্বিদ্বয়! এখানে ত্রিগুণ একাদশ (১১×৩=৩৩) অর্থাৎ তেত্রিশ জন দেবতা সহ মধুপান করতে এস'।

দেবতা শব্দে বর্ত্তমানে তোমরা যা মনে কর, সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা যে তা বোঝাতে চান নি, তা নিচের ঐ ঋঙ্‌মন্ত্র থেকেও বুঝতে পারবে,—

"যস্ত বাক্যং স ঋষিঃ যা তেনোচ্যতে সা দেবতা
তেন বাক্যেন প্রতিপাদ্যং যদ্বস্তু সা দেবতা"।

যাঁর কথা তিনিই ঋষি, যাঁর কথা তিনি বলেন তিনিই দেবতা; সেই ঋষি-বাক্যের প্রতিপাদ্য যা বস্তু তাই দেবতা। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেছেন—'বিদ্বাংসো বৈ দেবাঃ'। 'দিব্যতি প্রতিভয়া দ্যোততে ইতি দেবো দেবতা বা'; যাঁরা প্রতিভা দ্বারা দীপ্তি পেয়ে থাকেন, তাঁরাই দেবতা পদ বাচ্য। যাস্কাচার্য্য তাঁর নিরুক্তে দেবতা বলতে বলেছেন—

'দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা যো দেবঃ সা দেবতা' (৭, ১৫)

দান বা দীপন হেতু যিনি স্বর্গস্থানীয় হ'ন তিনিই দেবতা।

সুখং স্বর্গ—সুখময় স্থানকে স্বর্গ বলা হয়। Astral Regionএ এই আধ্যাত্মিক স্বর্গ বিরাজিত। সাধনা এবং তপস্যার বলে যাঁরা এই জীবনে অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি এবং দেবজ্ঞান লাভ করেন কিন্তু ভোগের ইচ্ছা তবুও থাকে তাঁরাই সূক্ষ্ম জগতে বাস করেন। সেখানে এই পৃথিবীর তুলনায় বহু বর্ষ ভোগ-সুখ সম্ভোগের পর পুণ্যটুকু ক্ষয় হলেই মর্ত্ত্যলোকে এসে জন্মাতে হয়। যাঁরা তপস্যার বলে ঋষিত্ব অর্জ্জন করেন, তাঁরা কারণজগতে স্থিতিলাভ করেন। ঐ সব ঋষিদের স্থিতি এবং প্রাপ্তি দেবতাদের চেয়ে ঢের উপরে; তাই ঋষির কাছে দেবতা সসম্ভ্রমে অবনত। তোমরা ঋষির বংশধর হয়ে হাজার হাজার মনঃকল্পিত দেবতাদের পূজা করে চলেছ কিন্তু মহাতপস্বী ঋষিরা এই দেবতা-দের কাছ থেকেই পূজা পেতেন। তোমাদের অতি প্রিয় পুরাণেই পাবে, দুর্ব্বাশা ভৃগু প্রভৃতি ঋষির চরণ তলে দেবতারা প্রণত; তাঁদের অনুগ্রহ-নিগ্রহের উপর দেবতাদের সম্পদ বিপদ নির্ভর করতো। দুর্ব্বাশার অভিশাপে ইন্দ্রকে স্বর্গভ্রষ্ট হতে হয়েছিল। স্বর্গ কোন নিত্যসুখের স্থান নয়।

ঋষির বংশধর! দেবতা পূজা তোমার সাজে না!

ঋষিভ্যঃ পিতরো জাতাঃ পিতৃভ্যো দেব দানবাঃ (মনু ৩য়, ২০১)

'ঋষিগণ হ'তে পিতৃগণ, পিতৃগণ হ'তে দেব দানব দৈত্য মানবের উৎপত্তি হয়েছে'। মহর্ষি কশ্যপের অদিতিগর্ভ সম্ভূত পুত্রগণ, ধর্ম্মের বিশ্বা, বসু, সাধ্যা নাম্নী পত্নীদের গর্ভোৎপন্ন পুত্রগণ, মহর্ষি ভৃগু ও অঙ্গিরার সন্তান সন্ততিগণই দেবতা নামে পরিচিত ছিলেন; এঁরাই তপস্যাবলে সূক্ষ্মজগতে স্থিতিলাভ করে-ছিলেন; এই সূক্ষ্মজগৎ [সন্তদের মতে পিণ্ডদেশ], তোমার সাধের স্বর্গ কৈলাশ বৈকুণ্ঠ যার অন্তর্গত, তা নিত্য নয়, কালের Jurisdiction এর বাইরে নয়; তাই গীতাতে এবং বহু উপনিষদের পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোকগুলিতে স্বর্গের অনিত্যতা এবং দেবতাদের অনিত্যসত্ত্বার কথা বারবার বলা হয়েছে।

গীতাতে আছে, দেবভক্তগণ দেবতাকে পায় কিন্তু যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ [গীতা ৯, ২৫]; 'দদামি পরমাং গতিং দেবানাং অপি দুর্লভং' ইত্যাদি বাক্য থেকেও আশা করি বুঝতে পারছো দেবতাদের গতি চরম নয়, দেবতার আরাধনায় দেবতা হয়ে গেলেও পরমগতি লাভ হবে না।

এই লোকের তুলনায় সূক্ষ্মজগৎ স্বর্গে সুখের স্থায়িত্ব বেশী। তাই কোষকারগণ বলেছেন 'অমরাঃ নির্জরাঃ দেবাঃ' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওঁরা অমর নন; প্রলয়ে দেবলোকের অন্ত হলে সৃষ্টিকালে পুনরায় তাঁদেরকে জন্মমৃত্যুর চক্রে আবর্ত্তিত হ'তে হয়।

তার পর স্বর্গে যে জরা ব্যাধি মৃত্যু নেই, এ তোমার মত পুরাণভক্ত সুবর্ণপদকপ্রাপ্ত পুরাণরত্নের মুখ থেকে শুনবো আশা করি নি! কারণ, পুরাণে তো দেবতাদের যুদ্ধ, বিগ্রহ, হিংসা, কাপট্য, রোগ, শোক, মৃত্যুর অজস্র প্রমাণ আছে,—

'আদিত্যাঃ বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যা বিশ্বে মরুদ্‌গণাঃ।
ভৃগবোঽঙ্গিরসশ্চৈব হ্যষ্টো দেবগণা স্মৃতাঃ'॥ (বায়ুপুরাণ ২, ২)
'তেষামপি হি দেবানাং নিধনোৎপত্তি উচ্যতে'।
(ঐ ৫অঃ, ৬১)

'অর্থাৎ বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্য, ধবাদি অষ্টবসু, শিব প্রভৃতি একাদশ রুদ্র, মন প্রভৃতি দ্বাদশ জন সাধ্য দেবতা, দশজন বিশ্বদেবতা, উনপঞ্চাশজন মরুদ্ দেবতা, ভৃগুবংশীয়গণ অঙ্গিরার সন্তানসন্ততিগণ সহ দেবগণ অষ্টশাখায় বিভক্ত; ঐ সব দেবতাগণের জন্ম ও মৃত্যুর কথা বলা হ'ল'। ঐ বায়ুপুরাণই বলছে,

দেবান্বয়ে দেবতা হ সপ্ত সম্ভূতয় স্মৃতাঃ
দেবত্বেচ ঋষিত্বেচ মনুষ্যত্বেচ সর্ব্বশঃ॥ (৩১অঃ ৬৩)

'দেবগণের বংশে সাতটি পৃথক পৃথক দেববংশের (সপ্ততন্তু) জন্ম হয়েছে; তাঁরা দেবতাও বটেন, ঋষিও বটেন, মানুষও বটেন'।

কৃষ্ণ যজু পড়ে জানতে পারি—'দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্'।

দেবতাদের রোগ শোক জরা [কৃষ্ণ যজু]

দেবা মনুষ্যাঃ পিতরস্তে অন্যত আসন্।
অসুরা রক্ষাংসি পিশাচাস্তে অন্যতঃ॥ [১২১।১২২ পৃঃ]

'দেবগণ ও অসুরগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; দেবতা মনুষ্য পিতৃগণ একপক্ষে, আর অসুর রাক্ষস পিশাচগণ অন্যপক্ষে ছিলেন'। তোমাদের পুরাণগুলিতে তো ব্রহ্মা দেবরাজ ইন্দ্র প্রভৃতির জন্ম মৃত্যু দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ, ইন্দ্রের নানা কপট আচরণের অসংখ্য আখ্যায়িকা আছে।

তারপর রোগশোকের কথা। দেবগণের রোগ না থাকলে স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমার ও ধন্বন্তরীর কী প্রয়োজন ছিল? পুরাণে পাও কি না যে চন্দ্রের নিদারুণ ইন্দ্রিয়সেবার জন্য যক্ষ্মারোগ হ'লে অশ্বিনী কুমারদ্বয় তাঁকে চিকিৎসা করে নিরাময় ক'রেছিলেন? পুরাণের কথা বাদ দিলেও প্রামাণ্য কৃষ্ণযজুতে পাই,

'অশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজৌ
তাভ্যামেব অস্মৈ ভেষজং করোতি'। [১১৮ পৃঃ]

অর্থাৎ অশ্বিনী কুমারদ্বয় দেবগণের চিকিৎসক, তাঁরা দেবতার জন্য ঔষধ প্রস্তুত করেন। তোমাদের রোগ শোক জরা হীন স্বর্গে চিকিৎসক আর ঔষধ কী প্রয়োজনে লাগতো? কৃষ্ণযজুতে আরও পাই—দেবতারা এক সময় মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হ'লেন—

"দেবা বৈ মৃত্যোরবিভয়ুস্তে প্রজাপতিম্ উপধাবন্"।

ব্রহ্মা তখন তাঁদেরকে ঋক সাম আর যজুর্ব্বেদ পাঠ করতে নির্দ্দেশ দিলেন। কারণ বেদজ্ঞান হলেই আত্মজ্ঞান হয়, আত্মজ্ঞান উদ্ভূত হলেই মৃত্যুভয় আর থাকে না; বাসনাই মৃত্যুভয়ের একমাত্র কারণ। বেদজ্ঞান হলেই বুঝতে পারা যায়, মৃত্যু দেহের পরিবর্ত্তন মাত্র! ছান্দোগ্য উপনিষদেও পাই, "দেবা মৃত্যোর্বিভ্যত স্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশন্"।

দেবগণ মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে বেদত্রয়ী ঋক সাম যজু অধ্যয়ণ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

আশা করি এই সব থেকে বুঝতে পারছো, যাদের রাগ দ্বেষ কাম ভোগবাসনা আছে, রোগ শোক জরা জন্মমৃত্যু আছে, তারা কি করে অমৃতময় হ'তে পারে বা মানুষের উপাস্য হতে পারে? জনম মরণশীল ভোগোন্মত্ত দেবতাদের পূজা করে কি করে তোমরা জন্মমৃত্যুর চক্র অতিক্রম করে অমৃত লাভ করবে?

ভৌতিক বা আধ্যাত্মিক যে কোন দৃষ্টিকোণ (angle of vision) থেকে বিচার করনা কেন, সহজেই বুঝতে পারবে, তোমাদের এই সব নিত্য নূতন কল্পিত হাজারগণ্ডা দেব দেবীর কথা বাদ দাও, বৈদিক ঋষিরা যাঁদেরকে দেবতা বলে mean করতেন তাঁদেরই জন্মমৃত্যুর উল্লেখ করে গেছেন, স্বর্গসুখ যে তুচ্ছ তাও প্রকাশ করে গেছেন।

অধ্যাত্মচেতনার আরও সমুন্নত কোণ থেকে বিচার করলে বুঝতে পারবে, দেবতা বলতেই সেই পরমাত্মাকেই বোঝায়, যে পরমাত্মার উপাসনা ব্রহ্মা প্রজাপতি মহর্ষিগণ পিতৃগণ এবং মহর্ষিপুত্র ঐ তেত্রিশজন দেবতাও করতেন।

'দিবুক্রীড়া-বিজিগীষা-ব্যবহার-দ্যুতি-স্তুত-মোদ-মদ-স্বপ্ন-কান্তি-গতিষু'—এই ধাতু হ'তে দেব শব্দ সিদ্ধ হয়। "যো দীব্যতি ক্রীড়তি স দেবঃ'—যিনি নিজের স্বরূপে নিজেই ক্রীড়া করেন, যিনি ক্রীড়াবৎ এই সহজ সৃষ্টিলীলার আধার; 'বিজিগীষতে স দেবঃ'—যিনি সকলের জেতা কিন্তু স্বয়ং অজেয়; 'ব্যবহারয়তি স দেবঃ'—যিনি ন্যায় অন্যায় ব্যবহারের জ্ঞাতা; 'যশ্চরাচরং জগৎ দ্যোতয়তি'—যিনি সকলের প্রকাশক; 'যঃ স্তূয়তে স দেবঃ'—যিনি সকলেরই স্তবযোগ্য; 'যো মোদয়তি স দেবঃ'—যিনি স্বয়ং আনন্দস্বরূপ, আনন্দময় অপরেরও আনন্দদাতা; 'যো মাদ্যতি স দেবঃ'—যিনি সর্ব্বদাই হর্ষযুক্ত অপরকেও হর্ষিত করেন; 'যঃ স্বাপয়তি স দেবঃ'—যিনি প্রলয়কালে অব্যক্তে সকল জীবকে নিদ্রিত করান; 'যঃ কাময়তে কাম্যতে স দেবঃ'—যাঁর সমস্ত কামনা সত্য, সত্যনিষ্ঠগণ যাঁর প্রাপ্তি কামনা করেন; 'যো গচ্ছতি গম্যতে বা স দেবঃ'—যিনি সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত এবং জ্ঞান স্বরূপ——সেই **পরমাত্মার** নাম **দেব**, তিনিই **দেবতা** পদবাচ্য।

ঋগ্বেদের উল্লিখিত তেত্রিশ জন ঋষিপুত্র দেবতা দৈত্য মানুষ গন্ধর্ব্ব ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যাবতীয় সকল প্রাণীর তিনিই একমাত্র উপাস্য দেবতা; তাই বেদে বা উপনিষদে যেখানে যেখানে দেবতার উপাসনার কথা বলা হয়েছে, সেখানে সেখানে উপাস্যদেব অর্থে **পরমাত্মাকেই** বুঝতে হবে। এই পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে—

'যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ··· ···'

"যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্রঃ রুদ্রঃ মরুতঃ স্তুবন্তি দিব্যৈ-স্তবৈঃ,
বেদৈ-সাঙ্গ-ক্রমোপনিষদৈ গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত গতেন মনসা ধ্যায়ন্তি যং যোগিনঃ,
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ দেবায় তস্মৈ নমঃ" ॥

কাজেই লোকস্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মা বরুণ ইন্দ্র রুদ্রগণ মরুদ্গণ যাঁকে দিব্যস্তব দ্বারা নিত্য স্তুতি করেন, বেদসাঙ্গক্রম উপনিষদাদি শাস্ত্রের লক্ষ্য যিনি, যাঁর মহিমাগানে বেদ-উপনিষদ মুখরিত, যোগিরাজগণ যাঁর চিন্তায় ধ্যান সমাহিত থাকেন,

সুর-অসুর কেউ যাঁর অন্ত জানতে পারেন নি, সে হেন দেব অর্থাৎ **পরমাত্মাই** আমাদের উপাস্য ; তোমাদের ঐ সব মনঃকল্পিত দেবতারা নয়। দেবতা পূজার নামে মূর্ত্তিগড়ে নানারকম ছং ভং কৌতুক সহ তোমরা যে পুতুল খেলা খেল, তাতে মুক্তিলাভ দুরাশা মাত্র !!

দ্বিতীয় পুষ্প

প্রশ্ন :— মূর্ত্তিগড়ে পূজাকে আপনি 'ছং ভং কৌতুক' বলছেন কিন্তু ভগবান রামচন্দ্র নিজে দুর্গাপূজা করেগেছেন মূর্ত্তিগড়ে, অকালবোধন করেছেন ; হনুমানকে দিয়ে মানস সরোবর থেকে একশত আটটি নীলপদ্ম আনিয়ে দেবীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলেন। দেবী ছলনা করে একটি পদ্ম হরণ করায় কমল আঁখি রাম তাঁর একটি নীলপদ্ম সদৃশ চক্ষু উৎপাটন করে দেবীর পায়ে অর্ঘ্য দিতে চেয়েছিলেন। তদনুযায়ী ভারতের সর্ব্বত্র আজও অকালবোধন শরৎকালে শারদীয়া মহাপূজা চলে আসছে ! এ সবও কি মিথ্যা ?

উত্তর :— হ্যাঁ সর্ব্বৈব মিথ্যা। রাম দুর্গাপূজা করেন নি। মূল বাল্মীকির রামায়ণে তা নেই। এটি হ'ল বাঙ্গালীর উদ্ভাবন। কবি কৃত্তিবাস তাঁর বাংলা রামায়ণে অপূর্ব্ব কাব্যসম্পদে পুষ্ট করে এই দুর্গাপূজাকে বিখ্যাত করে গেছেন। এ সম্বন্ধে আমি বিস্তৃত অলোচনা করছি ক্রমে ক্রমে, তার পূর্ব্বে, আমি তোমাকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি যদি রাম দুর্গাপূজা করে থাকতেন, তাহলে রাম তো লঙ্কাযুদ্ধকালে (তোমাদের আখ্যায়িকানুযায়ী) দেবী যখন রাবণকে কোলে করে রথের উপর আবির্ভূত হলেন, তখন নিরাশ হয়ে বিভীষণের পরামর্শে দেবীকে তুষ্ট করবার জন্য লঙ্কাতেই তো এ পূজার অনুষ্ঠান করেছিলেন ? পরে লঙ্কাতে তো তাঁরই অনুগত ভক্ত বিভীষণ রাজা হয়েছিলেন ; তাহলে লঙ্কাতে—বর্ত্তমান সিংহলে—তো এ পূজার প্রচলন থাকতো ? তা নেই কেন ? অযোধ্যার রাজা ছিলেন রামচন্দ্র। তাঁর দেহান্তের পর, তাঁর বংশধররা যাঁরা সিংহাসনে বসেছিলেন, তাঁরা কেন তাঁদের পূর্ব্বপুরুষ, ঐ রকম কুলগৌরব রামচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কেউ দুর্গাপূজা করেন নি ? অযোধ্যাতেই বা দুর্গাপূজার প্রচলন নেই কেন ?

এ সব কাহিনী পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ড। বৃহৎ নন্দিকেশ্বর পুরাণ, কালিকা পুরাণ দেবী ভাগবত ইত্যাদি অর্ব্বাচীন গ্রন্থ—যা তান্ত্রিক সাধুসন্ন্যাসী

ভক্তরা দুর্গার মহিমা বাড়াবার জন্য রচনা করেছিলেন—তারই উপর ভিত্তি করে কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে উল্লেখ করে গেছেন।

রামের নাম নিয়ে ছং ভং কৌতুক!

রামচন্দ্র ভারতবাসীর প্রাণপুরুষ, আদর্শ পুরুষ। রামকে দিয়ে দেবী পূজা করার কাহিনী রটাতে পারলে বিনা বিচারে সবাই দেবী পূজা করবে, এই জন্যই তাঁরা এ সব করেছিলেন। গবেষণাতে জানা যায় শাক্তদের শক্তি বড়, না, বৈষ্ণবদের বিষ্ণু বড়, শৈবদের শিব বড় কিংবা সৌরদের সূর্য্য বড় এই পুরানো দ্বন্দ্ব থেকেই ঐ সমস্ত গ্রন্থের সৃষ্টি! বিষ্ণুপুরাণে দেখ, বিষ্ণুভক্তরা বিষ্ণুকেই আদি অনাদি পুরাণ পুরুষ বলে বর্ণনা করে, in support of their view, দেবীকে দিয়ে বিষ্ণুর পূজা করিয়েছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে দেখ, দুর্গা হরিব্রত করছেন! আবার দেবী ভাগবতের সব অদ্ভুত কাহিনী পড়ে দেখ, সেখানে দেবীই অনাদি কারণ, পরমতত্ত্ব, বিধি বিষ্ণু শিব-প্রসবিনী ত্রিলোক তারিণী তারা; ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সবাই তাঁর চরণে প্রণত!

এই ভাবে, ভারতবর্ষে যখন শাক্তদের প্রাধান্য ছিল, তখন তাঁরা পদ্মপুরাণ দেবী ভাগবত, বৃহৎ নন্দিকেশ্বর পুরাণ, কালিকা পুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ রচনা করে নানা অলৌকিক আখ্যায়িকা বর্ণনা করে গেছেন, যাতে দেবীর প্রতিই সাধারণ মানুষের পরিপূর্ণ বিশ্বাস জন্মে। সাধারণ ভদ্রলোক ছাপার অক্ষরে যা দেখে, তাই ধ্রুব সত্য বলে গ্রহণ করে; তা যদি আবার দেবভাষা সংস্কৃতে রচিত হয় তাহলে তো আর কোন কথাই নেই! সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য, যে পরিমাণ সত্যানুসন্ধিৎসা, গবেষণা এবং অধ্যবসায়ের দরকার, সাধারণ মানুষের তা নেই। সেইজন্য যখন যেটি সমাজের পণ্ডিত ব্যক্তিরা চালু করে গেছেন, আবার তা যদি তৎকালীন রাজা মহারাজা দ্বারা সমর্থিত হয়, তাহলে সবাই সেই প্রথা বা আচারকেই অনুসরণ করে চলে। যে সময় রাম রাজা হয়েছিলেন, সে সময় ঐ সব পুরাণ-উপকথার অস্তিত্বও ছিল না; ভদ্রলোকদের মধ্যে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য এক সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ব্যক্তিরা 'ব্যাসোবাচ' 'শিবোবাচ' ইত্যাদি বাক্য দিয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করে যে যার ইষ্টের প্রাধান্য স্থাপন করে গেছেন। রাম যেহেতু সকলের বরেণ্য পুরুষ, এ জন্য শাক্তরা রামকে দিয়ে দুর্গাপূজা করার কাহিনী উদ্ভাবন করে সমাজে চালু করে গেছেন।

বিচার করে দেখ, রাম যদি দুর্গাপূজা করে থাকতেন, তাহলে বাল্মীকির চেয়ে সে সম্বন্ধে আর কে তা ভাল জানবেন? মনে কর, তোমার জীবনী যদি কেউ লেখেন, যিনি তোমার সমসাময়িক, তোমার ব্যক্তিগত জীবনের সমূহ ঘটনা যাঁর নখদর্পণে, তাঁর লেখা তোমার জীবনেতিহাস প্রামাণ্য হবে, না, তোমার জন্মের পর দশহাজার বছর পরে জন্মে, কেউ যদি তোমার সম্বন্ধে কতক কিম্বদন্তি, কতক কল্পনার রঙিন আবেগ মিশিয়ে জীবনী রচনা করে তার কথা প্রামাণ্য হবে? বাল্মীকি রামের সমসাময়িক ছিলেন। রামের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনা এমন কি লঙ্কাযুদ্ধকালে কার পর কে রথী হয়েছিলেন, কোন অস্ত্র কে ত্যাগ করেছিলেন—তারও বিস্তৃত বিবরণ বাল্মীকি তাঁর রচিত রামায়ণে দিয়েছেন, রাম যদি দুর্গাপূজা সত্যই করে থাকতেন তাহলে বাল্মীকি তাঁর মূল সংস্কৃত বামায়ণে এরকম একটি প্রধান ঘটনার বিন্দু বিসর্গও উল্লেখ করেন নি কেন? আর রামের সমসাময়িক প্রাচেতস্ বাল্মীকি যা জানলেন না, তা রামের বহু শত বৎসর পরে ফুলিয়ার কৃত্তিবাস জানলেন কি করে?

রাম কর্তৃক দুর্গাপূজার কুসুমিত পল্লবিত অলীক কাহিনীটি কবি কৃত্তিবাসের সৃষ্টি! তিনি মূল বাল্মীকি রামায়ণকে কোথাও সংক্ষিপ্ত করেছেন, কোথাও বা পুরাণ উপকথার কিংবদন্তির সঙ্গে নিজের অপূর্ব্ব কল্পনা ও কবিত্ব মিশিয়ে ঘটনাকে বহুভাবে বিস্তৃত করেছেন, নূতন বিষয়ের অবতারণাও করেছেন।

মূল বাল্মীকি রামায়ণ যদি কারও পড়া নাও থাকে তাহলেও 'কবি কৃত্তিবাস ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন ব্যাপারে, গঙ্গোত্রী হতে বেরিয়ে গঙ্গা যে সমস্ত পার্বত্যভূমির উপর দিয়ে ব'য়ে এসেছে তার উল্লেখ না করে, মোড়তলা আকনা মাহেশ নবদ্বীপ প্রভৃতি বাংলার যে সমস্ত গঙ্গাতীরবর্ত্তী গ্রাম নগরাদির উল্লেখ করেছেন তা থেকেই সহজে বুঝতে পার এ সমস্তই তাঁর সংযোজনা এবং এগুলি সঠিক নয়।

"আকনা মাহেশ গঙ্গা দক্ষিণ করিয়া
বিহরোদের ঘাটেতে উত্তরিল গিয়া।"

(আদিকা৩, কৃত্তিবাসের রামায়ণ)

রামের দুর্গাপূজার গল্পটিও এই ধরণের একটি সংযোজনা মাত্র। বাল্মীকি রামায়ণ পড়লেই বুঝতে পারবে, যখন লঙ্কাযুদ্ধ সুরু হয় তখন আশ্বিন কার্ত্তিক মাস, শরৎকাল শেষ হয়ে গেছে। বালীবধের পর রাম সুগ্রীবকে বলছেন, 'এখন চার

মাস বর্ষাকাল (আষাঢ় হতে আশ্বিন), এখন যুদ্ধোদ্যোগের সময় নয় ; কার্ত্তিক মাস পড়লে রাবণ বধের আয়োজন করবে, এখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর'।

মূল বাল্মীকি রামায়ণে দুর্গাপূজার কথা নেই !

(১) "প্রবৃত্তাঃ সৌম্য ! চত্বারো, মাসাঃ বার্ষিক সঞ্জকাঃ।
নায়মুদ্যোগ সময়ঃ, প্রবিশ ত্বং পুরীং শুভাম্ ॥"

(কিষ্কিন্ধাকাণ্ড মূল বাল্মীকি রামায়ণ)

(২) "কার্ত্তিকে সমনুপ্রাপ্তে ত্বং রাবণবধে যত
এষ ন সময়ঃ সৌম্য ! প্রবিশ ত্বং স্বমালয়ম্" (ঐ)

কাজেই তোমাদের সাড়ম্বরে দুর্গাপূজায় পরবর্ত্তীকালে মেতে উঠবার সুযোগ দেওয়ার জন্য শরৎকালে রামের শারদীয়া দুর্গাপূজার অবকাশ কোথায় ? তাও আবার লঙ্কাতে, রাবণ বধের সময় ? লঙ্কাতে, ওঁার যাওয়ার পূর্ব্বেই তো আশ্বিন মাসটি গত হয়েছিল ! সীতার অন্বেষণ করতে করতেই আশ্বিন মাস বহু পূর্ব্বেই যে গত হয়ে গিয়েছিল তা সীতান্বেষণরত হতাশ বানর পুঙ্গবদের কথাতেই বোঝা যায়—

"বয়মাশ্বযুজে মাসি কাল সংখ্যা ব্যবস্থিতা,
প্রস্থিতাঃ সোঽপিচা তীত কিমতঃ কার্যমুত্তমম্ ? (ঐ)

তবুও যদি কৃত্তিবাসের বর্ণনাকে প্রামাণ্য ধরে, তাঁর বর্ণিত রামের দুর্গাপূজাকে সত্য বলে ধরে নিয়ে একটা Spiritual importance দাও, তাহলে ঐ কৃত্তিবাসী রামায়ণেরই ঘটনাগুলি পারম্পর্য্যক্রমে বিচার করলেই দেখতে পাবে, তোমাদের আশ্বিন মাসের শারদীয়া দুর্গোৎসবের মূল ভিত্তি টিকবে না। 'রাম আশ্বিন মাসে এই দুর্গাপূজা করেছিলেন' বলে তোমরা যে দুর্গাপূজার নামে আজকাল কলিকৌতুক কর আর মূর্ত্তির প্রদর্শনী খোল, তার মূলে কোন সত্য নেই।

কৃত্তিবাসের বর্ণানুযায়ী বালি বধের পর সুগ্রীব যখন কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে বসেন তখন বর্ষাকাল। ;সীতা বিরহে রামচন্দ্রের দুঃখের অন্ত নেই।

"কাঁদিতে কাঁদিতে গেল সে শ্রাবণ মাস
রামের ক্রন্দনে গীত গায় কৃত্তিবাস"।

[কিষ্কিন্ধাকাণ্ড]

রাজ্যসুখে মত্ত সুগ্রীবকে লক্ষণ গিয়ে তিরস্কার করে আসার পর হনুমানকে সুগ্রীব বললেন—

'পাঠাও হে দূতগণে দেশ দেশান্তর
দশ দিন মধ্যে যেন আইসে সত্বর" [ঐ]

ভাদ্র মাসের দশ দিনে তাহলে বানর সৈন্যরা সমবেত হ'ল, দলে দলে ভাগ করে সুগ্রীব তাদেরকে নানাদিকে সীতার খোঁজ করতে পাঠালেন ; হুকুম দিলেন,

"যেই বীর মাসেকের মধ্যে না আইসে
সবংশে মরিবে সেই আপনার দোষে"। [ঐ]

ঐ কৃত্তিবাসী রামায়ণেই আছে, একমাস গত হয়ে গেল, অঙ্গদ হনুমানাদি সীতার কোন সন্ধান না পেয়ে যখন প্রায়োপবেশনে মরতে চাইছেন, সেই সময় জটায়ুর ভাই সম্পাতি তাঁদেরকে রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণের সংবাদ দিলেন। কি ভাবে সমুদ্র লঙ্ঘন করে লঙ্কাতে যেতে হবে তাও বলে দিলেন। তাহলে **সম্পাতির কাছে সীতার খবরই পেলেন তাঁরা আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি** ! তারপর হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন, অশোকবনে সীতাদর্শন, লঙ্কাদহন, ফিরে এসে রামচন্দ্রকে সীতাদত্ত অভিজ্ঞান উপহার, বানর সৈন্য সংগ্রহ সবকে পরিচালিত করে সমুদ্রতীরে আনয়ন প্রভৃতি ব্যাপার ঘটতে ঘটতে আশ্বিন মাস থাকছে কি ? তারপর এক মাস লাগলো শুধু সমুদ্র বন্ধন করতে।

"আনন্দে করয়ে নল সাগর বন্ধন
এক মাসে বাঁধা হল শতেক যোজন " [কৃত্তিবাস]

তারপর লঙ্কাতে পৌঁছেও,

"পঞ্চ দিন উভয় সৈন্যের সমাবেশ
পরস্পর কেহ কারে নাহি করে দ্বেষ" [ঐ]

লঙ্কাযুদ্ধ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তো আর রাবণের সঙ্গে রামের যুদ্ধ হয় নি, দেবী দুর্গাও রাবণকে রক্ষা করতে ছুটে আসেন নি, বা তাই দেখে রাম মূর্ত্তি গড়িয়ে দুর্গাপূজায় বসে যান নি ! কৃত্তিবাসেরই বর্ণনানুযায়ী অনেক রাক্ষস সেনাপতি মরলো, তরনীসেন, অতিকায়, ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণাদির মৃত্যুর পর রাবণ যুদ্ধে এলেন আর রামের বাণে পর্য্যুদস্ত হয়ে নিতান্ত অসহায় ভাবে কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা জানালেন দেবী দুর্গার কাছে ;

"স্তবে তুষ্টা হয়ে মাতা দিল দরশন
বাসলেন রথে কোলে করিয়া রাবণ"। (লঙ্কাকাণ্ড)

আর তাই দেখে রাম করলেন অকাল বোধন ? বিভীষণের পরামর্শে করলেন দুর্গাপূজা ? এই তো তোমাদের দুর্গোৎসবের উৎস ? সমস্ত ঘটনার সময় এবং কাল পর্য্যালোচনা করে দেখ, কৃত্তিবাসেরই বর্ণনানুযায়ী, **ঐ সময় শরৎকাল গত হয়ে গেছে কতো দিন আগে !** তবুও কি বলবে আশ্বিন মাসে রাবণ বধের সময়, রামচন্দ্র মৃত্তিগড়ে অকাল বোধন পূর্ব্বক দুর্গাপূজা করেছিলেন ?

প্রথম দুর্গাপূজার অনুষ্ঠাতা কে ?

প্রশ্ন :—আমরা এত ভুলে আছি ! মূল বাল্মীকি যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন আমরা কি তারই উপর ভিত্তি করে পূজা করে চলেছি ? আচ্ছা, তাহলে দুর্গাপূজা কি শুধু বাংলা দেশেই হয় ? আর ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে প্রবাসী বাঙ্গালী আছেন তাঁরাই দুর্গাপূজা করেন ? এই দুর্গাপূজা বাংলাদেশেই কখন থেকে সুরু হ'ল ?

উত্তর :—তোমার ধারণাই ঠিক ; এই দুর্গাপূজা বাঙ্গালীরই সৃষ্টি। ভারতের সর্ব্বত্র আমরা এই পূজাকে জনপ্রিয় করে তুলেছি। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজসাহীতে তাহেরপুরের ভুঞ্যা রাজা ছিলেন কংসনারায়ণ খাঁ। ['বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', ডাঃ দীনেশ সেন]। তিনি যজ্ঞ করতে মনস্থ করায় তাঁর পুরোহিত এবং শ্রেষ্ঠ সভাপণ্ডিত, (নাটোরস্থ বাসুদেবপুর গ্রামের) পণ্ডিত রমেশ চন্দ্র শাস্ত্রী তাঁকে জানালেন "চার রকম যজ্ঞ আছে (ক) রাজসূয় (খ) রাজপেয় (গ) বিশ্বজিৎ এবং (ঘ) অশ্বমেধ। প্রথম তিনপ্রকার যজ্ঞ, স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাজচক্রবর্ত্তী দিগ্বিজয়ী বীরের অনুষ্ঠেয়, আর অশ্বমেধ বা গোমেধ যজ্ঞ ক'লতে অচল। তবে আপনার ইচ্ছা পূরণের জন্য ঐ সব যজ্ঞেরই অনুরূপ এক মহা আড়ম্বরময় মহাপূজার ব্যবস্থা আমি করে দিব" এই বলে, তিনি বর্ত্তমানে তোমরা যে মহাঘটা করে দুর্গাপূজা কর, তার সমস্ত মন্ত্র পদ্ধতি নিয়মাদি রচনা করে দিলেন। রাজা কংসনারায়ণ খাঁ এই দুর্গাপূজায় তখনকার দিনে প্রায় আট লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। [রাজা কংসনারায়ণ খাঁর বংশধর, কাশী ধর্ম্মমহামণ্ডলের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়ও প্রাচীন দলিল ও কাগজপত্র দৃষ্টে এই কথা সমর্থন করে গেছেন]।

সারা বাংলায় এই মহাপূজার সংবাদ কুসুমিত পল্লবিত আকারে ছড়িয়ে পড়লো ; অন্যান্য রাজারাও আপন আপন ঐশ্বর্য্য, আড়ম্বর এবং পৌরুষ

দেখাবার জন্য এই ব্যয়বহুল পূজার অনুষ্ঠান করতে লাগলেন। মহাকবি কৃত্তিবাস ছিলেন এই ভূঞ্যারাজা কংসনারায়ণেরই সভাকবি। তিনি তাঁর রচিত রামায়ণে তাঁর অদ্ভুত কল্পনা এবং কবিত্বের বর্ণাঢ্য আলোক সম্পাতে রামচন্দ্রকে দিয়ে অকাল বোধনাদির কাহিনী ভক্তিস্নিগ্ধ ভাষায় প্রকাশ করলেন। আর তোমরাও, Spiritual point of view থেকে এর কোন ফল আছে কিনা, সত্য সত্যই এতে কোন পরমার্থলাভ হতে পারে কি না তা ভেবে না দেখে বাংলা রামায়ণের কথা কাহিনীকে অনুসরণ করে চলেছ! সারাদেশ দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে কবলিত হয়েছে, সর্ব্ববিধ্বংসী বন্যায় লক্ষ লক্ষ গৃহহীন হয়েছে, পথের পাশে কচি-কাঁচা কতো সবুজ প্রাণ একমুষ্ঠি অন্নের অভাবে অকালে শুকিয়ে গেছে; হয়েছে কতো মহত্তম সম্ভাবনার অঙ্কুরে বিনাশ; তবুও তোমরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করনি। পল্লীতে পল্লীতে হাজার হাজার টাকার চাঁদা তুলে জড় মূর্ত্তিপূজার মাধ্যমে আনন্দময়ীর আবাহনের প্রহসন করে চলেছ! কী নিষ্ঠুর পরিহাস! ব্রাহ্মণ এসে তোমাদের চণ্ডীমণ্ডপে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেন সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ", নিবেদন করেন, 'দুং দুর্গায়ৈ স্বাহা' বলে কতো মূল্যবান উপাদেয় নৈবেদ্যের সম্ভার জড় মৃন্ময়ী মায়ের উদ্দেশ্যে; ভক্ত তোমরা, মন্ত্র শুনতে শুনতে, মৃন্ময়ী মায়ের কল্পিত আহারের scenery অনুমান করতে করতে দরবিগলিত ধারে অশ্রুর বন্যা আসে তোমাদের চোখে—কিন্তু অদূরেই ছিন্নবস্ত্রে ছোট্ট কঙ্কালসার শিশুকে বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন যে ক্ষুধারূপা চিন্ময়ী মাতৃমূর্ত্তি, তাঁর ব্যথায় তোমাদের চোখে জল আসে না! বরং পূজা মণ্ডপের পবিত্রতা যাতে নষ্ট না হয় এজন্য তাঁকে মণ্ডপের বাইরেই আটকে রাখার প্রহরী রাখ!! একটি মাটির পুতুলের আগের দিকে যাকে ক্ষীর সর ছানাননীর সম্ভার, আর ঐ চিন্ময়ী মায়ের জন্য ব্যবস্থা থাকে শুকনো পোকা খই, বড় জোর তাতে একটু গুড় ছিটানো!!! বৎসরে একটিবার তোমরা 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা' বলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েই ক্ষান্ত হও, কিন্তু যদি তোমরা ঐ মর্ম্ম গ্রহণ করে, সঙ্ঘশক্তি নিয়ে রুদ্রতেজে লাম্পট্য, অনাচার, মাতৃজাতির অপমানকে রুখে দাঁড়াতে, প্রত্যেকেরই মধ্যে যাতে মাতৃভাবের বোধন ঘটে তার চেষ্টা করতে তাহলে সত্য সত্যই মাতৃপূজা হ'ত। কিন্তু

তোমরা চণ্ডীতে দেবীর 'মাতৃরূপা' 'ভক্তিরূপা' 'প্রজ্ঞারূপা' 'শক্তিরূপা',—দানবদলনী যে সমস্ত প্রলয়ঙ্কর তেজ, পৌরুষ এবং সংগ্রামশীল মনোভাবের অগ্নিরূপ রয়েছে তার মর্ম্ম গ্রহণ করে নিজেদের জীবনে তা রূপায়িত করার চেষ্টা কর না। কেবল জড় মূর্ত্তি পূজা করেই ক্ষান্ত!!

দুর্গাপূজার আধ্যাত্মিক মর্ম্ম; শক্তির বোধন।

একজন মরমী সাধক দুর্গাতত্ত্বের রহস্য কী ভাবে প্রকাশ করে গেছেন শোন—

"আজি ষষ্ঠীর বোধনে
জাগ কুল কুণ্ডলিনী।
মূলাধারে শিবরূপ বিল্বতলে
সার্দ্ধ ত্রিবেষ্টন করি কুতূহলে
কি কারণে বল নিদ্রা যাও ছলে
ছলিয়া ছাওয়ালে ছলনারূপিনী।
উঠ ধীরে ধীরে ঘুমে ঢলে ঢলে
চল ভেদ করি ছটি শতদলে
ব্রহ্ম রন্ধ্র পারে উঠ সহস্রারে
ওঁকার মাঝারে ঝঙ্কার কারিণী"।

ঐ বিজ্ঞানময় কোষের সাধনা, ঐ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব গ্রহণ করে তা যদি Realise করবার চেষ্টা করতে, তাহলে বহু দিব্যশক্তির বোধন ঘটতো; সন্তরা যাকে ব্রহ্মাণ্ডদেশ (Materio-Spiritual Region) বলে গেছেন সেই অন্তররাজ্যের অনুভূতি লাভ করতে পারতে। কিন্তু তাও তোমরা কর না! ষষ্ঠীর দিনে একটা বেলগাছের তলায় একটা মাটির ভাঁড়ে হুং ভং মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে দিয়ে কয়েকটা ফুল ছড়িয়ে দিয়েই প্রতি বছর অকাল বোধন সারছো! জড়ের পূজা করে করে তোমরা জড় হয়ে গেছ। তাই দুর্গাপূজার ঐতিহাসিক সত্যও গ্রহণ কর না, বৈপ্লবিক শক্তিতত্ত্বের বীজ গ্রহণ করে দানবনাশী সুপ্ত দেবশক্তিকে নিজের মধ্যে বিকশিত করেও তোল না, এর আধ্যাত্মিক তত্ত্বও Realise করে আনন্দলাভের চেষ্টা কর না। এই হ'ল কালচক্র। কালের দালালদের বহিরাচারে ভক্তকে রাখবার চক্রব্যূহ! জাঁকজমক জৌলুষের মারাত্মক আকর্ষণ এর মধ্যে টেনে নিয়ে যায়; নিষ্ক্রমণের পথ জান না।

পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী আর কৃত্তিবাসের রচনাই তোমাদের কাছে 'বেদবাক্য'। আজ যে দুর্গাপূজার নামে 'লারেলাপ্পা' থেকে আরম্ভ করে, উৎকট বিকট সুরে নবদ্বীপ হালদারের কমিক সহ 'আয়েগা আয়েগা' গান হয়, জলসার অনুষ্ঠান হয়, কোন অদ্ভুতকর্ম্মা কৃতবিদ্য পণ্ডিত যদি সংস্কৃতে ব্যাস বাল্মীকি বা রাম-কৃষ্ণোবাচ, চৈতন্যোবাচ প্রভৃতি আধুনিক অবতারদের নাম দিয়ে ঐ 'লারেলাপ্পা' হিন্দীগান আর নবদ্বীপ হালদারের কমিককেই পূজার মন্ত্র বলে চালু করে যান,—সংস্কৃতি আর শিল্পকলার নাম দিয়ে মাদুর্গার যে সমস্ত হাজার হাজার নটিনী, রঙ্গিনী হাস্যলাস্যময়ী ভ্রুভঙ্গবিলাসিনী, গান্ধীর হাতে পদ্ম এবং সুভাষচন্দ্রের হাতে খড়্গাদানরতা যে সমস্ত বিভিন্ন ঢং এর অভিনব মূর্ত্তি দেখা যায় সেগুলিকেই ভিত্তি করে যদি ধ্যানমন্ত্র পুষ্পাঞ্জলির স্তবমন্ত্র রচনা করে যান, তাহলে একশো 'বা দু'শো বছর পরে দেখবে জনসাধারণ তাই বেদবাক্য বলে মেনে নেবে ; এবং ঐ দশপ্রহরণ ধারিণী দুর্গার রূপ ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হয়ে, মার কোলে গণেশের বদলে বিরাজ করবেন গান্ধী, দেবীর পদতলে অসুরের বদলে থাকবে কোন অত্যাচারী ব্রিটিশ-সেনাপতি, কার্ত্তিকের বদলে বিরাজ করবেন সুভাষচন্দ্র—সিংহের পরিবর্ত্তে এরোপ্লেনে হেলান দিয়ে দেবী দাঁড়িয়ে থাকবেন, হাতে থাকবে হয়তো রকেট বা হাইড্রোজেন বোমা !! এহেন বাহন, অস্ত্র নূতন পরিজনবর্গ সহ দুর্গাদেবীর ধ্যান-মন্ত্র রচনাতে—পণ্ডিতদের উদ্ভাবনী প্রতিভা কৃপণ হয়ে যাবে না ! জনসাধারণও দরবিগলিত অশ্রু হয়ে মহা আড়ম্বরে এই পূজাই করে চলবে, আর ভাববে ধর্ম্ম করছি, এগিয়ে চলেছি মোক্ষের পথে !"

রহ্‌ সব কাল ছলী বল বাজী তীরথ ব্রত পূজা বথানা
ঝু'টা রচন রচী জগ মাঁহি, সব নর ভরম ভুলানা।" (তুলসী সাহেব)

প্রশ্ন :— পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী মশাই এবং কৃত্তিবাসই বা এই দুর্গাপূজার ভিত্তি পেলেন কোথায় ? দুর্গাপূজার পরিবর্ত্তে অন্য কোন পূজার ব্যবস্থাও তো তিনি করে যেতে পারতেন ?

উত্তর :— পণ্ডিতজী নিজে শাক্ত ছিলেন, কাজেই এটাই স্বাভাবিক যে তিনি দেবী পূজারই ব্যবস্থা করবেন। আমি পূর্ব্বেই বলেছি বিভিন্ন সম্প্রদায় যে যার ইষ্টের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য পৃথক পৃথক পুরাণ, পুঁথি রচনা করে সেই সেই দেবতার সর্বশ্রেষ্ঠত্ব, অনাদিত্ব, অদ্ভুত অদ্ভুত গুণ কর্ম্মের মহিমা কাল্পনিক গল্পচ্ছলে, খুবই

মনোরম রোচক ভাষায়, ব্যাস বাল্মীকি ঋষিদের নাম দিয়ে রচনা করেছিলেন। বেদে বা উপনিষদে যেখানে যেখানে সেই একই পরমাত্মার এক একটা attribute অনুযায়ী বিষ্ণু রুদ্র শিব ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি নাম ঋষিরা দিয়ে গেছেন, ঐ সমস্ত সম্প্রদায়ীরা ঐ এক একটা নাম অনুযায়ী এক একজন দেবতা স্থির করে, মনোমত রুচিমত গুন মহিমা আরোপ করে কল্পনা প্রভাবে শাস্ত্র রচনা করে সেই সেই দেবতার পূজা পদ্ধতি মূর্ত্তি পূজার প্রচলন করে গেছে। এবং সবাই বলে গেছে— তাদের ইষ্টদেবের নাম বেদে আছে, প্রাচীনতম এবং অনাদি!

সেই একই পরমাত্মা, তিনি সর্ব্ব ব্যাপক বলে ঋষিরা তাঁকে বেদে 'বিষ্ণু' নামে অভিহিত করেছেন। বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি চরাঽচরং জগৎ স বিষ্ণুঃ। সম্প্রদায়ীদের হাতে পড়ে পুরাণে তিনি কোথাও চতুর্ভুজ, লক্ষ্মী সরস্বতীর স্বামীরূপে, কোথাও বা দ্বিভুজ, রুক্মিণী সত্যভামাদির বররূপে পূজা পেতে লাগলেন স্বতন্ত্র দেবতারূপে। 'যঃ সর্ব্বান্ শিষ্ঠান্ মুমুক্ষুন্ বৃণোতি স বরুণঃ পরমেশ্বরঃ'; কিন্তু পুরাণকারদের হাতে পড়ে এই বরুণ হলেন জলের দেবতা একটা স্বতন্ত্র দেবতা! গণ সংখ্যানে—এই ধাতু হতে 'গণ' শব্দ সিদ্ধ হয়, তদুত্তর ঈশ শব্দের যোগে গণেশ; "যে প্রকৃত্যাদয়ো জড়া জীবাশ্চ গণ্যন্তে সংখ্যায়ন্তে তেষামীশঃ স্বামী পালকো বা"—যিনি প্রকৃত্যাদি জড় এবং জীবাখ্য-পদার্থ সমূহের পালন কর্ত্তা সেই ঈশ্বরের নাম গণেশ। কিন্তু সম্প্রদায়ীদের হাতে পড়ে ইনি হলেন শিবের পুত্র, ইন্দুর বাহন, লম্বোদর, শনির কোপে মাথা উড়ে যাওয়ায় গজানন!! কী ভীষণ প্রহেলিকা! শিবদুর্গার সন্তানের মাথা গেল খসে শনির কোপে! তোমরাই বল তোমাদের শিবদুর্গা নাকি স্রষ্টা; কত মৃত ভক্তকে তাঁরা কৃপা কটাক্ষে বাঁচিয়ে দিয়েছেন বলে তার রসালো বর্ণনা তোমাদেরই পুরাণে আছে অথচ তাঁদের পুত্রের নরমুণ্ড পুনরায় গজিয়ে উঠলো না! ঘরে ঘরে চলেছে এই গণেশ-মূর্ত্তির পূজা! পরমাত্মবাচক গভীর মর্ম্মার্থ তোমরা সমাধিধৌত হৃদয়ে অনুভব করতে চাও না! 'য ইন্দতি পরমৈশ্বর্য্যবান্ ভবতি স ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ'। কিন্তু পুরাণ-কারদের হাতে পড়ে এই পরমাত্মবাচক অর্থ আবরিত হ'ল; এক নূতন দেবতা শচীর স্বামীরূপে বর্ণিত হলেন। বারবার দৈত্য কর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হওয়া, অপরের তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন এবং গুরুপত্নী হরণাদি গল্প সহ ইনি কদর্য্যভাবে চিত্রিত হলেন! 'সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ (যজুর্ব্বেদ')

গতীশীল চেতন পদার্থ এবং তস্থুষঃ, স্থাবর পদার্থ সকলেরই আত্মা বলে এবং সকলকেই প্রকাশ করেন বলে সেই পরমাত্মারই এক নাম সূর্য্য। কিন্তু সৌর সম্প্রদায়ের হাতে পড়ে ইনি হলেন আর এক দেবতা! সৌর পুরাণে এঁর কত মহিমা, কতো পূজাপদ্ধতি হোমযাগের ব্যবস্থা রয়েছে!

এই ভাবে সেই পরমাত্মাই সকলের মঙ্গল করেন বলে তাঁর নাম শিব; "শিবং সুখং তদস্যাস্তি। অর্শাদ্যচ্। শিবয়তীতি বা তৎ করোতীতিণ্যন্তাৎ পচাদ্যচ্"—অর্থাৎ যিনি সুখস্বরূপ, মঙ্গল নিধান, সেই পরমাত্মার আর এক নাম শিব; যঃ শং কল্যাণং সুখং করোতি স শঙ্করঃ —কল্যাণ এবং সুখের কর্ত্তা বলে পরমাত্মাকে শঙ্কর বলা হয়। কিন্তু শৈব সম্প্রদায়েব হাতে পড়ে পাষাণ প্রিয় ভণ্ডদের কৃতিত্বে শিব হলেন একটা স্বতন্ত্র দেবতা, শ্মশানচারী, গাঁজা ধুতুরা সেবী, স্ত্রীপুত্র সমন্বিত ভৈরব মূর্ত্তি! অন্যান্য সম্প্রদায়ের দেবতাকে করে দিলেন এঁর উপাসনাকারী, আজ্ঞাবহ! নানা অভিসন্ধি নিয়ে বেদ ও শ্রুতির কদর্য্য বিকৃত অর্থ করে জড় মূর্ত্তিপূজক, সংকীর্ণ ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন পুরাণকার এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ীরা যা করে গেল, পরে তারই উপর ভিত্তি করে আরও বহু উপকরণ, গল্প, গাঁথা, মন্ত্র, তন্ত্র, পূজা পদ্ধতি সংযোজিত হ'ল, আসল তত্ত্ব এই ভাবে গেল রসাতলে। অনেক সময় নিজেদের মতবাদ যাতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা পায় এজন্য এরা সুকৌশলে মূল প্রামাণিক গ্রন্থসমূহে তদনুযায়ী শ্লোক রচনা করে প্রক্ষেপ করে গেছে। কবীর সাহেব এই অবস্থা লক্ষ্য করে তাই বলেছেন—

'হরতি ভূমি তৃণ-সঙ্কুল সমুঝ পরে নহে পন্থ'

হরতি ভুমি তৃণ সঙ্কুল সমুঝ পরে নহি পন্থ

জিমি পাখণ্ড (পাষণ্ড) বিবাদতে লুপ্ত ভয়ে সদ্‌গ্রন্থ'

বর্ষাকালে যেমন নূতন তৃণগুল্ম হ'য়ে মাটিকে দেয় ঢেকে; তেমনি সম্প্রদায়ী পাষণ্ডদেব বিবাদ, মিথ্যা রটনা এবং রচনার জন্য সত্য ধর্ম্ম প্রকাশক সৎগ্রন্থ সকল ভয়ে লুকিয়ে গেছে; তাৎপর্য্য এই যে মূল শাস্ত্রে বহু বহু প্রক্ষিপ্ত শ্লোক প্রবিষ্ট হওয়ায় প্রকৃত তত্ত্ব জানা সাধারণের দুঃসাধ্য।

যাক্ আমাদের আসল প্রসঙ্গে আসা যাক্। শাক্তরাও ঠিক ঐ ভাবে শক্তি পূজা দেবী পূজায় অনাদিত্ব প্রমাণ করবার জন্য বেদ-উপনিষদ হাতড়িয়েছে। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্তও ভারতে বৈদিক আর্য্যদের মধ্যে এই দেবী

পূজা ছিলো না। ছান্দোগ্য এবং কেনোপনিষদে রুদ্রানী, ভবানী, উমা প্রভৃতি যে নাম আছে, ঋগ্বেদের [বৈদিক সংশোধক মণ্ডল সংস্করণ] ৪র্থ খণ্ডে ৯৫৭।৯৫৮ পৃষ্ঠাদিতে ভদ্রা 'শিবা' 'দুর্গা' প্রভৃতির যে উল্লেখ আছে ['সহস্র সম্মিতাং দুর্গাং জাত বেদসে সুনবাম্ সোমম্'], মুণ্ডকোপনিষদে জাত বেদস্ অগ্নির, ['কালী-করালী চ মনোজবাচ, সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লোলায়মানাইতি সপ্তজিহ্বাঃ']— ইত্যাদি আহুতি গ্রহণে সমর্থা দ্যুতিমতী সপ্তজিহ্বার যে বর্ণনা আছে—তাই থেকে শাক্তরা উপাদান সংগ্রহ করে কালী তারা দুর্গা ষোড়শী বগলামুখী ইত্যাদি এক একটা স্বতন্ত্র দেবী বানিয়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মূর্ত্তিপূজার প্রচলন করে গেছে। বেদে উপনিষদে কিন্তু ভদ্রা দুর্গা উমা শক্তি প্রভৃতি নামগুলি একই **পরমাত্মা বাচক** অর্থে ব্রহ্ম বিদ্যাপ্রকাশিকা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন কেনোপনিষদের উমা, সম্প্রদায়ীদের মতানুযায়ী হিমালয়ের কন্যা শিব বলে কোন পৃথক দেবতার স্ত্রী দুর্গা নামে কোন পৃথক দেবী নয়। দেবতারা যখন সেই অদ্ভুত পরমাত্ম জ্যোতির স্বরূপ নির্ণয়ে অক্ষম হলেন তখন যে অদৃশ্য দিব্যশক্তি প্রকট হয়ে তাঁদেরকে জানিয়ে দিলো যে ইনিই পরমাত্মা ; উং বিষ্ণুং (সর্ব্বব্যাপক-ব্রহ্মচৈতন্য) পরিমাপেতি যা সা উমা—এই অর্থে উমা বলা হয়েছে। তেমনি, 'দেবী' বলতে পৃথক কোন ঠাকুর নয়, পরমেশ্বরের নামই দেবী। পরমেশ্বরের নাম তিনলিঙ্গেই আছে, যথা—'ব্রহ্মচিতিরী-শ্বরশ্চেতি' ; যখন ঈশ্বরের বিশেষণ তখন 'দেব' আর যখন চিতির বিশেষণ হ'বে তখন 'দেবী'। "যঃ শ্রীয়তে সেব্যতে সর্ব্বেণ জগতা বিদ্বদ্ভিঃ যোগিভিশ্চ স শ্রীরীশ্বরঃ"—সমস্ত জগৎ বিদ্বন্মণ্ডলী এবং যোগিগণ যাঁর সেবা করেন সেই পরমাত্মারই নাম "শ্রী"। যো লক্ষয়তি পশ্যত্যঙ্কতে চিহ্নয়তি চরাচরং জগদথবা বেদৈরাপ্তৈর্যোগিভিশ্চ "যো লক্ষ্যতে স লক্ষ্মীঃ সর্ব্ব প্রিয়েশ্বরঃ," যিনি সমস্ত চরাচর জগৎকে দেখেন, চিহ্নিত বা দর্শন যোগ্য করেন, যিনি সকল শোভার শোভা, যিনি বেদাদি শাস্ত্র এবং যোগিগণের পরমলক্ষ্য—সেই পরমেশ্বরেরই নাম "লক্ষ্মী"। কিন্তু সম্প্রদায়ীরা 'লক্ষ্মী' বলতে এক পৃথক পেচক বাহনা দেবীর সৃষ্টি করেছে, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে—প্রতি বৃহস্পতিবারে কোজাগরী পূর্ণিমাতে ধনলাভের আশায় মাটির ঝাঁড়ে বা মূর্ত্তিতে এঁর পূজা হয়!! ঠিক এই রকমই 'শক্তি' কথাটিও পরমাত্মবাচক। ঋষিগণ— [যঃ সর্ব্বংজগৎ কর্ত্তুং শক্নোতি স শক্তিঃ]

—যিনি সকল জগৎ রচনায় সমর্থ—সেই পরমেশ্বরকেই 'শক্তি' বলতেন। কিন্তু সম্প্রদায়ীরা ভিন্ন অর্থে শাক্তধর্ম্ম তান্ত্রিক সম্প্রদায় সৃষ্টি করে, এক একজন ভক্ত রাজাকে অনুগত করে ঐ সব মূর্ত্তি পূজাকে রাষ্ট্র ধর্ম্মরূপে বহুল প্রচার করে গেছে। 'শিবোবাচ' আর 'শৃণুদেবী প্রবক্ষ্যামি' দিয়ে শিবশিবার উক্তিচ্ছলে সাধারণের মনে ভক্তি বিশ্বাস দৃঢ়মূল করবার জন্য রচিত হয়েছে তন্ত্রশাস্ত্রগুলি; তাতে বহু দেবী এবং তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র পূজা পদ্ধতির বর্ণনা আছে।

আপামর জনসাধারণ যাতে দুর্গাপূজা গ্রহণ করে এজন্য, মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বের তেইশ অধ্যায়ে গীতা আরম্ভের পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অর্জ্জুন যেন দুর্গাস্তব করেছেন—এইধরণের প্রক্ষিপ্ত অংশ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিভাবে সম্প্রদায়ীরা নিজেদের স্বার্থে মুনিঋষির নাম দিয়ে শাস্ত্র রচনা করে, মূল গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত ঢুকিয়ে জনসাধারণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত পথ এবং অবৈদিক নানা আচার পদ্ধতির প্রচলন করে গেছে—তা রাজা ভোজ রচিত "সঞ্জীবনী" নামক ইতিহাস থেকে জানা যায়। একদল সত্যসন্ধানী গবেষক এই গ্রন্থটি গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত 'ভিণ্ড্' নামক স্থানে পেয়েছেন। তাতে লিখা আছে, এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বেদব্যাসের নাম দিয়ে মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং শিবপুরাণ রচনা করেছিলেন; তা জানতে পেরে রাজা ভোজ ঐ ব্রাহ্মণের হস্তচ্ছেদন করে দিয়ে, অতঃপর মুনিঋষির নাম দিয়ে কেউ গ্রন্থ রচনা করতে পারবে না—এই আদেশ রাজ্যময় প্রচার করে দেন। ঐ "সঞ্জীবনী"তে মহাভারত সম্বন্ধে লিখা আছে—"ব্যাসদেব চারি হাজার চারিশত এবং তাঁর শিষ্য পাঁচ হাজার ছয়শত অর্থাৎ সর্ব্বসমেত দশ হাজার শ্লোকযুক্ত "ভারত" রচনা করেছিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময়ে ইহা কুড়ি হাজারে পরিণত হয়, আমার পিতার সময় পঁচিশ হাজার এবং আমার অর্দ্ধ বয়সের সময় ত্রিশ হাজার শ্লোকযুক্ত মহাভারত দেখেছি। যদি এইভাবে মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'তে থাকে তাহলে উহা একটা উঁটের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে; আর ঋষি মুনিদের নামে যদি পুরাণাদি গ্রন্থ রচিত হয় তাহলে আর্য্যাবর্ত্তের লোকসমূহ ভ্রান্তপথে চলে বৈদিক ধর্ম্ম বিহীন হয়ে ভ্রষ্ট হ'য়ে পড়বে"।

'জিমি পাষণ্ড বিবাদতে … …'

ঠিক ঐভাবেই ক্রমে ক্রমে একই উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল দেবী ভাগবত

বৃহৎনন্দিকেশ্বর পুরাণ, কালিকাপুরাণ [একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের কোন শক্তিসাধক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ ইহা রচনা করেন—ডক্টর যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির অভিমত] এবং কাত্যায়নীতন্ত্র ইত্যাদি। কাত্যায়নীতন্ত্রে লিখা হ'ল—

> "রাম রাবনয়োর্যুদ্ধে দুর্গা রামেন পূজিতা
> অবধীদ্রাবণং রাম ইষে মাসি প্রপূজনাৎ
> তেন লোকাশ্চরিষ্যন্তি দুর্গায়াঃ শারদোৎসবম্"।

কালিকাপুরাণে লিখা হ'ল—

> 'রাবনস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ
> অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্তয়কৃতঃপুরা'।

অধিকাংশ ধর্ম্ম বিধির মূলে যেমন লোভ দেখানো হয়, ফলশ্রুতির ঘোরঘটা বর্ণনা থাকে—করলে স্বর্গলাভ কয়েক কল্প বৈকুণ্ঠেস্থিতি বিশাল ঐশ্বর্য্যলাভ, না করলে নরক, সর্বনাশ, পুত্রকন্যার বিনাশ ইত্যাদি, লোভ, ভয়, Injunction এর শেকল রচনা করে, দুর্ব্বলপ্রাণ মানুষের মনে ভয় ভক্তি উৎপাদন করা থাকে তেমনি ঐ কালিকাপুরাণে এই ভয় দেখানো হ'ল—

> 'যো মোহাদথবালস্যাদ্দেবীং দুর্গাং মহোৎসবে
> ন পূজয়েত দম্ভাদ্বা দ্বেষাদ্বাপ্যথ ভৈরব,
> ক্রুদ্ধা ভগবতি তস্য কামানিষ্টান্নিহন্তি বৈ'।

'হে ভৈরব! মোহবশতঃ অথবা আলস্যবশতঃ, দম্ভ বা বিদ্বেষবশে এই শারদীয় মহোৎসবে যে দুর্গাপূজা না করবে ভগবতী ক্রুদ্ধা হয়ে তার কাম ও ইষ্টসমূহ নষ্ট করে দেবেন'। দেবী যে মা! দয়াময়ী!! ব্যস্, এই ভয়ে সবাই সর্ব্বস্বান্তঃ হয়েও দুর্গোৎসবের নামে 'ভিটাতে-দুর্গা-ওঠা'র ব্যবস্থা করে চলেছে!!!

দুর্গাপূজার উৎপত্তি রহস্য, মূল উৎস।

ঐ সমস্তকে ভিত্তি করেই পণ্ডিত রমেশচন্দ্র শাস্ত্রী খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজা কংসনারায়ণ থাঁকে দুর্গাপূজার suggestion দিয়েছিলেন; এবং তদনুকূলে বহু দুর্ম্মূল্য রত্ন ও বস্ত্র সংগ্রহ, বেশ্যাবাড়ীর মৃত্তিকা থেকে আরম্ভ করে গোময় গোমূত্র, শূন্যের শিশিরোদক, সাতসমুদ্র তের নদীর জল পর্য্যন্ত মহাস্নান-দ্রব্য সংগ্রহের মহাড়ম্বরময় বিস্তৃত তালিকা সহ, অঙ্গন্যাস করন্যাস পীঠন্যাস

বলি পূজা পুষ্পাঞ্জলি, বিল্ববৃক্ষের তলে বোধন নবপত্রিকা থেকে সুরু করে, বিজয়ার পর হাতে অপরাজিতার মূল-বন্ধন, সিদ্ধি খাওয়া পর্য্যন্ত দুর্গাপূজা বিধির ব্যবস্থা পত্র দিয়ে গেলেন। এতে আর নেই কি? Minus Spiritualism Botany, Zoology, Hygiene, Commercial burgain সবই হয়তো আছে! এইভাবে রাজার পুরোহিত শ্রেষ্ঠ সভাপণ্ডিত যার করে গেলেন প্রচলন,—প্রতিষ্ঠা, কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে তাকেই করে তুললেন সর্ব্বজনপ্রিয়।

প্রশ্ন :—মহাকবি কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ এবং মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণে তাহলে অনেক পার্থক আছে? মূল ঘটনাও বিকৃত বা বর্দ্ধিত হয়েছে কৃত্তিবাসী রামায়ণে? প্রধান প্রধান ঘটনার পার্থক্য গুলো বলুন।

উত্তর :—মূল বাল্মীকি রামায়ণে দেখা যায় প্রাচেতস্ বাল্মীকি নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন ভূমণ্ডলের শ্রেষ্ঠ রাজা কে? জ্ঞানে গুনে সত্যনিষ্ঠা এবং চরিত্রবত্তায় আদর্শচরিত্র কার?

> চারিত্রেন চ কো যুক্তঃ সর্ব্বভূতেষু কো হিতঃ,
> বিদ্বান্ কঃ, কঃ সমর্থশ্চ, কশ্চৈক প্রিয়দর্শনঃ?
> আত্মবান্ কো জিতক্রোধো, দ্যুতিমান্ কোঽনসূয়কঃ
> কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে? [মূল বাল্মীকি, বালকাণ্ড]

নারদ তখন একাত্তরটি শ্লোকে রাম চরিত্র বর্ণনা করলেন—

> স চ সর্ব্বগুণোপেতঃ কৌশল্যানন্দ বর্দ্ধনঃ
> সমুদ্র ইব গাম্ভীর্য্যে স্থৈর্য্য চ হিমবানিব। [ঐ]

ইত্যাদি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বাল্মীকি রামায়ণের মূল কলেবরই বাড়তে থাকে। খৃষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বাল্মীকি রামায়ণের যে প্রথম সংস্করণ বেরোয়, তাতে সংখ্যা কিছু বেড়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে দেখা গেল শ্লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে চব্বিশ হাজার এবং বহু প্রক্ষিপ্ত ঘটনায় পরিপূর্ণ! তৃতীয় সংস্করণে পরিশিষ্ঠ ভাগে উত্তরকাণ্ড সহ কলেবর আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোল!

যাই হোক, বাল্মীকির রামচন্দ্র আদর্শ মানব; পরার্থপরতা প্রেম পিতৃ-ভক্তি পরাক্রম এবং প্রজানুরঞ্জনে তিনি গরীয়ান পুরুষ; দেবোপম দেবতা বা পূর্ণ পরমাত্মা ন'ন। রামচন্দ্রকে পূজা করতে হবে কিংবা তাঁর নামই তারক-ব্রহ্ম মুক্তিপ্রদ নাম, একথা বাল্মীকি বলেন নি। কিন্তু কৃত্তিবাস লিখলেন—

"শমনদমন রাবণ রাজা রাবণ দমন রাম
শমন ভবন না হয় গমন, যে লয় রামের নাম !"

বাল্মীকির পর যত রকমের রামায়ণ সম্প্রদায়ীরা লিখেছেন তাদের প্রত্যেকটিতে সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিমত্তা miracles করবার ক্ষমতা, পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য আরোপ করে রামের পূর্ণ পরমেশ্বরত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে। সবচেয়ে চরমে উঠেছে, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের অন্তর্গত অধ্যাত্ম রামায়নে ; এটি ব্যাসের নামে লিখা হয়েছে। অধ্যাত্ম-রামায়নে দেবতারা বটেই এমন কি মাতা কৌশল্যাকে দিয়েও পূর্ণ পরব্রহ্মজ্ঞানে রামের স্তব করানো হয়েছে !

অদ্ভুতাচার্য্যের অদ্ভুত রামায়নে আবার দশস্কন্ধ রাবনের পরিবর্ত্তে সহস্রস্কন্ধ রাবণের কথা আছে। তাতে আছে রাবণ যখন সীতাকে হরণ করতে যান তখন সহসা সীতা নাকি দুর্গামূর্ত্তি (!) ধারণ করে তার ৯৯০টা মুণ্ড ছেদন করে ফেললেন ; তারপর 'রামের হাতে রাবণের মৃত্যু' এই দৈববানী শুনে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সীতা হয়ে গেলেন ; শান্ত সুশীলা অবলা বালিকার মত রাবণকে অপহরণের সুযোগ দিলেন ! কোন রামায়ণকার আবার এমনই সীতারামের ভক্ত যে, দশানন রাক্ষস মা জানকীকে হরণ করে নিয়ে যাবে একথা লেখনী মুখে লেখেন কি করে ? কাজেই লিখা হ'ল—রাবণের হরণকালে ব্রহ্মা এসে সীতাকে নিয়ে গেছলেন, মায়া সীতাকে পঞ্চবটিতে রেখে। রাবণ এই মায়াসীতাকেই অপহরণ করেছিলো। রাবণ বধের পর, অগ্নিপরীক্ষাকালে মায়াসীতা দগ্ধ হলো আর অগ্নিমধ্য হতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়ে আসল সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন !! কৃত্তিবাসও রামভক্তিতে গদগদ হয়ে লিখেছেন— "তোমার গায়ের লোমাবলি যত দেবগণ,
সীতাদেবী লক্ষ্মী তুমি নিজে নারায়ণ" !

কৃত্তিবাসাদি রামায়ণকারদের কল্পনার কুহেলি

কল্পনার কুহেলি রচনায় এই সব অতিভক্ত রামায়ণকারদের কাছে বাল্মীকি শিশু মাত্র ! বাল্মীকির রামচন্দ্র 'সর্ব্বগুনোপেতঃ', 'নিয়তাত্মা মহাবীর্য্যো দ্যুতিমান্ ধৃতিমান বশী', 'ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ প্রজানাং চ হিতেরতাঃ'—একজন আদর্শ মানব ; পূর্ণ পরমেশ্বর ন'ন ; দেবতাগণ কিংবা মাতাপিতারও আরাধ্য ভগবান ন'ন। তোমরা সবাই রামের মূর্ত্তিগড়ে পূজা কর, নাম জপ কর—এ ধরণের কোন নির্দ্দেশ প্রাচেতস্ বাল্মীকি মুনি দিয়ে যান নি।

যাই হোক, মূল বাল্মীকির রামায়ণের সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রধান প্রধান ঘটনা নিয়ে পার্থক্যের বহরটা দেখ :—

(১) বাল্মীকি পূর্ব্বজন্মে দস্যু রত্নাকর ছিলেন—'মরা মরা' জপ করে বাল্মীকি হয়েছিলেন—মূল রামায়ণে এসব কথার বিন্দুবিসর্গও নেই।

(২) কৃত্তিবাস বর্ণিত রামের দুর্গাপূজা বা অকাল বোধনাদির কথা সত্যদর্শী বাল্মীকি মুনির মূল রামায়ণে নেই।

(৩) রামের জন্মের ৬০,০০০ বছর পুর্ব্বে বাল্মীকি রাঁমায়ণ রচনা করেছিলেন—এ কথাও মিথ্যা। 'কোন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবাণ্'—নারদকে বাল্মীকিব এ ধরনের প্রশ্নে স্পষ্টই বোঝা যায় তখন রাম রাজত্ব করছেন। মূল রামায়ণে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে—

'প্রাপ্ত রাজস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবান ঋষিঃ।
চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্র পদমর্থবৎ'। [আদিকাণ্ড, ৪র্থ সর্গ ১ম শ্লোক]

(৪) যজ্ঞ রক্ষার জন্য রাম লক্ষ্মণকে পাঠানোর ব্যাপারে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে দশরথ ছলনা করেছিলেন বলে কৃত্তিবাস যে রসালো বর্ণনা দিয়েছেন বাল্মীকি রামায়ণে তা নেই। বাল্মীকি রামায়ণে আছে বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে প্রার্থনা করায় বশিষ্ঠ বললেন—

'তেষাং নিগ্রহেণ শক্তঃ স্বয়ং চ কুশিকাত্মজঃ,
তব পুত্র 'হিতার্থায় ত্বামুপেত্যাভিযাচতে।'

বশিষ্ঠের ঐ কথা শুনে দশরথ প্রসন্নচিত্তে, নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামলক্ষ্মণকে যেতে দিলেন। কৃত্তিবাসের বর্ণনানুযায়ী দশরথের ছলনায় ক্রুদ্ধ হয়ে অগ্নিশর্ম্মা বিশ্বামিত্র অযোধ্যা ভষ্মসাৎ কবে ফেলবার ভয়দেখাতে, মুহুর্মুহু মূর্চ্ছিত হতে হতে, অগত্যা দশরথ রামলক্ষ্মণকে তাঁর সঙ্গে দিলেন এ ধরণের বর্ণনা মূল রামায়ণে নেই। মূল রামায়ণে বরং এই কথাই আছে—

''তথা বশিষ্ঠে ব্রুবতি রাজা দশরথঃ স্বতম্,
প্রহৃষ্ট বদনো রামম্ আজুহাব সলক্ষণম্'।
'দদৌ কুশিক পুত্রায় সুপ্রীতেনান্ত রাত্মনা'।

(৫) গৌতমপত্নী অহল্যা পাথর হয়েছিলেন; রামের চরণস্পর্শে তিনি মনুষ্যশরীর লাভ করলেন; রামের চরণস্পর্শে কাঠের নৌকা সোনা হয়ে

গেছলো—ইত্যাদির বর্ণনা দিয়ে কৃত্তিবাস রামভক্তির যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন—ঐ সব অলীক অলৌকিক কথা মূল রামায়ণে নেই। অহল্যা পাথর হয়ে যান নি, অন্যকে দেখা না দিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে কঠোর ব্রহ্মচারিনী জীবন যাপন করেছিলেন—এই কথাই বাল্মীকি রামায়ণে আছে; ['বাতভক্ষ্যা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী'—ইত্যাদি]।

(৬) রাবণ বিভিষণকে পদাঘাত করায় সে রামের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল—একথা কৃত্তিবাসের কৃপায় বাংলাদেশের শিশুও জানে! কিন্তু রাবণ বিভিষণকে তিরস্কার করেছিলেন মাত্র—পদাঘাত করেন নি—এই কথাই বাল্মীকি লিখেছেন। রাবণ ক্ষোভ প্রকাশ করলেন,

বাল্মীকি রামায়ণ VS কৃত্তিবাসী রামায়ণ

"বসেৎ সহ সপত্নেন ক্রুদ্ধেনাশীবিষেণ বা

নতু মিত্র প্রবাদেন সংবসেচ্ছত্রুসেবিনা।"

রাবণের ধিক্কারবাণী শুনে কুলপাংশু দেশদ্রোহী কৃতঘ্ন বিভীষনই বরং 'উৎপপাত গদাপানিশ্চতুর্ভি সহ রাক্ষসৈঃ,' দেশ ও জাতীব ঐ চরম বিপদেব মুহূর্ত্তে উল্টে রাবণকেই গালাগালি দিয়ে রামের কাছে চলে এল!

'........ ইত্যুক্তা **পরুষং বাক্যং** রাবণং রাবণানুজঃ

আজগাম মুহূর্ত্তেন যত্র রাম সলক্ষণঃ।' [বাল্মীকি রামায়ণ]

(৭) হনুমান কর্তৃক সূর্য্যকে বগলদাবা করে গন্ধমাদন পর্ব্বত মাথায় করে আনার উদ্ভট কথাও বাল্মীকি রামায়নে নেই (৮) কালনেমি সংবাদ, নন্দীগ্রামে ভরতের সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ, গরুড়পবনের যুদ্ধ, অঙ্গদরায়বার ইত্যাদি মূলরামায়নে নেই (৯) হনুমানের প্রার্থনায় উগ্রচণ্ডাদেবীর লঙ্কাত্যাগের কাহিনী, সমুদ্রলঙ্ঘন কালে সিংহিকা রাক্ষসী প্রসঙ্গ, জাস্তব কাক সীতাকে আক্রমণ করায় রামের নিক্ষিপ্ত ত্রিশিরাশর কাকটিকে দেবলোক, ব্রহ্মলোক, শিবলোক পর্য্যন্ত ধাওয়া করে তার চক্ষুবিদ্ধ করে আনলো—এই সব কথাও মূল রামায়ণে নেই। (১০) রাবণের স্বর্গ বিজয় কালে কুম্ভকর্ণের গমন, চৌষট্টি যোগিনী সহ যুদ্ধ, তরণীসেন বধ মহীরাবণ, অহীরাবণ বধ, অতিকায় বীরবাহু তরণীসেন প্রভৃতির কাটামুণ্ডের রাম নাম উচ্চারণের অতি মিথ্যা কাহিনীও বাল্মীকি রামায়ণে নেই। (১১) লক্ষণের চৌদ্দ বছরের ফল আনয়ণ কাহিনী, লবকুশের যুদ্ধাদি সমগ্র উত্তর কাণ্ডই বাল্মীকি

রামায়ণে নেই। (১২) বাল্মীকির সীতা আর কৃত্তিবাসের সীতাচরিত্র অঙ্কনেও তফাৎ আছে। বাল্মীকির সীতা বীরাঙ্গনা ; অপহরণকালে তিনি ক্রুদ্ধা সিংহিনীর মত গর্জ্জন করছে'ন—

'ধিক্ তে শৌর্য্যঞ্চ সত্ত্বঞ্চ যৎ ত্বয়া কথিতং তদা

রাবণকে বলছেন—

কুলাক্রোশকরং লোকে ধিক্ তে চারিত্রমাদৃশম্'।

'বদ্ধস্ত্বং কালপাশেন দুর্নিবারেণ রাবণ !!'

আর কৃত্তিবাসের বর্ণনা দেখ—

'করে দুই কুড়ি পাটি দন্ত কড়মড়ি,

জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি ' !!

আবার এই কৃত্তিবাসী রামায়ণেরই প্রকার ভেদের কথা যদি শোন তাহলে হয়তো চমকাবে ! কৃত্তিবাসের নামাঙ্কিত প্রায় দেড় শতের উপর পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। মহামহা পণ্ডিতরাই গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে উঠছেন, কোন্‌টি আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণ তা নির্ণয় করতে। বটতলা প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ যা তোমরা পড়ে থাক, আসলে তা কৃত্তিবাসেরই লিখা নয় ! পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত এবং সুচারুরূপে পরিবর্দ্ধিত ! শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বইটা পড়ে দেখলে অনেক ভ্রম ঘুচবে। তাঁর প্রাজ্ঞ-গবেষণাতে ধরা পড়েছে, একই কৃত্তিবাসের নাম দিয়ে পূর্ব্ববঙ্গে একরকম রামায়ণ আর পশ্চিমবঙ্গে আর এক রকমের ; ঘটনা সন্নিবেশেও বহু পার্থক্য ! ত্রিপুরা শ্রীহট্ট আর নোয়াখালীতে যে সব কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাওয়া গেছে তাতে বীরবাহু বধ, তরণীসেন বধ, রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক রামের স্তব, রামের দুর্গাপূজার কাহিনী আদি ক্ষুনাক্ষরেও নেই। ষোড়শ শতাব্দিতে বৈষ্ণব কবি কবিচন্দ্র তাঁর রচিত রামায়ণে রামলক্ষ্মণের মধ্যে চৈতন্য নিত্যানন্দের ছায়া ফেলে রাক্ষসদেরকে দিয়ে রামচন্দ্রের নিকট বৈষ্ণব সুলভ প্রার্থনা করিয়েছেন ; পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কৃত্তিবাসে ওগুলি জুড়ে দিয়েছিলেন। দীনেশ চন্দ্রের মতে কৃত্তিবাস আদৌ লঙ্কাকাণ্ড রচনা করে যান নি !

'বাল্মীকি বলে গেছেন,' 'কৃত্তিবাস লিখেগেছেন'—ইত্যাদি বরেণ্য লোকদের নাম quote করে তোমরা যে "রাম দুর্গাপূজা করেছিলেন, কাজেই আমরা

করলেও পরমার্থ লাভ হবে, দুর্গতি নাশ হবে; রত্নাকর যখন 'মরা মরা' বলে বাল্মীকি হয়ে গেলেন তখন আমরাও তারকব্রহ্ম রাম নাম জপে উদ্ধার হয়ে যাবো," বল—তোমাদের ঐ সব ভ্রান্তি নিরশনের জন্য এই তুলনামূলক আলোচনা করলাম। প্রক্ষিপ্ত অংশের ভারে মূলগ্রন্থের সার সত্য এবং তথ্য কি ভাবে বিকৃত হয়ে যায় এবং সম্প্রাদায়ী, স্বার্থপর, অজ্ঞ সাধু এবং পণ্ডিতদের জন্য ধর্ম্মরাজ্যে নানা কুহেলিকার সৃষ্টি হয়েছে—সেইটি ভাল করে বোঝাবার জন্য এই সত্য পরিবেশন করলাম।

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, বাঙ্গালী জীবনের মাধুরী মিশিয়ে ভাবভক্তির তারক-রসে কৃত্তিবাস যে বাংলা পয়ার ছন্দে রামায়ণ লিখে, রাজপ্রাসাদ থেকে দরিদ্রের পর্ণকুটীর, মুদীদোকান পর্য্যন্ত পিতৃভক্তি, সত্যরক্ষা, ভ্রাতৃস্নেহ, পাতিব্রত্য ধৈর্য্য এবং প্রেম প্রভৃতি সমুন্নত নীতিজ্ঞান প.িবেশন করে গেছেন—এজন্য তিনি প্রশংসার যোগ্য।

তৃতীয় পুষ্প

প্রশ্ন ঃ—তুমি বৈষ্ণববিদ্বেষী বলে মনে হচ্ছে! শ্রীকৃষ্ণকে তুমি 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম' মানতে চাও না কেন? চৈতন্য মহাপ্রভু থেকে আরম্ভ করে কতো বৈষ্ণব মহাজন শ্রীকৃষ্ণের দেহকে "অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহ" জ্ঞান করে গেছেন, "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" বৈষ্ণব মহাপুরুষদের এই অনুভূতসত্যকে যদি তুমি অস্বীকার কর তবে সেটা তোমারই মূঢ়তা। বৈষ্ণবশাস্ত্রে এও আছে যে শ্রীকৃষ্ণের 'অপ্রাকৃত দেহ' এবং তাঁর 'শ্রীবিগ্রহের চিন্ময়ত্বে' যে বিশ্বাস করবে না 'সেই পাপী নরকে মজয়'। 'বৈষ্ণবদেহে তিলক তুলসী মালা থাকলে মৃত্যুকালে বিষ্ণুদূত এসে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যায়'—বৈষ্ণব সাধুদের এ সব কথা কি করে মিথ্যা হবে?

উত্তর ঃ—পৃথিবীর সমস্ত লোক বৈষ্ণব সাজে সেজে, মালা ঝোলা তিলক রাগে রঞ্জিত হয়ে শুধু কৃষ্ণের কেন, নিজেদেরও দেহকে 'অপাকৃত, চিন্ময়', 'সুবর্ণময়', 'রেডিয়ামময়' বললেও, আমার পক্ষে তা স্বীকার করা সম্ভব নয়। বিদ্যা বুদ্ধি, ভগবান মানুষকে দিয়েছেন, পশুকে নয়। শিলা কাঠের মূর্তিকে যারা চিন্ময় বা অপ্রাকৃত বলে তাদের বুদ্ধি এবং দৃষ্টি যথেষ্ট ভয় এবং ভাবনার বিষয়! কোন বৈষ্ণবকে কি আজ পর্য্যন্ত কেউ কখনও স্বশরীরে বৈকুণ্ঠে বা গোলকে যেতে দেখেছ? সবিনয় নিবেদন থাকলো, যদি কোন বৈষ্ণবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, বিষ্ণুদূত এসে পুষ্পকরথে চড়িয়ে তাঁর তিলকলাঞ্ছিত দেহটিকে তাঁদের অপ্রাকৃত ধামে নিয়ে গেছেন দেখে থাকে, দয়া করে বিজ্ঞাপন বা পত্র যোগে জানালে

(কোন অপ্রাকৃত পদ্ধতিতে নয় !), চক্ষুচর্ম্ম সার্থক করে, দেখে, জন্মজীবন ধন্য করবো। জগতে এমন মূঢ়দের সংখ্যা বেশী না হলে ধর্ম্মের নামে এত অনাচার চলতো কি করে ? তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, বৈষ্ণবের দেহটি অগ্নিতে বা মাটিতে সংস্কার করবার সঙ্গে সঙ্গে তার তিলকছাপও এখানেই ধুয়ে মুছে যায় কি যায় না ?

'শ্রীবিগ্রহ অপ্রাকৃত চিন্ময় '—এই অপ্রাকৃত তত্ত্ব খণ্ডন

স্থূলদেহে মালা তিলক চন্দন পরলে সূক্ষ্মদেহে কি ছাপ পড়ে যে, মৃত্যুর পর দেহের বন্ধন মুক্ত হয়ে গেলেও জীবাত্মার সর্ব্বত্র (0) এই যূপকাষ্ঠ সদৃশ ছাপ দেখে, সেই Lebel অনুযায়ী যমদুতের পরিবর্ত্তে বিষ্ণুদূতরা এসে নিয়ে যাবে ?

পরাবর দৃষ্টিতে অনুভব করে ঋষিরা বলে গেছেন, এ জগতে যা কিছু দেখা যায় সবই সেই অনন্ত জগদাধার চৈতন্যসত্তার প্রকাশ এবং বিকাশ মাত্র ! যেমন ধরো তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার জামাটি কি ? তুমি বলবে সুতো দিয়ে তৈরী। 'সুতো কোথা থেকে এসেছে' ? 'তুলো থেকে'। 'তুলো কোথা থেকে' ? 'তুলোর গাছ হতে'। এইভাবে গাছ এসেছে বীজ হতে, আবার মরা বীজে তো আর গাছ হয় না ! তাহলে বীজের মধ্যে যে চৈতন্য সত্ত্বা আছে, ঐ অঙ্কুর, গাছ, ফল, তুলো, সুতো-তোমার জামাটা সব কিছুই সেই চিৎসত্ত্বারই প্রকাশ ও বিকাশ--Manifestation ! আত্মজ্ঞপুরুষরা ব্রহ্মদৃষ্টিতে এইভাবেই সর্ব্বত্র চৈতন্যসত্ত্বা অনুভব করেন। তাই বলে, মাটি, কাঠ, পাথর, কোন মানুষের দেহ—যা পাঞ্চভৌতিক উপাদানে গঠিত, তার সবই 'চিন্ময় বা অপ্রাকৃত' নয়। আর যদি বল যারা 'অপ্রাকৃত বা চিন্ময় দেহ' বলে, তারা একপ্রকারের Special চিন্ময় দৃষ্টিতে দেখে, তাহলে শুধু শ্রীকৃষ্ণের দেহটি আর তার মাটি কাঠ পাথরের শ্রীবিগ্রহগুলিই 'অপ্রাকৃত চিন্ময়' বলে প্রতিভাত হবে, আর কিছু হবে না, এমন কি হতে পারে ? আর লক্ষ লক্ষ বৈষ্ণব নামধারী সম্প্রদায়ীদের যদি সর্ব্বত্রই এই চিন্ময় দৃষ্টি হয়, সবকিছুই যদি তাঁরা অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, তাহলে মান, অভিমান, ঈর্ষ্যা, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দলাদলি, গদী নিয়ে কামড়াকামড়ি, মাধ্ব বড় কি রামানুজী বড়, চৈতন্যপন্থী গৌড়ীয় বড় কিংবা নিম্বার্কের দল বড়—এই নিয়ে কুৎসিত

দ্বন্দ্ব তাঁদের মধ্যে দেখা যায় কেন? নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের এইতো সেদিন এক ব্রজবিদেহী মোহান্তকে তাঁর গুরুভাইরা clique করে, একেবারে বিদেহ-অবস্থা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টায় ছিলেন! গদী ছেড়ে বৈষ্ণবচূড়ামণি অন্যত্র গিয়ে প্রাণ রক্ষা করলেন! গৌড়ীয়দের বঙ্গবিখ্যাত অপ্রাকৃত দলাদলি শেষ পর্য্যন্ত কোর্ট কাছারি উকীল ব্যারিষ্টারের মাধ্যমে প্রাকৃত ভাবেই মিটলো! এই সব প্রভুপাদদের 'অপ্রাকৃত চিন্ময়দৃষ্টি' তখন কোথায় ছিলো? একই গুরুর শিষ্য সেবকদের মধ্যে যে ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব-লড়াই হয়, তাতে হীন জৈব-লালসা আর জৈব দৃষ্টিরই পরিচয় পাই, কোন চিন্ময় দৃষ্টির নিদর্শন মিলে কি?

চিন্ময় কোন কিছু দর্শন বা অনুভব স্থূল দৃষ্টিতে হয় না। দিব্যবস্তু দর্শন করতে হলে দিব্যদৃষ্টিরও প্রয়োজন হয়। যোগী বা ভক্ত সমাধিস্থ অবস্থায় গুরুকৃপায় সেই দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে, সব বস্তুরই অন্তঃরালে একই চিন্ময়সত্ত্বা অনুভব করেন। কাজেই কৃষ্ণের হোক বা তাঁর মূর্ত্তিরই হোক, যে-কোন-কিছু চিন্ময়রূপে অনুভব করতে হ'লে যে চিন্ময় দৃষ্টির প্রয়োজন সেই 'অপ্রাকৃত' দৃষ্টি প্রভুপাদদের কেবল সভাসমিতি প্রচারপুস্তকের বস্তু ছাড়া প্রকৃতই যদি থাকতো তাহলে কি তাদের মধ্যে ঐ সমস্ত অতিপ্রাকৃত অভিনব কলহ-কোলাহল ঘটতে পারে?

স্বীকার করি, কৃষ্ণের দেহাভ্যন্তরেও ছিলো সেই শাশ্বত চিন্ময় সত্ত্বা যা প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে, পঞ্চকোশের আবরণে ঢাকা, কিন্তু মায়া-রহিত, উপাধি-রহিত ঐ অপ্রাকৃত সত্ত্বা অনুভব করতে হ'লে চাই আত্মদৃষ্টি। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নারদকে বলছেন—

> 'মায়াহ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
> সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং ন তু মাং দ্রষ্টুমর্হসি'।
>
> [মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব]

'হে নারদ তুমি চর্ম্মচক্ষুতে আমার যে দিব্যগন্ধাদিযুক্ত দেহ দেখছো—ইহা মায়িক। মায়িক দেহের আবরণে ঢাকা আমার স্বরূপ দেখতে পার না। স্বরূপ দর্শন করতে হলে সচ্চিদাঘন আত্মাতে সমাধি করতে হবে'।

'অন্ধ বিশ্বাসের অন্ধকূপ হত্যা'

কৈ, এখানে তো শ্রীকৃষ্ণ নিজের দেহকে মায়িক বা প্রাকৃত, বলেই

বলছেন ; 'অপ্রাকৃত বা চিন্ময় দেহ' বলছেন না তো ? কৃষ্ণ বুঝি কৃষ্ণভক্তগণের মত 'অপ্রাকৃত' জ্ঞানসম্পন্ন ন'ন ? ভগবান যেটুকু বুদ্ধিবৃত্তি দিয়েছেন, সেটুকুকে অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকূপে অন্ধকূপ হত্যা না করে, প্রামাণিক শাস্ত্র বাক্যের উপর ভিত্তি করে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে একটু বিচার করে দেখ ভাই। প্রকৃত প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়ার পূর্ব্বে, যে অর্ব্বাচীন শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকে তোমাদের ওঁ নিত্যলীলা প্রবিষ্ট এক হাজার আট শ্রীল প্রভুপাদরা মেনে গেছেন, তোমরা শ্রীপাদরাও যাকে একমাত্র 'শাশ্বতী শ্রুতি' বলে গদগদ হও, সেই শ্রীমদ্ভাগবতেই কৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে কি আছে দেখ :—মৈত্রেয়-বিদুর সংবাদে জানা যায়, ধর্ম্মের মূর্ত্তিনাম্নী পত্নীর গর্ভে নর ও নারায়ণ নামে দুইটি ঋষি উৎপন্ন হয়েছিলেন—

'মূর্ত্তিঃ সর্ব্বগুণোৎপত্তি নর নারায়ণাবৃষি
যয়োর্জন্মন্যদো বিশ্বমভ্যনন্দৎ সুনির্ব্বৃতম্'। [৪র্থ স্কন্ধ, ১, ৫১]

এই নরনারায়ণ ঋষি-উভয়েই গন্ধমাদন পর্ব্বতে তপস্যা করতে গিয়েছিলেন—'লব্ধাবলোকৈর্যযতুরর্চ্চিতো গন্ধমাদনম্' [ঐ ৪. ১. ৫৭]। মৈত্রেয় বিদুরকে বলছেন, ' ঐ নর এবং নারায়ণ ঋষিই ভূভার হরণের জন্য মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন যদুকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যজন কুরুকুলশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন—

'তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ।
ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরূদ্বহৌ'। [ঐ ৪, ১, ৫৮]

বৈষ্ণবমান্য শ্রীমদ্ভাগবতের চেয়েও প্রাচীনতর এবং প্রামাণিক গ্রন্থ সর্ব্বজনমান্য বেদব্যাসের মহাভারতেও কৃষ্ণের এই রকম প্রাকৃত দেহ নিয়েই জন্ম জন্মান্তর গ্রহণ এবং এক এক জন্মে কঠোর তপস্যার পরিচয় পাওয়া যায়।

শকুনি দুর্য্যোধনের দ্বারা কপট পাশা খেলায় রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে যখন বনবাসী হলেন, কৃষ্ণ এই সংবাদ শুনে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠলে, তাঁকে শান্ত করবার জন্য অর্জ্জুন তাঁর পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মের দেহকৃত ধর্ম্মসকল বর্ণনা করতে লাগলেন—'অর্জ্জুনোবাচ।—

দশবর্ষসহস্রানি যত্র সায়ংগৃহো মুনিঃ
ব্যচরস্ত্বং পুরা কৃষ্ণ! পর্ব্বতে গন্ধমাদনে।

দশবর্ষ সহস্রানি দশবর্ষশতানি চ, পুষ্করেষ্ববসঃ কৃষ্ণ ! ত্বমপো ভক্ষয়ন্ পুরা ।
ঊর্দ্ধবাহু বিশালায়াং বদর্য্যাং মধুসূদন ! অতিষ্ঠ একপাদেন বায়ুভক্ষঃ শতং সমাঃ ।
অবকৃষ্টোত্তরাসঙ্গঃ কৃশো ধমনী সন্ততঃ । আসীঃ কৃষ্ণ ! সরস্বত্যাং সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে ।
প্রভাসমপ্যথাসাদ্য তীর্থং পুণ্যজনোচিতং । তথা কৃষ্ণ ! মহাতেজা ! দিব্যবর্ষসহস্রকম্ ।
অতিষ্ঠস্ত্বমিহৈকেন পাদেন নিয়মস্থিতঃ । লোকপ্রবৃত্তিহেতোস্ত্বমিতি ব্যাসো মমাব্রবীৎ ।

[মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১২শ,—১১-১৬ শ্লোক]

'হে কৃষ্ণ ! তুমি পূর্ব্বকালে গন্ধমাদন পর্ব্বতে দশহাজার বছর কাল যত্রসায়ংগৃহমুনি হয়ে বিচরণ করেছিলে, তুমি এগার হাজার বছর শুধুমাত্র জল পান করে পুষ্কর-তীর্থে বাস করেছিলে। তুমি বিশাল বদরিকাশ্রমে ঊর্দ্ধবাহু হয়ে বায়ুভক্ষণ করে একপদে দাঁড়িয়েছিলে। তুমি সরস্বতীতীরে উত্তরীয় বস্ত্র বিবর্জ্জিত অবস্থায় শিরা-সঙ্কুল শীর্ণ শরীর হয়ে দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞকালে অবস্থান করেছিলে এবং সাধুজন সেব্য প্রভাস-তীর্থে গিয়ে নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক দেবতাদের পরিমিত সহস্র বৎসর এক-পদে অবস্থিত ছিলে' ইত্যাদি

তোমাদের ইষ্ট কৃষ্ণচন্দ্রও অর্জ্জুনের এই কথা স্বীকার করে নিয়ে বললেন,— "নরস্ত্বমসি দুর্দ্ধর্ষ হরিনারায়নোহ্যহম্। কালে লোকমিমং প্রাপ্তৌ নরনারায়নাবৃষী ॥ হে দুর্দ্ধর্ষ, তুমি নর, আমি নারায়ণ ঋষি। আমরা উভয়ে কালক্রমে এই লোকপ্রাপ্ত হয়েছি" [ঐ, বনপর্ব্ব, ১২শ, ৪৬,] ।

ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকেও আমরা জানতে পারি মহর্ষি ঘোর-আঙ্গিরসের নিকট ব্রহ্ম বিদ্যায় দীক্ষালাভ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। এমন কি, যে শ্রীমদ্ভাগবতকে ভিত্তি করে তোমরা বল 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং', তাতেও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে কৃষ্ণের সাধনা করার কথা। যিনি সাক্ষাৎ পরমাত্মা, "নরাকৃতি পরব্রহ্ম", পূর্ণ অসীম অনন্ত স্বতঃপ্রকাশ জ্ঞান স্বরূপ যিনি, তাঁর কি আবার সাধনার দরকার হয়। কৃষ্ণ একজন প্রাকৃত দেহ বিশিষ্ট মানুষই ছিলেন এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কঠোর তপস্যা করে, কৃষ্ণরূপেও মহাযোগ তপস্যা এবং জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে গেছেন ;

ভাগবত মতেই কৃষ্ণের প্রাকৃত জন্ম কর্ম্ম !

সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মসত্ত্বা, দেশকালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন একটি সীমাবদ্ধ পাঞ্চভৌতিক দেহের মধ্যে এসেছিলেন, এ ধারনা কেবল তাদেরই হ'তে পারে, যারা জ্ঞানবিচারের নামে কানে আঙ্গুল দিয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপ করে।

'ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় বার্য্যুপস্পৃশ্য মাধবঃ
দধ্যৌ প্রসন্নকরণ-আত্মানং তমসঃ পরম।
একং স্বয়ং জ্যোতিরনন্যবায়ং, স্ব-সংস্থয়া নিত্য নিরস্তকল্মষম্
ব্রহ্মাখ্যমস্যোদ্ভব নাশ হেতুভিঃ স্বশক্তিভির্লক্ষিত ভাবনির্বৃতিম্ [শ্রীমদ্ভাগবত, ১০, ৭০]

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠে জলস্পর্শ করে শ্রীকৃষ্ণ আচমন করে ইন্দ্রিয় সকলের প্রসন্নতা লাভ করলেন। অনন্তর যিনি উপাধিশূন্য, আত্মসংস্থিত, অব্যয় ও অখণ্ড, অজ্ঞানরহিত বলে সাক্ষাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ, জগতের উৎপত্তি এবং নাশের হেতুভূত স্বীয় শক্তিলক্ষণ দ্বারা যাঁর সত্ত্বা লক্ষিত হয়ে থাকে, শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রহ্মসত্ত্বার——নিত্যানন্দময় পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হ'লেন'।

একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ যোগী গৃহস্থ যেমন সাধনা করেন, নিত্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন শ্রীকৃষ্ণও যে তাই করতেন অন্যত্র তারও বর্ণনা মেলে ঐ বৈষ্ণবমান্য শ্রীমদ্ভাগবত থেকেই।

'অথাপ্লুতোঽম্ভস্যমলে যথা বিধি, ক্রিয়াকলাপং পরিধায় বাসসী
চকার সন্ধ্যোপগমাদি সত্তমো, হুতানলো ব্রহ্ম জজাপ বাগযতঃ।
উপস্থায়ার্কমুদ্যন্তং তর্পয়িত্বাত্মনঃ কলাঃ
দেবানৃষীন্ পিতৄন্ বৃদ্ধান্ বিপ্রাণভ্যর্চ্চচাত্মবান্॥] ঐ ১০, ৭০, ৫-৭]

সাধুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ নির্ম্মল জলে স্নানপূর্ব্বক বসন ও উত্তরীয় পরিধান করলেন, যথাবিধান সন্ধ্যা উপাসনা হোম ইত্যাদি করে সংযত বাক্ হয়ে ব্রহ্মমন্ত্র জপ করতে লাগলেন। তারপর প্রাতে সূর্য্য সমুদিত হ'তে দেখে সূর্য্য প্রনাম করে আত্মবান কৃষ্ণ দেবতা ঋষি পিতৃগণ বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বিপ্রগণকে অর্চ্চনা করলেন'।

এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কর্ম্ম তপশ্চরণের যে ইতিহাস পাই তাতে স্পষ্টই বোঝা যায়, Cycle of birth and death এর ভিতর দিয়ে আসতে আসতে যেমন একজন পূর্ণত্বের পথে এগিয়ে যায়, যেমন এক একজন জন্ম জন্মান্তরে তপস্যা করে করে অবশেষে একদিন ঋষিত্ব অর্জ্জন করে থাকেন, তেমনি বিভিন্ন জন্মে বিভিন্ন নরদেহ ধারণ করে, করে কঠোর ত্যাগ তপস্যা-সাধনার ভিতর দিয়ে অবশেষে কৃষ্ণকে কৃষ্ণরূপেই দেখতে পাই, মহাযোগী, স্থিতপ্রজ্ঞ, ব্রহ্মবিদরূপে। সমুদ্রপানকারী অগস্ত্য, দ্বিতীয় স্বর্গরচনাকারী বিশ্বামিত্রাদি অদ্ভুত-কর্ম্মা ঋষিদের মতই কৃষ্ণও ছিলেন, একজন মহাযোগৈশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ।

তাঁর যোগৈশ্বর্য্যাদি অদ্ভুত অলৌকিক কাজের জন্য যদি তাঁকে পূর্ণ পরমাত্মা 'অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহধারী স্বয়ং ভগবান' বলতে হয়, তাহলে ঐ **সমস্ত ঋষিরাকে** কেন **তোমরা পরমাত্মারূপে পূজা কর না?**

যাঁর কাছে তিনি ব্রহ্মবিদ্যালাভ করেছিলেন **সেই গুরু ঘোর ঋষিরই বা শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চাদির পূজা বৈষ্ণবরা করেন না কেন?** নারায়ণ ঋষির অবতার কৃষ্ণের যদি এত ঘটা করে পূজা এবং নাম জপ কীর্ত্তন হয়, তবে যাঁর সম্বন্ধে কৃষ্ণ নিজমুখে বলেছিলেন, "অনন্যঃ পার্থ! মত্তস্ত্বং, ত্বত্তশ্চাহং তথৈব চ; হে পার্থ! তুমি আমাহ'তে ভিন্ন নও আমিও তোমা হ'তে ভিন্ন নই" [মহাভা, বনপর্ব, ১২শ,] তাঁর সেই অভিন্নহৃদয় সখা এবং সাথী **নর-ঋষির অবতার অর্জ্জুনের নাম জপ, 'অপ্রাকৃত চিন্ময় জ্ঞানে' তাঁর শ্রীবিগ্রহের পূজা জপাদি কর না কেন?**

খুব ভাল করে পূর্ব্বাপর বিচার করলে দেখা যায়, মাতাপিতার রজোবীর্য্য সংযোগে আর পাঁচ জন মানুষ জন্মগ্রহণ করে, দেবকীবসুদেবের শুক্র-শোনিত যোগে শ্রীকৃষ্ণেরও দেহ উৎপন্ন হয়েছিলো। তারপর শৈশব, বাল্য, কৈশোর যৌবন বার্দ্ধক্যের ভিতর দিয়ে পরিণামশীল দেহের যেমন পরিবর্ত্তন হয় কৃষ্ণেরও তেমনি হয়েছিল। তাঁর দেহ 'অপ্রাকৃত' ছিল না। একশ কুড়ি বছর বয়সে নিজ জীবনের মধ্য দিয়ে নানা অলৌকিক কাজ করে যাদবগণের মৃত্যুর পর যোগস্থ হয়ে দেহ রক্ষা করেন। পরে দারুকের কাছে তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে, "অর্জ্জুন গিয়ে সকলের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করতে অসমর্থ হওয়ায় কেবলমাত্র বসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের দেহগুলি অগ্নিসংস্কার করে হস্তিনাপুরে চলে যান।" [মহাভারত, আদিপর্ব, ২অ,]

' স কৃষ্ণঃ ... ত্যক্তাদেহং দিবং গতঃ '

কৃষ্ণ বিরহে শোকার্ত্ত অর্জ্জুনও ব্যাসের আশ্রমে গিয়ে তাঁর প্রাকৃত দেহ যে এই প্রাকৃত জগতেই আর পাঁচজনের মত মৃত্যুর সময় ফেলে রেখে গেছলেন তা বললেন—

"যস্য মেঘবপুঃ শ্রীমান্ বৃহৎ পঙ্কজ লোচনঃ
স কৃষ্ণঃ সহ রামেন **ত্যক্তাদেহং** দিবং গতঃ"

কাজেই যে দেহ কৃষ্ণ নিজে পরিত্যাগ করে গেলেন, অর্জ্জুন নিজ হাতে অগ্নিসংস্কার করে যেটি পুড়িয়ে ফেললেন, তা অপ্রাকৃত দেহ হয় কিরূপে? তথাকথিত কৃষ্ণ-ভক্তদেরকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হয়, "অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহ" কি দাহ করা যায়?

মহাভারতের বেদব্যাস কৃষ্ণের যে অপ্রাকৃত দেহতত্ত্ব জানলেন না, বৈষ্ণবরা বুঝি তা Special ভাবক্লিষ্ট দৃষ্টিতে অনুভব করেছেন, 'ব্রজের গোপীপদরেণু'র মহিমায় ?

যে মরদেহকে শ্রীকৃষ্ণ এই ধূলির ধরনীতে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন জীর্ণ বস্ত্রবৎ, প্রাণপ্রিয়সখা যে দেহের অগ্নিসংস্কার করেছিলেন, এখন তাঁর মৃত্যুর হাজার হাজার বছর পরে মাটি কাঠ পাথরের একটি কৃষ্ণমূর্ত্তিগড়ে "অপ্রাকৃত চিন্ময় শ্রীবিগ্রহ" বলে পূজার্চ্চনা ভাবোন্মাদের খামখেয়াল ছাড়া কিছু নয় !

শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান অনন্তজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা ছিলেন না, তা মহাভারতের আর একটি ঘটনার উল্লেখ করে প্রমান করছি। ভারত-যুদ্ধের কিছু পরেই অর্জ্জুন জিজ্ঞেস করেছিলেন,

> 'যত্তৎ ভগবতা প্রোক্তং পুরা কেশব ! সৌহৃদাৎ
> তৎ সর্ব্বং পুরুষ-ব্যাঘ্র। নষ্টং মে ভ্রষ্টচেতসঃ' ।৬।

তার উত্তরে কৃষ্ণ বললেন, "তুমি নির্ব্বোধ ; যথাযথ শ্রদ্ধা তোমার নেই। এখন আমার আর সে স্মৃতিও নেই। যোগযুক্ত অবস্থায় পরব্রহ্ম বিষযে তখন যা বলেছিলাম তা এখন অশেষ ভাবে বলতে অক্ষম।

> বাসুদেব। নূনম্ অশ্রদ্দধানোঽসি দুর্ম্মেধাহসি পাণ্ডব।
> ন চ শক্যঃ পুনর্ব্বক্তু্ম্ অশেষেন ধনঞ্জয় ।১১।
> স হি ধর্ম্মঃ সুপর্য্যাপ্তো ব্রহ্মণে পদবেদনে,
> ন শক্যং তন্ময়া ভূয়স্তথা বক্তু্মশেষতঃ ।১২।
> পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেনতন্ময়া,
> ইতিহাসং তু বক্ষ্যামি তস্মিন্নর্থে পুরাতনম্ ।১৩।"
>
> [আশ্বমেধিক, অনুগীতাপর্ব্ব]

এখন চিন্তা করে দেখ, যদি 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং' হন, তাহলে তিনি পরব্রহ্ম বিষয়ে বলতে অক্ষম হলেন কেন ? একজন যোগী সমাধিতে যা অনুভব করেন সমাধি ভঙ্গের পর তিনি যেমন তা 'অশেষতঃ' বলতে অক্ষম হন, কৃষ্ণেরও সেই রকম অবস্থা ! সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মাই যদি তিনি হতেন তাহলে, নিরবচ্ছিন্ন, স্বতঃপ্রকাশ [redacted] প্রজ্ঞার উৎস যিনি, তাঁর কি আত্মবিস্মৃতি ঘটে ? সমগ্র যোগিজনের যিনি ধ্যেয, সমূহ যোগতপস্যা যাঁব উদ্দেশ্যে করা হয সেই স্বরাটবিরাট পরমাত্মস্বরূপের স্মৃতিভ্রংশ কিংবা যোগচ্যুতি সম্ভবপর ?

তাছাড়া আরও ভেবে দেখ ভাই 'অপ্রাকৃত চিন্ময়দেহ'ধারী পূর্ণ পরমাত্মা যদি কাউকে উপদেশ দেন তাহলে তার যে সচ্চিদানন্দময় অবস্থা লাভ হয়, তার কোন ক্ষয় ব্যয় হ্রাস বৃদ্ধি বিস্মরণ আদি ঘটতে পারে না। সত্য বটে ভয়াল বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে এবং পর পর নানাধরণের উপদেশ দিয়ে অর্জ্জুনকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, একবার জ্ঞানযোগ একবার কর্ম্মযোগ বা ভক্তিযোগের তত্ত্বকথা শুনিয়ে অর্জ্জুনের শঙ্কাও দুর করতে সমর্থ হয়েছিলেন তিনি, অর্জ্জুনও সেই মাত্র যা দেখেছে যা শুনেছে তদনুযায়ী বলেছিলেন বটে, 'নষ্টমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদাৎ ময়াচ্যুত !' [গীতা ১৮,৭৩] কিন্তু তাঁর এই মোহনাশ এবং স্মৃতিলাভ সাময়িক ভাবে হয়েছিল ; সত্যসত্য পরোক্ষ জ্ঞানলাভের ক্ষণিক ফলমাত্র !

অর্জ্জুন অবশ্য বলেই ছিলেন, "ব্যামিশ্র বাক্যের দ্বারা আমার বুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন করে দিও না, যাতে নিশ্চিত ভাবে শ্রেয়লাভ হয় তাই বল, তদেকং বদনিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽমাপ্নুয়াম [গীতা ৩.২]।" অর্জ্জুনের যদি এই মোহ-মুক্তি, 'স্বয়ং ভগবান'—প্রদত্ত 'শ্রেয়োলাভ' যদি সত্যকার হতো, তাহলে তিনি ভারতযুদ্ধের কিছু পরেই কি করে বলেন, 'তৎসর্ব্বং পুরুষব্যাঘ্র ! নষ্টং মে ভ্রষ্ট চেতসঃ' ? [মহাভারত, আশ্বমেধিক অণুগীতাপর্ব্ব, ১৬শ অধ্যায়] ।

শ্রুতি বলেন, সেই পরমতত্ত্ব অনুভব করতে পারলে পরমাত্মা সাক্ষাৎকার হলে হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হয়, সর্ব্বসংশয় নাশ হয়, সকল কর্ম্মেরও হয় ক্ষয় [মুণ্ডক ২.২.৮] ; শ্রীকৃষ্ণ যদি 'স্বয়ং ভগবান'ই হ'ন, তাহলে এহেন "নরাকৃতি পরব্রহ্মের" কাছে দেবদুর্লভ দিব্যচক্ষু লাভ করে অর্জ্জুনের 'দর্শন'টি কী ধরনের হ'ল যে তিনি অল্পদিন পরেই সব ভুলে গেলেন !! নিজেই কৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন, 'হে অর্জ্জুন ! কৃপাপরবশ হয়ে আত্মযোগসামর্থে তোমাকে যে বিশ্বরূপ দর্শন করালাম, এরূপ দর্শন ইতিপূর্ব্বে কেউ কখনও করেনি ; বেদ যজ্ঞাধ্যয়ন দানক্রিয়া উগ্র তপস্যাদির দ্বারাও নরলোকে এরূপ দর্শনে কেউ সক্ষম হয় না [গীতা ১১শ ৪৭,৪৮]।' [এখানেও বৈষ্ণবদের 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম' পূর্ণ ভগবানের কিঞ্চিৎ স্মৃতিভ্রংশ দেখা যাচ্ছে ! কারণ দিবচক্ষু দান না করেই বাল্যে মা যশোদাকে একবার আর কৌরব সভায় দুর্য্যোধন কর্ণাদি যখন তাঁকে বন্দী করতে চেয়েছিলেন তখন একবার—তাঁদেরকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন [মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ১৩১ অঃ] ।

বৈষ্ণবদের " নরাকৃতি পরব্রহ্মে"র কিঞ্চিৎ স্মৃতি ভ্রংশ

"নরাকৃতি পরব্রহ্মের" 'আত্মযোগসামর্থ্য' এবং সকল শ্রমই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছিল বলে মনে হচ্ছে, যখন অর্জ্জুন বললেন, 'নষ্টং মে ভ্রষ্টচেতসঃ' ! একটু সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে ভেবে দেখলে ঐ সব ঘটনা থেকে সহজেই বুঝতে পারবে ভাই, পূর্ণ পরমাত্মা কর্ত্তৃক সঞ্চারিত বা উপার্জিত জ্ঞান কখনও বিস্মরণ হয় না ; অথচ অর্জ্জুনের যখন তা হ'ল তাতে সহজেই বোঝা যায় কৃষ্ণকে 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম' বলা সাম্প্রদায়িক প্রচার মাত্র ! তাছাড়া কৃষ্ণ তো নিজেই বলছেন, "পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগ যুক্তেন তন্ময়া, আমা কর্ত্তৃক যোগযুক্ত অবস্থায় **পরব্রহ্ম বিষয়ে** তাহা কথিত হইয়াছিল !" কৈ বলছেন না তো, "আমাকর্ত্তৃক আমার নিজের বিষয়ে যাহা কথিত হইয়াছিল ?"

মেগাস্থিনিসের বিবরণে জানা যায়, তিনি যখন গ্রীক রাজদূতরূপে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় এসেছিলেন তখন অর্থাৎ খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত কৃষ্ণের দেবতা জ্ঞানে পূজা গুজরাটের সাত্বত বংশীয়দের মধ্যেই প্রচলিত ছিলো। ভারতের অন্যান্য লোকে কৃষ্ণকে ঐ সময় পর্য্যন্ত আদর্শ মহামানবরূপেই মানতেন, মানতেন রাজনীতি সমাজনীতি লোকনীতি সববিষয়েই একজন ভূয়োদর্শীরূপে। পরে সাত্বতদের এই অনুকরণে নব অভ্যুদিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভুপাদদের মহিমায় কৃষ্ণ একেবারে পূর্ণ অবতারী পুরুষ পরমাত্মারূপে দেখা দিলেন। বেদব্যাসের নাম দিয়ে ভাগবত রচিত হ'ল এবং তাতেই এই বিকৃত প্রচেষ্টা চরমে উঠেছে। চতুর্ভুজধারী বিষ্ণুর সঙ্গে কৃষ্ণ হয়ে গেলেন একাত্ম, কখনও শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী পীতাম্বর, আবার কখনও বা দ্বিভুজ মুরলীধারী, কটিতে পীতবসন পীতধড়া, মাথায় শিখিপুচ্ছ কেয়ূরকনককুণ্ডলবান্, বক্ষে শ্রীবৎস লাঞ্ছিত কৌস্তুভমণি ! রসিকেন্দ্র চূড়ামণির [ভাগবৎমতে] রসিক ভক্তরা নানাগ্রন্থের মাধ্যমে প্রচার করতে লাগলেন এ সমস্তই নাকি চিন্ময় ! পুনরায় তোমাদেরকে বিচার করে করে দেখতে বলি কৃষ্ণ যদি পূর্ণ পরব্রহ্মই হ'ন, তাহলে তাঁর ধাম তো প্রকৃতেঃ পরঃ [ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো··· তদ্ধামং পরমং মম ; গীতা ১৫.৬] ? প্রকৃতির পরপারে সেই পরম ধামে ভক্তের মনোহরণ বেশভুষা, শিখিপুচ্ছ' পীতবসন, অলঙ্কার, বাঁশী প্রভৃতি প্রকৃতিজাত বস্তুগুলি এল কি ভাবে ? কৃষ্ণ যদি পরব্রহ্ম হ'ন তাহলে সৃষ্টির আদিতে তো আর কারও থাকার কথা নয় ! শিরে শিখিপুচ্ছের জন্য শিখি, অলঙ্কার নির্ম্মাতা

স্বর্ণকার, পীতবসনের জন্য তন্তুবায়, বাঁশী তৈয়ারীর জন্য শিল্পী—এরাও কি সৃষ্টির আদিতে ছিল?

ভক্ত-প্রাণতোষিণী সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা টীকার কথা বাদ দিয়ে, বিবেকবুদ্ধি সহ শাস্ত্র বাক্য আর স্বয়ং কৃষ্ণবাক্য বিচার করে দেখলেই বোঝা যায়, 'নরাকৃতি পরব্রহ্মত্ব,' 'ধড়াচূড়া মূর্ত্তির চিণ্ময়ত্ব' 'মালা তিলক চন্দনের অপ্রাকৃত তত্ত্ব' প্রচারের মূলে কোন সত্য নেই। কেবল স্বতন্ত্র সম্প্রদায় সৃষ্টির একটা অপকৌশল !

গীতোক্ত 'মম' 'ময়ি' 'মাম' কথাগুলির ভাবার্থ

প্রশ্ন :—শ্রীকৃষ্ণ যদি পূর্ণ পরমাত্মাই না হবেন তাহলে গীতাতে তিনি 'কর্ম্মফল আমাকে অর্পণ কর', 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু', 'অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ', 'দেবভক্তরা দেবলোকে যায় আর আমার ভক্তেরা আমাকেই পায়', 'তদ্ধাম পরমং মম', 'আমাকেই তুমি প্রাপ্ত হবে'—এই সব কথা বলছেন কেন? আপনি তাঁকে পূর্ণ পরমাত্মারূপে মানুন আর নাই মানুন, তাঁর ঐ সমস্ত 'অহম্, মাম্, মে, মম, ময়ি' প্রভৃতি বাক্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় বৈষ্ণবরা ঠিকই বলেন 'কৃষ্ণই নরাকৃতি পরব্রহ্ম'। তিনি স্বয়ং-ভগবান না হলে 'আমি', 'আমার', 'আমাকে', ইত্যাদি কথা ব্যবহার করিতেন না। তিনি ছাড়া যদি কেউ স্বতন্ত্র ঈশ্বর থাকতেন, তাহলে 'তাঁকে কর্ম্মফল অর্পণ কর, তাঁকে নমস্কার কর, তাঁর শরণাগত হও' ইত্যাদি কথা গীতাতে কৃষ্ণ ব্যবহার করতেন না কি?

উত্তর :—'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং', এই slogan বা মন্ত্রটি যে গ্রন্থে আছে, তোমাদের সেই পরমপ্রিয় বৈষ্ণবদের মুকুটমনি শ্রীমদ্ভাগবতে, কপিলদেব, ঋষভদেব এবং ভূমাপুরুষের প্রসঙ্গ আছে যে অধ্যায়গুলিতে, সেগুলি একটু মন দিয়ে পড়তো লক্ষীটি! দেখ কপিলদেব তাঁর পিতাকে উপদেশ দিচ্ছেন—

> 'গচ্ছকামং ময়া পৃষ্টো ময়সন্ন্যস্ত কর্ম্মনা
> জিত্বা সুদুর্জ্জয়ং মৃত্যুম মৃতত্বায় মাং ভজ [ভাগ ৩, ২৪, ৩৮]

এখন যথা ইচ্ছা গমন কর, **আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করে,** দুর্জ্জয় মৃত্যুজয় এবং অমৃতত্ব লাভের জন্য আমায় ভজনা ক'রো'।

ঋষভদেবও, 'আমার প্রীতির জন্য কর্ম্ম করা, আমার কথা বলা, আমার ভক্তগণের সঙ্গ, আমার গুনকীর্ত্তন—মৎকর্ম্মভির্মৎকথয়া চ নিত্যং মদ্দেবসঙ্গাদ্

গুণকীর্ত্তনাম্মে' [৫. ৫. ১১] এই রকমের 'আমি আমার' সূচক উপদেশ দিয়ে পুত্রগণকে বলছেন, 'স্থাবর জঙ্গম যা কিছু আছে সেই সকল পদার্থেই আমার অধিষ্ঠান জেনে পবিত্র দৃষ্টিতে সতত তাদের সম্মান করো তাহাই আমার পূজা [৫. ৫. ২৬]'। দশম স্কন্ধের উননব্বই অধ্যায়ে ভূমাপুরুষও উপদেশ কালে 'মম, মাম্, ময়ি' কথা ব্যবহার করেছেন। ঐ কৃষ্ণকেই তাঁর নিজের অংশ বলে বলেছেন [১০. ৮৯. ৩২] কৈ—এজন্য তো তোমরা কপিলদেব, ঋষভ এবং ভূমাপুরুষকে পূর্ণ ভগবান বলে মান না? ভাগবতকার, বিশেষ করে শ্রীজীব গোস্বামী তো তাঁদের অংশত্ব প্রতিপাদনের জন্য 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে' প্রাণপন চেষ্টা করেছেন! কেবল শ্রীকৃষ্ণের বেলাতেই 'মম ময়ি মাম্' কথাগুলি পূর্ণ-ভগবত্ত্বা সূচনা করে? শঙ্করাচার্য্য যখন বলছেন, 'অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো বিভুর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাম্ .. ...' তখন কি তুমি বলবে তিনি নিজেকে পূর্ণ পরমাত্মা বলে declare করছেন? বর্ত্তমান যুগে রমনমহর্ষি, জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মানন্দস্বামীও 'আমি আমার' কথা উপদেশ কালে ব্যবহার করতেন। পূর্ব্বকালেও, কৃষ্ণের জন্মের হাজার হাজার বছর পূর্ব্বে বেদের ঋষিগণ, আত্মতত্ত্ব উপদেশ কালে 'অহং, মম' ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। কৈ এজন্য তো তাঁরা 'স্বয়ং ভগবান্' হয়ে যান নি?

শোন ভাই বৈষ্ণবচূড়ামনি! গীতাতে যেখানে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ 'মম ময়ি মাম্' ব্যবহার করেছেন, সেই সমস্তই তিনি কপিল, ঋষভ, শঙ্করাচার্য্যের মত আত্মাকে লক্ষ্য করে আত্মাতে সমাহিত হয়েই বলেছেন।

আত্মজ্ঞ মহাপুরুষ যখন ভূমি থেকে ভূমার ক্ষেত্রে উঠেন, তখন দ্বৈত-ভ্রান্তি দূরে যায়, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান, দ্রষ্টা-দৃশ্য-দর্শন, এই ত্রিপুটির হয় লয়; ব্যুত্থানের পরেও যে চিত্তবৃত্তি মানুষকে দেশকালপাত্র দেহাত্মবুদ্ধির মধ্যে পরিচ্ছিন্ন সীমিত করে রাখে, সেই চিত্তবৃত্তির নিরোধের জন্য স্বরূপোলব্ধি হওয়ায়, সর্বত্রই দেখেন, সেই একই আত্মা জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান, দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শনরূপে Subjectively & Objectively অভিব্যক্ত! তরঙ্গ যদি বলে আমি জল, স্বর্ণময় অলঙ্কার যদি নামরূপ উপাধির পরিবর্ত্তে বলে আমি সোনা, তাতে যেমন ভুল হয় না তেমনি নামরূপ উপাধি বিনির্মুক্ত স্বরূপোলব্ধির পর, সর্ব্বত্র অভেদ-দর্শনের জন্য আত্মজ্ঞ পুরুষরা 'আত্মাদেশ' বাক্য ব্যবহার না করে পারেন না। ব্রহ্মবিদ্

ব্রহ্মৈব ভবতি। আত্মতত্ত্ববিদ্ মহাযোগৈশ্বর্য্যশালী মহাপুরুষরা যখন শিষ্যকে উপদেশ দেন, তখন আত্মাতে সমাহিত হয়েই উপদেশ দেন। দেহাত্মবোধ থাকে না বলে, পরমাত্মার সঙ্গে একত্ববোধের জন্য, তাঁদের সেই সময়কার উপদেশগুলি পরমাত্মারই বাণীরূপে স্ফুরিত হয়।

'যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি সভূমা। অথ যত্র অন্যৎ পশ্যতি, অন্যৎ শৃণোতি, অন্যৎ বিজানাতি তদ্ অল্পম্। যো বৈ ভূমা তদ্ অমৃতম্, অথ যদ্ অল্পং, তৎ মর্ত্ত্যম্' শ্রুতিবাক্য][—যে স্থলে অন্য দ্রষ্টব্য দর্শন করে না, অন্য শ্রোতব্য শ্রবণ করে না, অন্য জ্ঞাতব্য জানেনা, তাহাই ভূমা, তাহাই অমৃত ; যাহা অল্প বা পরিচ্ছিন্ন, মনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য, তাহাই নশ্বর।

আত্মজ্ঞ পুরুষরা এই ভূমাবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়েই মম, ময়, মাম্ ইত্যাদি কথা ব্যবহার করেন ; তাঁদের সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত দেহ বা নিজের ব্যক্তিগত সত্ত্বা লক্ষ্য করে তাঁরা ওরকম কথা বলেন না। কিন্তু সাধারণ মানুষ এবং অনমুভবী সম্প্রদায়ী সাধুগুরুনামা ভণ্ডগণ নিজেদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী, তাঁদের কথার কদর্থ করে 'উল্টা বুঝলি রাম' করে বসে আছে। পূর্ব্বতন আত্মজ্ঞ ঋষিদের মতই পরমাত্মবোধে চৈতন্য 'মুই সেই মুই সেই', রামকৃষ্ণও 'যেই রাম সেই কৃষ্ণ ইদানীং সেই রামকৃষ্ণ' বলেছিলেন। কিন্তু ভক্তিরসে বিপ্লাবিত চিত্ত দেহাত্মবোধী ভক্তরা বুঝে বসে আছেন—ওঁরাই পূর্ণ পরমেশ্বর! অবতারী পুরুষ!! যুগাবতার ইত্যাদি !!!

পরোক্ষ এবং অপরোক্ষজ্ঞানের তারতম্যে, উপলব্ধ ভূমির তারতম্যানুযায়ী ঐ সর্বব্যাপক ব্রহ্মচৈতন্যের বিষয় বেদে বা শ্রুতিতে তিন উপায়ে উপদিষ্ট হয়েছে (১) কোথাও 'তদাদেশ' বাক্য কোথাও 'আত্মাদেশ' এবং কোথাও বা 'অহংকারাদেশ' বাক্য। 'তৎ ত্বম অসি', 'প্রজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম'—এই মহাবাক্যগুলি 'তদাদেশ' বাক্য ; 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', আত্মাদেশ বাক্য ; আর 'অহং ব্রহ্মাহস্মি'—এটি 'অহংকারাদেশ' বাক্য।

তিনিই ঊর্দ্ধে, অধে, পশ্চাতে, সম্মুখে, দক্ষিণে, উত্তরে, তিনিই এই সকল —স এব ইদম্ সর্ব্বমিতি—এটি 'তদাদেশ' বাক্য ; (২) আত্মাই অধে, ঊর্দ্ধে, পশ্চাতে, সম্মুখে, দক্ষিণে, উত্তরে, আত্মাই এই সকল—'আত্মা এব ইদং সর্ব্বমিতি—এটি আত্মাদেশ' বাক্য ; আর (৩) আমি অধে, ঊর্দ্ধে, পশ্চাতে, সম্মুখে,

' তদাদেশ ' ' আত্মাদেশ ' এবং ' অহংকারাদেশ ' ! দক্ষিণে, উত্তরে, আমিই এই সকল—'অহমেব অধঃস্তাৎ অহম্ উপরিষ্টাৎ, অহং পশ্চাৎ অহং পুরস্তাৎ……অহমেব ইদং সর্ব্বমিতি'— এই হ'ল 'অহংকারাদেশ' বাক্য।

অপরোক্ষানুভূতির পরমভূমিতে যিনি উঠেন তাঁর উপদেশ বাক্য ঐরূপ—'অহংকারাদেশ' রূপে উপদিষ্ট হয়। কৃষ্ণ যেমন গীতাতে বলেছেন, 'অহং ওষধীষু, বনস্পতিষু', বেদের ঋষিরাও ঠিক ঐ সুরেই ঐ ভাবেই বলেছেন, 'অহং ওষধীষু' ভুবনেষু অহং বিশ্বেষু ভুবনেষু অন্তঃ ;' 'অহং রুদ্রেভির্ব্বসুভিশ্চরাম্যহং'– [ঋগ্বেদ], 'অহং অদ্মি পিতুস্পরি মেধা মৃতস্য জগ্রহ, অহং সূর্য্য ইবাজানি' [সামবেদ], 'অহং পরস্তাৎ অহং অবস্তাৎ যদন্তরীক্ষঃ য অসৌ আদিত্যে পুরুষঃ স অসৌ অহম্' [যজুর্ব্বেদ]।

কৃষ্ণবাক্য, 'অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে' এবং ওদিকে ঋষিবাক্য 'অহং বিশ্বম্ ভুবনম্ অভ্যভবম্'—কি ঠিক একই রূপ নয় ?

কৃষ্ণ যেমন বলেছেন, 'অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণানাং দেহমাশ্রিতঃ' ঋষি বাক্যেও তেমনি পাই, অহং অন্নম্ অহং অন্নাদঃ'। এমন কি পুরাণ, সংহিতা তন্ত্রের যুগেও যাঁরা সেই আত্মভূমিতে উঠে উপদেশ দিয়েছেন তাঁদের কথাতেও ঐ অহংকারাদেশ বাক্য পাই, 'অহং ব্রহ্ম ন চান্যোস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্, সচ্চিদানন্দরূপোহহং নিত্য মুক্ত স্বভাববান্', অহং বা সর্ব্বভূতেষু, সর্ব্বভূতান্যথো ময়ি' ইত্যাদি।

এখন আমাকে বুঝিয়ে দাও ভাই, যদি গীতার ঐ সমস্ত অহংকারাদেশ বাক্য 'মম ময়ি মৎ মাং' থাকার ফলে কৃষ্ণের 'পূর্ণ পরমেশ্বরত্ব পূর্ণ অবতারত্ব' সিদ্ধ হয়, তাহলে কৃষ্ণের জন্মের বহু বহু হাজার বছর পূর্ব্বে বেদ এবং উপনিষদের ঋষিরা যে ভূমাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে একই ধরনের 'অহং মাম্' ইত্যাদি বাক্যে বরং আরও উদাত্তস্বরে এবং বজ্রগম্ভীর ব্যঞ্জনায় যে উপদেশ দিয়ে গেলেন, তাঁদেরকে কেন সেজন্য 'স্বয়ং ভগবান পূর্ণ অবতার' আদি বলা হয় না ? রসিক বৈষ্ণবগণ কেন ঐ সমস্ত বরেণ্য ঋষিদের শ্রীবিগ্রহের পূজা, পাদোদক সেবন, দরবিগলিত অশ্রুধারে নিয়ত তাঁদের নাম সংকীর্ত্তন করেন না ? একি কেবল নিজেদের সম্প্রদায় বাঁচাবার জন্য কৃষ্ণেই সব কিছু আরোপ করবার অপচেষ্টা নয় ?

ঐ রকম ভ্রম-প্রমাদ থেকে বাঁচাবার জন্যই শান্তিগীতাতে কৃষ্ণার্জ্জুনের

প্রশ্নোত্তর মুখে সব কিছু স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করছেন,—

'সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
পূরা প্রোক্তস্য তাৎপর্য্যং শ্রোতুমিচ্ছামি তদ্বদ'।

তদুত্তরে কৃষ্ণ বলছেন—

'মাং শব্দস্তুস্বদৃষ্ট্যাতু ন হি সংঘাত দৃষ্টিতঃ
একোঽহং সচ্চিদানন্দ স্তাৎপর্য্যেন তমাশ্রয়।

আমি যে বলেছি সর্ব্বধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমারই শরনাপন্ন হও, তার নিগূঢ়ার্থ এই যে সংঘাত দৃষ্টিতে আমার শরনাপন্ন হও—এ কথা আমি বলিনি; **স্বরূপ দৃষ্টিতেই** তা বলা হয়েছে। আমি এক সচ্চিদানন্দ—সেই **স্বরূপ বোধকেই** আশ্রয় কর।

দেহাত্মমানিনাং দৃষ্টির্দেহেঽহং 'মম' শব্দতঃ,
কুবুদ্ধয়ো.ন জানন্তি, মম ভাবমনাময়ম্। [শান্তিগীতা]

গীতাতে 'আমি আমার' এরূপ শব্দ প্রয়োগ করাতে দেহাত্মবুদ্ধি লোকেরা আমার দেহেতে দৃষ্টি করে আমাকে দেহরূপ জ্ঞান করে। মূঢ়েরা আমার নিত্যশুদ্ধ পরমভাব জানে না'।

স্বরূপবোধের পরিবর্ত্তে জড়মূর্ত্তি পূজা মূঢ়তা!

আশা করি, ঐ কথাতে স্পষ্টই বুঝতে পারলে তাঁর 'অপ্রাকৃত দেহ', তাঁর 'অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহ' বলে তাঁকেই পূর্ণ পরমেশ্বর 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম' জ্ঞানে জড় মূর্ত্তি পূজাদির অনুষ্ঠান—যে ভূমাচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি অন্যান্য বৈদিক ঋষিদের মতই 'অহংকারাদেশ' বাক্যে উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই স্বরূপবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তাৎপর্য্য গ্রহণ না করা—কতদূর মূঢ়তা!

চতুর্থ পুষ্প

প্রশ্ন:— দেখুন, আপনার কথার ভাবে বোঝা যাচ্ছে—আজকাল যেমন ঠাকুর দেবতার নামে ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ ইত্যাদি নাম রাখা হয় তেমনি পরব্রহ্মধামের পরব্রহ্ম-পুরুষ—যাঁর আকর্ষণী ধারার জন্য কৃষ্ণ বা রাম বলা হয়—সেই নামানুসারেই প্রাচীনকালে দুই রাজ পুত্রের নাম রাম এবং কৃষ্ণ ছিল। অযোধ্যার রাম কিংবা দ্বারকার কৃষ্ণ আপন আপন অলৌকিক গুনে অসাধারন হলেও রামভক্তরা যেমন রামকে, কৃষ্ণ ভক্তরা কৃষ্ণকেই সাক্ষাৎ ভগবান বলে মনে করেন আপনি তা মানতে রাজী নন। আপনি ঐতিহাসিক প্রমাণ এবং শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা বোঝাতে চাচ্ছেন যে কৃষ্ণ বৈষ্ণবদের ধারনানুযায়ী সাক্ষাৎ ভগবান ন'ন; একজন রাজর্ষি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ছিলেন—ইক্ষাকু জনকাদির মত! কিন্তু আপনার যদি 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ' ভাল করে পড়া থাকতো তাহলে কৃষ্ণই যে 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম' তা ভালভাবে বুঝতে পারতেন। শ্রীজীবগোস্বামী পাদ "শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে" অকাট্য প্রমাণ সহ বুঝিয়ে দিয়েছেন 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'। তাঁর নাম জপে অশেষ মঙ্গল হয়। নরাকৃতি পরব্রহ্ম—তাঁর দেহ অপ্রাকৃত; যে কৃষ্ণ নন্দগৃহে লালিত পালিত হয়েছিলেন সেই কংসারি, অর্জ্জুন সখা, গোপ বিহারী শ্রীকৃষ্ণই পরাৎপর তত্ত্ব; আপনার ধারনানুযায়ী সাধারণ ব্রহ্মজ্ঞ নন।

উত্তর:— তোমাদের মত তো আমার কোন Special বৈষ্ণবীয় 'অদভ্রঃ' চক্ষু নেই! কাজেই বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী নয়—নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে, সংস্কারমুক্ত

মন নিয়ে নিজের জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি মত—বিচার বিশ্লেষণ করে করে 'শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ' খানি পড়েছি। ওতে শ্রীজীব গোস্বামীজী বেদ উপনিষদ মহাভারত সব কিছু অগ্রাহ্য করে, প্রামাণিক শাস্ত্রোক্তি কোথাও twist করে, কোথাও বা কদর্থ করে, নিজেদের সম্প্রদায় সিদ্ধির অভিপ্রায়ে, একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতকেই 'নিখিল শাস্ত্র রাজচক্রবর্ত্তী' বলে, অন্য সমূহ শাস্ত্রের উপর ভাগবতের "বিমর্দ্দকত্ব" আছে বলে ধরে নিয়ে, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' ভাগবতের এই একটি মাত্র কথার উপর নির্ভর করে নিজেদের সম্প্রদায়ের দুই চার খানা অর্ব্বাচীন পুঁথির সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণকে "নরাকৃতি পরব্রহ্ম" বলে প্রমাণ করবার অপচেষ্টা করেছেন! একই পুরাণের মধ্যে বা মহাভারতের মধ্যে যে কথাগুলির টেনেবুনে, কোনমতে অন্ততঃ ব্যাকরণের বিভক্তি প্রত্যয়ের মারপ্যাঁচে—কৃষ্ণকে 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম' বলে দেখানো যেতে পারে—সেগুলি গ্রহণ করে—বাকীগুলি হয় অগ্রাহ্য করে নতুবা অর্থান্তর করে এক অদ্ভুত বিকৃত বাখ্যা বিভ্রাট ঘটিয়েছেন! তবুও আমার বিশ্বাস, কেউ যদি নিরপেক্ষভাবে "শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ" পড়েন তাহলে বুঝবেন শ্রীজীবের সহস্র চেষ্টাতেও কৃষ্ণের অংশত্বই প্রতিপাদিত হয়, 'পূর্ণ ভগবত্তা' কিছুতেই যুক্তিসিদ্ধ হয় না। অবশ্য কৃ—ষ্ণ এই কথাটি কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই যাঁদের অশ্রু পুলক শিহরণাদি 'অষ্ট বিকার' দেখা দেয়—পূর্ব্ব থেকেই যাঁরা 'বৈষ্ণব' হয়ে স্বাধীন চিন্তাধারাকে রুদ্ধ করে (Regimentation of thought) বসে আছেন—তাঁদের কাছে ঐ বই 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে' !!

যাক্, 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে' শ্রীজীবগোস্বামী কতভাবে অপূর্ব্ব ভাষ্যের কসরৎ করেছেন তার কিছু কিছু নমুনা দিচ্ছি ঃ—

[ক] রামানুজের মতে শ্রীনারায়ণ স্বয়ং ভগবান—শ্রীকৃষ্ণ কারনার্ণব শায়ী মহাপুরুষ মাত্র। রামানুজের এই মত শ্রীজীবাদি গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা মানেন না। কিন্তু ভূমাপুরুষের উক্তি 'তোমরা নর-নারায়ণ ঋষি' এটি মানলে কৃষ্ণকে নারায়ণ ঋষিরই অবতার বলতে হয়—আর 'স্বয়ং ভগবান' বলা যায় না। কাজেই ভূমাপুরুষের ঐ উক্তি খণ্ডন করার জন্য যে রামানুজকে তাঁরা মানেন না এই সময় একান্ত সুবিধাবাদীর মত ঐ রামানুজকেই authority ধরে নিয়ে শ্রীজীব বলছেন—ভূমাপুরুষের উক্তি (কৃষ্ণ=নারায়ণ ঋষি) যখন রামানুজের কথার (কৃষ্ণ=কারনার্ণব শায়ী মহাপুরুষ) সঙ্গে মিলছে না তখন তা মানা অনুচিত।

'ভূমাপুরুষের ঐ কথা যথাশ্রুত বাক্যের অত্যন্ত বিরুদ্ধ– তত্ত্বদর্থত্বে বিরুদ্ধেত', [শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ] !!! অথচ মনে রেখ ভাই, ভূমাপুরুষের ঐ কথা আসলে ভাগবত-কারেরই কথা। কারণ ভূমাপুরুষের উপাখ্যান এবং উক্তি শ্রীমদ্ভাগবতেই আছে !

[খ] বৈষ্ণবদের অপর সম্প্রদায়াচার্য্য মধ্বাচার্য্য ভাগবতের 'এতে চাংশ-কলা' ইত্যাদি শ্লোকের 'চ' স্থানে 'স্ব' পাঠ করে অংশাশীর অভেদ স্বীকার করে গেছেন। তাঁর এই মত স্বীকার করলে কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য অন্যান্য অবতারদের চেয়ে টিকে না, কাজেই শ্রীজীব বললেন—'না, তোমরা ঠিক ঠিক মাধ্বমুনির কথা বুঝতে পারো নি। মধ্বাচার্য্যের ঐ কথা মানলে কৃষ্ণ পদের কোন স্বার্থকতা থাকে না। 'স্বাংশ' শব্দ পাঠ করে বিভিন্নাংশ জীবকে স্বাংশ মৎস্যাদি হতে পৃথকরূপে দেখানোই তাঁর অভিপ্রায়'। এই বলেই—আপনারা তাঁর ঐ অপূর্ব্ব ব্যাখ্যান-কৌশলের জন্য সাধুবাদ দেন না দেন, শ্রীজীব নিজেকে নিজেকে 'বাহবা' দিয়ে বলছেন, "তস্মাৎ স্থিতে ভেদে সাধ্বেবদং ব্যাখ্যাতং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি ;—অংশাশীর ভেদ স্থির হ'ল এবং এই ব্যাখ্যা উত্তম হয়েছে" [প্রাণগোপাল গোস্বামীর অনুবাদ সহ শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ] !

[গ] মৎস্যপুরাণ ও পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডের যে সমস্ত কথাদ্বারা কৃষ্ণকে 'অংশ' বলে বলা হয়েছে—তাতে তাঁর "নরাকৃতি পরব্রহ্মত্ব"টিকে না বলে, শ্রীজীব গোস্বামী বললেন—'ঐ সব ।শবপ্রতিপাদক পুরাণ সকল তামস শাস্ত্র। কর্দ্দমাক্ত জল যেমন কর্দ্দম দ্বারা নির্ম্মল হয় না তেমনি তামসশাস্ত্র দ্বারা অজ্ঞানান্ধ-জীবের সংশয় ঘুচে না বরং বেড়েই চলে—যথা পঙ্কেন পঙ্কাম্ভ ইত্যাদিবৎ' [শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ]। সাম্প্রদায়িক একদেশী ব্যাখ্যাটি কেমন দেখ ভাই– শিববাক্য তামসশাস্ত্র !!!

শ্রীজীব গোস্বামীর ব্যাখ্যা-বিভ্রাট

[ঘ] বেশী কথা আর কি বলবো ভাই—শ্রীজীবের 'নিখিলশাস্ত্র-রাজচক্রবর্ত্তী' শ্রীমদ্ভাগবতে একটিবার মাত্র একস্থানে বলা হয়েছে 'এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' ; আর ঐ ভাগবতেরই অজস্র স্থানে কৃষ্ণকে পরমাত্মার অংশ বলে স্পষ্টভাবে বলা আছে। কিন্তু কী দুঃখের কথা,নিজেদের সম্প্রদায়সিদ্ধির জন্য শ্রীজীব ঐ একই গ্রন্থের অংশত্ব প্রতিপাদক শ্লোকগুলিকে তুচ্ছ এবং অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি বলেছেন—"ভাগবতে যে অংশত্ব প্রতিপাদক অনেক কথা

আছে সেগুলিকে 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' এই বাক্যের অনুগত ধরতে হবে; ওটি পরিভাষা, সাধ্য নির্ণয়ের জন্য প্রতিজ্ঞাবাক্য। কাজেই ঐ একটিমাত্র বাক্যদ্বারা কোটি কোটি বাক্য শাসিত (!) হয়ে থাকে, সবগুলিকে এরই অনুগতভাবে ব্যাখ্যা করাই শাস্ত্র সঙ্গত (!!)—ততশ্চ বাক্যানাং কোটিরপ্যেকেনৈবামুনা শাসনীয়া ভবেদিতি, নাস্য গুনবাদত্বং প্রত্যুতৈতদ্বিরুদ্ধায়মানানাং এতদনুগুণার্থতৈব বৈদুষী" [প্রাণগোপাল গোস্বামীর অনুবাদসহ 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ']

ঐ শ্রীজীবীয় যুক্তি তর্কের খাতিরে ধরে নিয়ে যদি বল, ভাগবতের ঐ পরিভাষাটি নয়তো ভাগবতের মধ্যেই যে সমস্ত বিরোধীবাক্য আছে তা শাসন (!) করতে পারে কিন্তু তাই বলে অন্যান্য পুরাণে বা মহাভারতের মধ্যে কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত বিরোধী যে সমস্ত বাক্য আছে সেগুলি ঐ 'পরিভাষা' দ্বারা শাসিত হবে কোন যুক্তিতে? শ্রীজীবের তখন অদ্ভুত উত্তর—'এইরূপ সন্দেহ করা যেতে পারে না, শ্রীমদ্ভাগবত পরমার্থনির্ণায়ক শাস্ত্র' [প্রাণগোপাল গোস্বামীর অনুবাদ ৪২ | ৪৩ পৃষ্ঠা]। শ্রীজীবের যুক্তি অনুযায়ী অন্যান্যগুলি যেন 'পরমার্থ নির্ণায়ক' শাস্ত্র নয়! একমাত্র ভাগবতকেই যেন পরমার্থ নির্ণয়ের Sole authority দেওয়া হয়েছে !!

এইবার ভাগবতের অংশত্ব প্রতিপাদক শ্লোকগুলির শ্রীজীবগোস্বামী কি রকম অত্যন্ত স্থূলভাবে টেনে বুনে অর্থ করেছেন তা বিচার করে দেখলেই বোঝা যাবে বসুদেব পুত্র গোপীকাবল্লভ (বৈষ্ণবমতে) শ্রীকৃষ্ণের 'পূর্ণ পরমেশ্বরত্ব' প্রমাণ করবার জন্য কী রকম প্রাণপাত অপচেষ্টা করেছেন, ঃ—

[ভ] শ্রীমদ্ভাগবতের [১০. ১. ১] শ্লোকে আছে (১) "অংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোঃ'; প্রকৃত অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশে অবতীর্ণ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে শ্রীজীব কষ্টকল্পনা করে অর্থ দাঁড় করিয়েছেন, "অংশের অর্থাৎ শ্রীবলরামের সহিত অবতীর্ণ কৃষ্ণ। সর্ব্বব্যাপকতা দ্বারা পরিপূর্ণতার পর্য্যাবসান শ্রীকৃষ্ণে আছে। এই জন্য বিষ্ণু শব্দে এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে নির্দ্দেশ করা হয়েছে"। কিন্তু পরিচ্ছিন্ন দেহধারী শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বত্র ব্যেপে থাকতেন সে কথা ব্যাসদেবের মহাভারতে কোথাও লেখা নেই। কোন কৃষ্ণভক্ত ভাগবত লিখে, যদৃচ্ছা কল্পনার আশ্রয়ে কৃষ্ণের অলৌকিকত্ব ব্যাপকত্ব ইত্যাদি দেখাতে পারেন কিন্তু ব্যাসদেবের মহাভারত পাঠে জানা যায়— কপট দ্যুতক্রীড়ায় হৃতসর্ব্বস্ব হয়ে

কৃষ্ণাসহ পঞ্চপাণ্ডব যখন বনে ছিলেন, তখন ভোজ পাঞ্চাল এবং বৃষ্ণিগণ সহ কৃষ্ণ সেখানে একদিন এসে বললেন—

"নৈতৎ কৃচ্ছ্র মনুপ্রাপ্তো ভবান্ স্যাদ্ বসুধাধিপ।
যদ্যহং দ্বারকায়াং স্যাং রাজন্ সন্নিহিতো পুরা।

আমি যদি **তখন দ্বারকাতে থাকতাম,** তাহলে হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! তোমাদের এত কষ্ট ভোগ হত না" ।—এই কথা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, তিনি যেথায় থাকুন না কেন, সে সময় যেখানেই ছিলেন সেখানেই ছিলেন, সর্বব্যাপকরূপে তখন দ্বারকা হস্তিনাপুর ইন্দ্রপ্রস্থ সর্বত্র বিরাজমান ছিলেন না! অথচ শ্রীজীব ওখানে সর্বব্যাপকতা আছে ধরে নিয়ে বিষ্ণুর সঙ্গে কৃষ্ণকে একাত্ম করে দিয়ে কেমন ভাবে টেনে বুনে বাখ্যা করেছেন দেখ!

মহাভারত মতে কৃষ্ণ অংশ, পূর্ণ নন

(২) 'বভৌ ভূঃ পক্কশস্যাঢ্যা কলাভ্যাং নিতরাং হরেঃ' [ভাগ ১০.২০. ৪০] প্রকৃত অর্থ — হরির অংশ শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বারা পৃথিবী নিরতিশয় শোভা পাইয়াছিল। শ্রীজীব দেখলেন—এখানে কৃষ্ণের নরাকারে পূর্ণব্রহ্মত্ব টিকে না! কাজেই তিনি অর্থ দাঁড় করালেন — 'হরির অংশ অর্থাৎ বিভূতিরূপা পৃথিবী পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বারা নিরতিশয় শোভাশালিনী হইয়াছিলেন' [শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ] (!)

(৩) 'দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবায় নঃ' [ভাগ ১০.২.৩৫]। প্রকৃত অর্থ—দেবগণ দেবকীকে বলেছেন, 'সাক্ষাৎ ভগবান পরমপুরুষ আমাদের শ্রীবৃদ্ধির জন্য **অংশদ্বারা** আপনার গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন'। এখানে কৃষ্ণ যে অংশ, পূর্ণ নন, তা এত স্পষ্টাক্ষরে বলা হ'ল যে 'স্বয়ং ভগবত্তা' দাঁড়ায় না! কিন্তু শ্রীজীবের কষ্টকল্পনাটা দেখ—'যিনি মৎস্যাদি অংশাবতাররূপে পূর্বে আমাদের মঙ্গলের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, হে মাতঃ, এইবার তিনি সাক্ষাৎ—স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়াছেন' [শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ]। সংস্কৃতের ঐ শ্লোকটি থেকে 'যিনি মৎস্যাদি অংশ অবতাররূপে পূর্বে আমাদের মঙ্গলের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন…' এই অর্থ কি করে টানা যায় ভাই? কৃষ্ণের পূর্ণত্ব স্থাপন করার জন্য বৈষ্ণবদেরকে 'Poetic License' এর মত এটুকু License দিতে হবে নাকি?

(৪) " এত ভগবতঃ সাক্ষাদ্ধরে নারায়নস্য চ,

অবতীর্ণাবিহাংশেন বসুদেবস্য বেশ্মনি [ভাগ ১০.৪৩ ২০]।

—এঁরা (রাম ও কৃষ্ণ) সাক্ষাৎ নারায়ণ হরির অংশে বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন"—এই প্রকৃত অর্থটি এখানে এত স্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল যে এখানে আর ব্যাকরণের কৃপায় বিভক্তি সমাস তিঙন্ত্ সুঙন্ত টেনে অংশকে পূর্ণ করা গেল না! বা হাজার গৌড়ীয় বৈষ্ণব হলেও 'রুমাল'কে বিড়াল করতে শ্রীজীবের বুঝি এখানে বিবেকে বাধলো; তাই তিনি অন্য কৌশল অবলম্বন করে কৈফিয়ৎ দিলেন—'তথা নাতি বিদ্বজ্জন বাক্যে—ইহা সুবিজ্ঞ ব্যক্তির বাক্য নহে; তাঁহারা সাতিশয় বোধ সম্পন্ন ছিলেন না, সাধারণ দর্শক মাত্র!' [ঐ]

(৫) 'তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ

ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরুদ্বহৌ' [ভাগ ৪।১ . ৫৮]

প্রকৃত অর্থ—পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য শ্রীহরির অংশদ্বয় যদুবংশে শ্রীকৃষ্ণ এবং কুরুবংশে অর্জ্জুনরূপে এখানে এসেছেন'। "শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে" এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে,—'ভগবান নানাবতার-বীজ হরির নর-নারায়ণাখ্য অংশদ্বয় শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনে প্রবেশ করিয়াছেন'। পূর্বজন্মের নরঋষি অর্জ্জুনরূপে এবং নারায়ণঋষি শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মেছিলেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে ১২ অধ্যায়ে অর্জ্জুন কৃষ্ণের পূর্ব পূর্ব পাঁচ জন্মের তপস্যার বিবরণ দিয়েছেন—কৃষ্ণও তা স্বীকার করে নিয়েছেন নিজেকে নারায়ণ-ঋষির অবতাররূপে। অথচ 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং' প্রমান করবার জন্য বৈষ্ণবীয় ব্যাখ্যা দাঁড়ালো—'.. নরনারায়নাখ্য সেই অংশদ্বয় শ্রীকৃষ্ণার্জুনে প্রবেশ করিয়াছেন'—অর্থাৎ ঘনীভূত পূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণে সেই নারায়নাখ্য ঋষি রূপী হরির অংশটুকু এসে মিশে গেছলো!!

(৬) শ্রীকৃষ্ণের নাম করণ প্রসঙ্গে গর্গাচার্য্য নন্দের কাছে কৃষ্ণের গুণ সম্বন্ধে পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন, 'নারায়নো সম গুণৈঃ'—ইনি গুণে নারায়নের সমান; গুণৈঃ নারায়নস্য সমঃ, এই হ'ল বাস্তবিক অর্থ। কিন্তু শ্রীজীবগোস্বামী কি রকম টেনে বুনে অর্থ দাঁড় করিয়েছেন দেখুন, 'গুণৈঃ নারায়নঃ সম যস্য, গুণে নারায়ণ সমান যাঁহার'! এর উপর প্রাণগোপাল গোস্বামী মন্তব্য করেছেন, 'শ্রীজীব গোস্বামী'র এই অর্থ ই সুসঙ্গত। কেননা 'গুণে নারায়নের সমান' এই অর্থ গ্রহণ করলে নারায়ণ আশ্রয়তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ আশ্রিততত্ত্ব হয়; কিন্তু তা হতে পারে

না। শ্রীকৃষ্ণই আশ্রয়তত্ত্ব, নারায়ণ আশ্রিততত্ত্ব'। যদি নিরপেক্ষভাবে কেউ প্রশ্ন করেন, ভাগবতের ঐ সমস্ত অজস্র উদাহরণে তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে .শ্রীকৃষ্ণ অংশ। তিনি কি করে আশ্রয়তত্ত্ব হবেন ? তদুত্তরে বৈষ্ণবরা বলবেন, 'আমরা জানি যে !' যদি বলা হয়, মহাভারতকার যা জানলেন না, কৃষ্ণ নিজেও যা বুঝলেন না, নিজেকে অংশরূপেই প্রকাশ করলেন [মহা-বনপর্ব] তাঁকে কি ভাবে আশ্রয়তত্ত্ব ধরে, নারায়নকে আশ্রিততত্ত্ব ধরা যায় ? তদুত্তরে আমার মনে হয় গৌড়ীয়দের সরল স্পষ্ট উক্তি হওয়া উচিত, 'নতুবা ব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ভগবত্তা মাঠে মারা যায় যে ! আমাদের সম্প্রদায়ও যে টিকবে না !!'

(৭) ভাগবতের দশম স্কন্ধে উননব্বই অধ্যায়ে কৃষ্ণকে ভূমাপুরুষের অংশ এবং ভূমাপুরুষকে 'পুরুষোত্তমোত্তম' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ভূমাপুরুষের উপাখ্যানে জানা যায় যে এক ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রকে ফিরিয়ে আনবার জন্য অর্জ্জুনকে নিয়ে অনন্তদেব ভূমাপুরুষের ধাম মহাকালপুরে প্রবেশ করলেন ! এই ভূমাপুরুষের তীব্র অঙ্গজ্যোতি দর্শনে অক্ষম হয়ে অর্জ্জুন চক্ষু মুদ্রিত করলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন উভয়ে সেই 'পুরুষোত্তমোত্তম' কে প্রণাম করলে তিনি বললেন, 'তোমরা আমার অংশ। পৃথিবীর ভার স্বরূপ অসুর বধের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছ। তা সম্পন্ন করে আমার কাছে আগমন কর ; কলাবতীর্ণাবনের্ভরাস্বরাণ, হত্বেহভূয়স্তরয়েতমন্তি মে' [ভাগ ১০. ৮৯. ৩২]। উভয়ে তখন 'ওম্' শব্দ উচ্চারণ করে সেই মহাকালপুরুষকে প্রনাম করে ব্রাহ্মণের মৃতপুত্রগণ সহ দ্বারকায় ফিরে এলেন।

এই আখ্যায়িকাতে বৈষ্ণবমান্য ভাগবত শ্রীকৃষ্ণকে মহাকালপুরুষের অংশ বলে বসলেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। কৃষ্ণের অভিন্নহৃদয় সখা অর্জ্জুন কৃষ্ণের নিত্য সঙ্গী থেকে গৌড়ীয়দের 'নরাকৃতি পরব্রহ্মদর্শনে' কোন অসুবিধা অনুভব না করলেও ঐ ভূমাপুরুষের অঙ্গজ্যোতিঃ দর্শনে যখন তাঁর চক্ষু ঝলসে গেছলো তাতে স্পষ্টই ভূমাপুরুষ অপেক্ষা কৃষ্ণের শক্তির এবং so-called 'অপ্রাকৃত অঙ্গজ্যোতির ন্যূনতা ধরা পড়ে ! কৃষ্ণ তাঁকে 'পুরুষোত্তমোত্তম' বলে প্রনাম করেছেন, ফিরার সময় পুনরায় ব্রহ্মমন্ত্র 'ওঁ' উচ্চারণ করে প্রনাম করে এসেছেন !

ভাগবতকার 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' এই একটি শ্লোক সারা গ্রন্থে একটিবার মাত্র বলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদেরকে 'নরাকৃতি পরব্রহ্মজ্ঞানে' শ্রীবিগ্রহের চরণতলে

ধূল্যবলুণ্ঠিত হওয়ার যে সুযোগ করে দিয়েছিলেন—পর পর পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলিতে তা নষ্ট করেছেন আর এই ভূমাপুরুষের উপাখ্যানে তা একেবারে নস্যাৎ করে দিলেন! ভাগবতকার যদি একটিবার ভেবে দেখ্‌তেন যে তাঁর এই রকম একটি বেফাঁস কথায় তাঁরই সমধর্ম্মী লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণভক্তদের মুখে চুনকালি পড়বে, তাহলে নিশ্চয়ই ভদ্রলোক 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' শ্লোকটিসহ কৃষ্ণ সম্বন্ধে অন্যান্য অলৌকিক কাল্পনিক ঘটনার যদৃচ্ছা সমাবেশ করে—বৈষ্ণব প্রাণে যে 'অপ্রাকৃত' ভাবের প্লাবন এনে দিয়েছিলেন তা স্বেচ্ছায় নষ্ট করে দিয়ে যেতেন না! কিন্তু ওঁ নিত্যলীলা প্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী এই সত্য ঘটনাকে চাপবার জন্য সুকৌশলে কদর্থ যোজনার যে অপচেষ্টা করেছেন—বাংলা প্রবাদ বাক্যে তাকে বলা হয় 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা'!!! আমি শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ থেকে শ্রীজীবের অত্যদ্ভুত অসঙ্গত যুক্তিগুলি তুলে দিচ্ছি, কষ্ট কল্পনার কী যে কষ্টকর দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন, তা প্রত্যেক সুধীব্যক্তিই বুঝতে পারবেন :—

ভাগবত বা অন্যান্য পুরাণে যেখানেই কৃষ্ণ সম্বন্ধে নানা আজগুবি অলৌকিক আখ্যায়িকার সমাবেশ আছে, তা যদি তাঁর পূর্ণ ভগবত্তা প্রতিষ্ঠার অনুকূল হয়েছে তবে শ্রীজীবসহ সমস্ত প্রভুপাদগণ তা মেনেছেন; কিন্তু শ্রীজীব এখানে যুক্তি দিয়েছেন, 'শ্রীমদ্ভাগবতে মহাকাল পুরাখ্যান সমাখ্যা (আখ্যায়িকার দ্বারা উপদেশ); শ্রীশৌনকের প্রতি শ্রীসূতের সাক্ষাৎ উপদেশ 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'—এই শ্রুতি দ্বারা ইতিহাস (সমাখ্যা) দ্বারা কথিত মহাকালপুর প্রসঙ্গোক্ত শ্রীকৃষ্ণের অংশত্ব প্রতিপাদক বাক্য নিরস্ত হইল'। এখন শ্রীসূত বাক্যকে কি ভাবে 'শ্রুতি' বলা যেতে পারে তা বিচার করে দেখি এস। সাক্ষাৎ উপদেশকে শ্রুতি বলে। যোগিগণ কূটস্থ হ'য়ে ভগবৎ-দর্শন কালে সাক্ষাৎ ভগবানের যে সমস্ত নিত্য সিদ্ধ শাশ্বত সত্যবাণী শোনেন (প্রত্যাদেশ) তাকেই শ্রুতি বলা হয়; উপনিষদগুলি এজন্যই শ্রুতি। ভগবৎ-বাক্য কোন সাম্প্রদায়িক হ'তে পারে না, নিরপেক্ষভাবে উপদেশ দান, তাই শ্রুতি 'নিরপেক্ষরবা', অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবৎ-বাক্য বলে, সমাধিস্থ অবস্থায় দিব্য শ্রুতিতে ঋষিগণ তা শ্রবন করেন বলে শ্রুতিবাক্য সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। শাস্ত্রের যাথার্থ, প্রকৃত মর্ম্ম নির্ণয়ের জন্য পূর্ব্বমীমাংসার রীতি অনুযায়ী ছ'টি উপায় :— শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান এবং সমাখ্যা; তার মধ্যে 'অর্থ-বিপ্রকর্ষ', অর্থের ব্যবধান বশতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা

পরেরটি দুর্ব্বল,—অর্থাৎ শ্রুতি হ'তে লিঙ্গ দুর্ব্বল, লিঙ্গ হ'তে বাক্য দুর্ব্বল, বাক্য হ'তে প্রকরণ, প্রকরণ হ'তে স্থান, স্থানাপেক্ষা সমাখ্যা দুর্ব্বল। কাজেই শ্রীজীবের কথানুযায়ী শ্রুতিবাক্য দ্বারা সমাখ্যা নিশ্চয়ই নিরস্ত হয় কিন্তু তাই বিচার করে বল শ্রীসূতবাক্য কি শ্রুতিবাক্য? যদি তাই হয়, তাহলে কৃষ্ণের প্রনম্য, 'পুরুষোত্তমোত্তম' সাক্ষাৎ ভূমাপুরুষের বাক্য নিশ্চয়ই সূতবাক্যের চেয়ে সাক্ষাৎ-উপদেশ বাক্যরূপে শ্রুতিবাক্য হিসেবে অধিকতর মর্য্যাদালাভের দাবী করতে পারে? সেই ভূমাপুরুষই যখন 'তোমরা আমার অংশ' বলছেন তখন কৃষ্ণকে 'অংশ' মানা হবে না কেন? বক্তা সূত অপেক্ষা, বক্তা ভূমাপুরুষের, শ্রোতা শৌনকের চেয়ে কৃষ্ণের dignity নিশ্চয়ই বেশী নয় কি?

শ্রীজীবের 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা'!

কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামী প্রথম থেকেই যে কৃষ্ণকে 'পূর্ণ ভগবান্' ধরে নিয়ে সব কিছু ব্যাখ্যা করেছেন কি না! তাই তিনি পুনবায় বলছেন, ভূমাপুরুষকে বক্তা এবং কৃষ্ণকে শ্রোতা বলে ধরলে শ্রীকৃষ্ণের 'সর্ব্বজ্ঞতার ব্যভিচার দোষ' জন্মে! কিন্তু মহাভারত থেকে এমন কি ঐ ভাগবত থেকেই এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে যাতে কৃষ্ণের সর্ব্বজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় না! শ্রীজীব আরও বলতে পারতেন, 'শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বজ্ঞ না ধরে নিলে যে তাঁকে পূর্ণ পরব্রহ্ম বলা যাবে না, আর তাঁর পূর্ণ ভগবত্তা না মেনে নিলে যে আমাদেব সম্প্রদায়ের কী দশা হবে"? এই শ্রীজীবই কিন্তু ভূমাপুরুষের 'তোমাদেরকে দেখবার জন্য ব্রাহ্মণ-পুত্রগণকে এনেছি' এই উক্তিটিকে টেনে বুনে বলছেন, "তচ্চযুবয়োর্দিদৃক্ষুনেতি-তদ্বাক্যেন ব্যভিচারিতম্, ভূমাপুরুষের সর্বদা দর্শনের ব্যভিচার দেখা যাইতেছে; শ্রীকৃষ্ণ যদি কখনও দর্শন দেন তবে ভূমাপুরুষ দেখিতে সমর্থ হয়েন, ইহাই স্থির হইতেছে। যদি স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণস্ত তদ্রূপাবাত্মানৌ দর্শয়তি তদৈব তেন তৌ দৃশ্যেয়াতামিত্যানিতঞ্চ" [শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ]। এই কথা বলেই শ্রাজীব দ্রুত Conclusion টানলেন, 'অতএব ভূমাপুরুষ হইতে শ্রীকৃষ্ণের অধিক শক্তিমত্তা হেতু, তস্মাদপ্যধিকশক্তিত্বেন—পূর্ণত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে'। কিন্তু অধিকতর শক্তিমত্তার পরিচয় তিনি কোথায় পেলেন? বরং কৃষ্ণার্জ্জুনকে বিভ্রান্ত করে সুকৌশলে মহাকালপুরে আকর্ষণ করে নিয়ে যাওয়া স্থূলদেহধারী মানব কৃষ্ণার্জ্জুনের সহনক্ষমরূপে দর্শনদান, 'তোমরা নর-নারায়ণ ঋষি, ধর্ম্ম

আচরণ কর; অসুর বধ করে শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর' ইত্যাদি কৃষ্ণের প্রতি তাঁর নির্দ্দেশ এবং উপদেশ বাক্যে ভূমাপুরুষেরই অধিকতর শক্তিমত্তা এবং শ্রেষ্ঠতার (Superiority) পরিচয় পাওয়া যায়।

'দ্বিজাত্মজা' ইত্যাদি শ্লোকে [ভাগ ১০. ৮৯. ৩২] ভূমাপুরুষ কৃষ্ণকে যে সমস্ত নির্দ্দেশ এবং উপদেশ দিয়েছিলেন শ্রীজীব ঐ মূল শ্লোকটিরও নানারকম অর্থ বিভ্রাট ঘটিয়ে, 'অর্থাৎ' টেনে টেনে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন, আসলে নাকি ভূমাপুরুষ ঐ শ্লোকের দ্বারা কৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন উভয়েরই স্তব করেছেন !! তাঁর ঐ কদর্থ অনুযায়ী ভূমাপুরুষ কৃষ্ণ সহ অর্জ্জুনের স্তবই যদি করেছিলেন, তাহলে স্তাবক ভূমাপুরুষের অঙ্গজ্যোতিতে স্তব্য অর্জ্জুনের চোখ দুটি ঝলসে গেছলো কেন? ভূমাপুরুষেরও অংশী কৃষ্ণই যদি হবেন তাহলে তাঁর নিত্য সঙ্গী অর্জ্জুনের ঈদৃশ অবস্থার হেতু কি? কৃষ্ণ কর্ত্তৃক ভূমাপুরুষকে ভক্তিভরে প্রণামের কারণটাই বা কি?

তার উত্তরে বহুস্থলে বৈষ্ণবরা যা বলে থাকেন, শ্রীজীবও এখানে সেই যুক্তিই দিয়েছেন (১) অর্জ্জুনের সঙ্গে কৃষ্ণের এটি কৌতুক বিশেষ (২) ইহা তাঁহার লীলা !!! মহাকালপুরে গমনকালে "অপ্রাকৃত অশ্বগুলির" প্রাকৃত অন্ধকারে দিকভ্রষ্ট হওয়া এবং শাল্ব জরাসন্ধাদির ভয়ে 'নরাকৃতি পরব্রহ্মের' পলায়নাদির কারণরূপে বৈষ্ণবরা যেমন বলেন, 'কৃষ্ণ অনন্ত শক্তির আশ্রয় হলেও তিনি সে সময় স্বেচ্ছায় শক্তি গোপন রেখেছিলেন', এখানে শ্রীজীবীয় যুক্তিটিও তেমনি হাস্যকর! যদি কেউ নিরপেক্ষভাবে সরলমনে জিজ্ঞাসা করেন, কেন তিনি ঐ রকম লীলাভরে পলায়ন করেন, ('successful retreat' এর মত !), কেন তিনি নিজশক্তি গোপন করেন, তার উত্তরে শ্রীজীবীয় যুক্তি হ'ল, "এস্থলে কি অন্যত্র, শ্রীকৃষ্ণ কেন এইরূপ করেন, এই প্রশ্ন উঠতেই পারে না, কারণ তিনি স্বেচ্ছানুরূপ লীলা করেন—এবমত্র পরত্র বা তদীয়লীলায়াস্তু পূর্ব্বপেক্ষা নাস্তি, তস্য স্বৈরাচরণত্বাৎ।" "স্বৈরাচরণরত" এহেন কৃষ্ণের স্বৈরাচারী ভক্তদের স্বৈরাচারী অযৌক্তিক যুক্তির কুজ্ঝটিকা ভেদ করে বিচারের আলোকে, আশা করি, বিবেকী পাঠক দেখতে পাচ্ছেন, একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সিদ্ধান্ত ছাড়া, ঐ ভাগবতের শ্লোকগুলি দ্বারাই বোঝা যাচ্ছে, কৃষ্ণ 'অংশ'ই ছিলেন 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম' ন'ন।

মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ মতে কৃষ্ণ কেশাবতার মাত্র !

বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারত থেকে আর দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়ে, সাম্প্রদায়িক অপভাষ্য এবং ব্যাখ্যা বিকৃতি কী রকম চরমে উঠেছে—এই প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই।

(ক) বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে, "ক্ষীরোদশায়ী পৃথিবীর ভার হরণের জন্য প্রার্থিত হ'য়ে আপনার সিতকৃষ্ণ কেশযুগল উদ্ধার করেছিলেন, উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণ মহামুনে!" (খ) কৃষ্ণ যে পরমাত্মার একটি কেশের অবতার মাত্র, মহাভারতও তার বর্ণনা দিচ্ছে।—

স চাপি কেশৌ হরিরুজ্জহর্হে শুক্লমেকম্ পরঞ্চাপি কৃষ্ণং
তৌ চাপি কেশাবাবিশতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ৌরোহিনীং দেবকীঞ্চ।
তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ
কৃষ্ণো দ্বিতীয় কেশবঃ সংবভূব, কেশৌ যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ॥

[আদিপর্ব্ব ১৭০, ৩৩, ৩৪,]

'দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হয়ে শ্রীহরি কেশদ্বয় উৎপাটন করেন। তার একটি শুক্ল, অপরটি কৃষ্ণবর্ণ। সেই কেশদ্বয় যদুকুলমহিলা রোহিনী এবং দেবকীতে আবিষ্ট হয়েছিল; শ্বেতবর্ণ কেশ বলভদ্র আর দ্বিতীয় কৃষ্ণবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ অনুযায়ী কৃষ্ণরূপে উক্ত হ'ন।'

শুধু তাই নয়, যে ভাগবত শ্রীজীবীবের মতে 'নিখিলগ্রন্থরাজচক্রবর্ত্তী', তাতেও কৃষ্ণের কেশাবতারত্বের উল্লেখ আছে—

"ভূমে সুরেতরবরূথ বিমর্দ্দিতায়াঃ
ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ"

—অর্থাৎ পৃথিবী অসুর সৈন্য দ্বারা নিপীড়িতা হলে পৃথিবীর ভার হরণের জন্য অংশ সহ সিতকৃষ্ণ কেশ জন্মগ্রহণ করে··· ··" ইত্যাদি। ঐ ভাগবতে একথাও স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, অসুরভারক্লিষ্টা ধরিত্রীর দুঃখ অপনোদনের জন্য পরমেশ্বর সিতকৃষ্ণকেশদ্বয় উৎপাটন করে বলেছিলেন, "তস্যায়মষ্টমো গর্ভে মৎকেশো ভবিতা সুরাঃ, অর্থাৎ হে সুরগণ! তাহার অষ্টমগর্ভে আমার কেশ উৎপন্ন হইবে।"

ঐগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কৃষ্ণ 'স্বয়ং ভগবান' ছিলেন না,

সর্ব্বত্র তাঁকে 'অংশ' 'ভূমাপুরুষের অংশ' বা 'পরমেশ্বরের একটি কৃষ্ণকেশ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আর ঐ সব বর্ণনায় বারবার Repetition থাকায় শাস্ত্রকারদের মনোভাবও স্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল হয়েছে। একমাত্র যারা (ক) **ভ্রম** [অবস্তুতে বস্তুবুদ্ধি, শুক্তিতে রজত ভ্রম, অংশকে পূর্ণজ্ঞান, জড়মূর্ত্তিকে অপ্রাকৃত চিন্ময়জ্ঞান ইত্যাদি] (খ) **বিপ্রলিপ্সা** [বঞ্চনেচ্ছা. নিজজ্ঞাত অর্থ বা শাস্ত্রনিহিত প্রকৃততত্ত্ব প্রকাশ না করা, সম্প্রদায় রক্ষার জন্য ভুল অর্থ যোজনা করা] এবং (গ) **করুণাপটব** [ইন্দ্রিয়মান্দ্য, এমন ইন্দ্রিয় বৈকল্য যে মননিবেশ করেও বস্তু পরিচয় লাভ হয় না]—প্রভৃতি দোষে ভুগছে, তাদের কথা স্বতন্ত্র।

শ্রীজীব গোস্বামী ঐ সিতকৃষ্ণ কেশের ব্যাখ্যায় কত শব্দবিন্যাস আর অর্থযোজনার অপকৌশল অবলম্বন করেছেন তা এবার দেখানো হচ্ছে:—(ক) "বিষ্ণুপুরাণে উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ ইত্যাদি যে বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য, কেশমাত্রের আবির্ভাব নহে; ভূভারহরণ কার্য্য এমন বেশী কি? সেজন্য আমার (ক্ষীরোদশায়ীর) আবির্ভাব প্রয়োজন? আমার কেশও তাহা করিতে পারে" [ঐ প্রাণগোপাল গোস্বামীর অনুবাদ, ৬৩ পৃঃ]। (খ) শ্রীজীবের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা—"নমু দেবাঃ কিমর্থং মামেবাবতারয়িতুং ভবদ্ভিরাগৃহ্যতে অনিরুদ্ধাখ্য পুরুষ প্রকাশ বিশেষস্য ক্ষীরোদশ্বেতদ্বীপধাম্নো মম যৌ কেশাবিব স্ব স্ব শিরোধার্য্যভূতৌ তাবেব শ্রীবাসুদেব সঙ্কর্ষণৌ স্বয়মেবাবতরিষ্যতঃ। ততশ্চ ভূভারহরণঃ তাভ্যামীষৎকরমেবেতি; অর্থাৎ হে দেবগণ! আমাকে অবতীর্ণ করাইতে কেন আপনারা আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন? পুরুষের প্রকাশ বিশেষ ক্ষিরোদ সমুদ্রস্থিত শ্বেতদ্বীপাখ্য-ধামাধীশ্বর অনিরুদ্ধাখ্য যে আমি সেই আমার শিরোধার্য্য শ্রীবাসুদেব শঙ্কর্ষণ স্বয়ং আবির্ভুত হইবেন। তাঁহাদিগ কর্ত্তৃক ভুভার হরণ অতি সামান্য কার্য্য অর্থাৎ তাঁহারা অনায়াসে ভূভার হরণ করিবেন" [ঐ]

শ্রীজীবের এত আয়াসসাধ্য অর্থযোজনাতেও কৃষ্ণের কিন্তু কেশাবতারত্ব বা অংশাবতারত্ব খণ্ডিত হ'লনা! '... .. আমার কেশও তাহা করিতে পারে'—শ্রীজীবের এই ব্যাখ্যাই যদি ঠিক হয় তাহলে পরমাত্মার একটিমাত্র "কেশই" কৃষ্ণরূপে কংসশিশুপালাদি বধ করে, কৌরব যাদব বংশাদিধ্বংশের কারণ হয়ে ভূভার হরণ করেছিলেন, একথা স্বীকার করা হ'ল!! শ্রীজীবের দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুযায়ী, দেবগণ স্বয়ং তাঁকে অবতীর্ণ করবার জন্য চেষ্টা এবং আগ্রহ প্রকাশ

করলেও, 'অতি সামান্য কার্য্য ভূভারহরণের জন্য' তিনি অবতরণ করতে চান নি; তাঁর "প্রকাশ বিশেষ" অর্থাৎ অংশ বিশেষ, 'শ্বেতদ্বীপাখ্যধামাধীশ্বর শ্রীবাসুদেব সঙ্কর্ষণই' কৃষ্ণরূপে 'অনায়াসে ভূভারহরণের' জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন !!!

শ্রীজীবের ' ভ্রম, প্রমাদ ও করণাপটব '!

কেশের অর্থ শ্রীজীব একস্থানে 'জ্যোতিঃ' করেছেন। 'কেশা রশ্ময়ঃ' এই নিরুক্ত অনুসারে কেশের অর্থ জ্যোতিঃ বা রশ্মি করা যায়। কিন্তু তাতেও সূর্য্যের অংশ যেমন সূর্য্যের রশ্মি, তেমনি পরমাত্মার রশ্মি বা জ্যোতিঃরূপে কৃষ্ণের অংশত্বই প্রমাণিত হয়, 'পূর্ণত্ব' নয়! তাছাড়া 'উজ্জহার' 'উজ্জজহ্রে' প্রভৃতি শব্দ থাকায় কেশ শব্দের জ্যোতিঃ বা রশ্মি অর্থ অন্ততঃ এখানে সঙ্গত হয় না। পরমাত্মার শ্বেতকৃষ্ণ জ্যোতিকে 'উদ্ধার' বা 'উৎপাটিত' করেছিলেন—এতে অর্থসঙ্গতি বা ভাব সঙ্গতি থাকে কি? এই 'সিতকৃষ্ণকেশে'র ব্যাখ্যায় এবং অর্থ যোজনায় ভাগবত ভাষ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী যে পরিশ্রম করেছেন তা বিশেষ উপভোগ্য। সিতকৃষ্ণকেশের ব্যাখ্যাকল্পে চক্রবর্ত্তী মশাই বলেছেন, "সিতঃ=রুদ্র, কৃষ্ণ=বিষ্ণু, কঃ=ব্রহ্মা, ঈশঃ=পূর্ণ ভগবান্"।

'উজ্জহার' এবং 'উজ্জজহ্রে' শব্দের সঙ্গে চক্রবর্ত্তী মশাইএর এই অভিনব ব্যাখ্যার অর্থ সঙ্গতি থাকে কি? কেশের বিশেষণ 'সিতকৃষ্ণ'। কেশ অর্থের কঃ=ব্রহ্মা, ঈশ=পূর্ণ ভগবান করে, এ হেন কেশের পূর্ব্বে সিতকৃষ্ণ বিশেষণের অর্থ 'রুদ্র বিষ্ণু' বিশেষণ বসালে কি রকম অর্থ দাঁড়ায়? সিতকৃষ্ণকেশরূপ "রুদ্র বিষ্ণু ব্রহ্মা এবং পূর্ণ ভগবান' কার দ্বারা কি ভাবে 'উৎপাটিত' হয়েছিলেন? "মৎ কেশো ভবিতা সুরাঃ"—ইহার অর্থ কি তাহলে, "আমার ব্রহ্মা এবং পূর্ণ-ভগবান' জন্মিবেন? Bravo !!

ভক্তজন প্রাণতোষিণী এবংবিধ ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রীবিগ্রহের পূজারত, কৃষ্ণসখী—অনুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের চোখে প্রেমাশ্রুর বাণ ডাকতে পারে, কিন্তু যে কোন বিচারশীল লোকের কাছে—ঐ অপরূপ (!) ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য।

প্রভাস খণ্ডেও ঐ কেশাবতারের প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু শ্রীজীব সেখানে শিববাক্যের দোষ দেখিয়ে বলেছেন, "প্রভাস খণ্ডের এটি ছলোক্তি! তাছাড়া শিব-শাস্ত্রীয়ত্বাচ্ছনাত্র বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধত্ব তস্যোপযোগঃ; পরন্তু প্রভাসখণ্ডের কেশাবতার প্রসঙ্গ শিব শাস্ত্রোক্ত বলিয়া বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ।" অর্থাৎ

নিজেদের সিদ্ধান্তই সার সিদ্ধান্ত. নিজেদের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাই সার ব্যাখ্যা, বৈষ্ণবরা যা বলেন যা ভাবেন—তাই ঠিক আর সব—সব ভুল !!! ঐ রকম একদেশী, সঙ্কীর্ণ, গণ্ডীবদ্ধ ব্যাখ্যার উপর অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

কাজেই, কালাতীত পরমেশ্বরের পক্বাপক্ক কেশ অর্থাৎ কাঁচা পাকা চুলের কল্পনার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের 'পূর্ণভগবত্তা' প্রতিষ্ঠার ব্যাখ্যাকে পৌরাণিক মিথ্যা কল্পনা কিংবা নরাকৃতি পরব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন প্রয়াসটি গৌড়ীয়দের একটি 'ছলোক্তি' বলে উপেক্ষা করতে পারি।

ছলোক্তির লক্ষণ—'অভিপ্রায়ান্তরেন প্রযুক্তস্যার্থান্তরং প্রকল্প্য দূষণং ছলম্' ; অন্য অভিপ্রায়ে (কৃষ্ণের নরাকৃতি পরব্রহ্মত্ব, পূর্ণভগবত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য), স্ব সম্প্রদায়ের স্বার্থে, প্রযুক্ত শব্দের অর্থান্তর কল্পনা করে দোষ প্রদর্শন (উপরে তার অজস্র প্রমাণ দিয়েছি ; যা বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলেনি তাকে শ্রীজীব মিথ্যা বলেছেন, আর টেনে বুনে বিকৃত অর্থ করেছেন) করার নাম **ছল**।

পঞ্চম পুষ্প

প্রশ্ন :— বৈষ্ণবরা যদি একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতকেই প্রামান্য মনে করে, তার থেকেই প্রমান প্রয়োগ দিয়ে কৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব প্রমান করে তাতে দোষের কী আছে? কারণ পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের পর, মহাভারত ব্রহ্মসূত্রাদি রচনা করার পরেও তিনি যখন প্রাণে শান্তি পেলেন না তখন ব্যাসদেব ঐ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেছেন। কোন গ্রন্থকারের শেষ বয়সের শেষ গ্রন্থেই তো তাঁর পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টি এবং পরিণত কলানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কাজেই বেদব্যাস বিরচিত, তাঁর পরিণত বয়সের পূর্ণজ্ঞানসমৃদ্ধ রচনা শ্রীমদ্ভাগবতকেই যদি প্রামাণিক ধরে বৈষ্ণববা অন্য গ্রন্থের উপর তার মর্য্যাদা দেয় তাতে দোষ কি? এই জন্যই তো শ্রীজীব গোস্বামী বলে গেছেন—'তদেতৎ শ্রীমদ্গীতা গোপাল তাপন্যাদি শাস্ত্রগণ সহায়স্য নিখিলেতর শাস্ত্রশতপ্রণতচরণস্য শ্রীভাগবত-স্যাভিপ্রায়েন শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বং করতলইব দর্শিতম্—অর্থাৎ গীতা গোপাল-তাপণী ইত্যাদি শাস্ত্রগণ যাহার সহায়, অন্যান্য নিখিল শাস্ত্রগণ যে গ্রন্থের চরণে প্রণত, সেই ভাগবতের অভিপ্রায়ানুযায়ী করতলগত মণিব ন্যায় সুস্পষ্টরূপে কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্বা প্রমাণিত হইল' [শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ]।

উত্তর :— শ্রীমদ্ভাগবত যদি বেদব্যাসেব শেষ বয়সের রচনা হ'ত, তাহলে তোমার যুক্তি-অনুযায়ী, প্রভুপাদদের মত আমিও নিশ্চয়ই ভাগবতকে প্রামানিক গ্রন্থ বলে গণ্য করতাম। কিন্তু বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের রচয়িতা নন, শুক-দেবও পরীক্ষিতকে ভাগবত নামক বৈষ্ণব গ্রন্থটি শোনান নি!

গৌর বন্ধু :— আপনি ঠিক বলেছেন। ভাগবত বেদব্যাসের লেখা হতেই পারে না। ভাগবতের টীকাকার শ্রীধর স্বামী খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর লোক। ইনি আচার্য্য শঙ্করের পরে এসেছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে শঙ্কর আবির্ভূত হয়ে

অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করে যান। তিনি প্রধান প্রধান উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র এবং গীতার টীকা ভাষ্যাদি রচনা করে গেছেন। ঐ সময় পর্য্যন্ত যদি এই ভাগবতের অস্তিত্ব থাকতো তাহলে তিনি খণ্ডন বা মণ্ডনের জন্য এই বই এর সম্বন্ধে কিছু লিখতেন। কিন্তু তাঁর প্রচারের মধ্যে ভাগবতের নামগন্ধও নেই। তাতেই মনে হয়, এই বৈষ্ণবমান্য ভাগবতটি আচার্য্য শঙ্করের পরে এবং শ্রীধর স্বামীর পূর্ব্বে লিখিত হয়েছে। বিশেষ করে ঐ ভাগবতেরই দ্বিতীয় স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে এবং চতুর্থ স্কন্ধের উনবিংশ অধ্যায়ে জৈন বৌদ্ধ তান্ত্রিক কাপালিক ধর্ম্মাদিকে 'পাষণ্ড মত' বলে নিন্দা করা হয়েছে। কাজেই জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচারিত হওয়ার পরে যে ভাগবত রচিত এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই করা যেতে পারে না। কাজেই বেদব্যাসের লেখা কি করে হতে পারে? আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মহর্ষি দয়ানন্দের মতে শ্রীমদ্ভাগবত 'হিমাদ্রি' গ্রন্থ রচয়িতা বোপদেবের লেখা [সত্যার্থ প্রকাশঃ, ৩৭২ পৃঃ]। 'হিমাদ্রি' গ্রন্থে লিখা আছে,

'শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণঞ্চ ময়েরিতম্,
বিদুষা বোপদেবেন শ্রীকৃষ্ণস্য যশোন্বিতম্।

ভাগবত যে বোপদেবের লেখা, সে কথা নগেন সরকার প্রণীত বাংলা 'বিশ্বকোষ' এবং সুবলমিত্রের বাংলা অভিধান (৬ষ্ঠ সংস্করণ) গ্রন্থেও উল্লেখ করা আছে।

মুনীন্দ্র লাহিড়ী :—শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ নিয়ে এর পূর্ব্বে অনেক গালাগালি হয়ে গেছে। রামাশ্রম কৃত 'দুর্জ্জন মুখচপেটিকা', কাশীভট্টকৃত 'দুর্জ্জন মুখ মহাচপেটিকা' 'দুর্জ্জন মুখ পদ্মপাদুকা' এবং 'ভাগবত স্বরূপ বিষয়াশঙ্কা নিরাশ ত্রয়োদশ' প্রভৃতি পুস্তকে সে সব ব্যক্ত রয়েছে। উইলসন সাহেবও এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করে বোপদেবের লেখা কিনা আলোচনা করে যা অভিমত দিয়ে গেছেন তাও অগ্রাহ্য করা যায় না। তবে কিনা, ও সব পুরাণো কাসুন্দী ঘেঁটে আর লাভ কি!

উত্তর :—সত্যাসত্যনির্ণয়ের জন্য এ সবের প্রয়োজন আছে বৈ কি! যে গ্রন্থকে বেদব্যাস বিরচিত বলে মনে করে, মিথ্যা প্রচারের দ্বারা বিভ্রান্ত, লক্ষ লক্ষ লোক সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে—সেই সরল প্রাণ জনসাধারণের ভ্রান্তি নিরশনের জন্য—ভাগবত যে বেদব্যাসের লেখা নয়—তা বিশ্লেষণ করে বোঝায়

'লাভ' আছে বলে মনে করি। ভাগবতের সঠিক লেখক কে, কোন সময় লেখা হয়েছিলো সে সম্বন্ধে আমি কোন বাদানুবাদের মধ্যে না গিয়ে, **ঐ ভাগবতেরই ঘটনা এবং বিষয়বস্তুর অসংলগ্নতা, অসামঞ্জস্য এবং অসারতা বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা দেখিয়ে দিয়ে প্রমাণ করতে পারি এই অর্ব্বাচীন গ্রন্থটির লেখক আর যেই হো'ন না কেন —মহাভারত, ব্রহ্মসূত্র এবং গীতা প্রণেতা মহর্ষি বেদব্যাসের লেখনী থেকে ঐ রকম পরস্পর বিরুদ্ধ ঘটনা, তত্ত্ব, তথ্য এবং সংকীর্ণ ভাবধারায় পরিপূর্ণ সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ লিখিত হ'তে পারে না।**

প্রথমেই বিচার করে দেখ, শুকদেব পরীক্ষিৎকে এই ভাগবত উপদেশ দিয়েছিলেন বলে যে বর্ণনা আছে—এটি কত বড় প্রচণ্ড মিথ্যা!

কারণ, মহাভারতে বৈশম্পায়ন কৃত ভীষ্ম বাক্য বর্ণনায় জানা যায় যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই শুকের দেহান্ত হয়েছিল।

ভীষ্ম উবাচ।—

'নারদেনাভ্যনুজ্ঞাতঃ শুকো দ্বৈপায়নাত্মজঃ।
অভিবাদ্য পুনর্যোগমাস্থায়াকাশমাবিশৎ'॥ ৯॥

নারদের অনুজ্ঞা নিয়ে শুকদেব যোগাবলম্বন করতঃ আকাশে আবেশ করলেন। অনন্তর তিনি প্রজ্বলিত বিধূম পাবকের ন্যায় নিত্যনির্গুণ লিঙ্গবর্জিত আদিত্যান্তর্য্যামী পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হলেন—

'ততস্তস্মিন্ পদে নিত্যে নির্গুণে লিঙ্গবর্জ্জিতে
ব্রহ্মণি প্রত্যতিষ্ঠৎ স বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্'।

শুকদেবের বিদেহ কৈবল্যলাভ হ'ল; তিনি সর্ব্বগত, সর্ব্বতোমুখ এবং সর্ব্বাত্মা হয়ে গিয়েছিলেন—

'শুকঃ সর্ব্বগতো ভূত্বা সর্ব্বাত্মা সর্ব্বতোমুখঃ'॥ ২৩
'অন্তর্হিতঃ প্রভাবং তু দর্শয়িত্বা শুকস্তদা
গুণান্ সন্ত্যজ্য শব্দাদীন্ পদমভ্যগমৎপরম্'॥ ২৬

শুকের এই মহাপ্রয়াণ হওয়ায় ব্যাসদেব পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। মহাদেব তখন আবির্ভূত হয়ে তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন—

'স গ়তং পরমাং প্রাপ্তো দুষ্প্রাপাম জিতেন্দ্রিয়ৈঃ
দেবতৈরপি বিপ্রর্ষে! তং ত্বং কিমনুশোচসি'। ৩৬

[মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৩৩ অধ্যায়]

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই যাঁর দেহপাত হয়ে গেল তাঁরপক্ষে পুনরায় যুদ্ধশেষের বহু পরে, দ্বাপরের শেষভাগে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত পরীক্ষিতকে সেই শুক কর্তৃক ভাগবতরূপী হরিকথা শোনান কি করে সম্ভব? এই রকম হাজার হাজার অসংলগ্ন বাক্যে ভাগবত পরিপূর্ণ। মহাভারত এবং ভাগবতের মধ্যে এত অসামঞ্জস্য আছে—তা তুলনামূলকভাবে দেখাতে গেলে একটা বড় বই হয়ে যাবে। যদি ভাবগত বেদব্যাসেরই রচনা হয় তাহলে একই ব্যক্তির রচিত মহাভারত এবং ভাগবতের ভাব, মতবাদ, সিদ্ধান্ত এমন কি বিভিন্ন চরিত্র বর্ণনায় এত তফাৎ কেন? যদি 'অপ্রাকৃত চিন্ময় শ্রীবিগ্রহবাদী' বৈষ্ণবদের মত বলেন যে, পরীক্ষিতের নিকট শুকদেব অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহ নিয়ে প্রকট হয়ে ভাগবত কথা শুনিয়ে গেছলেন তাও যুক্তিতে দাঁড়ায় না। কারণ, ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হয়ে পরীক্ষিত গঙ্গাতীরে যখন প্রায়োপবেশনে ছিলেন মুনিগণ পরিবৃত হয়ে, তখন শুকদেব 'যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করতে করতে' সেখানে এসে পৌঁছলেন। ভাগবতকার শুকদেবের বর্ণনা দিচ্ছেন 'তং দ্ব্যষ্ঠবর্ষং সুকুমারপাদ', তাঁর বয়স ষোল বৎসর! দেহ শ্যামবর্ণ, গঠন সুবলিত, বেশ দিঙ্‌মাত্র (উলঙ্গ), কেশজাল ধূলিধূসরিত— 'দিগম্বরং বক্রবিকীর্ণ কেশং... ... ... স্ত্রীনাং মনোজ্ঞ রুচিরাস্মিতেন'—ইত্যাদি।

যদি অপ্রাকৃত চিণ্ময় দেহেই তিনি উপদেশ দিয়ে থাকেন তাহলে সেই চিণ্ময় সূক্ষ্মদেহের কি ষোলবছর পরিমাণ পরিচ্ছিন্ন বয়স নির্ণয়, কেশজাল শ্যামবর্ণ ইত্যাদি থাকবে? কোন চিণ্ময় বস্তুর যে দেশকাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বয়স, বর্ণ, আকৃতির গঠন পারিপাট্য ইত্যাদি থাকতে পারে না, সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাসের কি সেই জ্ঞানটুকু নেই? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বেই যাঁর দেহান্ত হয়েছে, তাঁর মুখদিয়ে পরীক্ষিৎকে ভাগবত শোনানোর আখ্যায়িকা বেদব্যাস কি করে বর্ণনা করতে পারেন? জীবন্মুক্ত শুকদেবের পিতা ঋষি বেদব্যাসের কখনও এ ভ্রম হতে পারে না, তিনি ভাগবত রচনাও করেন নি।

বিচার করে দেখ, তুমি যদি দুই খানি বই লিখ একটি ঘটনাকেই কেন্দ্র করে, তুমি কি তোমার রচিত দুই খানি বই এ, একই ঘটনাকে দু' রকম ভাবে

বর্ণনা করতে পার? তুমি দিল্লীতে কুতব মিনার দেখে এসে আমার কাছে 'মনুমেণ্টের মত' আর নরেশ বাবুর কাছে 'Calcutta Senate Hall এর মত দেখতে' বলে বর্ণনা দিতে পার কি? এই ধর, Mount Evarest অভিযানে শেরপা তেনজিং এর সঙ্গে যে সমস্ত শেরপা গিয়েছিল, ফিরে এসে প্রথমেই তেনজিং একটি বই লিখে তাতে তাদের মৃত্যুসম্বন্ধে বর্ণনা দিলেন যে 'বরফে ঢাকা পড়ে তারা মারা গেছে'। আবার আর একটি বই তেনজিং এর নাম দিয়ে প্রকাশিত, তাতে দেখা গেল তিনি শেরপাদের মৃত্যুসম্বন্ধে বর্ণনা দিয়েছেন, "সেই সকল শেরপারা বরফে অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে হে শিব শঙ্কর বলে কাঁদতে লাগলো। সহসা দেখা গেল, একটি দিব্য বিমানে শিব দুর্গা সেখানে আবির্ভূত হয়ে সেই সমস্ত তুষারক্লিষ্ট মৃতপ্রায় শেরপাদিগকে কৈলাস-শিখরে নিয়ে চলে গেলেন'! এখন একই ঘটনা— শেরপাদের মৃত্যু প্রসঙ্গে— একই লোক যদি দুই খানি বই এ দু'রকম বর্ণনা দেন, তাহলে হয় ভাবতে হ'বে, তেনজিং এর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে বা তিনি মিথ্যাবাদি; নতুবা শেষোক্ত বই তাঁর লিখা নয়, ঐ রকম কাল্পনিক বর্ণনাও তিনি দেন নি, তাঁর নাম দিয়ে কোন শিবভক্ত 'কৈলাস শিখরের পবিত্রতা, শিবদুর্গার নিত্যলীলা, তাঁরা কৈলাস শিখরে বিরাজ করছেন', ইত্যাদি প্রমাণ করবার জন্যই ঐ রকম গালগল্প রচনা করে তেনজিং এর নাম দিয়ে তা প্রকাশ করেছে! এ কথা তুমি মান ত?

পরস্পর বিরুদ্ধ ঘটনায় ভাগবত পরিপূর্ণ

মহাভারত যে বেদব্যাসের রচনা এবং তা ভাগবতের বহু পূর্ব্বেই লিখিত তাতে কারও কোন সন্দেহ থাকতে পারে না—ভাগবতেও সে কথার উল্লেখ আছে। মহাভারত রচয়িতাই যদি ভাগবত রচয়িতা হ'তেন তাহলে তাতে তো কোন অসামঞ্জস্য থাকার কথা নয়। আবার একই ঘটনা দুই গ্রন্থে দুইভাবে একই গ্রন্থকার কর্তৃক বর্ণিত হ'তে পারে কি? যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণবদের ভাগবত গ্রন্থের পত্তন **সেই মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ এবং তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে মহাভারত এবং ভাগবতে কিরকম পরস্পর বিরুদ্ধ সামঞ্জস্যহীন বর্ণনা আছে দেখ।** তোমাদের পার্থক্যটা বুঝবার সুবিধার জন্য একই ঘটনা সেই পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ প্রসঙ্গ এবং তাতে তাঁর মনের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে দুই বই কিরকম দুই রকমের বর্ণনা দিয়েছে

তা in detail বলে যাচ্ছি। তুলনামূলক ভাবে তোমরা একই ঘটনার দুই গ্রন্থে দুই রকম বর্ণনা বিচার করলেই বুঝতে পারবে, মহাভারত যিনি রচনা করেছেন সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসদেব অর্ব্বাচীন ভাগবত-গ্রন্থের লেখক ন'ন।

মহাভারতের আদিপর্বে আছে, পরীক্ষিৎ শমীকঋষি প্রেরিত গৌরমুখের নিকট সাত দিনের মধ্যে তক্ষক দংশনে মৃত্যু হবে' শৃঙ্গীমুনির এই অভিশাপ শুনে,

সম্মন্ত্র্য মন্ত্রিভিশ্চৈব স তথা মন্ত্রতত্ত্ববিৎ
প্রাসাদং কারয়ামাস একস্তম্ভং সুরক্ষিতং ।২৯।
রক্ষাং চ বিদধে তত্র ভিষজশ্চৌষধানি চ
ব্রাহ্মণান্ মন্ত্রসিদ্ধাংশ্চ সর্ব্বতো বৈ ন্যযোজয়ৎ ।৩০।
রাজকার্য্যাণি তত্রস্থঃ সর্ব্বাণ্যেবাকরোচ্চ সঃ
মন্ত্রিভিঃ সহ ধর্ম্মজ্ঞঃ সমন্তাৎ পরিরক্ষিতঃ ।৩১।
ন চৈনং কশ্চিদারূঢ়ং লভতে রাজ সত্তমম্
বাতোঽপি নিশ্চরংস্তত্র প্রবেশে বিনিবার্য্যতে ।৩২।

[মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৪২ অধ্যায়]

'নিজেকে রক্ষার জন্য মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে এমন এক এক-স্তম্ভ-প্রাসাদ তৈয়ারী করালেন যে সেটি অত্যন্ত সুরক্ষিত। স্তম্ভের চারিদিকে প্রধান প্রধান রক্ষক, বৈদ্য, নানারকম বিষ নাশক ওষধি এবং প্রধান প্রধান মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ নিয়োগ করে, রাজা তারমধ্যে থেকেই রাজকার্য্য পরিচালনা করতে লাগলেন। সেই স্তম্ভটি তিনি এমনভাবে সুরক্ষিত করেছিলেন যে, কোনও প্রকার প্রাণীর কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং বায়ুও তাতে প্রবেশ করতে সমর্থ নয়'। তারপর যেদিন সপ্তম দিন উপস্থিত হ'ল তক্ষক সেখানে উপস্থিত হয়ে হস্তিনাপুরে রাজা সুরক্ষিত অবস্থায় রাজকার্য্য পরিচালন করছেন দেখে সূক্ষ্মভাবে একটি ফলের মধ্যে অনুপ্রবেশ করলেন এবং রাজাকে ঐ ফল নিবেদন করা হলে—সেই ফলের মধ্য থেকে আবির্ভূত হয়ে সগর্জ্জনে তাঁকে দংশন করলেন—

'তস্মাৎ ফলাদ্বিনিষ্ক্রম্য যৎ তদ্রাজ্ঞে নিবেদিতম্
বেষ্টয়িত্বা চ বেগেন বিনদ্য চ মহাস্বনম্।
অদশৎ পৃথিবীপালং তক্ষকঃ পন্নগেশ্বরঃ ।। ৩৬ ।।'

[মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৪৫ অধ্যায়]

এই বারে ভাগবতে ঠিক ঐ ঘটনাটিরই কি ভাবে বর্ণনা আছে শোন। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে উনবিংশ অধ্যায়ে আছে, শমীক ঋষির এক শিষ্য এসে মহারাজ পরীক্ষিৎকে শৃঙ্গীমুনির অভিশাপের কথা শোনালে রাজা বিবেচনা করলেন—'আমি এতদিন বিষয় সুখে মত্ত ছিলাম, এখন আমার সংসারের প্রতি অবশ্যই বৈরাগ্য জন্মিবে'।

অথো বিহায়েমমমুঞ্চ লোকং বিমর্শিতৌ হেয় তথা পরস্তাৎ
কৃষ্ণাঙ্‌ঘ্রি সেবামধিমন্যমান উপাবিশৎ প্রায়মমর্ত্যনদ্যাম্ ॥ ৫

'অনন্তর ইহলোক পরলোক উভয়ই ত্যাগ করে, শ্রীকৃষ্ণের পদসেবাই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করলেন এবং অনশনে প্রাণত্যাগ করার বাসনায়, সুরধনীর তীরে উপবেশন করলেন'।

ভাগবতে মিথ্যা বর্ণনার বহর

Mark the difference. মহাভারতে দেখা যাচ্ছে, পরীক্ষিৎ প্রাসাদ তৈয়ারী করিয়ে চারিদিকে বিষঘ্ন ওষধি এবং মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ নিয়োগ করে সুরক্ষিত অবস্থায় রাজকার্য্য করতে লাগলেন; তাঁর বাঁচবার ইচ্ছা অভিব্যক্ত হয়েছে। আর কৃষ্ণভক্ত ভাগবতকার কৃষ্ণমহিমা দেখানোর জন্য বর্ণনা দিচ্ছেন, অভিশাপ শুনেই পরীক্ষিতের মনে বাঁচবার ইচ্ছা থাকলো না, বৈরাগ্য দেখা দিল, তিনি সব ছেড়ে দিয়ে **কৃষ্ণসেবাকেই** শ্রেষ্ঠ মনে করে অনশনে প্রাণ-ত্যাগের ইচ্ছায় গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে বসলেন।

ইতি ব্যবচ্ছিদ্য স পাণ্ডবেয়ঃ প্রায়োপবেশং প্রতিবিষ্ণুপদ্যাম্।
দধৌ মুকুন্দাঙ্‌ঘ্রিমনন্যভাবো মুনিব্রতো মুক্ত সমস্তসঙ্গঃ ॥ ৭ [ভাগ]

'সেই পাণ্ডবতনয় এইরূপে গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করে অনন্যমনে কৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তা করতে লাগলেন এবং বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করে মুনিদের ব্রত ধারণ করলেন'! এইবার কল্পনাকুশল ভাগবতকার এমন একদল ঋষিকে পরীক্ষিতের কাছে এনে হাজির করলেন যাঁদের একজনও দ্বাপরান্তে পরীক্ষিতের সময় জীবিত ছিলেন না! ভাগবতকারের বর্ণনাটার বহর দেখ। রাজা ঐ ভাবে প্রায়োপবেশনে বসার পরেই সেখানে অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান্, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, গাধিসুত বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ সুবাহু, মেধাতিথি, দেবল, আর্ষ্টিসেন, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব্ব, কবষ

কুম্ভযোনি, দ্বৈপায়ন, নারদ প্রভৃতি আরও আরও অনেক দেবর্ষি মহর্ষি সেখানে রাজদর্শনে এলেন।

'অন্যে চ দেবর্ষি মহর্ষিবর্য্যা রাজর্ষিবর্য্যা অরুণাদয়শ্চ,
নানার্ষেয় প্রবরাণ সমেতানর্ভ্যচ্চ রাজা শিরসা ববন্দে'।

রাজা ঐ সমস্ত ঋষিদিগকে ধূল্যবলুন্ঠিত হয়ে বন্দনা করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মুনিবৃন্দ! আমি প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করতে ইচ্ছা করেছি, তা উচিত কি অনুচিত'। মুনিগণ তা অনুমোদন করলেন। এমন সময় যদৃচ্ছা ভ্রমণ করতে করতে 'ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম সুবলিত শ্যামবর্ণ দেহ' (!!) শুকদেব সেখানে এলেন। রাজা তাঁকে বন্দনা করে, শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়ে ভক্তিবিনম্রচিত্তে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি যোগিগণের পরম গুরু। অতএব আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, মুমূর্ষু, বিশেষতঃ মুমুক্ষু মনুষ্য কি কাজ করতে পারলে সিদ্ধিলাভ করতে পারে? অতঃপর, শুকদেব কর্তৃক বৈষ্ণবপ্রিয় কৃষ্ণকথা আরম্ভ। ভাগবতের সূচনা।

সমগ্র ভাগবত শোনানোর পর শুকদেব পরীক্ষিৎকে দেহত্যাগের অনুমতি দিয়ে যতিগণ সহ চলে গেলেন। সাত দিনের মধ্যেই সব হয়ে গেল; on the 7.th. day, তক্ষক রাজাকে দংশন করতে এসে পথিমধ্যে দেখলেন, বিষ বৈদ্য কশ্যপও রাজসভায় যাচ্ছে। তক্ষক কশ্যপকে ধনদানে নিবৃত্ত করে (ঘুষ দানে!) ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরে এসে পরীক্ষিতকে দংশন করলেন [ভাগবত]।

ইতিহাস পুরাণের যথার্থজ্ঞান তোমাদের যদি নাও থাকে তবুও তো রামায়ণ পড়া জ্ঞানটুকু থেকেও তো বুঝতে পারো, ত্রেতা যুগে রামের আমলে যাঁদের নাম শুনেছ, সেই বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান্, গাধিসুত বিশ্বামিত্র, পরশুরাম ইত্যাদি যে সমস্ত ঋষিদের নামের List ভাগবতকার অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই দিয়ে গেল, তাঁরা কি দ্বাপরান্তে পরীক্ষিতের সময়েও জীবিত ছিলেন? 'শুকঃ সর্ব্বগতো ভূত্বা সর্বতঃ সর্বতোমুখঃ', মহাভারতের একথাতো পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি।

ব্যাসের নাম দিয়ে বই লিখে শুকদেবের মুখ দিয়ে বলাতে পারলে authorititive হবে, কৃষ্ণকথায়, অপ্রাকৃত লীলা বর্ণনাদিতে একটা অনাদিত্ব, প্রাচীনত্ব, প্রামানিকত্ব এনে দেওয়া যাবে, এই আশায় কৃষ্ণভক্ত কোন প্রভুপাদ

স্বকপোলকল্পিত, বহুবিরুদ্ধ ঘটনার সমাবেশে পূর্ণ ভাগবত রচনা করে, ব্যাস শুকদেবের নামে চালালেও মিথ্যা কোনদিন জয়যুক্ত হ'তে পারে না। তাই সত্যের শাশ্বত মহিমায়, ভাগবতকারেরই বর্ণনায়, এমন ত্রুটি, অসংবদ্ধ প্রলাপের দৃষ্টান্ত রয়ে গেল যে, যে-কোন-বিচারশীল লোক বিচার করলেই বুঝতে পারবে, মহাভারত যিনি রচনা করেছেন, সেই বেদব্যাসের পক্ষে এই রকম অলীক ঘটনা ভাগবতে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়।

মহাভারতকে আমরা কোনক্রমেই অপ্রামাণ্য বলতে পারি না! কারণ এটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ; ভাগবতও তা স্বীকার করেছে এবং ভাগবত যে মহাভারতের বহু পরে রচিত, তাও ঐ ভাগবতে উল্লেখ আছে। এ হেন মহাভারত অনুযায়ী স্পষ্টতঃই জানা যাচ্ছে, **মহারাজ পরীক্ষিৎকে ভাগবত-কথা আদৌ উপদেশ করা হয় নি।** কৃষ্ণ-গুণানুবাদে ভরা, কোন কৃষ্ণভক্ত প্রভুপাদের ভক্তির আতিশয্যে রচিত ভাগবত সম্পূর্ণই মিথ্যা এবং কল্পিত।

ভাগবতের অসংবদ্ধ প্রলাপ

কাজেই কোন কৃষ্ণভক্ত যদি ভক্তির আতিশয্যে ভাগবতের চরণে নিখিলশাস্ত্ররাজি বেদ, উপনিষদ, মহাভারতাদিকে 'প্রণত' আছে বলে মূঢ় দম্ভ প্রকাশ করেন তা মূঢ়তা ছাড়া কিছুই নয়। তুমিও যদি সত্যনারায়ণের পাঁচালি' যা পাঁজিতে থাকে তাকেই যদি সর্ববেদান্তের সার, সকল বেদ-বেদান্ত এই পাঁচালির চরণে ভক্তিপ্রণত বলে প্রচার কর, তাতে বাধা দেবে কে? 'বালকোলাহল' ভেবে প্রকৃত বিচারশীল ব্যক্তির তা উপেক্ষা করাই উচিত।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি, এক এক সম্প্রদায় তাদের সম্প্রদায় সিদ্ধি এবং মত পথ স্থাপনের জন্য, বেদ উপনিষদের নাম দিয়ে, অনেক অলীক কল্পিত গ্রন্থ রচনা করে, ব্যাস, বাল্মীকি, শুকদেব, শিবদুর্গাদির নাম দিয়ে চালিয়ে গেছে। শৈবরা রচনা করেছে শিবপুরাণ, রুদ্রযামল, রুদ্রহৃদয়-উপনিষদ্, শিবগীতা তাতে প্রমাণ করেছে, শিবই অনাদি পুরুষ আর সব দেবতারা তাঁর চরণতলে; শিবের সম্বন্ধে যত অলৌকিক ঘটনা থাকতে পারে, ঐ ঐ গ্রন্থে তার সমাবেশ করে, ঐ গ্রন্থগুলিই যে একমাত্র অনাদি প্রাচীনতম এবং authority তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে। দেবী ভক্তরা দেবীভাগবত, কালিপুরাণ, চণ্ডী, দেবীগীতা,

অন্নপূর্ণোপনিষদ ইত্যাদি দেবী বিষয়ে নানা উপনিষদ রচনা করে, দেবীকেই all in all বলে প্রমাণ করেছে। গীতাতে যেমন কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন, দেবীও তেমনি হিমালয়কে বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন ; রামভক্তরাও রামগীতাতে, আনন্দ রামায়ণে রাম কর্ত্তৃক বিশ্বরূপ দর্শনের রোচক শ্লোক রচনা করে সম্প্রদায় সৃষ্টির Competition এ, কাল্পনিক ঘটনা সন্নিবেশের চাতুরিতে পিছিয়ে নেই। মূল বাল্মীকি রামায়ণে রামের সম্বন্ধে যা নেই, অর্থাৎ মহর্ষি বাল্মীকি সমাধিপূত হৃদয়ে যা ভাবতে বা জানতে পারেন নি, রামভক্তেরদল পরবর্ত্তীকালে, সেগুলি তাঁরই নামে গ্রন্থাকারে চালিয়ে গেছেন। বৈষ্ণবরা যেমন রচনা করেছে গীতগোবিন্দ, ভাগবত, গোপালতাপনী উপনিষদ্, কৃষ্ণোপ-নিষদ্, বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি, রাম ভক্তরাও তেমনি রচনা করেছে রামের প্রশস্তি মূলক অজস্র গ্রন্থ, পুরাণ, বহুবিধ রামায়ণ, শ্রীরামগীতগোবিন্দ, শ্রীরামপূর্ব্ব-তাপনী-উপনিষদ্, রামগীতা ইতাদি। উপনিষদ্ সর্ব্বজনমান্য বলে, মূল উপনিষদ্গুলিতে যে যার সম্প্রদায় আর সম্প্রদায়গত ইষ্টের অনাদিত্ব প্রমাণসূচক কোন সমর্থন বাক্য না পেয়ে, শৈব রচনা করেছে, রুদ্রহৃদয়-উপনিষদ্ ; তার থেকেই quotation দিয়ে সে বোঝাতে চেয়েছে—এগুলি উপনিষদ্ বা শ্রুতিবাক্য, অতএব প্রামান্য ! দেবীভক্তরা রচনা করেছে, অন্নপূর্ণোপনিষদ্, রামভক্ত শ্রীরাম-পূর্ব্বতাপণী উপনিষদ্ আর কৃষ্ণ ভক্তরা রচনা করেছে, শ্রীগোপালতাপনী-উপনিষদ্, শ্রীনৃসিংহ তাপনী উপনিদ্, কৃষ্ণোপনিষদ্ ইত্যাদি !! এমন কি, পরবর্ত্তী কালে আল্লার প্রশস্তিতে আল্লোপনিষদ্ও রচিত হয়েছে !!! এইভাবে উপনিষদাখ্য নাম গ্রন্থে দিয়ে স্ব স্ব সম্প্রদায়ানুগত প্রচার চালালেও যদি কোন বিবেকবান লোক সবগুলি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করে দেখে বুঝতে পারবে এদের দুরভিসন্ধি, লোককে বিভ্রান্ত করবার ছলনা। কারণ এদের একটির সঙ্গে আর একটির অনেক প্রভেদ। ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য বৃহদারণ্যক ছান্দোগ্য প্রভৃতি বারটি প্রধান উপনিষদ্ ছাড়া আর কোনগুলিই এই-জন্য প্রামাণ্য নয়। এই সেদিন রাজাগোপালআচারী রচনা করেছেন শ্রীরাম-কৃষ্ণোপনিষদ্। বইটির শেষে 'উপনিষদ' নাম দেওয়া হয়েছে বলে ঐ গ্রন্থটি কি শ্রুতির মর্য্যাদা পাবে ? না, Authentic এবং Authoritive রূপে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য ?

কল্পিত গ্রন্থ রচনার চাতুরী

কালক্রমে কত শত অবতার জন্মাবেন, তাঁদের হয়ত নাম হবে হরে কৃষ্ণ, ক্ষ্যাপানন্দ, রমন্, বমন, ইত্যাদি! সম্প্রদায়ীদের দ্বারা রচিত হবে হরেকৃষ্ণোপনিষদ, ক্ষ্যাপানন্দোপনিষদ্, রমনোপনিষদ্, বমনোপনিষদ ইত্যাদি !! এই সমস্ত Modern, ultra Modern উপনিষদগুলিতে, যথেষ্ট Method-সহকারে সুকৌশলে রমন বমন পবন ইত্যাদির পূর্ণপরমেশ্বরত্বের প্রমান থাকবে, সূত্রাকারে বীজাকারে নানা শ্লোক থাকবে !!! স্বার্থান্বেষী সম্প্রদায়ীরা যে গ্রন্থ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে বোঝাতে চাইবে, এগুলি শ্রুতিবাক্য—তাবলে সত্যই তুমি এগুলিকে মানবে ? ধরো যাঁরা রামকে মানেন, তাঁরা বলেন, (১) ' রামায়ণের সমান অন্যগ্রন্থ নেই, রামায়ণ সকল উপমার উপমেয় ; অতএব এমন কোন্ কবি আছেন, যিনি শব্দের দ্বারা রামায়ণের উপমা দিতে সমর্থ ?' 'রামায়ণ সম কোউ নহি সব উপমা উপমেয়, উপমা ভাষা ঔরকী, কৈসে কোউ কবি দেয়' [তুলসীদাস] (২) 'রামায়ণ সাক্ষাৎ বেদ ; বাল্মীকি হইতে সাক্ষাৎ বেদ রামায়ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, রামায়ন যে বেদ, তাহাতে সংশয় নাই' ।

এখন রামভক্তের সংশয় না থাকতে পারে, কিন্তু অন্যকোন সম্প্রদায়ের ভক্তকে, তোমাদের ঐ কৃষ্ণভক্তের দলকেই গিয়ে জিজ্ঞেস কর, তারা মানতেই চাইবে না—কানে আঙুল দিয়ে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে' বলে উদ্দণ্ড নৃত্য করতে সুরু করে দেবে ; তারা বলবে, 'রাম তো দ্বাদশ কলা, আমাদের কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং ষোল কলা ; শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র বেদ, শাশ্বতী শ্রুতি' ! তুমি যদি সংস্কারমুক্ত মনে, বিবেকের সঙ্গে বিচার করে দেখ বুঝতে পারবে এদের অন্তঃসারহীন চাটুকারিতা আর মিথ্যা প্রচারের বেসাতি !

কাজেই শ্রীজীবগোস্বামী এবং তার দলবল প্রভুপাদগণ ভাগবতকেই 'সর্বশাস্ত্ররাজচক্রবর্ত্তী' বলে বৃথা আত্মগর্ব করতে পারেন, 'নিখিলেতর শাস্ত্রশত প্রণত চরণস্য শ্রীভাগবতস্যাভিপ্রায়েন শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বং করতল ইব দর্শিতম্' বলে 'বালকোলাহল' করতে পারেন, কিন্তু করতলগতমণির ন্যায় কৃষ্ণের 'স্বয়ং ভগবত্তা' যে তিনি ভাগবত সহায়ে প্রমান করতে পারেন নি, তা পূর্বের আলোচনায় দেখিয়েছি। ভাগবত যে বেদব্যাসের রচনা কিংবা শুকদেবের উপদেশ নয় তাও বুঝলে। কাজেই এর প্রামানিকতা দাঁড়াবে কিসের উপর ?

ভাগবতে যে কত বেদ শ্রুতি বিরুদ্ধ এবং পরস্পর বিরুদ্ধ কথা আছে, তার ইয়ত্তা নেই। এবারে আমি সেই অসংলগ্ন অসংবদ্ধ অসামঞ্জস্যগুলি ধীরে ধীরে দেখাচ্ছি। আমি শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল বলছি বলে তা না শুনেই অগ্রাহ্য করো না। আমি যে যুক্তিগুলি পর পর উপস্থাপিত করছি—তা দয়া করে, খোলা বিবেক নিয়ে বিচার করে দেখ—এই প্রার্থনা। আচ্ছা নরেশবাবু, আপনি ভাগবতের সূচনাটার একটু বর্ণনা দিনতো ;—

নরেশবাবু:—শৌনকাদি ঋষিগণকে সূত ভাগবত-উৎপত্তির বিবরণ দিতে গিয়ে বলছেন, ব্যাসদেব কালবশে মানুষের শক্তিহ্রাস ও আয়ুক্ষীণ হয়ে আসছে দেখে, সমগ্র বেদকে ঋক, সাম, যজু, অথর্ব এ চারিভাগে ভাগ করলেন, ব্রহ্মসূত্র রচনা করলেন। তারপর **বেদে স্ত্রীশূদ্র এবং নিন্দিত দ্বিজগণের** কল্যাণের নিমিত্ত মহাভারত নামে সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য **তবুও তিনি মনে প্রসন্নতা বা শান্তি লাভ করতে পারলেন না।** সরস্বতীতীরে বসে একদিন ভাবতে লাগলেন, 'আমি ভগবৎপ্রিয় ও পরমহংসগণের প্রীতিপ্রদ ভাগবত-ধর্ম্ম উত্তমরূপে নিরূপণ করতে পারি নি, তজ্জন্যই কি চিত্তে আমার অবসাদ'? এমন সময় নারদ এসে উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে মহাভাগ পরাশর-তনয়, তোমার শরীর, মন ও আত্মা পরিতুষ্ট ত? অত্যদ্ভুত ভারত-গ্রন্থ রচনা করে ধর্ম্মার্থ বিবৃত করেছ, ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করে সনাতন ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার ও মীমাংসা করেছ ; তথাপিও তোমাকে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ মনে হ'চ্ছে কেন'? ব্যাসদেব বললেন, "ব্রহ্মন্! এত গ্রন্থ সংকলন করেও, এমন কি, **পরাবরে ব্রহ্মনি ধর্ম্মতো ব্রতৈঃ, স্নাতস্য মে ন্যুনমলং বিচক্ষ্ব** [ভাগ. ১. ৫. ৯], পরব্রহ্মবিদ হয়েও আমার মনে শান্তি নেই কেন—আপনিই তা দয়া করে বিচার করে বলুন"। নারদ বললেন, "**ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হ্যনুবর্ণিতঃ**, তুমি বাসুদেবের অমল চরিত কথা বিশদভাবে বর্ণনা করনি। **ব্রহ্মজ্ঞান হরিভক্তিপূর্ণ না হলে প্রীতিপ্রদ হয় না।** তাঁর **লীলা কথা** ভিন্ন যাই বর্ণনা করনা কেন, বাতাহত তরণীর মত তোমার বুদ্ধি কিছুতেই স্থিরতা লাভ করতে পারবে না, ন কর্হিচিৎ ক্বাপি চ দুঃস্থিতা মতির্লভেত বাতাহত নৌরিবাস্পদম্ [ভাগ ১ ৫. ১৪]। অতএব, এখন তুমি সেই মহামহিমশালী শ্রীহরির লীলাকথা বিশদভাবে বর্ণনা কর"। ব্যস্, এই হ'ল ভাগবতের সূচনা, কৃষ্ণকথা সুরু হ'ল।

উত্তর :—আহা, হরিলীলামৃত ভাগবতের সূচনাটুকু শুনে প্রাণ জুড়ালো! Begining টার মধ্যেই যথেষ্ট মুন্সীয়ানা আছে। জীবন্মুক্ত-পুরুষ ব্যাসদেবের ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পরেও মনে শান্তি এল না! (অর্থাৎ হরিলীলার কাছে ব্রহ্মজ্ঞান তুচ্ছ এটা যে প্রভুপাদগণকে প্রমাণ করতে হবে!) চারিবেদ সংগ্রহ ব্রহ্মতত্ত্বের বিচারমূলক ব্রহ্মসূত্র ও মহাভারত প্রণয়ন করে, পরব্রহ্মে নিষ্ণাত হয়েও বেদব্যাসের মনে শান্তি নেই! (তা না হলে ভাগবত-গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা মুস্কিল হবে যে!) নারদকে দিয়ে ব্যাসকে উপদেশ দেওয়ানো হ'ল, 'ব্রহ্মজ্ঞান হরিভক্তিপূর্ণ না হলে প্রীতিপ্রদ হয় না! অতএব হরিলীলা গাও'! —ইনি সেই নারদ, ছান্দোগ্য উপনিষদে পাই, যিনি বেদ বেদাঙ্গাদি নানা শাস্ত্র অধ্যয়নান্তে, আত্মজ্ঞান লাভার্থ, সনৎকুমার ঋষির নিকট উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন, 'স অহং ভগবো মন্ত্রবিৎ এব অস্মি, ন আত্মবিৎ, শ্রুতং হি এব মে ভগবদ্দৃশেভ্যঃ তরতি শোকং আত্মবিৎ ইতি। স অহং ভগবঃ শোচামি, তং মা ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়তু ইতি— হে ভগবন্, আমি মন্ত্রবিৎ কিন্তু আত্মবিৎ নই, সুতরাং সন্তাপ বিমুক্ত হ'তে পারি নি। ঋষিগণের নিকট শুনেছি, **আত্মবিৎ শোকোত্তীর্ণ হয়**; ভগবন্, আপনি আপনি আমাকে আত্মজ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক শোকসাগর হ'তে উত্তীর্ণ করুন'। সনৎকুমারও তাঁকে 'সত্যং ভগবো বিজিজ্ঞাস, বিজ্ঞানং ভগবো বিজিজ্ঞাস' ইত্যাদি বাক্যে সম্বোধন করে, 'ইদং ব্রহ্ম ইদং ক্ষত্রম্ ইমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানি ইদং সর্বং যদ্ অয়ম আত্মা' এই অখণ্ড ব্রহ্মানুভূতি দিয়ে নারদকে চিরতৃপ্ত, আপ্তকাম করে ছিলেন।

ভাগবতে শ্রুতিবিরুদ্ধ কথা

নারদেরও যখন বেদ বেদান্ত অধ্যয়ন করে, মন্ত্রবিৎ হয়েও আত্মজ্ঞান ছাড়া সন্তাপ না যায়, সনৎকুমারের ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশে তিনি যখন আত্মবিৎ হয়ে শান্তি ও অমৃতের সন্ধান পেয়েছিলেন, ব্যাসদেবও বেদবেদান্ত ভারতাদি সংকলন করেও যখন শান্তি পাচ্ছেন না দেখলেন, তখন নারদ নিজে যে ঔষধে নিরাময় হয়েছিলেন ব্যাসের বেলাতেও সেই ঔষধ Prescribe করলেন না কেন? সনৎকুমারের নিকট তিনি স্বয়ং কৃষ্ণলীলার রসাস্বাদন করে শান্তি পান নি, ব্রহ্মজ্ঞানলাভেই চিরতৃপ্ত হয়েছিলেন, তাহলে তিনি কি করে একজন 'পরব্রহ্মবিদ্' ঋষিকে শান্তিলাভের জন্য কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করবার উপদেশ দেন? এ কি বিশ্বাস যোগ্য?

ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে, 'ইদং ব্রহ্ম, ইদং ক্ষত্রম্, ইমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানি ইদং সর্বং, যদ্ অয়ম আত্মা' [শ্রুতিবাক্য], এই রকম সর্ব্বত্র ব্রহ্মময় অনুভূত হলে কারও পক্ষে কি আত্মেতর, এক পরিচ্ছিন্ন, ঈশ্বরের লীলা কথা কীর্ত্তন সম্ভব ? 'ব্রহ্মজ্ঞান হরিভক্তিপূর্ণ না হলে প্রীতিপ্রদ হয় না' এই রকম অসার এবং অবাস্তব উপদেশ দান নারদের পক্ষে সম্ভব বলে মনে হ'চ্ছে না। ভাগবতকার বলছে, বেদজ্ঞ পরব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যাসের মনে নাকি শান্তি ছিল না! **ভাগবতকারের এ কথাও শ্রুতি বিরুদ্ধ, কাল্পনিক, মিথ্যা ঘটনা মাত্র!** ভাগবতকার তথা বৈষ্ণব প্রভুপাদগণকে আমার প্রশ্ন, বেদব্যাস ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পর বেদবিভাগ এবং ব্রহ্মতত্ত্বের বিচারমূলক ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ণ করেছিলেন, না, ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পূর্ব্বে ? যদি প্রভুপাদেদর এই সিদ্ধান্ত হয় যে ব্রহ্মসূত্রাদি প্রণয়নের সময় তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় নি, তাহলে Perfection এ না পৌঁছেই তিনি বেদ বেদান্ত গীতা যা লিখেছেন বা সম্পাদনা করেছেন তা Imperfect! ত্রুটি পূর্ণ !! আর যদি বলেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর তিনি ঐ সব গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তাহলে তাঁর মনে 'শান্তি' আসে নি, তিনি 'খিন্নমনে' ছিলেন—ইত্যাদি ভাগবত-বাক্য একেবারে শ্রুতিবিরুদ্ধ ; মিথ্যা। **'প্রজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম'—বেদের এই মহাবাক্যানুযায়ী ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের বিষাদ আসতে পারে না।** ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।

'আনন্দং ব্রহ্মনো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনঃ [শ্রুতি]'। 'রসো বৈ সঃ রসোহ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি [শ্রুতি]'। 'আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তীতি সংবিংশন্তীতি [শ্রুতি]'— এই যাঁর অনুভব, সেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কখনও নিরানন্দভাব আসতে পারে না, তাঁর কাছে সর্ব্বত্র, সবকিছুই, সব সময় আনন্দম্, আনন্দম্। উপনিষদে আছে, 'অভয়ং বৈ ব্রহ্ম, অভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ' 'অথ স অভয়ং গতো ভবতি'—সেই প্রজ্ঞান আনন্দময় বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বরকে আত্মরূপে জেনে ব্রহ্মজ্ঞ ত্রিতাপ মুক্ত হ'ন, অভয়-অমৃতপদ প্রাপ্ত হ'ন। 'যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদিশ্রিতাঃ' [শ্রুতি]। 'যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ' [শ্রুতি]। 'অথ মর্ত্তোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে' [কঠোপনিষদ্]। 'যখন হৃদয় সর্ববিধ কামনাহীন হয়, যখন সকল রকম হৃদয়-

গ্রন্থি ছিন্ন হয় **অর্থাৎ** আসক্তি **ক্ষয়** হয়, তখন **জীব** ইহলোকেই **ব্রহ্মভূত** হয়'। বেদব্যাস যে একজন **জীবন্মুক্ত** ব্রহ্মবিদ্ **ঋষি** **ছিলেন** এ কথা কেউ আশা করি **অস্বীকার** করতে পারবেন না? গীতামুখে বৈষ্ণবদের "নরাকৃতি পরব্রহ্ম" **শ্রীকৃষ্ণ** বলছেন, '**ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি**'। '**জ্ঞানং লব্ধা পরাংশান্তিং** অচিরেণ অধিগচ্ছতি' [গীতা ৪. ৩৯]।

'ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ংপ্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চা প্রিয়ম্,
স্থিরবুদ্ধিঃ অসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণিস্থিতঃ' [ঐ ৫. ২০]

অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণিস্থিতঃ, যিনি স্থির-বুদ্ধি, মোহহীন, প্রিয় প্রাপ্তিতে **তাঁর প্রহর্ষ** নেই, **অপ্রিয়** প্রাপ্তিতে তাঁর উদ্বেগ নেই।

'স ব্রহ্মযোগ যুক্তাত্মা **সুখম্ অক্ষয়ম্ অশ্নুতে**' [ঐ ৫. ২১]
'মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি' [কঠ ২. ২২]।

সেই মহতো মহীয়ান্ পরমাত্মাকে মনন করে ধীর ব্যক্তি শোকের অতীত হ'ন।

'যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতঃ অথ এষ এব পরম আনন্দঃ'
[বৃহদারণ্যক ৪ ৩, ৩৩]

মানবীয় ভাষায় এই আনন্দের উপমা নেই। কাজেই গীতা বেদ উপনিষদাদির মত **অনুযায়ী ব্রহ্মভূত ঋষি, অবৃজিন,** অকামহত, ভূমানন্দময় ব্যাসদেবের **কোন সন্তাপ আসতে পারে না।** ব্যাসদেব নিজগ্রন্থে কোনদিন এই রকম **শ্রুতিবিরুদ্ধ 'বাজে'** কথা লিখতে পারেন না। **স্পষ্টই** বোঝা যাচ্ছে কোন কৃষ্ণ-ভক্ত ব্যাসের নাম দিয়ে ভাগবত লিখেছে, তাই এই বিপত্তি!

ভাগবতে বেদবিরুদ্ধ কথা।

ভাগবতকার বেদব্যাসের মুখ দিয়ে, (as if, ব্যাস বলছেন!) কত বড় মিথ্যা কথা লিখেছে দেখুন,

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি গোচরা
কর্মশ্রেয়সী মূঢানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্ [ভাগ ১, ৪, ২৫]।

'**বেদে অনধিকারী স্ত্রী শূদ্র নিন্দিত ও দ্বিজগণের কল্যাণলাভের জন্য তিনি মহাভারত নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করলেন**' (!!) ভাগবতকারের এ কথাটি একেবারে বেদ-**বিরুদ্ধ! 'স্ত্রীশূদ্র বেদে অনধিকারী'** এ কথা বেদে নেই।

শতপথে স্পষ্টভাবেই লেখা আছে, গার্গী প্রভৃতি নারীরা বেদাধ্যয়ণ করে-ছিলেন। বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ মহয়সী নারীদিগকে ব্রহ্মবাদিনী বলা হ'ত; পুরাকালে কুমারীগণের মৌঞ্জীবন্ধন, **বেদ-অধ্যয়ণ** এবং সাবিত্রী বাচন প্রচলিত ছিল,

'পুরাকল্পে কুমারীনাং মৌঞ্জী বন্ধনমিষ্যতে
অধ্যয়নঞ্চ বেদানাং সাবিত্রী বচনং তথা' [যমঃ]

গোভিল গৃহ্যসূত্রে বিবাহ প্রকরণে যজ্ঞোপবীত ধারিণী কন্যার উল্লেখ আছে,

'প্রাবৃতাং যজ্ঞোপবীতিনীমভ্যুদানয়ন জপেৎ
সোমোহদদৎ গন্ধর্ব্বায়েতি।
[২ প্রপাঠক, ১ম খণ্ড, ১৯ সূত্র]

শ্রৌত সূত্রাদিতেও আছে, 'ইমং মন্ত্রং পত্নী পঠেৎ'। বেদ-অধ্যয়নে স্ত্রীলোকের যদি অধিকার নাই থাকে তো বেদমন্ত্র পাঠ করবে কি করে?

দেবীসূক্তের মন্ত্রগুলিতো অম্ভৃনঋষির কন্যা ব্রহ্মবিদুষী বাক্ রচনা করেছিলেন, 'অম্ভৃনস্য ঋষের্দুহিতা বাঙ্নাম্নী ব্রহ্মবিদুষী স্বাত্মানমস্তৌৎ। অতঃ সা ঋষিঃ'। বেদের আরও মহু মন্ত্র নারীদের রচনা। সামবেদ সংহিতার বহুমন্ত্রের রচয়িত্রী ইন্দ্রমাতৃগণ;

'ত্বামন্ত্রবলাদপি মহমো জাত ওজসঃ।
তং সন্ বৃষণ বৃষেদসি॥ [ঐন্দ্র পর্ব্ব]'

বেদ-শ্রুতি বিরুদ্ধ ভাগবত বেদব্যাস লিখতে পারেন না

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ থেকে জানা যায়, শূদ্র জানশ্রুতি রৈক্যমুনির নিকট **বেদাধ্যয়ণ** করেছিলেন। বেদে স্বয়ং পমেশ্বর বলেছেন, "যেমন আমি সকল মনুষ্যের জন্য এই কল্যাণ-প্রদায়িনী ঋগ্বেদাদি চারি বেদের বাণী উপদেশ করেছি, সেই রকম তোমরাও উপদেশ করতে থাক। আমি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, (অর্য্যায়) বৈশ্য শূদ্র এবং (স্বায়) নিজভৃত্য বা স্ত্রী আদি এবং (অরনায়) অতি শূদ্রাদির জন্য বেদ প্রকাশ করেছি,

যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়॥"
[যজু. অ ২৬,২]

কাজেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ঋষি, যিনি বেদবিভাগ করে বিস্তার করেছিলেন এবং বেদে অতুলনীয় পারংগতার জন্য বেদব্যাস নামে পরিচিত, তিনি কি কখনও কোন গ্রন্থে, 'স্ত্রীশূদ্রের বেদে অধিকার নেই' এই রকম বেদবিরুদ্ধ কথা লিখতে পারেন ? স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, বেদব্যাস 'ভাগবত' নামক ঐ কৃষ্ণলীলা কথা রচনা করেন নি !

আলোক-তীর্থ

তৃতীয় অর্ঘ্য

প্রথম পুষ্প

বিনোদ দাস ঃ— আপনার কথার মাথামুণ্ড কিছুই বোঝা যাচ্ছে না! ভাগবত বেদব্যাসের লেখা নয়, কি বলছেন আপনি? আপনার মাথা ঠিক আছেত? আমাদের পাশের বাড়ীতে দেখি, ভাগবত পাঠ হয়, হাজারো লোকের সমাগম হয়, আমাদের মেদিনীপুরের বিশিষ্ট বিশিষ্ট বাবুরা ভাগবত শুনতে শুনতে চোখের জল মুছতে থাকেন দেখি! যিনি কোলকাতা থেকে ভাগবত পাঠ করতে আসেন, তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রী আছে— কয়েক দিনে হাজার, দু' হাজার টাকা নিয়ে যান! ভাগবত যদি বেদব্যাসেরই লেখা না হবে, আপনার ভাষায় 'বাজে' কথাতেই পূর্ণ হবে তাহলে 'ভাগবত-ভাগবত' করে এত লোক পাগল হ'ন কেন? ভাগবত গ্রন্থে কোথায় কি অসামঞ্জস্য আছে বলুন তো শুনি?

উত্তর ঃ—আমার কথার 'মাথামুণ্ড' বুঝতে হলে, আপনাদের মাথার Brain cells গুলো যা কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত ধারণায় ঠাসা (filled up) আছে' সেগুলো প্রথমে Vacant করতে হবে যে! আমি challenge করে বলছি শ্রীমদ্ভাগবত যে বেদব্যাসের লেখা; তা কোন 'প্রভুপাদ' 'বিশিষ্ট' বা 'ডক্টরেট' ডিগ্রীধারী প্রমাণ করতে পারবেন না। এর প্রমানিকতা প্রমাণ করবার জন্য ব্যাস শুকদেবের নাম দিয়ে কোন কৃষ্ণভক্তেরই স্বকপোলকল্পিত রচনা!! কিন্তু মিথ্যাকে সত্য বলে প্রমাণ করতে গিয়ে, অত্যধিক কল্পনার আশ্রয় নেওয়ায় অনেক

অসামঞ্জস্য এসে গেছে। মহাভারতে যে সমস্ত ঘটনা নেই, যে ভাবধারা নেই কৃষ্ণের 'অপ্রাকৃত লীলা' বর্ণনা করতে গিয়ে, ভাগবতকার এমন সব অতিরঞ্জিত ঘটনার সমাবেশ করেছে যে তার ইয়ত্তা নেই। কৃষ্ণের পুতনা-অঘাসুর-বকাসুর বধ, গিরি-গোবর্দ্ধন ধারণ, কুব্জাবেশ্যা সঙ্গম, রাসলীলা, গোপিনীতত্ত্বাদি 'অপ্রাকৃত লীলা খেলা'র ঘটনা মহাভারতকার উল্লেখই করেন নি। যদি বলেন, বেদব্যাস মহাভরতে যে সমস্ত ঘটনা লেখেন নি, সেগুলি ভাগবতে লিখেছেন, মহাভারতে যা আছে, তাই যে ভাগবতে লিখতে হবে, তার কোন নিয়ম নেই, আর হুবহু সেই সেই ঘটনা লিখতে হলে তো দ্বিতীয় গ্রন্থের প্রয়োজনই থাকে না! আপনার এ কথা স্বীকার করে নিয়েই আপনাদের সবাইকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি- ঐ দুইটি গ্রন্থই একই গ্রন্থাকারের লেখা হলেতো একই ঘটনা সম্বন্ধে (যেমন পরীক্ষিতের মৃত্যু প্রসঙ্গে বলেছি) দুইরকম, পরস্পর-বিরুদ্ধ, বর্ণনা থাকবে না? আর বেদব্যাসের মত দ্রষ্টা পুরুষের রচিত কোন গ্রন্থে পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবধারা, ঘটনার অসামঞ্জস্য থাকার কথাও নয়,—সম্ভব নয়। আমি ভাগবত থেকে ঐ রকম কতকগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ ঘটনা এবং তাদের অসামঞ্জস্যের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, বিচার করে দেখুন ঃ—

ভাগবতে বর্ণিত ঘটনার অসামঞ্জস্য

(১) হিরণ্যাক্ষ বধ প্রসঙ্গে ভাগবত বলছে, সে নাকি পৃথিবীকে মাদুরের ন্যায় জড়িয়ে উপাধান করে শুয়ে ছিলো। বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করে, তার মাথার নিম্নদিক দিয়ে পৃথিবীকে মুখ দিয়ে শূন্যে তুলে ধরলেন ইত্যাদি! এখন প্রশ্ন, পৃথিবী কি গোলাকার বা মাদুরের ন্যায় চতুষ্কোণ বিশিষ্ট!! পৃথিবীর আকৃতি সম্বন্ধে এখনকার একজন বৈজ্ঞানিক যা জানেন, ব্যাসদেব যদি ঐ গ্রন্থের রচয়িতা হ'তেন, তাহলে তাঁর মত দ্রষ্টা পুরুষের তা কি অজানা থাকার কথা? মনে রাখবেন ব্যাস প্রভৃতি সে যুগের ঋষিদের কাছে পৃথিবীর আকৃতি, পৃথিবীর গতিশীলতা এবং মাধ্যাকর্ষন শক্তির তত্ত্ব অজানা ছিল না ঃ—

(ক) 'কপিথ ফল বৎ বিশ্বং'

(খ) 'চলা পৃথ্বী, স্থিরা ভাতি বোম্নি সচলঃ তিষ্ঠতি'।

(গ) 'আকৃষ্ট শক্তিশ্চ মহীর্তয়া যৎ স্বাভিমুখং (towords its centre) সশক্ত্যা·········'(with force) ইত্যাদি।

(২) [ক] প্রিয়ব্রত রাজার রথচক্রের ঘর্ষণে নাকি সমুদ্রের উৎপত্তি হয়েছে! (খ) পৃথিবীর আয়তন নাকি উনপঞ্চাশ কোটি যোজন!! [গ] এবং সুমেরু পর্বতের পরিমাণ সম্বন্ধেও আজগুবি গালগল্পগুলি ব্যাস কখনও লিখতে পারেন না।

(৩) ভাগবতকার লিখেছে, পূতনার শরীর ছয়ক্রোশ বিস্তৃত এবং অতিশয় লম্বা ছিল! কৃষ্ণ নাকি পুতনাকে বধ করে মথুরা ও গোকুলের মাঝখানে ফেলে দিয়েছিলেন, 'পতমানোঽপি তদ্দেহস্ত্রিগব্যূত্যন্তর দ্রুমান্, চূর্ণয়ামাস রাজেন্দ্র! মহদাসীৎ তদ্ভূতম্' [১০. ৬. ১৪]!! মনে রাখবেন মথুরা আর গোকুলের দুরত্ব চার পাঁচ মাইলের বেশী নয়!!!

(৪) রাম এবং কৃষ্ণকে আনবার জন্য কংস যখন অক্রূরকে পাঠালেন, তখন তিনি 'রথেন বায়ুবেগেন' বায়ুবেগগামী রথেচড়ে, মহামতি অক্রূর সেই রাত্রি মধুপুরীতে কাটিয়ে প্রাতঃকালে গোকুল যাত্রা করলেন,' অক্রূরোঽপি চ তাং রাত্রিং মধুপূর্য্যাং মহামতিঃ, উষিত্বা রথমাস্থায় প্রযযৌ নন্দগোকুলম্' [ভাগ] এবং **বায়ুবেগে রথ চালিয়ে (!!!)** সূর্য্যাস্তকালে, গোকুলে এসে পৌঁছলেন! 'রথেন গোকুলং প্রাপ্তঃ **সূর্য্যশ্চাস্ত** গিরিং নৃপ! (শুকবাক্য!)' [ভাগ ১০. ৩৮. ২৪] তারপর অক্রূর যখন প্রাতঃকালে রামকৃষ্ণ নিয়ে গোকুল থেকে Start করলেন স্ত্রীলোকগণ কাঁদতে লাগলেন, 'স্ত্রীনামেবং রুদন্তীনাম্ **উদিতে সবিতর্য্যথ'**, বায়ুবেগে রথ চালিয়ে যমুনা অতিক্রম করে, **'রথেন বায়ুবেগেন** কালিন্দীমঘ-নাশিনীম্', সন্ধ্যাকালে রাম ও কৃষ্ণকে নিয়ে মথুরাতে পৌঁছেগেলেন, 'মথুরামনয়ৎ রামং কৃষ্ণঞ্চৈব **দিনক্ষয়ে'** [ভাগ ১০. ৪১. ৬] !!! ঐরকম অবাস্তব অযৌক্তিক কথা কি 'শুকবাক্য' হতে পারে? ঐরকম হাস্যকর কথা ব্যাসদেবের লেখা নয়।

(৫) মহাভারতে দ্রৌপদির দেহত্যাগের বর্ণনা ইতিপূর্ব্বে অন্য অর্ঘ্যে দিয়েছি। পঞ্চপাণ্ডব মহাপ্রস্থানের পথে যাওয়ার সময় **দ্রৌপদিকে সঙ্গে করে নিয়ে** গেছলেন, এমন কি কুকুর একটিও তাঁদের সঙ্গে ছিলো।

'ভ্রাতরঃ পঞ্চ কৃষ্ণা চ ষষ্ঠী শ্বা চৈব সপ্তমঃ
আত্মনা সপ্তমো রাজা নির্যযৌ গজসাহ্বয়াৎ' [মহাভারত];

তারপর মেরুপর্বতের শিখর দেশে এসে 'যাজ্ঞসেনী ভ্রষ্টযোগা নিপপাত মহীতলে,' (ঐ) কিন্তু ভাগবতে কি লেখা আছে দেখুন। **মহাভারত যিনি লিখেছেন সেই একই লোক বেদব্যাস যদি ভাগবত গ্রন্থের রচয়িতা হ'তেন, তাহলে,**

[মহাভারতকার ভাগবত লেখক ন'ন]

এই রকম একটি ঘটনা সম্বন্ধে পরস্পর-বিরুদ্ধ কথা লিখতে পারতেন না :—

"কৃষ্ণের তিরোভাবের সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠির পঞ্চভ্রাতাসহ উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করলেন। কুরুকুলদেবী দ্রৌপদী দেখলেন **পতিগণ কেউ কারও জন্য বা তাঁর জন্যও অপেক্ষা করলেন না!** তখন তিনিও বাসুদেবে উপগত হয়ে দেহত্যাগ করলেন।

দ্রৌপদী চ তদাজ্ঞায় পতীনামনপেক্ষতাম
বাসুদেবে ভগবতিহ্যেকান্ত মাতরাপতম্"। [ভাগ ১, ১৫, ৫০]

(৬) দশমস্কন্ধে বর্ণনাদি প্রসঙ্গে এমন সব প্রলাপোক্তি, অশ্লীল বর্ণনাদি আছে, যা মনে হয় ভাগবতকার একেবারে রসোন্মত্ত অবস্থায় লিখে ফেলছেন! দশমস্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায় আছে, হেমন্তকালের প্রথম মাসে অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে গোপকুমারীগণ, হবিষ্য ভোজনসহকারে, ব্রত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কাত্যায়নীর পূজা করলো।

'হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চন ব্রতম্'॥ ১॥

দেবী কাত্যায়ণার কাছে তারা বর চাইলো, 'নন্দগোপসুতং দেবি! পতিং মে কুরুতে নমঃ॥ ৫॥, কৃষ্ণই আমাদের পতি হউন'। গোপিনীরা এই সময় পূর্ণ যুবতী, কুমারী, কৃষ্ণের বয়স সাত বছর। এই ব্রত পালনকালেই কৃষ্ণ বস্ত্র হরণ করলেন। বস্ত্র হরণকালে ভাগবতকারের বর্ণনা, 'গোপিনীরা উলঙ্গ অবস্থায় উভয় হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক বস্ত্র চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের ঈষৎ অক্ষত যোনি দর্শন করিয়া প্রীত হইলেন'।

ততো জলাশয়াৎ সর্ব্বা দারিকাঃ শীতবেপিতাঃ
পানিভ্যাং যোনিমাচ্ছাদ্য প্রোত্তেরুঃ শীতকার্ষিতাঃ।
ভগবানাহতাবীক্ষ্য...................... '[১০, ২২, ১৭ | ১৮]

এদিকে বলা হ'ল অবিবাহিতা কুমারী, তাদের আবার ঈষৎ অক্ষত যোনি অর্থাৎ সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল না—এ কথায় প্রমাণ হয়, তারা বিবাহিত নতুবা ব্যভিচারিণী ছিল! কিন্তু 'কুমারী' কথাটি থাকায় এবং কাত্যায়নীর নিকট 'কৃষ্ণই আমাদের

পতি হউন' এই বর চাওয়ায় তারা যে বিবাহিতা ছিল না এটা মানতেই হবে !! আশা করি অসামঞ্জস্যটা বুঝতে পারছো। কিন্তু এহ বাহ্য আগে বাঢ় আর—

তারপরে শরৎকালে রাসলীলা সুরু হ'ল। গোপকুমারীদেরকে কৃষ্ণ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন,

"যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ

[১০, ২২, ২৭]

হে অবলাগণ! তোমরা ব্রজে গমন কর, সিদ্ধ হয়েছে; আগামিনী যামিনীতে তোমরা আমার সঙ্গে বিহার করতে পাবে······ইত্যাদি"

তদনুযায়ী, শারদোৎফুল্ল অপূর্ব্ব শোভাময়ী পূর্ণ জ্যোৎস্নাস্নাত রাত্রিতে [ভাগ ১০, ২৯, ১], কৃষ্ণ একদিন গোপিনীদের সঙ্গে বিহার করবার ইচ্ছায় তাঁর মধুর বাঁশী বাজাইলেন! ব্যস, কৃষ্ণের সেই, 'নিশম্যগীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং' কাম বর্দ্ধক গান শুনে গোপিনীরা এমন অধীরা উদ্বেলা হয়ে উঠলো যে, যে যে-অবস্থায় ছিলো সেই অবস্থাতেই কৃষ্ণের কাছে ছুটে যেতে লাগলো। 'তা বার্য্যমানাঃ **পতিভিঃ** পিতৃভিঃভ্রা্তৃবন্ধুভিঃ'—**পতি** (!!!) পিতা, ভ্রাতা বন্ধুগণের বারণ সত্ত্বেও ছুটে যেতে লাগলো সব ফেলে রেখে!

'পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ
শুশ্রূয়ন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্' [১০, ২৯-৬]

যে **শিশুদিগকে স্তনপান করাচ্ছিলো**, সে শিশুকে স্তনদান ছাড়িয়ে, যে **স্বামী সেবা** করছিলো, সে সেই সেবাত্যাগ করে ছুটে যেতে লাগলো কৃষ্ণের নিকট! ভাগবতকারের এই বর্ণনানুযায়ী তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কৃষ্ণপানে ধাবিতা এই গোপিনীরা **পতিপুত্রবতী**? কী ভীষণ প্রহেলিকা বুঝে দেখুন, মাত্র এক বছর আগে যারা 'কুমারী' 'ঈষৎ অক্ষত যোনি' ছিলো, 'কৃষ্ণই আমাদের পতি হউন' এই যাদের বর প্রার্থনা ছিলো, মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই তাদের পতিপুত্র সব হ'য়ে গেল? তাহলে কৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য তাদের তপস্যা এবং কাত্যায়নীর বরদান রইলো কোথায়? তারপর, রাসলীলার বর্ণনা প্রসঙ্গে ভাগবতকার এমন সব যৌনক্রিয়া এবং নর্ম্মলীলার বর্ণনা দিয়েছে যে, যে সমস্ত প্রভুপাদ ব্যাকরণের প্যাঁচ কষে কষে রাস পঞ্চাধ্যায়ের শ্লোকগুলির

ন্যর্থ বোধক গভীর রস বাখ্যা বের করার চেষ্টা করেন ; তাঁদের টেনে বুনে অর্থ করার পণ্ডিতী প্যাঁচও ব্যর্থ এবং স্তব্ধ হয়ে যায়,

'বাহু প্রসার-পরিরম্ভ-করালকরুনীবীস্তনালভন নর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ।
ক্ষে ল্যাবলোকহসিতৈর ব্রজসুন্দরীনাম্, উত্তম্ভয়ন্ রতিপতিঃ রময়াঞ্চকার।'
(ভাগ ১০, ২৯, ৪৬)

প্রভৃতি আদিরসাত্মক শ্লোকগুলিতে !! এই শ্লোকের অনুবাদ করলেও অশ্লীলতা দোষ আসবে। আপনাদের কারও বিশেষ আগ্রহ থাকলে ভাগবত খুলে পড়ে নিন, বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা।

ভাগবতের অশ্লীল বর্ণনার বাখ্যায় পণ্ডিতী প্যাঁচও ব্যর্থ হবে !

যাইহোক, গোপিনীরা যখন পতিপুত্রবতী, কৃষ্ণের সঙ্গে নিশ্চয়ই তারা উপপত্নীরূপে বিহার করেছিলো। অনেকে বলেন, যৌনক্রিয়ার বর্ণনা থাকলেও কৃষ্ণের সঙ্গে গোপিনীদের কোন দৈহিক সম্পর্ক ছিলো না, যা কিছু ঘটেছিলো সব 'অপ্রাকৃত' দিব্য দেহে ! কিন্তু ঐ ভাগবতেই দশম স্কন্ধের বিরাশী অধ্যায়ে পাই, কুরুক্ষেত্রে একসময় সূর্য্যগ্রহনকালে সকল যাদব এবং পাণ্ডবগণ মিলিত হয়েছিলেন, গোপিনীরাও এসেছিল। তারা বহুকাল পরে কৃষ্ণকে পেয়ে অনিমেষ নেত্রে তাঁকে দেখতে দেখতে হৃদয়মধ্যে তাঁকে নিয়ে গিয়ে আলিঙ্গন সুখে তন্ময় হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাদেরকে নিভৃতে নিয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করে সহাস্যে বললেন 'সখিগণ স্বগণের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য শত্রুদমনে ব্যস্ত থেকে আমি বহুকাল তোমাদের নিকট হতে দূরে আছি'।

যদি দৈহিক সম্পর্কই না ছিলো তবে, গোপিনীরা তো মনে মনে আলিঙ্গন সুখ উপভোগ করছিলো, কৃষ্ণও 'দিব্যদেহে' আলিঙ্গন দিতে পারতেন। কিন্তু মূঢ় ভাগবতকার বর্ণনা দিচ্ছে, কৃষ্ণ তাঁদেরকে **নিভৃতে** নিয়ে গিয়ে……ইত্যাদি। দৈহিক সম্পর্ক না হলে নিভৃতে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি ? আপনারা মনে করবেন না যে, আমি কৃষ্ণচরিত্রে দোষারোপ করবার জন্য এই quotation গুলি দিচ্ছি। মূঢ় ভাগবাতকার কি ভাবে কৃষ্ণচরিত্রকে হেয় করেছে, তা দেখানোই আমার উদ্দেশ্য। বেদব্যাস যে এই রকম অশ্লীল এবং অসামঞ্জস্য-পূর্ণ ঘটনা লিখতে পারেন না, ভাগবত যে তাঁর লেখা নয়, এইটে আপনারা যাতে বুঝতে পারেন এজন্যই ভাগবতের কাণ্ডকারখানাগুলো দেখাচ্ছি।

রাসলীলা বর্ণনাপ্রসঙ্গে যে সমস্ত যৌনক্রিয়ার বর্ণনা আছে, অনেকে তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেয়, বলে ও সমস্ত 'অপ্রাকৃত লীলা'! কিন্তু তা যে নয় তা তেত্রিশ অধ্যায়ে শুকমুখে প্রকাশ পেয়েছে,—'মহারাজ! সত্যসংকল্প শ্রীকৃষ্ণ আপনাতে শুক্র অবরুদ্ধ করে **গোপিনীরাকে সম্ভোগ** করেছিলেন'! রাজা পরীক্ষিৎও শুকমুখে ঐ সমস্ত অশ্লীল যৌনক্রিয়ার কথা শুনে জিজ্ঞেস করলেন 'ব্রহ্মন্! তিনি ধর্ম্মসেতুর বক্তা, কর্ত্তা এবং রক্ষক হয়ে কি করে পরদার সম্ভোগ-রূপ অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেছিলেন?'

অনেক কথাই আমরা দ্ব্যর্থবোধক ভাবে বলি। কিন্তু বক্তার expression এবং বক্তব্য থেকেই শ্রোতা impression পায়, বক্তার মনোভাব কি, বক্তব্যই বা কি। পরীক্ষিৎ এমন কিছু 'কচি খোকা বা অল্পজ্ঞ ছিলেন না! তিনি শুকদেবের মুখ থেকে রাসলীলার বর্ণনা শুনে 'পরদার সম্ভোগরূপ অধর্ম্ম' অনুষ্ঠানেরই Bad Smelling পেয়েছিলেন বলেই না প্রশ্ন করেছিলেন—

'স কথং ধর্ম্মসেতুনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা
প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মণ পরদারাভিমর্শনম্?'

বর্ত্তমানে গোপীপদরেণু আকাঙ্ক্ষী প্রভুপাদগণ এর আধ্যাত্মিক 'অপ্রাকৃত' ব্যাখ্যা আরোপ করবার চেষ্টা করলেও, ভাগবতকার কিন্তু শুকমুখে এই পরদার-সম্ভোগের কোন আধ্যাত্মিক অর্থ দেন নি! শুকদেব উত্তর দিলেন,—

'ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরানাঞ্চ সাহসম্
তে জীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা'

[ভাগ ১০, ৩৩, ২৯]

'ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তিগণকে কখনও কখনও ধর্ম্মে ও ব্যবহারে ব্যতিক্রম দেখা যায়; কিন্তু অগ্নি যেমন সমস্ত দ্রব্য ভোজন করেও পবিত্র থাকেন, তদ্রূপ যাঁরা তেজস্বী ব্যক্তি তাঁরা সর্ব্বপ্রকার কাজ করেও পবিত্রই থেকে যান, তাতে তাঁদের কোন দোষ স্পর্শ করে না'। অর্থাৎ ভাগবতের শুকবাক্যানুযায়ী (!) বোঝা যাচ্ছে; ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তি যে কোন অনাচার ভ্রষ্টাচার করতে পারে!!

ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তিতো সত্যস্বরূপ, বেদময়, পুণ্যময় হ'ন, তাঁর পক্ষে কি কায়েন মনসা বাচা কোন রকমের অনাচার করা সম্ভব? 'ধর্ম্মে ও ব্যবহারে' তাঁদের কোন রকম 'ব্যতিক্রমও' কি সম্ভব? ভাগবতকারের কি সুন্দর Logic!

আর যদি তাই হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তিকে যদি কোন দোষ স্পর্শ না করে থাকে, এই যদি ভাগবতকারের অভিমত হয়, তাহলে তৃতীয় স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে সে কি করে লেখে, সৃষ্টিকালে স্রষ্টা ব্রহ্মা কামোন্মত্ত হয়ে আপন কন্যা বাকের প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন, তারপর মরীচি আদি পুত্রদের ভর্ৎসনায় লজ্জায় তিনি শরীর ত্যাগ করলেন! ব্রহ্মা কি ঈশ্বর তুল্য ব্যক্তি ন'ন? স্থূলদেহধারী কৃষ্ণের চেয়ে সূক্ষ্মদেহধারী ব্রহ্মা কি শ্রেষ্ঠতর ছিলেন না? তা ছাড়াও, ভাগবতকারের আর একটি প্রলাপ দেখ। স্রষ্টা ব্রহ্মা হলেন কামমোহিত তাও কন্যাকে দেখে! প্রজাপতি ব্রহ্মা কামজয়ী নন! সামান্য মানুষ একটা যত বড় লম্পট এবং পাষণ্ড হোক্ কন্যাকে দেখে তার কোন পাপলালসা জাগে না। কিন্তু ভাগবতকার ব্রহ্মাকেও এক কুৎসিত চরিত্ররূপে প্রকাশ করে স্রষ্টারই দেহান্ত ঘটিয়ে ছেড়ে দিয়েছে! কথায় আছে, মূঢ়, দাম্ভিক, চপলমতি কোন মাতালের হাতে ধারালো তরবারি থাকলে তাতে যেমন অনর্থ ঘটে, তেমনি কৃষ্ণগুণানুবাদের রসকথায় রসোন্মত্ত ভাগবতকারও 'mighter than the sword' লেখনীমুখে কী অনর্থ ঘটিয়েছে দেখুন। দোহাই আপনাদের, আর যাই করুন, বিচার করে বুঝতে চেষ্টা করুন, এই ভাগবত আর যারই লেখা হোক, সর্বজ্ঞ ব্যাসদেব এর লেখক ন'ন, মহাযোগেশ্বর শুকদেবও এর বক্তা ন'ন।

ভাগবতে মিথ্যার বেসাতি

(১) ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে নবম অধ্যায়ে আছে, শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে চতুঃশ্লোকী ভাগবতের উপদেশ দিয়ে বর দিলেন, 'ভবান্ কল্প বিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ—আপনি সৃষ্টি ও প্রলয়েও কখনও মোহপ্রাপ্ত হবেন না' [২ ৯,৩৬]। অথচ দশমস্কন্ধে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করে, কৃষ্ণ মহিমা বাড়াতে গিয়ে ভাগবতকার লিখলো—ব্রহ্মমোহন অধ্যায়; ব্রহ্মা গোবৎস এবং গোপবালাগণকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে তাঁর ত্রুটি কাল অর্থাৎ মানুষের সম্বৎসর পরেও এসে দেখলেন, যমুনা-পুলিনে গোবৎস গোপবালক সবই ঠিক আছে, শুধু তাই নয়, তিনি দেখলেন প্রত্যেক গোবৎসও বিষ্ণুমূর্তি! এই ভাবে ব্রহ্মা যে মোহিত হয়েছিলেন তার ঘটা করে বর্ণনা দেওয়া আছে। শ্রীভগবানের বর রইলো কোথায়? এও এক প্রহেলিকা!

(৮) ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে আছে 'ভগবান বুদ্ধাবতার হয়ে পাষণ্ড বেশে অসুরদিগকে নানা উপধর্ম্মের উপদেশ দিয়েছিলেন'।

দেবদ্বিষাং নিগমবর্ত্মনি নিষ্ঠিতানাং, পূর্ভির্ময়েন বিহিতাভিরদৃশ্যতুর্ভিঃ
লোকান্ ঘ্নতাং মতি বিমোহমতিপ্রলোভং বেষং বিধায় বহু ভাষ্যত—

—উপধর্ম্মান্ (ভাগ ২,৭, ৩৯)

ভগবানও তাহলে 'পাষণ্ডবেশ' ধারণ করেন? বিভ্রান্ত করবার জন্য দয়াময় হরি ভুল শিক্ষা দিয়ে জাহান্নমের পথ পরিষ্কার করেন?

ঐ ভাগবতকারই আবার চতুর্থ স্কন্ধের ঊনবিংশ অধ্যায়ে বলছে, 'পৃথুর যজ্ঞে বিঘ্ন জন্মাবার জন্য ইন্দ্র যে যে বেশ ত্যাগ ও গ্রহণ করেছিল, তাতেই জৈন, বৌদ্ধ কাপালিক প্রভৃতি পাষণ্ডমত সৃষ্টি হয়েছিলো'। একবার বলছে, ভগবানের 'পাষণ্ডবেশ' বুদ্ধাবতারই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক আরেকবার বলছে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলে ইন্দ্রের ছদ্মবেশ গ্রহণ! **ক্ষমা প্রেম দয়া মুদিতা করুণা মৈত্রী ধর্ম্মের উদ্গাতা মানবদরদী অমিতাভ বুদ্ধ, ভাগবতকারের মতে 'পাষণ্ড'**! কি বিনোদ বাবু! 'এই স্বাদু স্বাদু পদে পদে' ভাবগত শুনে অশ্রু, পুলক, শিহরণ, লোমহর্ষণ, রোমাঞ্চ দেখা দিচ্ছে না কি? জৈন বৌদ্ধ, কাপালিক ধর্ম্মের উল্লেখ থাকাতে বোঝা যাচ্ছে না কি যে ভারতে ঐ ধর্ম্মগুলি প্রবর্ত্তিত এবং প্রচারিত হওয়ার পর ভাগবত লেখা হয়েছে? ভাগবত যে বেদব্যাসের লেখা নয় তা কি বুঝতে কষ্ট হচ্ছে?

(৯) গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা বলেন, ব্রজরাজ কৃষ্ণগোপিনীদের সঙ্গে যে লীলা করেছিলেন রসগত বিচারে তাই নাকি শ্রেষ্ঠ! 'পরকীয়া প্রেমে হয় রসের উল্লাস' (চৈ, চ)। তাই গোপিনীদের সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রেম 'পরমোৎকর্ষতা' লাভ করেছিল! রুক্মিণী সত্যভামাদি কৃষ্ণমহিষীও তাই কৃষ্ণচন্দ্রের তত প্রিয় ন'ন, এঁদের স্থানও রাসমণ্ডলে নেই, কিন্তু গোপিনীদের রাসমণ্ডলে পূর্ণ অধিকার! শুধু তধু তাই ন, 'রাসেশ্বরী' শ্রীরাধা সহ 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম' যে রাসলীলা 'অপ্রাকৃত' বৃন্দাবন ধামে করেছিলেন এবং আজও নাকি করে চলেছেন, ঐ সব গোপিনীদের দয়া না হলে সে রাসস্থলীর নিত্যলীলা দর্শন কারও ভাগ্যে ঘটতে পারে না! তাই সখী অনুগত হয়ে কৃষ্ণভক্তগণ ভজন করেন! এই গোপিনীরা পতিপুত্র ত্যাগ করে এসে কৃষ্ণরূপে মোহিত হয়ে শারদোৎফুল্ল রজনীতে উপপত্নী-

ভাবে কৃষ্ণের সঙ্গে বিহার করেছিলেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধের উনত্রিশ, তেত্রিশ অধ্যায়ে এই রাসলীলার বর্ণনা আছে। আবার ঐ দশম স্কন্ধেরই পৌঁষট্টি অধ্যায়ে ভাগবতকার **বলরামের সঙ্গে গোপিনীদের রাসলীলা বা যৌন লীলা** যাই বলুন, তার বর্ণনা দিয়েছে,—

'দ্বৌমাসৌ তত্র চাবাৎ সীন্মধুং মাধবমেব চ,
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপানাং রতিমাবহন্। ১৭।
পূর্ণ চন্দ্রকলা দৃষ্টে কৌমুদী গন্ধ বায়ুনা,
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগনৈবৃতঃ ।১৮।
উপগীয়মানো গন্ধর্বৈ র্বণিতা শোভিমণ্ডলে
রেমে করেণূযূথেশো মাহেন্দ্র ইব বারণঃ ।২১।
বনেষু ব্যচরৎ ক্ষীবো মদ বিহ্বললোচনঃ ।২৩।

ভাগবতের কুরুচিপূর্ণ কাহিনী, বলরামের রাসলীলা !!!

'বলরাম নিশাভাগে গোপিনীদের আসক্তি উৎপাদন করে, তথায় চৈত্র ও বৈশাখ দুইমাস বাস করিলেন; পূর্ণচন্দ্রের কিরণজালে সমুজ্জ্বল, কুমুদ্বতীর গন্ধবহ বায়ুকর্ত্তৃক সেবিত যমুনার উপবনে গোপিনীদের সঙ্গে বিহার করতে লাগলেন। বারুণী মদ গোপিনীদের সঙ্গে পান করে, হলধর মদবিহ্বল আরক্তলোচন হয়ে, মাতঙ্গীদের সহিত মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, গোপিনীদের সঙ্গে যথেচ্ছা বিহার করতে লাগলেন' [ভাগ ১০. ৬৫. ১৭—২৩] এই গোপিনীরা যে অন্য গোপিনী নয়, কৃষ্ণেরই নর্ম্ম সহচরী রাসলীলার গোপিনী তাও ঐ অধ্যায়েই উল্লেখ আছে। বলরাম উপস্থিত হওয়া মাত্রই এরা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কৃষ্ণ কি আমাদের সেবা স্মরণ করেন? তাঁহার কথা আমরা কেনই বা বলি? তিনি যদি আমাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন, তবে আমরাও পারিব'। তারপরেই পূর্ণিমার রাত্রিতে যমুনার উপবনে সুরাপানসহ মদমত্ত হলধরের সহিত রাসলীলা সুরু !!!

কৃষ্ণের সঙ্গে রাসলীলার যারা আধ্যাত্মিক বা 'অপ্রাকৃত' রসালো ব্যাখ্যা দেয়, বলরামের সঙ্গে গোপিনীদের এই যৌনলীলার কি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেবে? কৃষ্ণ নয়তো গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে স্বয়ং ভগবান। গোপিনীরা তাঁদের 'অপ্রাকৃত' চোখ দিয়ে এই 'অপ্রাকৃত' ভগবানকে

বুঝে, তাঁর সঙ্গে অপ্রাকৃত লীলা করেছিলো কিন্তু বলরামের সঙ্গেও কি তাই? আর ছোটভাই-এর যারা নর্ম্ম সঙ্গিনী, তারাই আবার বড়ভাই-এর সঙ্গে বিহার করে কি করে? যে গোপিনীরা এত 'কৃষ্ণগত প্রাণা'—যাঁর জন্য পতিপুত্রপ্রিয়-পরিজন ত্যাগ করে এসেছিলো তারাই আবাব কি করে বলরামের সঙ্গে রাসলীলায় প্রবৃত্ত হলো? মানুষী চিত্তে তো বিকার আসারই কথা! তাদের 'অপ্রাকৃত' চিত্তে বুঝি কোন রসবৈগুণ্য ঘটে নি? যদি বলেন, তারা সবই কৃষ্ণময় দেখতো, বলরামও কৃষ্ণের এক মূর্ত্তি, তাই তারা বলবামের সঙ্গেও বিহার করেছিলো! তাই যদি হয়, তাহলে স্থাবর জঙ্গম সব কিছুই তো বৈষ্ণবমতে কৃষ্ণের মূর্ত্তি, কৃষ্ণময় চোখে তাহলে সকলকে কৃষ্ণময় দেখে, গোপিনীরা যাকেই দেখবে, তারই সঙ্গে কৃষ্ণজ্ঞানে ঐ ধরণের আদিরসাত্মক রাসলীলা করতে পারে? বেদব্যাস কখনও এরকম কুরুচিপূর্ণ কাহিনী কোন বইএ লিখতে পারেন না। ভাগবত তাঁর লিখা নয়। ভাগবতের বর্ণনাগুলি যদি সত্য হয়, অর্থাৎ ভাগবতকার তার 'অপ্রাকৃত' চোখে কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে গোপিনীদের রাসলীলা বা যৌন বিহার সত্য সত্যই দেখে লিখে থাকেন, তাহলে গোপিনীরা যে জাররতা বারাঙ্গনা ছিলো তাতে কোন সন্দেহ নেই। দশম স্কন্ধে কৃষ্ণ গোপিনীরাকে বলেছিলেন, 'কুলকামিনীদের জার সেবন স্বর্গচ্যুতির প্রধান কারণ'। বৈষ্ণবদের এই 'পূর্ণভগবানের' কথা যদি সত্য হয়, তাহলে গোপিনীরা স্বর্গচ্যুতা, কোন নরকে কে জানে! এখন, গোপীপদরেণুপ্রার্থীর দল, যারা সখী অনুগত হয়ে, গোপীকৃপাকণা লাভের দ্বারা 'ওঁ নিত্যলীলা প্রবিষ্ট' হওয়ার সাধ করেন, তাহলে তাঁদের গতি কি হবে?

(১০) ভাগবতের বহু বিখ্যাত প্রহ্লাদের উপাখ্যানটিও একবার পর্য্যালোচনা করে দেখুন। নৃসিংহমূর্ত্তিতে হিরণ্যকশিপুকে বধ করার পর ভগবান প্রহ্লাদকে বললেন, 'বর প্রার্থনা কর'। প্রহ্লাদ পিতার সদ্‌গতি প্রার্থনা করলেন। নৃসিংহ বরদান করলেন, 'হে নিষ্পাপ, তুমি আমার সকল ভক্তের উপমাস্থল। তোমার পুণ্যফলেই তোমার পিতা ঊর্দ্ধতন একবিংশতি পুরুষসহ উদ্ধার হয়ে গেছেন'।

'ত্রিসপ্তভিঃ পিতাপূতঃ পিতৃভি সহ তেঽনঘ।
যৎ সাধোঽস্য কুলে জাতো ভবান্ বৈ কুলপাবন।'

[ভাগ ৭, ১০ অধ্যায়]

প্রহ্লাদের ঊর্দ্ধতন পুরুষের তালিকানুযায়ী প্রহ্লাদ পঞ্চম পুরুষ মাত্র !

ব্রহ্মা
- প্রজাপতি
  - কশ্যপ
    - হিরণ্যাক্ষ
    - হিরণ্যকশিপু
      - প্রহ্লাদ

প্রহ্লাদের একুশপুরুষ কোথায় যে, একুশপুরুষ সহ হিরণ্যকশিপু উদ্ধার হয়ে গেলেন ? ভগবান অর্দ্ধেক নর, অর্দ্ধেক পশুরূপ ধারণ করায় (ভাগবত মতে !) তাঁর কি বিমল বুদ্ধি লোপ পেলো ? কিংবা, হিরণ্য কশিপুর সঙ্গে যুদ্ধে গদাপ্রহারে জর্জ্জরিত হয়ে সেই ঘোর রৌদ্র বীভৎস রস তাঁকে মিথ্যাবাদী ভাগবতকারের মতই বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল ? অথচ বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয় বিজয়ই নাকি সনকাদি ঋষির অভিশাপে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু, দ্বিতীয় জন্মে রাবণ কুম্ভকর্ণ এবং তার পরজন্মে দন্তবক্র শিশুপালরূপে জন্মে শত্রুতা করে করে তিন জন্মে মুক্ত হয়েছিলেন—একথাও ভাগবতে আছে !! যদি নৃসিংহের বর অনুযায়ী প্রহ্লাদের পিতাসহ ঊর্দ্ধতন একুশ পুরুষ উদ্ধারই হয়ে যায় তাহলে রাবণ কুম্ভকর্ণরূপে, পরে দন্তবক্র শিশুপালরূপে, জন্মালো কারা ? ভগবান কি বর দেওয়ার এ সময় ভুলে গেছলেন ? ভগবানের ভ্রান্তি ? না, তাঁর বর মিথ্যা হোল ? এর কোনটা সত্য ? একটা সত্য ? একটা মিথ্যা হলে অপরটাও মিথ্যা হয়, এইভাবে দু'টো ঘটনাই মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ভগবান, নৃসিংহও হ'ন নি— এসব বলেনও নি, **ব্যাসদেবও এই সব 'গাঁজিকা' প্রণয়ন করে যান নি। এ সমস্তই ভাগবতকারের মিথ্যা কল্পনা মাত্র।**

(১১) এই ভাগবত যে বেদব্যাসের লেখা নয় তা নিচের শ্লোকটি বিচার করলেই ধরা পড়ে—

'কালেনমীলিতধিয়ামবমৃশ্য নৃ নাং
স্তোকায়ষাং স্বনিগমো বত দূর পারঃ।
আবির্হিতস্ত্বনুযুগং স হি সত্যবত্যাম্,
বেদদ্রুমং বিটপশো বিভজিষ্যতি স্ম।' (ভাগ ২,৭,৩৬)

"অহো! যুগে যুগে কালবশে মানুষের বুদ্ধি সঙ্কুচিত এবং পরমায়ু অল্প হয়ে আসছে দেখে, ভগবান ভাবলেন, 'মৎকৃত বেদের পারগমন করা তাদের পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠছে', তাই সেই ভগবানই সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসরূপে উৎপন্ন হ'য়ে বেদতরুর শাখা বিভাগ করেছিলেন।"

ভাগবত যদি বেদব্যাসেরই রচিত হ'ত, তিনি নিজেই কি নিজেকে ভগবানের এক অবতার বলে আত্মশ্লাঘা করতে পারেন?

দ্বিতীয় পুষ্প

গুরুদাস ব্রহ্মচারী (গিরীনবাবু) :—

দেখুন আপনি ভাগবতকে বেদব্যাসের রচনা বলে মানুন আর নাই মানুন, কিন্তু রাসলীলাকে যৌনলীলা বলা আপনার উচিত নয়। অনেকে বলেন, মহাযোগেশ্বর চিরকুমার শুকদেব যার প্রবক্তা তা কামশাস্ত্র নয়। তাছাড়া মত্যুকে যাঁর আর মাত্র সাত দিন বাকী তিনি নিশ্চয়ই কামচর্চ্চা করবার জন্য শুকদেবের মত ঋষিকে ডাকেন নি! আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুক্তি অনুযায়ী বুঝতে পারছি—আপনি এ সব কথাকে আমলই দেবেন না; কারণ মহাভারত থেকে আপনি অকাট্য প্রমাণ দিয়ে দিয়েছেন, শুকদেবের ভাগবত-বর্ণনা এবং হরিকথা শোনানো একেবারে মিথ্যা রটনা মাত্র! কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন ঐ ভাগবতেই কৃষ্ণকে 'সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ' বলা হয়েছে। রাসলীলা বর্ণনাকে যাতে না কেউ যৌনলীলা বা কামচর্চ্চা বলে মনে করে এজন্য রাসলীলা অধ্যায়ের অন্তে ভাগবতকার বর্ণনা দিয়েছে—

'বিক্রীড়িতং ব্রজ বধূভির্রিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্যকামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্য চিরেণ ধীবঃ। (১০, ৩৩, ৩৯)

অর্থাৎ যিনি ব্রজবধূগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এই ক্রীড়াকথা শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ ও বণন করবেন, তিনি ত্বরায় ভগবানে পরমাভক্তি লাভ করে ধীরচিত্তে অবিলম্বে কামরূপ মানসিক পীড়া হ'তে বিমুক্ত হ'তে পারবেন।' এর পরেও কি আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গোপীদের সঙ্গে রাসলীলাকে যৌনলীলা বলবেন? কৃষ্ণ চরিত্রের মহত্তম দিকগুলি ভেবে দেখুন—তখন আর তাঁর অনুষ্ঠিত লীলাকে যৌনলীলা বলতে পারবেন না।

উত্তর :— কৃষ্ণ চরিত্রের মহৎ দিকগুলি সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট অবহিত বলেই তাঁর নামে ভাগবতে যে সমস্ত অলীক লীলাখেলার বর্ণনা আছে তাকে রূঢ়ভাবে সমালোচনা করছি। আমি তো আর কৃষ্ণ চরিত্রকে ছোট করবার উদ্দেশ্যেই জোর করে রাসলীলাকে যৌনলীলা বলছি না! আমি মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্রে যে সবমহৎ আপ্তপুরুষোচিত মহিমা লক্ষ্য করেছি, তাতেই বুঝেছি ভাগবত পুরাণ একেবারেই কল্পিত, বেদব্যাস এ গ্রন্থের লেখক ন'ন, মহাভারতের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই যে শুকদেবের দেহান্ত হয়েছে—তিনি এর প্রবক্তা হ'তে পারেন না, ভাগবতকারের স্বকপোল কল্পনা কৃষ্ণ চরিত্রকে হেয় করে দিয়েছে। যে কৃষ্ণ গীতা মুখে বলেছিলেন,

'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ
স যৎ প্রমানং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে' (৩, ২১)

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা যা আচরণ করেন, তিনি যা প্রামানিক বলে স্থির করেন সাধারণ লোকে তাই মেনে চলে—সে-হেন কৃষ্ণ মনীষা এবং তপস্যায় একজন বরেণ্য ব্যক্তি হয়ে, এমন কোন জঘন্য কাজ কখনই করে যান নি, যা সাধারণের নিকট অসৎ দৃষ্টান্তের উপমা হতে পারে! গোপিনীদের সঙ্গে কৃষ্ণের রাসলীলা, কুরুচিপূর্ণ বস্ত্র হরণ, কুব্জা বেশ্যাসঙ্গম ইত্যাদি যে সমস্ত জঘন্য লীলাখেলা ভাগবতকার কৃষ্ণের নামে আরোপ করেছে এবং যা অনুসরণ এবং অনুকরণ করতে গিয়ে Socalled কৃষ্ণভক্তমহলে নায়িকা ভজন, কিশোরী ভজন ইত্যাদি নেড়ানেড়ী লীলাভিনয় গুপ্তভাবে চ'লে, ধর্ম্মসমাজে অনাচারের ঢেউ বইছে, আমি বরং বলতে চাই, ওগুলি কৃষ্ণচরিত্রের অবমাননা। ভাগবতকারেরই ওগুলি সৃষ্টি!

মহাভারত এবং হরিবংশ পাঠ করে কৃষ্ণের যে মহৎ চরিত্র এবং অত্যদ্ভুত মনীষার পরিচয় পাই, গীতার প্রবক্তা হিসেবে তাঁর যে প্রজ্ঞার পরিচয় পাই, তাতে কৃষ্ণ চরিত্র সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধাই আছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ীরা বিভিন্ন গ্রন্থে নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সব অযৌক্তিক কাহিনী রটিয়েছে—সেগুলিতেই আমার আপত্তি। সমগ্র কৃষ্ণচরিত্র অনুশীলন করলে কি যোগৈশ্চর্য্যে, সমাজনীতি, সমরনীতি এবং রাষ্ট্রনীতির কূট কৌশলে, কি গার্হস্থ-নীতির মহত্তম আচরণে, কিংবা লোকচরিত্র অনুশীলনে কৃষ্ণের তুলনা মেলে না।

পূর্ব পূর্ব পাঁচজন্ম থেকে কঠোর তপস্যার ফলে কৃষ্ণের মধ্যে অলৌকিক যোগবিভূতি এবং দিব্যশক্তির স্ফুরণ ঘটেছিলো। পুতনাবধ, অঘাসুর-বকাসুর বধ, কালীয় দমন, কংসবধ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পরিচালনা, জয়দ্রথবধ শেষে যদুবংশ ধ্বংশ—সকল বিষয়ই ধীর স্থির ভাবে পর্য্যালোচনা করলে দেখতে পাই কৃষ্ণ শৌর্য্য-বীর্য্যশালী, 'দুঃখেষুঅনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষুবিগতস্পৃহঃ' এক স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষ, সত্য ও ধর্ম্মবক্তা আত্মবিদ্ রাজর্ষি। নন্দগোপালয়ে তিনি ব্রজবাসিদের স্নেহে নিত্য অভিসিক্ত, গোপেদের সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় স্নেহ সম্পর্ক, কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্যের আহ্বান এল, অক্রুরের সঙ্গে কংসের ধনুর্যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে মথুরায় চলে গেলেন, তাঁর বিরহ ব্যথা সহ্য করতে না পেরে নন্দ যশোদা, প্রাণপ্রিয় রাখাল সখাগণ শোকে কাতর হ'য়ে পড়লেন, কেউ কেউ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন কিন্তু কৃষ্ণকে আমরা দেখি অবিচলিত সংকল্পে অটুট ; কোন স্নেহের শৃঙ্খল তাঁকে বেঁধে রাখতে পারলো না ; সেই যে গেলেন আর ফিরেও আসেন নি, কিন্তু তাই বলে তাঁদের স্নেহ প্রীতির কথাও ভুলেন নি। কী অপূর্ব্ব অনাসক্তি! কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় প্রাণপ্রিয় ভাগিনেয় অভিমন্যুর মৃত্যুকালেও সেই একই অবিচল অবস্থা। আবার প্রভাসক্ষেত্রেও যখন যাদবরা, তাঁর মহাবীর পুত্ররা পরস্পর যুদ্ধে একে একে মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়ছেন, তখনও তাঁর সেই একই নির্বিকার প্রশান্তভাব, কোন ক্ষোভ নেই, কোন শোক নেই। ব্রহ্মভূত, প্রশান্তাত্মা স্থিতধী মহাত্মার মতই সে সময়ও তিনি সমস্ত কাজের দ্রষ্টা মাত্র! নিজের মহাপ্রয়াণকালেও নিজে যোগস্থ হ'য়ে ধীরে ধীরে দেহত্যাগ করলেন, জরাব্যাধ বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করেছিলো, তাকে তিনি করলেন আশীর্ব্বাদ!

কৃষ্ণচরিত্রে 'Intense activity with intense rest'!

গীতার প্রচ্ছদপটে আমরা যে একটি ছবি দেখতে পাই,—চারিদিকে শকুনী গৃধিনীর চিৎকার, যুদ্ধক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে আহত সৈন্যদের আর্ত্তনাদ, চারিদিকে মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা ; এই মহাবিভীষিকাময় পরিবেশে, রথের সামনে পাঁচনি হাতে দণ্ডায়মান সারথীবেশী কৃষ্ণের পদতলে গাণ্ডীব রেখে, অর্জ্জুন নতজানু ; কৃষ্ণের মুখে স্মিতহাসি! এই হ'ল কৃষ্ণচরিত্রের যথার্থ চিত্র! 'Intense activity with intense rest' নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মধারার মধ্যেও অনবচ্ছিন্ন শান্তি! গীতাতে অর্জ্জুনকে স্থিতপ্রজ্ঞ, গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ বলতে গিয়ে কৃষ্ণ বলেছিলেন—

(ক) দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে। (২, ৫৬)

(খ) যঃ সর্ব্বত্রাণভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (২, ৫৭)

(গ) উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যোন বিচাল্যতে
গুণাবর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে (১৪, ২৩)।

(ঘ) সম দুঃখ সুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীর স্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ (১৪, ২৪)

(ঙ) ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাঽহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ (১৪, ২৭)

—কৃষ্ণের জীবনে ঐ পাঁচটি গীতামন্ত্রের Practical demonstration দেখতে পাই ; দেখতে পাই তাঁর জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই সেই 'আপূর্য্যমানং অচল প্রতিষ্ঠং' সমুদ্রবৎ স্থির গম্ভীর ভাব। **এহেন বিশুদ্ধ চরিত্র, আপ্তপুরুষ কৃষ্ণ কোন-দিনই ভাগবতকারের বর্ণনানুযায়ী গোপীনিদের নিয়ে রাসলীলা ওরফে যৌনলীলা করেন নি, ঐই হ'ল আমার অভিমত।** আমি বরাবরই বলে আসছি, ভাগবত কাল্পনিক গ্রন্থ, ভাগবতকার কৃষ্ণচরিত্রকে দূষিতরূপে অঙ্কিত করেছে, কৃষ্ণের মহৎ চরিত্র অনুশীলন করার পরিবর্ত্তে যারা ভাগবতকেই চরমও পরমগ্রন্থ মনে করে মালা ঝোলাতিলক কৃষ্ণজপ ইত্যাদির মাহাত্ম্য প্রচার করে আসছে তারাই কৃষ্ণচরিত্রকে করেছে হীনপ্রভ। ভাগবত পড়ে আপামর জন-সাধারণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে আসছে কৃষ্ণ সত্য সত্যই রাসলীলা করেছিলেন, তাই দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরে কিন্তু সুদৃশ্য লক্ষ লক্ষ টাকার রাসমঞ্চের বাহার কত ! তাই তো ধনীর দুয়ারের গোড়ায় একমুষ্ঠি অন্নের জন্য যখন নিরাশ্রয় পথহারা খুঁকছে, প্রাসাদের অন্দরে রাসপূর্ণিমার সময় তখন (বৈষ্ণবদের ভাগবতীয়) কৃষ্ণচন্দ্রের শৃঙ্গারবেশের জন্যই খরচ হচ্ছে চল্লিশ হাজার !! যাত্রা, থিয়েটার আর পুতুল নাচের হৈ হুল্লোড় !!!

বিদেশী সত্য সন্ধানী জ্ঞানীগুণীরাও এই জন্য ভাগবত থেকে কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে ঐ রকম হীনধারণা পোষণ করেন, অথচ **ভাগবতের কৃষ্ণচরিত্র (বৈষ্ণবীয় রাসবিহারী নটবর কৃষ্ণ,) মহাভারতীয় কৃষ্ণচরিত্রের Caricature মাত্র !**

একটা Vile, grotesque representation of **শ্রীকৃষ্ণ** !!

ভাগবতের কৃষ্ণ, মহাভারতের কৃষ্ণের Caricature মাত্র !

গত বছর বিয়াসে (অমৃতসর) স্যার জন ডিউক নামে এক বিশিষ্ট, সংস্কৃতজ্ঞ, ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তিনি সদ্‌গুরু অন্বেষণে বিশেষ করে ভারতীয় সংস্কৃতি ভাল করে বুঝবার জন্য ভারতে এসেছিলেন। পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করে হরিদ্বার হৃষিকেশ ঘুরে আগ্রার দয়ালবাগে পুনরায় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। ধর্ম্মবিষয়ক নানাবিধ আলোচনা হ'তে হ'তে তিনি আমায় বললেন, "কৃষ্ণের অনেক গুণ ছিল বটে তবে গোপিনী ও কুব্জা প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্কের পরিচয় পাই তাতে তাঁর লাম্পট্যের ('Voluptuous and profligate character') পরিচয় পাওয়া যায়।" আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম "আপনি তো মথুরা বৃন্দাবনও ঘুরে এসেছেন, এ সম্বন্ধে কোন বৈষ্ণব সাধুকে জিজ্ঞেস করেন নি?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আলমোড়ার কৃষ্ণপ্রেমজী (ইউরোপীয়ান বৈষ্ণব সাধু) এবং অন্যান্য কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত বৈষ্ণবের সঙ্গে আলোচনা করেছি; তাঁরা কি সব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ('Spiritual, mystic interpretation') টেনে বুনে ('Insert') দিলেন তা আমার মনঃপূত হয়নি"। আমি তাঁকে বললাম, "মহাভারতের ভীষ্ম কর্ণ পঞ্চপাণ্ডব বিদুর প্রভৃতির চরিত্র আপনার কেমন লাগে?" "ওঃ, ওঁরা সবাই আদর্শ চরিত্র ('Ideal') ছিলেন। ভীষ্মের valour এবং পিতৃ ভক্তির তুলনা নেই! কর্ণার্জ্জুনের শৌর্য্যবীর্য্য, কর্ণের দানশীলতা unique! কিন্তু সবচেয়ে ভাললাগে যুধিষ্ঠিরকে। এমন সত্যনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় ধাম্মিক রাজা ভারতবর্ষে ছিলেন, এ ভাবলেও আনন্দ হয়'। সাহেবের ঐ কথা শুনে বললাম, "যাঁদের আপনি এত প্রশংসা করলেন তাঁরা সকলেই কৃষ্ণকে শ্রদ্ধা করতেন। বিশেষ করে অর্জ্জুন যুধিষ্ঠির তো কৃষ্ণগত প্রাণ ছিলেন, তাঁর আজ্ঞাবহ দাসের মত থাকতেন। তাহলেই ভেবে দেখুন কৃষ্ণ কত বড় মহান্ ছিলেন! যাঁদের চরিত্র আপনার কাছে মহত্তম বলে মনে হয়েছে, সেই মহত্তমদেরও যিনি শ্রদ্ধার পাত্র তিনি কখনও কলুষিত চরিত্রের হতে পারেন না। ভাগবত থেকে আপনি কৃষ্ণ-চরিত্র সম্বন্ধে idea করতে গেছেন বলেই যত অনর্থ হয়েছে। Bhagbat is fictitious book! বেদব্যাসের নাম দিয়ে এক বিশেষ সম্প্রদায় ভাগবতকে

মানলেও ভাগবত কোন প্রামাণিক গ্রন্থ নয়। মহাভারতে দেখুন, সভাপর্বে সমবেত রাজন্যবর্গের মধ্যে জ্ঞানে, গুণে, শৌর্য্যে, বির্য্যে, মহত্বে, তপঃশক্তি এবং প্রজ্ঞায় কৃষ্ণ তৎকালীন ভারতবর্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন বলেই তাঁকেই সর্বপ্রথম পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে বরণ করবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন—

ততো ভীষ্মঃ শান্তনবো বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য বীর্য্যবান্
বার্ষ্ণেয়ং মন্যতে কৃষ্ণং অর্হনীয়তমং ভুবি ॥২৭
এষ হ্যেষা সমস্তানাং তেজোবল পরাক্রমৈঃ
মধ্যে তপন্নিবাভাতি জ্যোতিষামিব ভাস্করঃ ॥২৮

[মহা, সভাপর্ব, কৃষ্ণার্ঘ্যদানে ষট ত্রিংশ অধ্যায়]

ভেবে দেখুন কৃষ্ণ যদি দূষিত চরিত্রের ('Voluptuous etc') হ'তেন, বৈষ্ণবদের ধারণানুযায়ী, ভাগবতের বর্ণনানুযায়ী গোপিনী বা কুব্জাবেশ্যা নিয়ে কোনরকম লীলা খেলা করতেন তাহলে কি আবাল্য ব্রহ্মচারী, সত্যধর্ম্মন্যায়পরায়ণ ভীষ্ম কি তাঁকে সকলেরই বরেণ্য বলে বর্ণনা করতেন?" সাহেব আমার কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করেছিলেন। সত্যসন্ধানী বিদেশীরা এইভাবে বিভ্রান্ত হ'ন। আমাদের দেশেও ভাগবত পড়ে এবং প্রভুপাদদের প্রচারের ঢক্কানিনাদে বিভ্রান্ত হয়ে সকলেই কৃষ্ণের রাসলীলাদি কাণ্ড কারখানাকে ধ্রুব সত্য বলে মনে করে থাকেন। অথচ এসব একেবারেই মিথ্যা।

রাজসূয়যজ্ঞের প্রারম্ভে ঐ ভীষ্ম শিশুপালের অভিযোগের প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে কৃষ্ণচরিত্রের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, তা অনুধাবন করলেই বুঝতে পারবেন, কৃষ্ণের নামে রাসলীলাদির সরস আখ্যা যারা রটনা করেছে, তারা কতখানি দুরপনেয় কলঙ্ক কালিমা এই লোকপূজ্য চরিত্রে লেপন করেছে।— ভীষ্ম বলছেন,

"বেদবেদাঙ্গ বিজ্ঞানং বলঞ্চাপ্যধিকং তথা,
নৃনাং লোকে হি কোঽন্যোঽস্তি বিশিষ্টঃ কেশবাদৃতে? ১৯।
দানং দাক্ষ্যং শ্রুতং শৌর্য্যং হ্রীঃ কীর্ত্তিবুদ্ধিরুত্তমা
সন্ততিঃ শ্রীধৃতিস্তুষ্টিঃ পুষ্টিশ্চ নিয়তাচ্যুতে। ২০।
তমিমং লোকসম্পন্নমাচার্য্যং পিতরং গুরুং
অর্ঘমর্চ্চিতমর্চ্চার্হং সর্ব্বে সংক্ষন্তুমর্হথ [মহাভারত, সভাপর্ব]

মহাভারতে কৃষ্ণচরিত্রে মহিমা-মনীষা-তপঃশক্তি

কাজেই যিনি বেদবিজ্ঞান-বলসম্পন্ন, দানদাক্ষিণ্য শাস্ত্রজ্ঞান, লজ্জা, শৌর্য্য, কীর্ত্তি, উত্তমাবুদ্ধি, বিনতি, শ্রী, ধৃতি, তুষ্টি ও পুষ্টি প্রভৃতি গুণ যার মধ্যে নিত্য প্রতিষ্ঠিত তিনি কি কখনও ভাগবাতকারের বর্ণিত লীলা খেলা করতে পারেন? আর যদি বলেন, 'রাসলীলা তাঁর অপ্রাকৃত চিন্ময় লীলা, ওতে দোষ দেখছেন কেন'? তাহলে জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ ভীষ্ম নিশ্চয়ই বলতেন, 'এই নরাকৃতি পরব্রহ্মের বিশেষ গুণের মধ্যে ইনি প্রেমিকা গোপিনীদের সঙ্গে অপ্রাকৃত চিন্ময় লীলা কবতেও সমর্থ'! কিন্তু কৈ তিনি ত তাঁর 'অপ্রাকৃত চিন্ময় লীলার' কোন উল্লেখ করছেন না?

অশ্বত্থামার অস্ত্রপ্রভাবে উত্তরা যখন মৃত পুত্র প্রসব করেন, উত্তরার কাতর ক্রন্দনে এবং প্রার্থনায় বিচলিত হ'য়ে কৃষ্ণ অভিমন্যু-পুত্রকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। এই দিব্য যোগৈশ্বর্য্য যাঁর, তাঁর কখনও পরস্ত্রীগমন বা বেশ্যা সঙ্গম দোষ থাকতে পারে না। অভিমন্যুর পুত্রকে পুনরুজ্জীবিত করার সময় কৃষ্ণ সত্যধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন—

> ন ব্রবীম্যুত্তরে মিথ্যা সত্যমেতদ্ভবিষ্যতি
> এষ সঞ্জীবয়াম্যেনং পশ্যতাং সর্ব্বদেহিনাম্। ১৮।
>
> নোক্তপূর্ব্বং ময়া মিথ্যা স্বৈরেষপি কদাচন,
> ন চ যুদ্ধাৎ পরাবৃত্তস্তথা সঞ্জীবতাময়ম্। ১৯।
>
> যথা সত্যঞ্চ ধর্ম্মশ্চ ময়ি নিত্যং প্রতিষ্ঠিতৌ,
> তথা মৃতঃ শিশুরয়ং জীবিতাদভিমন্যুজঃ। ২২

[মহা. অশ্বমেধ পর্ব, ৬৩ অধ্যায়]

'হে উত্তরে, আমি কখনও মিথ্যা বলি নি, সুতরাং আমার বচন অবশ্যই সত্য হবে। আজ সব দেহধারী দেখুক, আমি এই বালককে জীবিত করছি। যদি আমি কখনও হাস্য পরিহাসেও মিথ্যা না বলে থাকি, যদি যুদ্ধে কখনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে থাকি, তাহলে এই বালককে জীবিত করতেও পশ্চাৎপদ হবো না। যদি সত্য ও ধর্ম্ম আমার মধ্যে নিত্যই প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে এর প্রভাবে এই অভিমন্যুর মৃতপুত্র জীবিত হয়ে উঠুক'। আর সত্য সত্যই মৃতপুত্র জীবিত হয়েছিল। তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, যদি কৃষ্ণ রাসলীলাদির মত ব্যভিচার

করতেন, তাহলে তাঁর শপথ অনুযায়ী সত্য ও ধর্ম্মের অমোঘ প্রভাব প্রকাশ পেতো না। বেশ্যাসঙ্গমকারী কলুষিত চরিত্র ব্যক্তির আবার সত্য ও ধর্ম্ম কোথায়? কাজেই আমার সিদ্ধান্ত, ভাগবতে রাসলীলা, কুব্জাঘটিত ব্যাপারাদি একেবারেই মিথ্যা, ভাগবত শাস্ত্রও মিথ্যা। আরও ভেবে দেখুন আপনারা, যদি সত্য সত্যই কৃষ্ণ গোপিনীদেরকে নিয়ে ঐ সব লীলা খেলা করতেন তাহলে তা ভাগবতকার এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের 'অপ্রাকৃত' কর্ণকুহরে ঐ 'চিন্ময় বার্ত্তা' 'অপ্রাকৃত' Telegraphic message এ পৌঁছবার পূর্বেই কৃষ্ণবিদ্বেষী শিশুপালের কানেও পৌঁছতো এবং সভামধ্যে তিনি কৃষ্ণনিন্দাকালে কৃষ্ণের বাল্যাবস্থা থেকে সে পর্য্যন্ত যা যা ঘটনা ঘটেছিল, সেই শকট ভঞ্জন, যমলার্জ্জুন ভঙ্গ, তৃণাবর্ত্ত বধ, ননী মাখন চুরি, গোচারণ, মাতুলহত্যা, জরাসন্ধের ভয়ে দ্বারকায় পলায়ন, রুক্মিণী হরণাদি সব কিছুরই উল্লেখ করে তিনি তীব্র নিন্দা করেছিলেন; কিন্তু তুমি 'লম্পট ও ব্যভিচারী, পরস্ত্রীগমনকারী গোপিনীদের সঙ্গে আসক্ত'— এধরণের কথা আদৌ বলেন নি। ঐ সব দোষ কৃষ্ণের থাকলে বা বৈষ্ণবপ্রভুদের মতে ওটি যতই 'অপ্রাকৃত ব্রজলীলা' হোক না কেন, ছিদ্রান্বেষী কৃষ্ণ নিন্দুক শিশুপাল ঐ সব কাণ্ডের একটিবার অন্ততঃ উল্লেখ না করে ছাড়তেন না! কাজেই মহাভারতে কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সব কথা নেই, শিশুপালের মত কৃষ্ণ বিদ্বেষীও যে বিষয়ের মিথ্যা কলঙ্ক কৃষ্ণচরিত্রে দেন নি, সেই বস্ত্রহরণ ব্রজলীলা কুব্জাগমনাদি ব্যাপার সমস্তই মিথ্যা। এটি 'মহাপ্রসাদসেবী', 'তুলসীরাণী'র ভক্ত বৈষ্ণব-বাবাজীদের উর্ব্বর মস্তিষ্কের কৃষ্ণ বিষয়ে কৃষ্ণ-অবদান!!

তবুও যদি আপনারা ভাগবত বর্ণনাকে সত্য বলে মনে করেন, তাহলে ভাগবতে রাসলীলাদির ব্যাপারের যা বর্ণনা আছে, তাকে কামচর্চ্চা যৌনক্রিয়া ছাড়া কিছুই বলা যায় না। এবং মহাভারতের সত্যনিষ্ঠ রাজর্ষি কৃষ্ণ যা করেন নি, ঐ ভাগবতের কৃষ্ণ যদি বৈষ্ণবদের মতে তা করে থাকেন, তাহলে ঐ বৈষ্ণবদের কৃষ্ণ ব্যভিচারীই ছিলেন, একথা বলতেই হবে।

আপনি ভাগবতের ঐ quotation টি দিয়ে যে বলতে চাচ্ছেন, যেহেতু ভাগবত বলেছে, রাসলীলা শুনলে কাম দূরে যাবে, তার উত্তরে আমি ঐ ভাগবত থেকেই দেখাচ্ছি দেখ, **রাসলীলা শ্রবণে বা কৃষ্ণ গুণগাঁথা বর্ণনে কাম জয় তো দূরের কথা, কৃষ্ণকে স্বশরীরে দেখেও কামই জাগতো, 'অধিরূঢ়ে**

কামরূপ মানসিক পাড়া' দূর হতো না।

দশমস্কন্ধের একুশ অধ্যায়ে ভাগবতকার বর্ণনা দিচ্ছে,

(১) তদ্ ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ম্,
কাশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোঽন্ববর্ণয়ন্
তদ্বর্ণয়িতুমারব্ধাঃ স্মরন্ত্যঃ কৃষ্ণচেষ্টিতম্,
নাশকং স্মরবেগেন বিক্ষিপ্ত মনসো নৃপ' (২১, ৩-৪)।

ভাগবত শ্রবণে 'কাম যায় না, কামাগ্নি বৃদ্ধি পায়'!

'অর্থাৎ কৃষ্ণের বাঁশীর সেই গান শুনে গোপীদের 'স্মরোদয়ম্' অর্থাৎ কামের উদ্রেক হ'ল। তাতে কেউ কেউ পরোক্ষে আপন সখাদের কাছে তাঁর গুণ বর্ণনা করতে লাগলো। কিন্তু বর্ণন করতে গিয়ে তাঁব চরিত্র স্মরণ হওয়াতে [কামরূপ মানসিক পীড়া অবিলম্বে দূর হওয়ার পরিবর্তে !!!] কন্দর্পের আবেগে, কামজ্বালায় তাদের চিত্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। অতএব তাদের চেষ্টা ফলবতী হলো না !!

(২) দশমস্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ে, গোপিনীবা স্পষ্টভাবেই কৃষ্ণকে খোলাখুলি ভাবেই বলছে।

"সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ,
হাসাবলোক কলগীত জহৃচ্ছয়াগ্নিম্।৩৫।

তোমার হাস্যময় দৃষ্টি এবং মধুর গানে যে কামাগ্নি উৎপন্ন হয়েছে, তুমি তোমার অধর সুধাধারায় তাহা সিঞ্চন কব"। কৈ এখানেও তো 'কামাগ্নি' নিভে যাওয়ার কথা নেই? সাক্ষাৎ "নরাকৃতি পরব্রহ্ম"কে দর্শন করেও তো গোপনীদের কামজ্বালা দূরে যাচ্ছে না! গোপিনীদের এই কথা শুনে, ভাগবতকারেব মতে কৃষ্ণও,

"বাহুপ্রসার পরিরম্ভকরালকোরু—
নীবিস্তনালভনর্নর্মনখাগ্র পাতৈঃ।
ক্ষ্বেল্যাবলোক হসিতৈ ব্রজসুন্দরীনা—"
—মুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার (ভাগ ২৯, ৪৬)

ঐ শ্লোকের বাংলা অনুবাদ করলে অশ্লীলতা দোষ ঘটবে। ঐ রকম বহু বর্ণনা, ভাগবতকার দিয়েছে। আধুনিক অতিন্যক্কারজনক Sexologyর বই গুলিতেও ঐ রকম বর্ণনা কমই থাকে !!

(৩) ঐ ভাগবতকারই আবার লিখেছে, কৃষ্ণের সঙ্গে গোপিনীদের এই নর্ম্মলীলা দেখে,

"কৃষ্ণ বিক্রীড়িতং বীক্ষ্য মুমুহুঃ খেচরস্ত্রিয়ঃ
কামার্দ্দিতাঃ শশাঙ্কশ্চ সগনো বিস্মিতোঽভবৎ"।

(ভাগ, ১০, ৩৩, ১৮)

'শ্রীকৃষ্ণের গোপিনীগণ সহ বিহার ও সম্ভোগলীলা দর্শনেখেচর-কামিনীরা **কামশরে পীড়িত** হ'তে লাগলো'! কৈ রাসলীলা যদি যৌন লীলাই না হবে, কিংবা ঐ রাসলীলা শুনলে বা বর্ণনা করলেই যদি 'কামপীড়া অবিলম্বে চলে যাবে,' তাহলে গোপিনীদের এবং খেচরকামিনীদের অত excitement কেন হ'চ্ছে? কেন তারা কামশরে জরজর?

কাজেই আপ্তপুরুষ কৃষ্ণ ঐ রকম কোন লীলা করেন নি, হয় এ কথা বিশ্বাস কর, নতুবা ভাগবতের বর্ণনাকে সত্য মানলে ওসব যৌনলীলাই বলতে হবে।

প্রশ্ন :—ভাগবতে যে গোপীভাব প্রধান গোপিকাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা দেখতে পাই তা কত প্রাচীন? মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত মধুরভাবের সাধনার ধারা তো আমরা গীতগোবিন্দরচয়িতা জয়দেব এবং বিদ্যাপতির মধ্যেও দেখতে পাই। অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় কি মহাপ্রভুর এই ধারা মানেন? মহাভারতে যদি রাসলীলাদি ঘটনা নাই থাকে তাহলে রাধা এবং গোপিনীদের কল্পনা কোথা থেকে এল? প্রাক্‌চৈতন্য যুগে বাংলাদেশে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রকে উপজীব্য করেছিলেন কিনা বৈষ্ণবরা?

উত্তর :— ভারতের প্রধান চারিটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়, শ্রী, মাধ্ব, রুদ্র এবং চতুঃসন বা সনক সম্প্রদায়ের মধ্যে গৌড়ীয়দের মত এমন মধুরভাবের গোপীপ্রেমের কোন কামময় তরল উচ্ছ্বাস নেই। নিম্বার্ক এবং বিষ্ণু স্বামীর প্রবর্ত্তিত মতবাদে আংশিকভাবে রাধাকৃষ্ণ সেবা ও মধুরভাব স্বীকৃত হলেও তাঁদের মধ্যেও সখী অনুগত হয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করবার কথা নেই। **মাধ্বমতে তো রাস-পঞ্চাধ্যায় একেবারে অচল**। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মনে করেন যে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই গোপীভাবসাধনার প্রচলন ছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না ["বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম্ম"]।

আপনি জয়দেব এবং বিদ্যাপতির নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সর্ব্ব সাধারণের প্রচলিত ধারনানুযায়ী **কবি জয়দেব 'বৈষ্ণব' ছিলেন না,** তিনি পঞ্চোপাসক স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন ["বাঙ্গালীর ইতিহাস"—ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়]। বিদ্যাপতিও স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসক ছিলেন ["মহাকবি বিদ্যাপতির কীর্ত্তিলতা"—পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী] গীতগোবিন্দ রচয়িতা জয়দেব এবং বিদ্যাপতি উভয়েই কৃষ্ণ বিষয়ে অনেক রাগাত্মিকা কবিতা লিখেছেন বটে কিন্তু তবুও তাতে "পরকীয়া প্রেমে হয় রসের উল্লাস"—এই ধরণের 'অপ্রাকৃত' তত্ত্ব প্রকাশ করেন নি। জয়দেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রাণ ভাগবত-পুরাণকে অনুসরণ ক:রন নি। ভাগবত-পুরাণে শারদীয় রাসের বর্ণনা আছে, কিন্তু জয়দেব বসন্তকালীন রাসলীলা বর্ণনা করেছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ অবলম্বনে তিনি বর্ণনা করেছেন, নন্দের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমতী রাধিকা যখন শ্রীকৃষ্ণকে গৃহে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন উভয়ের মিলন হয় !

প্রাক্‌চৈতন্য যুগে বৈষ্ণবধর্ম্মের রূপ

হালসপ্তশতীতে ঐ 'শ্রীমতীর' উল্লেখ দেখতে পাই। ডাঃ নীহার রঞ্জন রায় মনে করেন, **শাক্ত ধর্ম্মের প্রভাব বশতঃ সেন পর্ব্বের কোন সময়ে ক.ষ্ণের শক্তি হিসেবে "রাধা"র কল্পনা এসেছে।** ভোজবর্ম্মার বেলাব শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে কৃষ্ণকে "গোপীশত কেলিকার" বলে একশত গোপিনীর সঙ্গে তাঁর বিচিত্র প্রেমলীলার বর্ণনা আছে। এই বেলাব শিলালেখেও কিন্তু রাধাকে দেখতে পাওয়া যায় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের হাতে পড়ে এই রাধাই, "হ্লাদিনী যা মহাশক্তি সর্ব্বশক্তি বরীয়সী", "সর্ব্ব গোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা" [উজ্জলনীলমণি, রাধাপ্রকরণ, ৩, ৪, শ্রীরূপ গোস্বামী] রূপে দেখা দিল। রাধা প্রেমই হয়ে গেল এঁদের কাছে সর্ব্ব সাধ্য সার" ! এই রাধা ভাবের প্রাবল্যে সম্প্রদায়ীদের কল্পনা প্রভাবে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে প্রচার করা হয়েছে—

(১) "রাধার বরণে অঙ্গ গৌরাঙ্গ হইয়া
রাধিকার ভাবরস অন্তরে ধরিয়া" [চৈ, ম, আদিখণ্ড]

(২) রায় রামানন্দ চৈতন্যকে স্পর্শ করতে গেলে তিনি নাকি বলেছিলেন (!)

"গৌর-অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন
গোপেন্দ্র সুত বিনা তি"হো না স্পর্শে অন্যজন" (চৈতন্য চরিতামৃত)

চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে এই বাংলাদেশেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের রূপ কিরকম ছিল তা আমরা মালাধর বসুর রচিত "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" থেকে জানতে পারি। প্রাক চৈতন্য যুগে যে সকল কৃষ্ণ-চরিত্র লেখা হয়েছে, তার মধ্যে, এই গ্রন্থই প্রথম ও প্রাচীন [মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়—অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত ভূমিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়]। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে গোপিনীদের কথা থাকলেও **শ্রীমতী রাধিকাকে দেখা যায় না** "অপ্রাকৃত ব্রজলীলা"র শৃঙ্গার তত্ত্বের ধারা প্রাকচৈতন্য যুগে আভাষ মাত্ররূপে ছিলো। প্রাক্‌চৈতন্যযুগেও বাংলাদেশে মহাভারতীয় কৃষ্ণচরিত্রে অনেক deviation, কল্পনার রঙিন চিত্র মিশিয়ে অতিরঞ্জন ও পরিবর্দ্ধন সুরু হলেও তথাপিও **শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য, বিভূতি এবং ভগবত্তা প্রমাণই ছিল তৎকালীন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ধারা।**

ধোয়ী, জয়দেব, উমাপতি ধর, শ্রীধর প্রভৃতি কবিগণ লক্ষনসেনের সভাকবি ছিলেন। এঁরা রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা বিষয়ে অনেক কবিতা রচনা করে গেছেন। পূর্ব্বকালে রাজারাজড়াদের একান্ত বশম্বদ পরিষদবর্গ এবং সভাকবিরা রাজার স্তুতিচ্ছলে অনেক কবিতা লিখতেন। লক্ষন সেনের অনুগ্রহপুষ্ট সভা কবিরাও রাজার মনোরঞ্জনের জন্য তাঁকে "গোপবধূবীট" কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করে অনেক কাব্য রচনা করেন। ডাঃ নীহার রঞ্জন রায় মনে করেন তৎকালীন ভোগবিলাসব্যসনে মত্ত অভিজাত সমাজের চটুলচিত্র, শৃঙ্গার রস এবং ভাব-তারল্যের ফেণাল উচ্ছ্বাস ঐ সব কবিদের কাব্যে পাওয়া যায়; কাব্য সাহিত্যে এই যুগ মন্মথ ভট্টের রস তত্ত্বের যুগ, রসই এই যুগে কাব্যের প্রধান গুণ ছিল, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে যত কাব্য, সাহিত্য, রচিত হয়েছিল, এই সময় তাতে ঐ সব শৃঙ্গাররস সমন্বিত তরল ভাবোচ্ছ্বাস দেখতে পাওয়া যায়। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনেও এই প্রাকৃত কামকলার চিত্র দেখি; কৃষ্ণ এখানে আপন বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যের দ্বারা নায়িকা রাধিকাকে বারবার প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করেছেন।

ঐ সমস্তেরই প্রভাব খুব বেশী পরিমাণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের গোপীভাব প্রধান সাধনার ধারাকে প্রভাবিত করেছে। রাধাতন্ত্র, বিষ্ণুযামল প্রভৃতি তন্ত্র গ্রন্থেরও প্রভাব কম নেই। শ্রীধর স্বামীর ভাগবতের টীকা এবং প্রাক্‌চৈতন্যযুগে যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, সেই সময়ের কবিদের কৃষ্ণবিষয়ে নানা কবিতার নানা বিষয়বস্তুর ছায়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে দেখা যায়। সুফী ধর্ম্ম, মহাযান, সহজযান,

[গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে বামাচারী তন্ত্রমতের প্রভাব]

বজ্রযান প্রভৃতি বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রভাবও আছে। ডাঃ সুশীল কুমার দের Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal' নামক মূল্যবান গবেষণা মূলক গ্রন্থটি পড়লে বুঝতে পারবে, মহাযান এবং সহজযান বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ অবস্থায় বাংলাদেশে যে সকল আচার আচরণ প্রচলিত ছিল, সেগুলিকেও পরমার্থ লাভের সোপানরূপে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে (অন্ততঃ অংশতঃ) এই গৌড়িয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে **বামাচারী তন্ত্রমত, সহজিয়া এবং নাথ ধর্ম্মেরও প্রচুর প্রভাব এর উপর রয়েছে।**

প্রশ্নঃ— (সন্তদাস নলিনীকান্ত) শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁর রচিত 'প্রমেয় রত্নাবলীতে' গৌড়ীয়মত সংক্ষেপে বলছেন—

> 'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয় স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
> রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা।
> শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমলং প্রেমাপুমর্থো মহান্
> শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো ন পরঃ।'

চৈতন্যচরিতামৃতেও আছে, 'পরকীয়া প্রেমে হয় রসের উল্লাস', মধুর ভাব বিশেষ করে রাধাপ্রেম 'সাধ্য শিরোমণি'; আর আপনি ভাগবত মানছেন না, রাসলীলা মানছেন না, এ কেমন কথা?

উত্তর ঃ—যে কোন সম্প্রদায় তাঁদের সম্প্রদায় সিদ্ধির জন্য 'পরকীয়া প্রেম' আর 'পরদারগমনকে' শ্রেষ্ঠ রসের উল্লাস বলে উল্লসিত হ'তে পারেন, যে কোন গ্রন্থ বিশেষকে মাথায় তুলে নাচতে পারেন কিন্তু তাই বলে তা প্রামাণ্য, বরেণ্য এবং সর্বজনগ্রাহ্য হ'বে এ আশা আপনি করেন কি করে? আমি তো পূর্ব্বেই মহাভারতাদি থেকে প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছি, ভাগবত বেদব্যাসের লেখা নয়, সম্পূর্ণ কল্পিত, কাজেই তাতে রাসলীলা বস্ত্রহরণাদি ঘটনা যা মহান্ কৃষ্ণচরিত্রকে কালিমালিপ্ত করেছে এবং তারই অনুসরণ করে বালবিধবা, কুমারী ও কিশোর বালকদের সামনে ভাগবত-পাঠ কথকতার মাধ্যমে, নানারকম যৌন ভাবোদ্দীপক হাবভাব রঙ্গরসের ব্যাখ্যা করে, তাদের এবং বাবাজীদের সংযমহীন অবশীকৃত কাঁচামনে নানারকম চাঞ্চল্য এনে দেওয়ায় হরিভজনের পরিবর্ত্তে নেড়ানেড়ীর ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় আজ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অবস্থা

'মজালে কনকলঙ্কা, মজিলে আপনি' !!

বৈষ্ণব প্রভুপাদদের মতে, ব্রজবধূদের উপাসনাই যদি শ্রেষ্ঠ উপাসনা, গোপিনীরাই যদি রমনীকুলরত্ন এবং কৃষ্ণের রাসবিহারীরূপই যদি আরাধ্য হয় এবং তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নিই, কৃষ্ণ ব্রজধামে কৈশোরে ঐ সব অপ্রাকৃত লীলা করেছিলেন, তাহলে সেই কৃষ্ণ পরবর্ত্তীকালে কোথাও কোনখানে অর্জ্জুনকে বা অন্য কাউকে উপদেশদানকালে 'ব্রজবধূরাই শ্রেষ্ঠ, ব্রজলীলা রাসলীলাই শ্রেষ্ঠলীলা শ্রেষ্ঠভাব', এসব কথা বলেন নি কেন? গীতাতে প্রাণপ্রিয় সখা শিষ্য এবং ভক্তচূড়ামণি অর্জ্জুনকেই বা তিনি, পরকীয়া প্রেমই যে তাঁকে বুঝবার জানবার একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়, তা বলেন নি কেন?

ভাগবতই যদি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হবে, তাহলে গীতার দশম অধ্যায়ে ব্রহ্মভাবে তাঁর বিভূতি বর্ণনাকালে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, 'বেদানাং সামবেদোঽস্মি', 'অধ্যাত্ম-বিদ্যা বিদ্যানাং' 'বৃহৎসাম তথা সাম্নাং', 'গায়ত্রীচ্ছন্দসাহম্' ইত্যাদির নাম করেছেন, ভাগবতের নামগন্ধ করেন নি কেন?

অর্জ্জুন যখন কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করলেন, 'তুমি যে যে বিভূতির দ্বারা সর্ব্বলোক ব্যেপে রয়েছ, তোমার সেই দিব্যবিভূতি সকল দয়া করে বল', তখন কৃষ্ণ তাঁর অপার বিভূতির বর্ণনা দিতে গিয়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সব বস্তুর নাম করলেন কিন্তু 'অপ্রাকৃত ধাম বৃন্দাবন' 'পরকীয়ারস' 'গোপিনীপ্রেম' আর তাঁর 'রাসবিহারী রূপই যে শ্রেষ্ঠরূপ' তার উল্লেখ করেন নি কেন? অর্জ্জুন যখন প্রার্থনা করলেন, 'কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া' [গীতা ১০. ১৭] 'হে ভগবন্! আমি তোমাকে কোন্ কোন্ পদার্থে চিন্তা করিব বলিয়া দাও', তখন তিনি সেই প্রাণপ্রিয় অভিন্নহৃদয় ভক্তকে রাসলীলা বা ব্রজভাবের কোন কথা, কোন আভাসই দিলেন না কেন? বরং তিনি স্বরূপ দৃষ্টিতে তাঁর ব্রহ্মভাবের কথাই বললেন

'অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ
অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ'

[গীতা ১০, ২০]

অর্থাৎ 'হে গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতের হৃদয় স্থিত আনন্দঘন চৈতন্যস্বরূপ আমিই সর্বভূতের উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশস্বরূপ'।

নারীজাতির মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ বিভূতি বিলাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে ধর্ম্মের সপ্তপত্নীর নাম করে বলছেন, 'কীর্ত্তি শ্রী বাক স্মৃতি মেধা ধৃতিঃক্ষমা, আমি নারীগণের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি এবং ক্ষমা' [গীতা১০, ৩৪]।

শঙ্করাচার্য্যের মত বাদ দিলেও বৈষ্ণবপ্রভুদের মান্য শ্রীধরস্বামী ঐ শ্লোকের টীকা করতে গিয়ে বলছেন, 'যাসামাভাসমাত্র যোগেন প্রাণিনঃ শ্লাঘ্যা ভবন্তি তাঃ কীর্ত্ত্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়োমদ্বিভূতয়ঃ'।

কৈ এখানে ত কৃষ্ণ 'নারীকুলের মধ্যে আমি রাধিকা চন্দ্রাবলী বৃন্দা অনঙ্গমঞ্জরি' ইত্যাদি গোপিনীদের নাম করলেন না?

শ্রীকৃষ্ণ নিজের পরিচয় দিয়েছেন 'বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি,' 'গোপিকাবল্লভ' নয়!

নন্দগৃহে শ্রীকৃষ্ণ, রাখালসঙ্গে গোচারণরত শ্রীকৃষ্ণ, ভাগবতমতে বৈষ্ণবমতে গোপিনীদের সঙ্গে রাসলীলারত শ্রীকৃষ্ণ, কংসকেশীনিসূদন শ্রীকৃষ্ণ, দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রের গীতার প্রবক্তা রাষ্ট্রনীতিকুশল যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ,—ইত্যাদি কৃষ্ণ-জীবনের বহুবিধ aspect এর মধ্যে, কৃষ্ণ তাঁর জীবনের যে অংশে সামগ্রিক ভাবে তাঁর শ্রেষ্ঠভাব প্রকাশ পেয়েছে, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে অর্জ্জুনকে বলছেন **'বৃষ্ণীণাং বাসুদেবঽস্মি'**।

পুরাণপ্রিয় বৈষ্ণবদের মান্য পুরানেই বাসুদেব অর্থে 'পরব্রহ্ম' বলা হয়েছে,

(১) বাস সর্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু।
তস্য দেব পরং ব্রহ্ম বাসুদেব ইতীরিতঃ। [ব্রহ্মবৈবর্ত্ত কৃষ্ণজন্মখণ্ড-৮৭ অঃ]

(২) সর্বানি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমাত্মনি।
ভূতেষপি চ সর্ব্বাত্মা বাসুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ। [বিষ্ণু, ৬, ৬)

(৩) মহাভারতও বাসুদেবের বুৎপত্তিগত অর্থ পরব্রহ্মবাচক করেছে—

ছাদয়ামি জগৎ বিশ্বং ভূত্বা সূর্য্য ইবাংশুভিঃ।
সর্ব্বভূতাদিবাসশ্চ বাসুদেবস্ততোহম্। (১২, ৩৪১, ৪১)

শুধু তাই নয়, এই বাসুদেব অর্থাৎ পরব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠজ্ঞান এবং শ্রেষ্ঠ ভক্ত জ্ঞানীরাই যে এই তত্ত্ব বুঝতে পারেন, এ সম্বন্ধে গীতার সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,

বহুনাং জন্মনাং অন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ'। (৭, ১৯)

'বহুজন্মের পরে শ্রেষ্ঠভক্ত জ্ঞানীগণ সমস্ত জগৎই বাসুদেবরূপ, এই অখণ্ডবোধ অভেদ দর্শন করেন, সুতরাং তাদৃশ মহাত্মা সুদুর্ল্লভ'।

এখানেও শ্রীকৃষ্ণ, 'যে গোপিনীরা আমার সঙ্গে রাসলীলা করেছিল, সেরূপ গোপিনীরা সুদুর্ল্লভ কিংবা সেই রাসভাবই সুদুর্ল্লভ শ্রেষ্ঠভাব'—এ কথাতো কৈ বললেন না ?

শঙ্করাচার্য্য ঐ বাসুদেবের অর্থ করেছেন, "বাসুদেবং প্রত্যগাত্মানং" [ঐ শ্লোকের শঙ্কর ভাষ্য], 'বাসুদেবং রাসলীলারতং কৃষ্ণং' নয় !! শ্রীধর স্বামীও ঐ শ্লোকের [৭. ১৯.] টীকায় বলেছেন, "বহুণাং জন্মনাং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্যোপচয়েনান্তে চরমে জন্মনি জ্ঞানবান্ সন্ সর্ব্বমিদং চরাচরং বাসুদেব এবেতি সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা মাং প্রপদ্যতে ভজতি। অতঃ সমহাত্মাঽপরিচ্ছিন্নদৃষ্টিঃ সুদুর্ল্লভঃ"।

কৈ এখানেও ত শ্রীধরস্বামী অভেদ ব্রহ্মদর্শন অর্থাৎ সর্ব্ববস্তুতে অপরিচ্ছিন্ন পরব্রহ্মবোধের অখণ্ডানুভূতিকেই সুদুর্ল্লভ বলেছেন ; 'রাসবিহারীমূর্ত্তি, রাসলীলা কিংবা বহু বহু জন্মের শেষে জ্ঞানের সুপরিপক্ক অবস্থায় গোপীভাব জন্মে, পরকীয়া-ভাবে রসের উল্লাস test করবার জন্য কৃষ্ণের সঙ্গে রাসবিহার করবার সুদুর্ল্লভ সুযোগ আসে', একথা তো বলেছেন না ?

পরব্রহ্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে কৃষ্ণ বলেছেন, 'বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি', কিন্তু কোনাস্থানেই 'আমি গোপবংশের কানাই', 'রাধিকা চন্দ্রাবলির' রাসবিহারী,' কিংবা 'গোপাঙ্গনবল্লভ' বলে পরিচয় দেন নি !

কাজেই সন্তদাসজী ! আপনি 'প্রমেয়রত্নাবলীর' ঐ শ্লোকটি উদ্ধৃত করে যা বলতে চাইছেন তা সাম্প্রদায়িক প্রচার মাত্র।

তৃতীয় পুষ্প

প্রশ্ন :—আমি সর্ব্ববিদ্যার বংশধর। মেহার কালী বাড়ীর কথা কে না শুনেছে। কামরূপের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিকাচার্য্য পূর্ণানন্দের কাছে আমি পূর্ণাভিষিক্ত। এই তন্ত্রমতকে আমরা জাগ্রত মত বলে মনে করি। আপনার মত-অনুযায়ী মূর্ত্তি-পূজাই যদি মিথ্যা হবে, তাহলে যে আমাদের একান্ন পীঠস্থান, দশমহাবিদ্যার বিভিন্ন মূর্ত্তি আছে এগুলিকে একেবারে মিথ্যা বলতে চান? তন্ত্র পড়লে বুঝতে পারবেন, তাতে যে পূজার বিধান আছে, তা অত্যন্ত জাগ্রত, প্রত্যক্ষ ফলদায়ী। আর হবে নাই বা কেন? এই তন্ত্র সাক্ষাৎ মহাদেবের শ্রীমুখের বাণী। কৈলাসে বসে কেবলমাত্র দুর্গাকেই তিনি তন্ত্রসাধনার বহু গুহ্যতত্ত্ব বলে গেছেন। আপনি বলছেন, এক এক সম্প্রদায় নাকি নিজেদের সম্প্রদায়গত দেবতার অনাদিত্ব প্রমাণ করবার নানা উপনিষদ নানা গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। কিন্তু আমাদের তন্ত্র শাস্ত্র সে রকম ধরণের নয়, সাক্ষাৎ শিব প্রবর্ত্তিত। একান্ন পীঠস্থান এই কলিকালেও দেখুন। জাজ্বল্যমান ভাবে বিরাজ করছে। আমাদের কোন কুলাবধূতের সঙ্গে যদি আলোচনা করেন তাহলে আপনার মূর্ত্তিপূজার সম্বন্ধে সংশয় ঘুচবে, মূর্ত্তিপূজাকে আর মিথ্যা বলতে পারবেন না। তন্ত্রে সর্ব্বত্রই মূর্ত্তিপূজার প্রসংশা আছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলিও, ভেবে দেখুন, যিনি যে উদ্দেশেই রচনা করুন, তাঁরা অবশ্যই স্বনামধন্য পণ্ডিত ছিলেন, পূর্ব্বাপর বিচার করেই তাঁরা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ' মূর্ত্তিপূজাতে একেবারে কিছু ফল না থাকলে তাঁরা তা লিখলেন কেন? তন্ত্র, সংহিতা, দেবীগীতা প্রভৃতি গ্রন্থ মানবেন না?

উত্তর :—স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনেকেই এ জগতে অনেক কিছুই করে থাকেন, তিনি যত বড়ই জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত হোন। তারপর নিজেদের সম্প্রদায় সিদ্ধির জন্য, গুরুর মুখ রক্ষা ইষ্টের অনাদিত্ব স্থাপন এবং নিজেদের সাধনপ্রণালী যে একমাত্র

শ্রেষ্ঠ সাধন পন্থা তা প্রমাণ করবার জন্য, অনমুভবী পুরুষরা সব কিছুই করতে পারেন; যে কোন ছলবল কৌশলে তাঁদের বাধে না। যেমন একজন লিখেছেন, 'গোবিন্দ স্বপ্নে ব্রহ্মসূত্রের এই বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা প্রকাশ করে গেছেন'! একজন তো ছদ্মবেশে এক দ্বৈতবাদী গুরুর কাছে শিষ্য সেজে সেবা করে, অদ্বৈতবাদের খণ্ডনপদ্ধতি জেনে এসে সে গুলিকে খণ্ডন করে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য বই লিখে গেছেন। কেউ বা বলেন, 'অমুক গ্রন্থ ভগবান নিজে এসে দিয়ে গেলেন'। এই তো যেমন 'মদনমোহন' cinema তে দেখানো হয়েছে, যে বৈষ্ণব গ্রন্থগুলিকে হাম্বীরের দস্যুরা ছিন্ন ছিন্ন করে জলে ফেলে দিয়েছিলো, বৈষ্ণবের সত্যাগ্রহে বিচলিত হয়ে বিষ্ণুপুরের 'অপ্রাকৃত' মদনমোহন নদীকে হুকুম করলেন, নদী বইগুলি ফেরৎ দিলো, দেখা গেল মদনমোহনের বেদী ভেদ করে জলের স্রোতে বাহিত হয়ে আপ্রাকৃত বৈষ্ণব গ্রন্থ পুনরায় আবির্ভূত হলেন !!!

আপনি যে একান্ন পীঠস্থান এবং দশমহাবিদ্যার কাহিনী বলছেন, তা বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের প্রবর্ত্তিত; পরে শাক্ত সম্প্রদায়ের পণ্ডিতরা তার এক একটা আধ্যাত্মিকরূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। শিবও কখনই তন্ত্রের প্রবর্ত্তক বা রচয়িতা নন। আর্য্য সমাজের মহর্ষি দয়ানন্দজী, যিনি সারা ভারতবর্ষের পণ্ডিত সমাজকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করে প্রমান করেছিলেন. মূর্ত্তিপূজা বেদানুকুল নয়, তিনি তন্ত্রমত খণ্ডন করে গেছেন। তাঁর সামনে কোন 'কুলাববধুত'ই এগিয়ে আসেন নি ভয়ে!

তবুও যদি আপনাদের কাছে তন্ত্রই বহুমান্য এবং প্রমান্য হয়, তাহলে কোন 'কুলাববধুতে'র সঙ্গে আলোচনা করবার প্রয়োজন দেখি না, আপনাদের শ্রেষ্ঠ তন্ত্র গ্রন্থ **'মহানির্ব্বাণতন্ত্র'** এই **মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে** কী কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেছে, দেখুন,

'মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাং চেন্মোক্ষ সাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তথা।
মৃৎশিলা ধাতুদার্ব্বাদি মূর্ত্তৌ ঈশ্বর বুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তিতে ॥ ৩ ॥

অর্থাৎ মনঃ কল্পিত মূর্ত্তি যদি মানুষের মোক্ষসাধক হয়, তাহলে তো মানুষ স্বপ্নলব্ধ রাজ্যের দ্বারাও প্রকৃত রাজা হতে পারে! মাটি কাঠ পাথর ধাতু দিয়ে তৈরি

মূর্ত্তিকে ঈশ্বরবোধে পূজা করে মানুষ বৃথাই কষ্ট পায়; কেন না, তপস্যালব্ধ তত্ত্বজ্ঞান ছাড়া কেউ মুক্তি লাভ করতে পারে না।

' স্তুতির্জপোঽধমোভাবো বহিঃপূজাধমাধমা '

ঐ মহানির্ব্বাণ তন্ত্র একথাও বলছে,

'উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যান ভাবস্তু মধ্যমঃ
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বহিঃপূজাধমাধমা'।

অর্থাৎ, ব্রহ্মসদ্ভাব উত্তম, ধ্যানভাব মধ্যম, স্তুতিজপ অধম ভাব, আর মাটি কাঠ পাথরের মূর্ত্তি গড়ে পূজাপদ্ধতি, মালাজপাদি যত বহিরাচার সে সব অধম হতেও অধম !!!

'পীঠমালা তন্ত্র' নামে আপনাদের আর একটি পরমপ্রিয় তন্ত্র কি বলেছে শুনুন,

ন মুক্তির্জপনাৎ হোমাৎ উপবাস শতৈরপি
ব্রহ্মৈবাঽহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ।
ন কর্ম্মণা বিমুক্তঃ স্যাৎ ন মন্ত্রারাধনেন বা
আত্মনাত্মানমাজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানবঃ।
মন্ত্রোপূজা তপোধ্যানং হোমং জপ্যং বলিক্রিয়াম্
সংন্যাসং সর্ব্ব কর্ম্মাণি লৌকিকানি ত্যজেদ্ বুধঃ।

আশা করি এর সহজ বাংলা অর্থ বুঝাবার জন্য 'পুর্ণাভিষিক্ত' হওয়ার প্রয়োজন লাগে না। মূর্ত্তি পূজা বা বাহ্যিক কোন উপাসনার কথা এতে বলছে কি ?

শিব-সংহিতাতেও, আত্মস্থ শিবকে পরিত্যাগ করে, বাইরের কোন মূর্ত্তিতে বা লিঙ্গে পূজা করাকে, হাতের খাদ্য ফেলে দিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চেয়ে খাওয়ার মত মূঢ়তা এবং নীচতা বলে ধিক্কৃত করা হয়েছে—

আত্মসংস্থং শিবংত্যক্ত্বা বহিস্থং যঃ সমর্চ্চয়েৎ
হস্তস্থং পিণ্ডমুৎসৃজ্য ভ্রমতে জীবিতাশয়া।

আপনি প্রশ্নচ্ছলে দেবীগীতার নামোল্লেখ করেছেন; মনে হয়, দেবীগীতার নামটি আপনার শোনা আছে মাত্র! দেবীগীতা পড়া থাকলে বেদশ্রুতি বিরুদ্ধ একান্ন পীঠস্থান দশমহাবিদ্যার মূর্ত্তিপূজার স্বপক্ষে যে ওকালতি করছেন, তা 'তামস' বলে বুঝতে পারতেন। কৃষ্ণভক্তদের যেমন গীতা, রামভক্তদের রামগীতা,

তেমনি দেবীভক্তদের একটা গীতা না থাকলে চলবে কেন ! কাজেই সম্প্রদায়ীরা রচনা করেছে, এই দেবীগীতা ! আপনি দেবীভক্ত বলে এই দেবীগীতাতে কি আছে তা বলছি শুনুন ; পার্ব্বতী হিমালয়কে যেন উপদেশ দিচ্ছেন —

অন্যেষাং শাস্ত্র কর্ত্তৃনাং অজ্ঞান-প্রভবত্বতঃ
অজ্ঞানদোষ দুষ্টত্বাত্তদুক্তেন প্রমানতা।
তস্মাৎ মুমুক্ষুধর্ম্মার্থং সর্ব্বথা বেদমাশ্রয়েৎ ॥ ১১
অন্যানি যানি শাস্ত্রানি লোকেঽস্মিন্ বিবিধানি চ
শ্রুতি স্মৃতিবিরুদ্ধানি তামসান্যেব সর্ব্বশঃ ॥ ২৬ [দেবী গীতা ৯ অঃ]

আপনাদের দেবী বলছেন, 'বেদভিন্ন অন্যশাস্ত্রকারদের বাক্য অজ্ঞান সম্ভূত বলে তা প্রামাণ্য হতে পারে না। এই জন্যই মুমুক্ষু ব্যক্তি সব সময় বেদকেই আশ্রয় করবে। এই শ্লোকে শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ, অন্যান্য যে সমস্ত শাস্ত্র আছে, তাকে সর্ব্বথা তামসশাস্ত্র বলে জানবে'।

বেদ, শ্রুতি, গীতা প্রভৃতিতে একান্ন পীঠস্থান দশমহাবিদ্যার কথা নেই ; ঐ সব প্রামাণ্যশাস্ত্র মতে মূর্তিপূজা যে কতখানি মিথ্যা এবং অবাস্তব তা অন্যান্য অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে আসছি। আপনি দেবীভক্ত, 'পূর্ণাভিষিক্ত', যদি দেবীর কথাই মানতে হয় তাহলে আপনাদের তন্ত্র শাস্ত্রকে তো 'তামসশাস্ত্র'ই বলতে হয়। তবুও এই তামশাস্ত্র এবং অন্যান্য অর্ব্বাচীন গ্রন্থকে ভিত্তি করে ছোট ছেলের মত যে পুতুলপূজা ত্যাগ করতে আপনারা চান না, তার কারণ, **জড়ের পূজা করে করে আপনাদের আত্মাতে এবং বুদ্ধিতে জড়ত্ব সঞ্চারিত হয়েছে।**

একান্ন পীঠস্থান কল্পিত স্বার্থান্বেষীদের সৃষ্টি !

প্রশ্ন :— কি বললেন, আমাদের একান্ন পীঠস্থান মিথ্যা ? দক্ষযজ্ঞে পতি নিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করলে পর, শিব দক্ষকে বিনাশ করে, সতীর মৃত দেহ কাঁধে নিয়ে অত্যন্ত শোকার্তভাবে উদ্দণ্ড নৃত্য সুরু করলেন। তাঁর সেই প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখে দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু শিবকে কিছুতেই শান্ত করতে না পেরে সুদর্শন চক্রে সতীদেহকে একান্ন খণ্ডে বিভক্ত করলেন ; কোথাও পড়লো অঙ্গুষ্ঠ, কোথাও ব্রহ্মরন্ধ্র, কোথাও নাভি, কোথাও বা কঙ্কাল।

তদনুযায়ী দেবীর একান্নটী মূর্ত্তি হয়ে একান্নটি জাগ্রত তীর্থ স্থান হয়েছে! কালীঘাটের কালী, বক্রেশ্বরের দেবী, জ্বালামুখী, বিমলা, তমলুকের বর্গভীমা এঁরা ভয়ানক জীবন্ত, জাগ্রত, প্রত্যক্ষ! শিব নিজে দেবীকে তন্ত্রোপদেশ দিয়ে দেবী পূজার ব্যবস্থা করে গেছেন, এ সব মানবেন না? কলিতে শক্তি মন্ত্রই সিদ্ধিপ্রদ, অন্য কোন মন্ত্রে তো সিদ্ধিলাভের আশাই নেই।

উত্তর:— তোমাদের অতলস্পর্শী অজ্ঞতা দেখে বড় দুঃখ জাগে যে, **ভণ্ড সম্প্রদায়ীরা মূর্ত্তিপূজার প্রচলন করে, নানা কাল্পনিক গালগল্প রচনা করে দেশের কতো সর্ব্বনাশ করে গিয়েছে। তাদের এ বিষ সমাজের অধিকাংশ মানুষের রক্ত কনিকায় এমন ভাবে মিশে গেছে যে সহজে তা দূর করা যাবে না।** তোমরা যারা তরুণ, দেশের প্রাণশক্তি, তোমরাও ছোটবেলা থেকে যে কুসংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাসের আওতায় মানুষ হও, তার প্রভাব এমন ভাবে deep-rooted হয়ে যায় তোমাদের মনে যে, বিচার শক্তি, সত্যানুসন্ধিৎসা সব নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে!

প্রত্যেক মানুষই তার স্ত্রীকে ভালবাসে। সাজাহানের মত ঐশ্বর্য্য না থাকার ফলে মমতাজের স্মৃতিতে একটা বিরাট তাজমহল সকলে গড়ে তুলতে পারে না সত্য, তাবলে প্রত্যেকের সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি প্রত্যেকের টান, কারও চেয়ে কারও কম নয়। কিন্তু তবুও কারও স্ত্রীবিয়োগ হলে তার মরদেহটা অগ্নিতে বা মাটিতে সংস্কার করে ফেলে। শোকের তীব্রতা কিছুদিন পরেই যায় কমে; স্মৃতি হয়ত চিরকাল জাগরুক থাকে। অত্যন্ত স্ত্রৈন একজন বদ্ধজীবের মধ্যেও এমন কাউকে কি দেখেছ যে স্ত্রী বিয়োগ হ'লে সেই মৃত দেহটা কাঁধে নিয়ে, উন্মত্ত ভাবে নাচতে নাচতে কাঁদতে কাঁদতে ঘুরে বেড়ায়? একজন সাধারণ বদ্ধজীবের যে বুদ্ধি বৃত্তি থাকে, যে সংযম থাকে, দেবাদিদেব মহাযোগেশ্বরের কি তাও ছিল না? জন্মালেই সবকে মরতে হয়, মরলেই পাঞ্চভৌতিক দেহটা অগ্নিসংস্কার করে ফেলতে হয়, এই অত্যল্প জ্ঞানটুকুও কি মহাদেবের ছিল না? শিব কি এতই হীনবুদ্ধি, অসংযমী, স্ত্রৈন এবং রিপুর দাস ছিলেন? তোমরা মুখে তাঁকে বল অনাদি কারণ মহাদেব, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে idea এবং বিশ্বাসটা যেন তিনি একটা উন্মত্ত, অবুঝ, পাগল

শিবতো জিতেন্দ্রিয়, প্রশান্তাত্মা, স্থিতপ্রজ্ঞ, পরব্রহ্মবিদ্ ছিলেন, 'শোকং তরতি আত্মবিৎ', আত্মজ্ঞ শোকজয়ী হ'ন, এই শ্রুতি বাক্য অনুযায়ী তাঁর তো অধীর হওয়া সম্ভব নয়। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, মুক্ত পুরুষ হৃদয়ের সমস্ত শোক হতে উত্তীর্ণ হ'ন, 'তীর্ণো হি তদা সর্ব্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য ভবতি' [বৃহদারণ্যক ৪. ৩. ১২] যিনি আত্মরতি, আত্মক্রীড় হয়ে পরম আনন্দ স্বরূপ হয়ে যান, তখন—'তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্' [কঠ ৫ ১৩], তাঁরই শাশ্বতী শান্তি অপরের নয়। ঋষি শান্তির এখানে বিশেষণ দিয়েছেন, শাশ্বতী; অর্থাৎ কোন প্রতিকূল সংঘাতমুখর অবস্থাতেই, যে শান্তির ক্ষয় ব্যয়, হ্রাস বৃদ্ধি নেই। **কাজেই শিব সম্বন্ধে ঐ সব রটনা মূঢ় সম্প্রদায়ীদের আর একটি ছুং ভং কৌতুক!**

বিচার করে দেখ, শিবের মত লোক কি এতই মূঢ় এবং স্ত্রৈন হ'তে পারেন যে কারও প্রবোধ বাক্যই তিনি কানে নিলেন না? সতীর মৃত দেহ কাঁধে নিয়ে অমনি ধেই ধেই নাচতে সুরু করে দিলেন? বিষ্ণু এসে দেহটিকে ঠিক গুণে গুণে একান্ন খণ্ড করে ছিটিয়ে দিলেন তোমাদের কল্যাণে (!) এবং তা পড়লো শুধু এই ভারতবর্ষে? যাতে গজিয়ে উঠতে পারে এক একটা তীর্থ মন্দির, না? ধর্ম্মপ্রাণ মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে, নানা গালগল্প রচনা করে, তাদের মনে মিথ্যা বিশ্বাস উৎপাদন করে তাই বুঝি তোমাদের সাধু আর পাণ্ডাদের চলেছে অবাধ শোষণ এবং লুণ্ঠন? ঐ সব রক্তপায়ী মৎকুনের দলকে আর তোমাদের মত সরলপ্রাণ নির্বোধকে, অন্ধ বিশ্বাসীর দলকে আমার জিজ্ঞাস্য, শিবকে দশমহাবিদ্যা রূপ দেখিয়ে ভীতত্রস্ত করে forcibly তাঁর অনুমতি আদায় করে দক্ষগৃহে যাওয়া, এবং বিষ্ণুচক্রে তাঁর দেহের একান্ন খণ্ডে ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার গালগল্প পেলে কোত্থেকে? কবির যথেচ্ছ কল্পনা, মঙ্গলকাব্য আর কিংবদন্তীই কি তোমাদের ধর্ম্মের উৎস? ওগুলির আধ্যাত্মিক মূল্য কিছু আছে কি নেই, Spiritual point of view থেকে তাকি, একবারও বিচার করে দেখবে না?

সমগ্র মহাভারতে সতীর নাম উল্লেখই নেই। অর্ব্বাচীন শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে যদি সতীর পিতৃগৃহে যাওয়া এবং তথায় শিব নিন্দা শুনে দেহত্যাগের কথা আছে, কিন্তু সেখানেও একান্ন খণ্ডে খণ্ড খণ্ড হয়ে নানাস্থানে ছিটিয়ে পড়ার কোন উল্লেখই নেই। ভাগবতকার সতীর দেহত্যাগের এইভাবে

বর্ণনা দিয়েছেন। দক্ষ যখন শিবনিন্দা করলেন, তখন সতী অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বললেন—

সতীর দেহ বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত করা হয় নাই ; যোগাগ্নিতে দগ্ধ হয়েছিল।

ন যস্য লোকেঽস্ত্যতিশায়িনঃ, প্রিয়স্তথাঽপ্রিয়ো দেহভৃতাং প্রিয়াত্মনঃ।
তস্মিন সমস্তাত্মানি মুক্ত বৈরকে ঋতে ভবন্তং কতম্ প্রতীপয়েৎ। [ভাগ ৪, ৪, ১১]

'হে পিতঃ! ইহলোকে যিনি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেউ নেই, যাঁর প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই নেই, যিনি দেহীগণের আত্মাবৎ প্রিয়, যিনি সর্বভূতান্তরাত্মা, যিনি সর্ব্ববৈরিতা হতে মুক্ত, আপনি ভিন্ন অন্য কে তাঁর প্রতিকূলাচরণ করবে ?

[সতীর ঐ উক্তি থেকেই বুঝতে পার, তাঁর মতো মহত্তম চরিত্রের তত্ত্বদর্শী পুরুষ কি ঐ ভাবে তোমাদের ধারণা মত পাগলের আচরণ করতে পারেন ?] "উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি যদি ধর্ম্মরক্ষক নিজপ্রভুর নিন্দা করে তবে সামর্থ্য থাকলে তখনই সেই নিন্দুকের জিহ্বা ছেদন করা উচিত, নচেৎ নিজের প্রাণত্যাগ করা উচিত, তাও না পারলে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করে সে স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়া উচিত [৪. ৪. ১৭]।......সুতরাং আপনার অঙ্গোৎপন্ন এই ঘৃণিত দেহ আমি মৃত দেহের ন্যায় এখনই ত্যাগ করবো"। এই বলে সতী উত্তরাস্যা হয়ে ভূমিতলে উপবিষ্ট হলেন এবং আচমনপূর্ব্বক পীতবসনে দেহ ঢেকে যোগস্থ হ'লেন। **সমাধিজাত অগ্নিদ্বারা তাঁর দেহ সহসা প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো** [ভাগবত]।

আগ্নেয়ী যোগধারণা দ্বারা যোগীশ্বর যাঁরা তাঁরা দেহকে এইভাবে প্রজ্বলিত করে ফেলতে পারেন।

সতীর দেহই যদি প্রজ্জ্বলিত হয়ে যায় যোগাগ্নিতে, তাহলে সেই দেহ নিয়ে উন্মাদের মত শিব নাচলেন কি করে ? আর বিষ্ণুরই বা সুযোগ কোথায় একান্ন খণ্ডে সতীদেহ ছিন্ন ভিন্ন করে, একান্ন পীঠস্থানের নিমিত্ত সৃষ্টি করে, রক্তপায়ী মৎকুনের দলকে অবাধ লুণ্ঠন ক্রিয়া চালাবার সুযোগ দেওয়ার ?

তাছাড়া শিব নিজেও দক্ষালয়ে যান নি। তাঁর অনুচর বীরভদ্রাদিকে পাঠিয়েছিলেন ; তারাই দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করে দক্ষের শিরশ্ছেদ করলে দেবতাগণ সন্ত্রস্ত হয়ে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে সব নিবেদন করলেন। ব্রহ্মা তখন শিবের সঙ্গে দেখা করবার জন্য সৌগন্ধিক নামক উপবনে গিয়ে দেখলেন, নারদকে তখন তিনি

বেদোপদেশ দান করছেন [ভাগবত]। কৈ প্রশান্তাত্মা মহাদেব শোকার্ত্ত হয়ে পাগল হয়ে গেছেন, এমন অলীক ঘটনা তো কল্পনাপ্রিয় ভাগবতকারও লেখে নি!

'জ্বালামুখীতে দেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র পড়েছে, সর্ব্বদাই ব্রহ্মজ্যোতি সেখানে দেদীপ্যমান, বক্রেশ্বরে দেবীর ভ্রূ পড়েছে, সিদ্ধিলাভের প্রধান স্থান, তাঁর তৃতীয় নেত্রের ললাট-অগ্নি জ্বলছে, তাই তপ্তকুণ্ড'—ইত্যাদি বহু মিথ্যা রটনা আছে; অনেক কালের দালাল, agent of Negative power, যারা অজ্ঞ সমাজে কৌলাবধূত, সিদ্ধ, মহাসিদ্ধ, পরমহংস ইত্যাদি নামে খ্যাত, তারাও ঐ স্থানে গিয়ে ঐ সব অগ্নিশিখা, তপ্তকুণ্ডকেই 'জাগ্রত দেবীশক্তি' বলে প্রচার করে গেছে। কিন্তু এখনত বৈজ্ঞানিকরা জ্বালামুখা চন্দ্রনাথ প্রভৃতি স্থানে আগ্নেয়গিরি নয়ত বা কোন খনির অস্তিত্ব অনুমান করছেন, আর বক্রেশ্বরে Ravon Gas এর। বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের বিজ্ঞানবলে যা জানলেন, ঐ সব 'পরমহংসে'র দল তাদের দিব্যজ্ঞানে তা জানতে পারলো না কেন?

ঐ তোমাদের কেদার ভুড়ভুড়িতে (বালিচক রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে দুই তিন মাইলের মধ্যে) একটি পুকুরে পাঁচটি জলের বুদ্‌বুদ্‌ উঠছে। তোমরা সাধু মহাত্মা আর জনশ্রুতির উপর বিশ্বাস করে, এতকাল বিশ্বাস করে এসেছ যে ওখানে পঞ্চতীর্থের সংযোগ আছে! কেদারেশ্বর শিব জাগ্রত!! প্রতি বছর পৌষ-সংক্রান্তি হ'তে পনের দিন ব্যাপী কত বড় মেলাও হয়। বন্ধ্যা পুত্রলাভ কামনায়, নির্ধন ধন কামনায় আসে! সহস্র ভক্তের 'জয় শিব শঙ্কর' ধ্বনিতে মহা আড়ম্বরে পূজাও হয়। কিন্তু এখন ত Scientific test এ ওখানে পঞ্চতীর্থের পবিত্র জলের পরিবর্ত্তে কেরোসিন তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে! পরীক্ষা নিরীক্ষাও চলছে। বক্রেশ্বর সম্বন্ধে বলা হয়, দেবীর শক্তি ওখানে এমনই জাগ্রত যে ঐ তপ্ত কুণ্ডের জল পান করলে, দেবীর আরাধনা করলে অম্লশূলাদি ভাল হয়। Sciertific Test এ যে Ravon Gas এর সন্ধান ঐ জলে পাওয়া গেছে, ঐ Ravon Gas যে কোন Liver এর অসুখে মহৌষধ। কাজেই এ কোন দেবমহিমা নয়!

স্বার্থান্ধ ধর্ম্মবণিক ব্রাহ্মণ পাণ্ডা সাধুদের একান্ন পীঠ সম্বন্ধে এই অপ-প্রচারের মতই 'কলিতে একমাত্র শক্তিমন্ত্রই সিদ্ধিপ্রদ' এটি আর একটি মিথ্যা

গুজব! তাহলে কলিতে যাঁরা যাঁরা সিদ্ধ হয়েছেন বলে জানা গেছে, তাঁরা কি সবাই তান্ত্রিক? না, তান্ত্রিক ছাড়া আর কোন সম্প্রদায়ের কোন সাধুই সিদ্ধ হ'তে পারেন নি? কলিতে বেদমন্ত্রগুলি কি যুক্তিতে শক্তিহীন হয়ে গেল?

শিব সম্বন্ধে তন্ত্রকার ও পুরাণকারদের কেচ্ছাকাহিনী

শিব তন্ত্রশাস্ত্রের প্রবর্তক বা প্রবক্তা ন'ন। তিনি হঠযোগ, রসায়নশাস্ত্র (Chemistry) এবং জ্যোতিষ প্রভৃতি বেদাঙ্গ শাস্ত্রের প্রবর্তক। এঁর সর্বত্র অভেদ ব্রহ্ম দর্শন হওয়ায়, সর্বদা সমাধির ভাবে তন্ময় থাকার ফলে, সব সময়ই ব্রহ্মানন্দের নেশায় বিভোর থাকতেন। কামুক তান্ত্রিকদের দল, এঁকে ধুতুরা ভাং-সেবী মত্ত বলে চিত্রিত করেছে। কল্পনাপ্রিয় পুরাণকাররা এই যোগেশ্বর শিবকে (ইনি তিব্বতের অধিবাসী, আমাদেরই মত মানুষ ছিলেন) কিভাবে বিকৃত করে চিত্রিত করেছে তার দু' একটি উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবে। বামন পুরাণে লিখেছে, নগ্নবেশে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যুবা শিব ভিক্ষাকপাল হস্তে ঘুরে বেড়াতেন। একদিন ঐ ভাবে তিনি মুনিদের আশ্রমে আসেন। তপোবনের মুনিপত্নীরা শিবের নগ্ন মূর্ত্তি দেখে কামমোহিত হয়ে সভ্যতার সব সীমা লঙ্ঘন করে বসলেন। পুরাণকারদের পক্ষেই এই বিচিত্র কল্পনা সম্ভব! যাই হোক মুনিরা তখন একযোগে শিবকে আক্রমণ করলেন নিজ নিজ কামিনীদের এই অস্বাভাবিক চিত্তচাঞ্চল্য এবং কামুকতা দেখে;

> ক্ষোভং বিলোক্য মুনয় আশ্রমে তু স্বযোষিতাম্
> হন্যতামমতি সন্তাষ্য কাষ্ঠ পাষাণ পানয় [বামন ৪৩, ৫৯-৭০]

পাথর ঠুকে ঠুকে শিবকে মার দিয়ে নাকি তাঁর লিঙ্গচ্ছেদ করে দিলেন। পরে মুনিরা নিজেরাই ভয় পেলেন—লিঙ্গপূজা সুরু হয়ে গেল [ঐ ৪৩-৪৪ অ]। কূর্ম্মপুরাণের সর্বজ্ঞ (!) গ্রন্থকার লিখেছে, নারীবেশধারী বিষ্ণুকে নিয়ে উলঙ্গ যুবক শিব ঠাকুর দেবদারু বনে ঘুরে বেড়াতেন, মুনি পত্নীরাও কামমোহিত হয়ে নানা-রকম যৌনলীলা করতেন, মুনিরা তখন তিক্ত বিরক্ত হয়ে শিব বিষ্ণুকে লগুড়াঘাত সহ মধুর অশ্রাব্য গালাগালি দ্বারা আপ্যায়ন করতে লাগলেন [ঐ ৩৭.১৩-১৭.২২ ও ৩৯]!!! স্কন্দপুরাণের মাহেশ্বরখণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায়ে, নাগরখণ্ড ১ম অধ্যায়ে, লিঙ্গপুরাণের পূর্ব্বভাগে পঞ্চান্ন-তম অধ্যায়ে এই শিবঠাকুরের নানালীলা খেলার বর্ণনা আছে! এই সব ভণ্ড পুরাণকারদের স্বৈরাচারী কল্পনার

সঙ্গে নানা কিম্বদন্তী মিশিয়ে স্বার্থসন্ধী সাধু এবং পুরোহিতের দল যা চালু করে গেছে তোমরাও তার সত্য মিথ্যা যাচাই না করে, সত্য সত্যই ঐ ভাবে জড় মাটি কাঠ পাথরের শিব পূজায় কোন পারমার্থিক কল্যাণ হবে কিনা না ভেবেই শিবপূজা করে চলেছ। প্রকৃত পক্ষে, পূর্ব্ব অর্ঘ্যে, আলোচনা প্রসঙ্গে বিশুদ্ধচক্রের Presiding Diety যে শিবের কথা বলেছি—সেই শিব আর এই শিব এক ন'ন। বিশুদ্ধ চক্রের Presiding Diety শিবকে অনুভব করতে হলে অন্তর্মুখ সাধনার প্রয়োজন, জড়মূর্ত্তি পূজাতে অনাদ্যন্ত কালেও সম্ভব নয়। তির্ব্বতে আমরা যে শিব নামে আর এক যোগেশ্বরের সন্ধান পাই, তাঁর নাম ঐ বিশুদ্ধচক্রের অধিপতির নামানুসারে থাকলেও দুই শিব এক ন'ন। অজ্ঞ জনসাধারণ দুই শিবকে এক বলে confuse করে, মানুষ শিবের আ।র-আচরণকে সূক্ষ্মমণ্ডলের দেবতাতে আরোপ করে ফেলেছে। আবার পূর্ব্বোল্লিখিত পুরানকারদের কল্পিত শিব ঠাকুরের কেচ্ছাকাহিনী, হঠযোগ জ্যোতিষ রসায়ন শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক মহাযোগেশ্বর শিবেতে আরোপ করে শিব সম্বন্ধে এক কিম্ভূতকিমাকার ধারণা প্রচলিত করেছে।

তান্ত্রিকরাও শিব সম্বন্ধে নানা অনর্থ ঘটিয়েছে। তন্ত্র বলতে যদি ব্যাপক অর্থে, 'তন্যতে বিস্তীর্য্যতে আত্মজ্ঞানম্ অনয়া' যার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় সেই Practical ক্রিয়াকে বোঝায় তাহলে সেই অর্থে যোগেশ্বর শিবকেও তান্ত্রিক বা তন্ত্রশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক বলা যায়। কিন্তু তোমরা তন্ত্র বলতে যা বোঝ, কালীতারার জড় মূর্ত্তিপূজা, শ্মশানে বসে শব-সাধনা, মদ্যপান, ভৈরবীচক্রে বসে গুপ্তভাবে নানা কুৎসিত যৌন ব্যভিচার, ছিন্দি ছিন্দি ফট্ স্বাহা, হ্রীং শ্রীং ক্রীং ইত্যাদি মন্ত্র জপ, গলায় হাড়মালা, ললাটে ভীষণ সিন্দুর ফোঁটা, দেবীর নামে পাঁঠাবলি ইত্যাদি অনাচার—এই ধরণের তান্ত্রিক, শিব ছিলেন না। কিংবা এই ধরণের বাজে আচার পদ্ধতি যে সমস্ত তন্ত্র শাস্ত্রে আছে—সেগুলিরও প্রবর্ত্তক শিব কখনই ন'ন। শিব কখনই ঐ ধরণের জঘন্য পুস্তক রচনা করে অতি ঘৃণ্য মতবাদ প্রচার করে যান নি! শিবের নাম দিয়ে সম্প্রদায়ীদের প্রচার মাত্র!

বুদ্ধদেবের দেহান্তের পর সঙ্ঘে যে সমস্ত ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ছিল, তাদের মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী ব্যভিচার দোষ দেখা দেয়। বুদ্ধদেব যে সঙ্ঘের

ব্যবস্থা করে যান তাতে পুরুষ স্ত্রীলোক সবাই প্রব্রজ্যা নিয়ে পৃথক ভাবে থাকতেন। এই ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের এক সময় একত্র বাস সম্বন্ধে বুদ্ধদেব প্রিয়শিষ্য আনন্দকে বলেছিলেন, 'এর দ্বারা আমি নিজেই এই ধর্ম্মমতের বোধ হয় ধ্বংসের বীজ রেখে গেলাম'। তাঁর দূরদৃষ্টি প্রভাবে তিনি যে ভয় ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, অনাচার ব্যভিচারের যে বীজের সম্ভাবনার তিনি অনুমান করেছিলেন, কালক্রমে সেই বীজ শাখাবিস্তৃত এক বিরাট বিষবৃক্ষরূপে দেখা দিল। তাঁর মহানির্ব্বাণের পর ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার ফলে, কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের অভাব, বুদ্ধদেবের মত ঐরকম কোন শক্তিশালী আচার্য্যের অভাবে, ব্যভিচার দেখা দিল। এক সময় এই অনাচারের স্রোত এমন ভাবে বেড়ে উঠলো, এই ইন্দ্রিয়ভোগ-লালসার জন্য বহু ভিক্ষু-ভিক্ষুণী বিতাড়িত হয়েছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এরা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গভীর অরণ্যে পর্ব্বতে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের মধ্য থেকেই হ'ল 'বজ্রযান' নামক বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের উৎপত্তি। এরা জিতেন্দ্রিয় না হলেও এদের মধ্যে অনেকে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁরাই জঘন্য জৈব লালসাকে ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে চরিতার্থ করবার জন্য, নিজেদের প্রবৃত্তি এবং ভোগের সমর্থনে অনেক রহস্যপূর্ণ শব্দজাল দিয়ে গ্রন্থ রচনা করলেন। চলতে লাগলো মদ্য মাংস মৈথুনাদি পঞ্চমকারের সাধনা; সাধনার নামে ভৈরবী চক্রে বসে নরকপালে অজস্র মদ্যপান, যোনিলিঙ্গপূজা অর্থাৎ পূজার নামে, বামা নিয়ে সাধনার নামে ব্যভিচারের ক্লেদাক্ত যৌনলীলা। সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন বৌদ্ধ গ্রন্থ 'ত্রিপিটক' তিব্বতে চলে যায়, তখন 'ব্রজযান' নামে তান্ত্রিক বৌদ্ধমত এবং তাদের. ধর্ম্মের অনাচার-অনুষ্ঠানের সমর্থনে রচিত বামমার্গী গ্রন্থগুলিও সেখানে চলে যায়। যেহেতু যৌন প্রবৃত্তির দিকে মানুষের সহজাত প্রবণতা আছে, এজন্য ধর্ম্মাচরণের নামে এই অবাধ ভোগলীলাকে সবাই গ্রহণ করতে লাগলো, তিব্বতের অধিকাংশই হয়ে গেল তান্ত্রিক। মারণ, বশীকরণ, উচাটন ইত্যাদি বহু রকম ক্রিয়া প্রক্রিয়া মন্ত্রবীজ রচিত হ'ল এই সব সম্প্রদায়ীদের দ্বারা। 'বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন কক্ষপুটম্' নামক একখানি গ্রন্থে শত্রুজয় শত্রুবধ স্ত্রীলোক বশীকরণ, মারণ উচাটন ইত্যাদির নানারকম অসার পদ্ধতির বর্ণনা আছে!! ঐ সমস্ত সর্ব্বাভীষ্ট প্রপূরক ক্রিয়া প্রক্রিয়ায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির লালসায় অজ্ঞরা দলে দলে

তান্ত্রিক হয়ে যেতে লাগলো। খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর অন্তিমভাগে ঐ সব ব্যভিচারী বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের তথাকথিত ধর্ম্ম আর্য্যদের সংস্পর্শে এসে নূতনরূপে রূপায়িত হ'তে লাগলো। যোনিলিঙ্গপূজা পরিণত হ'ল "শিবলিঙ্গ ও গৌরীপট্ট" রূপে'। 'শিবোবাচ' 'ভৈরবোবাচ', 'পার্বত্যুবাচ' ইত্যাদি নাম দিয়ে বহু তন্ত্র শাস্ত্র রচিত হ'ল। 'তন্ত্র' শব্দের অর্থ দেওয়া হ'ল যে ক্রিয়া দ্বারা তনুত্রাণ হয় অর্থাৎ মুক্ত হওয়া যায়। এরা বললো, ভোগের মধ্য দিয়েই ত্যাগের পথে যেতে হ'বে। প্রবৃত্তিমার্গের এই ভোগের দ্বারা নিবৃত্তি এলে তবেই জীব মুক্ত হয়ে যেতে পারে! কাজেই 'কৈলাসে শিখরে রম্যে' বসে শিব 'শৃণু দেবী প্রবক্ষ্যামি' বলে পার্বতীকে সম্বোধন করে যেন উপদেশ দিচ্ছেন, গুরুত্ব দেওয়ার জন্য শিবের মুখ দিয়ে বলানো হ'চ্ছে, 'দেবি! এই যে গুহ্যতত্ত্ব তোমাকে বলছি, এটি যথা তথা ন দাতব্যং ন বক্তব্যং গোপনীয় প্রযত্নতঃ'! মানুষের মনে বিশ্বাস উৎপন্ন করার জন্য শিবের নাম দিয়ে, গ্রন্থ রচনা করে, শিবের মুখ দিয়ে বলানো হ'ল,

"বেদশাস্ত্রপুরানানি সামান্তা গণিকা ইব
সা যথা সাম্ভবা মুদ্রা গুপ্তা কুলবধূরিব' [জ্ঞান সংকলিনীতন্ত্র]।

এরাই প্রচার করলো, 'কলিতে তান্ত্রিক সাধনা ছাড়া বৈদিক উপাসনায় কোন ফল হবে না'! এরাই শিবের নাম দিয়ে কালীতন্ত্র রচনা করে শিববাক্য (!!) প্রচার করলো,

'মদ্যং মাংসং চ মীনং চ মুদ্রা মৈথুনমেব চ
এতে পঞ্চমকারাঃ স্যু মোক্ষদা হি যুগে যুগে'।

লিঙ্গগুহ্য পরায়ণ যারা ধর্ম্মের নামে জৈবলালসার পঙ্ককুণ্ডে ডুবে থেকে জড়বুদ্ধি হয়ে গেছে তাদের পক্ষেই ঐ 'পঞ্চমকার'কে "মোক্ষদা" বা মুক্তিদায়িকা বলা সম্ভব! যতক্ষণ না মদ খেতে খেতে অজ্ঞান হয়ে যাও ততক্ষণ নরকপালে মদ ভরে ভরে পান করে যাও—এই হ'ল তান্ত্রিকী অমিয় বাণী !!

'পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে
পুনরুত্থায় বৈ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে' [তন্ত্রবাক্য !]

ঐ সব অনাচারের জন্য অনন্তকাল যাদের নরকাগ্নিতে জ্বলে মরা উচিত, তাদের আবার 'পুনর্জন্মের' সম্ভাবনা কোথায়? এরা মানুষ জন্ম না পেলেই মঙ্গল! পরমাংস খাওয়া, বিষ্ঠাভক্ষণ পূরীষ মূত্র ভক্ষণাদিও এদের চলে! এদের

নাম 'অঘোরী'। কাপালিক সম্প্রদায়ও এই তান্ত্রিকদেরই একটি শাখা। কালক্রমে এরা নরবলিও দিয়েছে, এখনও কোথাও কোথাও ঐ সমস্ত তান্ত্রিক কাপালিকের দল নরবলি দিযে থাকে, সংবাদপত্রে জানা যায়।

সর্ব্বনাশা তন্ত্রমত

রক্ষাকালী, শ্মশানকালী, গুহ্যকালী, দক্ষিণাকালী, ভদ্রকালী, তারা, উগ্রতারা, ধূমাবতী, ছিন্নমস্তা, মাতঙ্গী, ভৈরবী, সম্পৎপ্রদা ভৈরবী, ষট্‌কূটা ভৈরবী ইত্যাদি বহু প্রকটা বিকটা উৎকটা দেবদেবী সৃষ্টি হয়ে গেলো এদেরই মহিমায়; তদনুযায়ী বহু আকৃতি প্রকৃতি ধ্যানমন্ত্র 'হ্রীং স্ত্রীং হুঁ ফট্' 'সর্বদুষ্টানাংবাচং স্তম্ভয় স্তম্ভয় কীলয় স্বাহা' 'হসরৈং হসকলরীং হসরোং' 'ডরলকসহৈং ডরলকসহাং ডরলকসহৌং' 'ক্রীং কালী কাকালি কাকতালি পোড়াকপালী ইত্যাদি বহুরকমের মাথামুণ্ডহীন অর্থহীন অদ্ভুত অদ্ভুত মন্ত্র তৈরি হয়ে গেছে। প্রচার করা হয়েছে, এ সমস্ত অত্যন্ত শক্তিশালী, পরম সিদ্ধিপ্রদ মন্ত্র !! অজ্ঞ মানুষও এই সব দুর্জ্ঞেয় রহস্যের পেছনে ছুটে সস্তায় সিদ্ধিলাভের আকাঙ্খায় হয়ে উটলো মশ্‌গুল! ঘনকুজ্ঝটিকাময় রাত্রে, নির্জন শ্মশানে শবের উপর বসে 'কারণবারি' (মদ) পান, মাংসাদি ভক্ষণ এবং ঐ সব অর্থহীন বিকট মন্ত্রের জপ করে অজস্র পশুবলি, কোথাও কোথাও নরবলি দিতে থাকে এই সব সম্প্রদায়ীরা। কালক্রমে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও এই মত সমর্থন করতে লাগলেন, অবচেতন মনের প্রচ্ছন্ন ভোগলালসা চরিতার্থ করবার জন্য, ধর্ম্মব্যবসা চালানোর জন্যও বটে! এই সব পণ্ডিত ব্যক্তিরাই প্রচার করতে লাগলেন, মানুষের সহজাত উচ্ছৃঙ্খল ভোগ প্রবৃত্তিকে ধর্ম্মের নামে এই ভাবে সংযত করা যাবে! অর্থাৎ আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়ে তা নিবানোর চেষ্টা !! "মাংস যখন মানুষ খাবেই, তখন তা দেবীকে দিয়ে 'ছিন্দি ছিন্দি ফট্' মন্ত্রে উৎসর্গ করে খাক্, মাযের চরণে উৎসর্গ করে দিলে পাঠাগুলোও মুক্তি পাবে" !!! 'মদ্যপান করুক, দ্রং স্ত্রূং যা হোক একটা মন্ত্র জপে'! কিন্তু এ সব মনকে আঁখি ঠারানো, ভাবের ঘরে চুরি ছাড়া আর কিছুই নয়।

কোটিজন্মের তপস্যার বস্তু যে মুক্তিধন তা যদি একটা কালী মূর্ত্তির কাছে 'ছিন্দি ছিন্দি ফট্' মন্ত্রে বলি দিলেই হয় তাহলে ঐ সব তান্ত্রিকরা গুহেন মুক্তি থেকে তাদের পূজ্য মাতা পিতাকে কেন বঞ্চিত করে? ভোগের মধ্য দিয়ে যদি

ত্যাগ আসে তাহলে তো যযাতির নিবৃত্তি আসতো ! ভোগের পর ত্যাগ আসে না ; আসে অবসাদ। আগুনে যত বেশী আহুতি দেওয়া হয়, ততই অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, অগ্নি নেভে না।

যাই হোক, কালক্রমে সংস্কৃতজ্ঞ যে সমস্ত পণ্ডিত ব্যক্তি এই সব সম্প্রদায়ে ঢুকলেন তাঁরা প্রত্যেক দেবী মূর্ত্তির এক একটি আধ্যাত্মিক বাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। এমন কি পঞ্চমকারেরও আধ্যাত্মিক বাখ্যা Insert করে বসলেন, নূতনভাবে তন্ত্র রচিত এবং পুনঃ সংস্কৃত হয়ে তাতে লিখা হ'ল, মদ বলতে সাধারণ মদ নয়,

'সোমধারা ক্ষরেদ্ যস্তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাণনে !
পীত্বানন্দ ময়স্তাং যঃ, স এব মদ্য সাধকঃ' [আগমসার]

শিব যেন বলছেন, ব্রহ্মরন্ধ্র হ'তে যে সোমধারা ক্ষরিত হয়, তাই হ'ল মগুপান। রামপ্রসাদও গাইলেন, 'সুরাপান করিনে আমি সুধা খাই জয় কালী বলে' ইত্যাদি।

বাংলাদেশের বীরভূম (তারাপীঠ, বক্রেশ্বর প্রভৃতি) হ'তে আরম্ভ করে প্রায় সর্বত্র, আসামের কামরূপ-কামাখ্যাতে এদেরই সংস্পর্শে, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেও নায়িকা সাধনা, কিশোরীভজন, পরকীয়াভাবে "আন্তঃ শাক্তঃ বহির্বৈষ্ণব" ইত্যাদি গালভরা বচনের অন্তঃরালে ধর্ম্মরাজ্যে ব্যভিচারের স্রোত চলেছে। আচার্য্য শঙ্কর এই জন্যই তাঁর শিষ্য রাজা সুধন্যার সৈন্য সাহায্যে ঐ সব ব্যভিচারী কাপালিক, তান্ত্রিক, অঘোরীদেরকে হত্যা করে এই পাশবিক ধর্ম্মের উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন। শংকরাচার্য্য কামরূপ বা বাংলাদেশে আসেন নি। কতকটা এইজন্য আর এগারশত উনসত্তর খৃষ্টাব্দে বল্লালসেন বাংলার সিংহাসনে আরোহন করে যখন তান্ত্রিক ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তখন রাষ্ট্রানুকুল্যে এই ধর্ম্মের অনেক প্রসার, প্রচার এবং পুষ্টিলাভ হয়। বহু গ্রন্থ, বহু রকমের উচ্চ আধ্যাত্মিক বাখ্যা, তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ইত্যাদির সংযোজন চলতে লাগলো তন্ত্রশাস্ত্রে ; 'শিবোবাচ' 'পার্বত্যুবাচ' নাম দিয়ে প্রচারের ঢক্কানাদ চলতে লাগলো।

একটু বিচার করলেই বুঝতে পারবে, যদি শিবই স্বয়ং এই তন্ত্রগুলির প্রবক্তা হ'ন, তিনি তো "কৈলাসে শিখরে রম্যে" বসে তাঁর স্ত্রীকে এই সব কিম্ভূতকিমাকার উপদেশ দিয়েছিলেন ? তাঁদের উভয়ের ঐ কথোপকথন তন্ত্রকার এবং কৌলের দল কি আড়ি পেতে শুনতে গেছলো ? না, ঐ

সমস্ত অঘোরী বামাচারী দলকে সাক্ষ্য রেখে পার্বতীকে তিনি উপদেশ দিচ্ছিলেন, "শৃণু দেবী প্রবক্ষ্যামি, গোপনীয় প্রযত্নতঃ" ?

'ব্যাসোবাচ', 'বিষ্ণুরুবাচ', 'শিবোবাচ', 'পার্বত্যুবাচ' নাম দিয়ে গ্রন্থ রচনা সম্প্রদায়ীদের এক একটা কূট কৌশল মাত্র ! তা যদি না হয়, ওগুলি যদি সত্যসত্যই তোমাদের কাছে ব্যাস, বিষ্ণু, শিব, পার্বতীর রচনা এবং বাণী বলে মনে হয় এবং ঐ জন্য ঐ সাম্প্রদায়িক পুস্তকগুলিকে অভ্রান্ত বলে মানতে চাও, তাহলে যে 'দেবীগীতা' পার্বতী-হিমালয়ের কথোপকথন ছলে লিখা হয়েছে, সেই দেবী-গীতার বাক্যকেও পার্বতীর শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী বলে, মা ভগবতীর কথা বলে অভ্রান্ত এবং পরিপূর্ণ সত্য বলে মানা উচিত। দেবীগীতাতে দেবী, হিমালয়কে উপদেশ দিতে গিয়ে কী বলছেন দেখ :—

বামং কাপালকং চৈব কৌলকং ভৈরবাগমঃ
শিবেন মোহনার্থায় প্রণীতো নান্যহেতুকঃ। ২৭

কারা ঐ ভ্রষ্টাচারী দুর্ভাগার দল ?

অর্থাৎ বামমার্গী (যারা স্ত্রীলোক নিয়ে সাধনা করে, মানে, সাধনার নামে ব্যভিচার করে), কাপালিক (যারা মরামানুষের মাথার খুলিতে মদ মাংস খায়), কৌল এবং ভৈরবাগম, এ সমস্ত শাস্ত্র মহাদেব লোকের মোহনার্থ অর্থাৎ **তাদেরকে ভুলিয়ে রাখবার জন্য** প্রণয়ন করেছেন। নতুবা এ সব গ্রন্থ রচনার তাঁর আর কোন কারণ নেই !

দক্ষশাপাদ্ ভৃগোঃ শাপাদ্দধীচস্য চ শাপতঃ।
দগ্ধাঃ যে ব্রাহ্মণবরা বেদমার্গ বহিষ্কৃতাঃ। ২৮
তেষামুদ্ধরনার্থায় সোপান ক্রমতঃ সদা।
শৈবাশ্চ বৈষ্ণবাশ্চৈব সৌরাঃ শাক্তাস্তথৈব চ। ২৯
গাণপত্যা আগমাশ্চ প্রণীতাঃ শঙ্করেণ তু। ৩০

[দেবীগীতা ৯ অ]

"যে সকল ব্রাহ্মণ দক্ষ ভৃগু ও দধীচি মুনির শাপে ভস্মীভূত হয়ে বেদমার্গ হতে বহিষ্কৃত হ'য়েছিল তাদের উদ্ধারের জন্য অর্থাৎ জন্মান্তরে সোপানক্রমে যাতে কিঞ্চিৎ বেদাধিকার পায়, এই মনে করে শঙ্করদেব, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, শক্তি এবং গাণপত্য নামক এই পাঁচ রকমের আগম প্রণয়ন করেছেন।"

'ব্যাসোবাচ', 'শিবোবাচ', 'কৃষ্ণোবাচ', 'পার্ব্বত্যুবাচ', থাকলেই যখন তোমরা তা অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস কর, তাহলে দেবীগীতার ঐ 'পার্ব্বতী বাক্যা'নু-যায়ী, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায় (যাদের প্রতাপে, অজ্ঞতা ও অনাচারের, জড়মূর্ত্তি পূজা এবং বাহ্যরাচারের 'অপ্রাকৃত' লীলায় প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব রসাতলে যেতে বসেছে),কি **পূর্ব্বজন্মের মুনিশাপগ্রস্ত ভ্রষ্টাচারী দুর্ভাগার দল ?** জ্ঞানীরা বলেন, **Present life is nothing but the will and activities of the Past life" ! হিন্দুদর্শনের কর্ম্মবাদের মূল রহস্যেও এ তত্ত্ব স্বীকৃত।** সেই জন্যই, জন্মান্তরীন সংস্কার অনুযায়ী, সহজাত অনাচার-প্রবণতার জন্যই কি, এজন্মেও ওরা সবাই বেদশ্রুতি বহির্ভূত জড় মূর্ত্তি পূজা, গলায় খড়ম, মালা, ঝোলা ধারণ, তিলকরাগ, গুরুগিরি করে শিষ্যের রক্ত শোষণ, কাংস্য ঘণ্টা খোল করতালের কলরোল, পশুবলি, বেদে যা নেই, সেই সমস্ত এছোষষ্ঠী, শীতলা কালী মনশা ইত্যাদি হাজার গণ্ডা দেবদেবীর মূর্ত্তিপূজার নামে নিত্য নূতন ভণ্ডামি এবং ভ্রষ্টাচার করে চলেছে ?

চতুর্থ পুষ্প

প্রশ্ন :— আপনার এই সমস্ত অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগে সবই বুঝছি। কিন্তু তবুও মন যেন মানতে চাইছে না। রামকৃষ্ণদেবকে ব্রাহ্মণীমা এসে ঐ তন্ত্রমতে সাধনা করিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের মত অনুযায়ী যখন 'যত মত তত পথ', তখন এও একটা নিশ্চয়ই পথ। রামপ্রসাদও ঐ তন্ত্র সাধনা মূর্ত্তি পূজা করে গেছেন। তাছাড়া, রামকৃষ্ণের মত লোক যখন করে গেছেন, তখন এর মধ্যে নিশ্চয়ই সত্য আছে।

উত্তর :— Human Psychology হ'চ্ছে, যে যেটা গতানুগতিক ভাবে করে আসছে তা ত্যাগ করতে তার মায়া লাগে! 'সেটা কিছু নয়' বললে তার Ego Complex এ ঘা লাগে! এবং যে কথা, যে ভাবধারা, যে রীতিনীতি তার I-ness কে শুড়শুড়ি দিয়ে পলকিয়ে দিতে পারবে—সে সেটারই জয়গানে উল্লসিত হয়ে পড়বে। 'অনুকূল বেদনং সুখং প্রতিকূল বেদনং দুঃখং', মনের অনুকূল যা তা সুখকর এবং মনের প্রতিকূল যা তা দুঃখকর। মূঢ় অহংকারে যাদের মন ভরে আছে—তারা তো তাদের গতানুগতিক ভাবধারার উল্টো কিছু হলে তা সরাসরিই অগ্রাহ্য করে বসে। তাই সমাজে দেখা যায় কোন বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক কিংবা সত্যদ্রষ্টা পুরুষ সমসাময়িক জনসাধারণের হাতে লাঞ্ছিত হ'ন। আর যে সমস্ত সুযোগ সন্ধানীর সুবিধাবাদের নরম কথা, ক্লীব ভাবধারা, মানুষের চিরাচরিত ভাবধারাতে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না, ক্লৈব্য আপোষ এবং মিঠা বুলি তত্ত্বকথার চুবড়িতে ভরে পরিবেশন করা হয় General Mass তা সহজেই গ্রহণ করে।

নির্ম্মল চৈতন্য দেশের অধিপতি সাচ্চাকুলমালিকের দর্শন লাভের জন্য পঞ্চকোষের আবরণ ভেদ করে, পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অতীত ভূমি, রামকৃষ্ণের কথা মত কোন "হালদার পুকুরের পাড়" নয় যে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম ঈশান অগ্নি নৈঋত বায়ু

—যে কোন দিক বা কোন দিয়ে চলে যাওয়া যাবে !!! যত মত তত পথের উদাহরণ, "হালদার পুকুরের পাড়ে"'র analogy অত্যন্ত স্থূল এবং বাজে। কোন Physical analogy দিয়ে সেই Spiritual cosmic—তত্ত্ব বোঝান যায় না। চোখ, কান, জিহ্বার ভিতর দিয়ে গুহ্যদ্বার বা নাকের ভিতর দিয়ে কোন পথ নেই যে, যে কোন পথ ধরে দ্বিদলচক্র ভেদ করে সহস্রার এবং তদূর্দ্ধ Purely Spiritual Region এ যাওয়া যেতে পারে। কেউ হঠযোগের পথ ধরে, কেউ প্রাণযোগের পথ ধরে, কেউ নাদ যোগ, পিপ্পলী যোগ, রাজযোগ লয়যোগ ইত্যাদি যে কোন একটা পথ ধরে মনটা লয় করতে পারে মাত্র! কিন্তু দ্বিদলপদ্ম বা Tisra Til, সন্তরা যাকে 'Tenth Door' বলেছেন—অধ্যাত্মভূমির সেই তোরণ দ্বারে প্রবেশ পথ পেতে হলে সুষুম্নার **একটা পথই** আছে। মনময় কোষ ভেদ করবার জন্যই অনেকগুলো উপায় থাকতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানময় আনন্দময় কোষ ভেদ করে, সেই "হিরন্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং" [ঈশ] কে উপলব্ধি করতে হলে Particular একটা পথই আছে। আর সন্তরা যাকে সাচ্চা দাতাদয়াল বলেন, সেই নির্ম্মল চৈতন্যময় দেশে Entrance পেতে হলে সেই দিব্য Scund Current, সাচ্চা নাম ছাড়া আর কোন পথ নেই। বেদ উপনিষদ যে ব্রহ্ম পরব্রহ্মভূমির কথা বলে গেছেন সেখানেও তাঁরা একটা Particular পথই ইঙ্গিত করেছেন এবং দৃঢ়কণ্ঠে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন "নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়"।

যাঁরা মনোময় কোষের দিকে দৃষ্টি দিয়ে তত্ত্বোপদেশ ঝাড়তে গেছেন জ্ঞানের অপরিপক্ক অবস্থায় তাঁরাই বলবেন 'যতমত তত পথ' !! আর সাধারণ অনমুভবী লোক যাঁরা within the domain of mind পড়ে আছেন, যাঁদের মন মনময়, প্রাণময় অন্নময় কোষ আর লিঙ্গ গুহ্য দ্বারের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে তাঁরাই "যত মত তত পথ" কে অমৃত-উপদেশ বলে মাথায় তুলে নাচবেন।

রাগ করো না ভাই, আত্মার অধিরোহনকেই অধ্যাত্মপথ বলে। মনের অধিরোহন বা মন লয়ের Process কে নয়। মন এবং আত্মার মধ্যেও আকাশ পাতাল তফাৎ! **অধ্যাত্মচেতনার সমুন্নত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখ ভাই, ন' দরজা অতিক্রম করে দশমি গলিতে প্রবেশ করার একটা পথই আছে।** যদিও Physical analogy দিয়ে বোঝানো যাবে না, তবুও

আমিও দুই একটা analogy র আশ্রয় নিচ্ছি! তোমার বাড়ীর চারিদিকে ইঁটের প্রাচীর আছে। এখন ঐ প্রাচীরের দিকে নজর দিয়ে প্রাচীর পর্য্যন্ত অনেক উপায়ে পায়ে হেঁটে সাইকেলে বা অন্যভাবে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সদর দরজায় ঢুকবার একটা পথ আছে কি না? সেই পথ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে তিন তলার ঘরটিতে তোমার পড়ার ঘরে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করারও একটা পথ কি না?

মনোময় কোষ পর্য্যন্ত বহু মত' 'হিরণ্ময়ে পরে কোষে ' পথ একটাই

মনে কর কলিকাতায় গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice-chancellor এর সঙ্গে তোমার দেখা করা প্রয়োজন। এখন University পর্য্যন্ত যাওয়ার অনেক উপায় আছে :— পা-দল, গোরুরগাড়ী; ট্রেন, নৌকা ষ্টীমার, এরোপ্লেন, বাস, ট্রাম, যে কোন ভাবে যার যেমন সুবিধা. সেই রকম যানের সাহায্যে কোলকাতায় পৌঁছে, University র Gate পর্য্যন্ত পৌঁছতে পাব। কিন্তু এর মধ্যেও দেখ, যে নদী পথে আসবে সে তো আর ষ্টীমার বা নৌকা যোগে University র Gate পর্য্যন্ত আসতে পারবে না? ট্রেন যোগে যে আসবে, গোরুরগাড়ী, এরোপ্লেন ইত্যাদির সাহায্যেও সরাসরি Gate পর্য্যন্ত আসা যাবে না। ভেবে দেখ, একএকটা উপায় কোলকাতারই বিভিন্ন অঞ্চলের এক একটা Particular স্থান পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে! University এর Gate দিয়ে দেখ একটা পথ, যানবাহনেরও সীমাবদ্ধ উপায়। এইবার Vice-chancellor এর কক্ষ পর্য্যন্ত একটা পথ কি না? যদিও এটাও একটা analogy তাই এটা থেকেও হয়ত ত্রুটি ধরে বলতে পারো Vice-chancellor মশাই তো ভগবানের মত সর্ব্বব্যাপী নন কাজেই তাঁর কাছে যাওয়ার একটা পথ থাকতে পারে কিন্তু সর্ব্যাপী যিনি তাঁর কাছে যাওয়ার নানা উপায়। কিন্তু একটু মাথাঠাণ্ডা করে বিচার করে দেখলেই বুঝতে পারবে তিনি সর্ব্যাপী হলেও তাঁর সেই সর্ব্যাপক চিদ্ সত্ত্বা অনুভব করতে হ'লে তোমার মনকে dilute করে dissolve করে যে চিৎকন্ আত্মা (Spirit force) দিয়ে অনুভব করা যাবে তার একটা পথই আছে। তোমার দেহ সর্ব্যাপী নয়, তোমার মনও সর্ব্যাপী নয়; তাছাড়া মন সেখানে যায় না। 'যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'। এই সীমাবদ্ধ দেহ সীমাবদ্ধ মনের গণ্ডী এবং মনের বন্ধন কাটিয়ে মুক্তআত্মা দিয়ে পরমাত্মাকে অনুভব করার পথ একটাই।

যাক্, আসল প্রশ্নে আসা যাক্। তুমি বলছো, রামকৃষ্ণের মত লোক যখন তন্ত্রমতের সাধনা করে গেছেন, তখন এও নিশ্চয়ই একটা পথ! কিন্তু আমার মতে যত বড় লোকেরাই ঐ পথের সাধনা করুন না কেন ওটা কুপথ এবং বিপথ !! সত্য বটে, ভৈরবী ব্রাহ্মনী দ্বারা প্ররোচিত হয়ে, 'এক পূর্ণযৌবনা বিবস্ত্রা নারীর কোলে বসা', 'কুকুর শেয়ালের এঁটো খওয়া' 'শবের খর্পরে মৎস্য রান্না খাওয়া' 'গলিত আম-মহামাংস (নরমাংস) ভক্ষণ' এবং 'একজন ভৈরবীকে পাঁচসিকা পয়সা দিয়া বীরভাবের সাধন, যোনিমন্থন' ইত্যাদি তন্ত্রসাধনার নামে নানা জঘন্য ক্রিয়া কলাপ রামকৃষ্ণ করেছিলেন [স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ'' দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯—২০৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য], তাই বলে তাঁর জ্ঞানের অপরিপক্ক অবস্থার ঐ সকল নির্ব্বোধ আচরণ কোন প্রকারেই শ্রেয়োলাভের পথ হয়ে যাবে না। কিছু মনে করো না ভাই, বুদ্ধি বিচার বিবেক বাদ দিয়ে 'রামকৃষ্ণের মত লোক বলে গেছেন' 'শিব বা ব্যাসের মত লোক বলে গেছেন' ইত্যাদি যে তোমরা বল, এবং নিজেদের বিবেকে বাধলেও, বিবেকের টুঁটি চেপে তা অনুসরণ কর, এ হ'ল তোমাদের ক্ষয়রোগ ; এই ক্ষয়রোগই তিলে তিলে তোমাদেরকে ক্ষয় করে দিচ্ছে। তুমি যদি 'রামকৃষ্ণের মত লোক বলে গেছেন' প্রমাণ দেখাতে চাও, আমি তেমনি মহর্ষি দয়ানন্দের মত লোকের নাম করে বলতে পারি, তিনি ঐ জঘণ্য তন্ত্রমত খণ্ডন করে গেছেন। মহর্ষি দয়ানন্দজী সারা ভারতের পণ্ডিত এবং সাধু সমাজকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করে মূর্ত্তিপূজা যে মিথ্যা এবং বেদ-বহির্ভূত, তা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। তোমাদের ঐ 'যুগাবতার' তখন ত সাহসই করেন নি ঐ বেদজ্ঞ দিগ্বিজয়ী মহর্ষির সঙ্গে বাক্যালাপ করতে!

তাছাড়া তোমাদের ঐ 'যুগাবতারের' গুরু, যাঁর কাছে এসে রামকৃষ্ণ সত্যকার অনুভবী মহাপুরুষ হতে পেরেছিলেন, রক্ষা পেয়ে ছিলেন তন্ত্রসাধনা হনুমৎসাধনা মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি লক্ষগণ্ডা সাধন পথ অর্থাৎ বিপথকুপথের পাকচক্র হ'তে, সেই তোতাপুরীরও পরমগুরুর পরমগুরু স্থানীয় যিনি, যাঁকে বলা হয় 'শঙ্করো শঙ্করো সাক্ষাৎ', সেই জ্ঞানাবতার আচার্য্য শঙ্করের মত লোক ঐ জঘণ্য তন্ত্র-কৌলমত খণ্ডন করে গেছেন এবং ঐ সর্ব্বনাশা মত পথ দেশের ও জাতির সর্ব্বনাশ করে থাকে বলে, উচ্ছৃঙ্খল ভোগ-প্রবৃত্তির পঙ্কিল-আবর্ত্তে, বিচার বুদ্ধিহীন অতিবিশ্বাসী সরল লোকদেরকে ডুবিয়ে মারে বলেই না তিনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে

রাজা সুধন্বার সৈন্য দিয়ে বনজঙ্গল পর্ব্বত খুঁজে খুঁজে, ঐ সব কৌল, কাপালিক, তান্ত্রিক অঘোরীর দলকে উচ্ছেদ করে দিতে চেয়েছিলেন ? রামকৃষ্ণের চেয়ে আচার্য্য শঙ্কর এবং মহর্ষি দয়ানন্দ কি কম authority ?

রামকৃষ্ণ করে গেলেও তন্ত্রমত কুপথ এবং বিপথ

তোতাপুরীর কাছে ব্রহ্মদীক্ষা লাভের পর তান্ত্রিকী ক্রিয়া পদ্ধতির জঘণ্যতা বুঝতে পেরেই না পববর্ত্তীকালে রামকৃষ্ণ ঐ মতকে 'খিড়কি দোরের সাধনা' বলেছিলেন ?

'রামপ্রসাদও ঐ তন্ত্রসাধনা মূর্ত্তিপূজা কবে গেছেন'—তোমার এ কথা রামপ্রসাদ সম্বন্ধে তোমার অজ্ঞতাই প্রমাণ করে। রামপ্রসাদ মূর্ত্তিপূজাও করেন নি, কিংবা পশুবলি, নরকপালে মদ্যপান, ভৈরবীচক্রে বসে যোনিলিঙ্গ পূজা ইত্যাদি নানারকম ভ্রষ্টাচাব কবে যান নি। নানাবকম জনশ্রুতি এবং Cinema theatre এর কাল্পনিক গালগল্প এর উপব ভিত্তি করে তোমরা রামপ্রসাদ সম্বন্ধে ধারণা করে তাঁর অপমানই ক'রছ। তাঁর দুই-চারটি গান পর্য্যালোচনা করলেই বুঝতে পারবে তাঁব সাধনার ধারাটি কি ?

কৌল কাপালিক তান্ত্রিকের দল 'কারণবারি' নাম দিয়ে পিপে পিপে মদ গিলে মরে, আর মহাপুরুষ রামপ্রসাদ কি বলছেন শোন —

(ক) ওরে সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে,
মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে।
গুরু দত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে মা,
আমার **জ্ঞান-শুঁড়িতে** চুয়ায় ভাটি
পান করে মোর মন-মাতালে।
মূলমন্ত্র যন্ত্রভরা, শোধন করি বলে তারা মা,
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্বর্গ মেলে।

রামপ্রসাদের এই মাতাল হওয়া মানে, **মায়ের দিকেই তাল থাকা,** সম্পূর্ণ **মাতৃময়, ইষ্টময় হওয়া।**

(খ) রামপ্রসাদের ঐ তারামা বা কালিটি যে কোন জড়মূর্ত্তি নয় তা বুঝে দেখ,— কে জানে গো কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দর্শন ;
মূলাধারে সহস্রারে, সদা যোগী করে মনন।

তারা পদ্মবনে হংসসনে, হংসীরূপে করে রমন,
আত্মারামের আত্মা কালী প্রমান প্রণবের মতন,
তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।

(গ) মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে, ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে,
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতিত অভাবে কি ধরতে পারে?
মন অগ্রে শশী বশীভূত, কর তোমার শক্তিসারে,
ওরে কোটার ভিতর চোরকুটরী, ভোর হ'লে সে লুকোবেরে!
ষড়দর্শনে দর্শন, মিলে না, আগম নিগম তন্ত্রসারে,
সে যে ভক্তিরসের রসিক সদানন্দে বিরাজ করে।
সে ভাব লোভে পরম যোগী যোগ করে যুগ যুগান্তরে,
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে।
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি বুঝরে মন ঠারে ঠোরে।

রামপ্রসাদের সাধনা, ব্রহ্ম সাধনা

রামপ্রসাদের ঐ গানগুলির মধ্যে তাঁর **অন্তরপথে ব্রহ্ম সাধনারই পরিচয়** পাওয়া যাচ্ছে। কোন জড়মূর্ত্তিপূজা, বহিরাচার বা ভোগমূলক তন্ত্রের কোন গন্ধ পাওয়া যায় কি?

যাঁদের জন্মান্তরীণ সাধনবল থাকে, তাঁরা ভুলক্রমে ভণ্ডগুরু বা ভৈরবী-মায়েদের পাল্লায় পড়ে, প্রথম জীবনে তান্ত্রিক সাধনা সুরু করলেও, আসলে তাঁদের জিতেন্দ্রিয়তা এবং স্বাভাবিক মনস্থৈর্য্যের ফলে, কুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধা হয়, তাঁরা সিদ্ধিলাভ করে থাকেন ষট চক্র ভেদ ক'রে। এঁদেরকে তুমি তান্ত্রিক বলতে পারো না। প্রকৃতপক্ষে এঁদের সাধনার ধারা বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করলে বোঝা যাবে, এঁদের সাধনা প্রাণযোগের সাধনা, ষট্‌চক্র ভেদ করে ব্রহ্ম সাধন। শ্যামা শ্যাম, কালীকৃষ্ণ এঁদের কাছে অভেদ।

এঁদের প্রথম জীবনে কোন মূর্ত্তি নিয়ে সাধনায় হাতে খড়ি হলেও, ঐ মূর্ত্তিপূজা ধরে কখনও সিদ্ধিলাভ হতে পারে না।

রামপ্রসাদ কোনদিনই **জড়োপাসক ছিলেন না**। কালীমূর্ত্তির পায়ে তোমাদের মত রাশি রাশি ফুল ছড়িয়ে, পাঁঠাবলি দিয়ে, তান্ত্রিক কৌলদের মত

নিজের রসনা পরিতৃপ্তি করতেন না। রামপ্রসাদ **অন্তর পথে** কুণ্ডলিনীশক্তিকে গুরুকৃপায় জাগ্রত করে **ব্রহ্মসাধনাই** করেছিলেন ; মা বললে অত্যন্ত নৈকট্য এবং প্রিয়ত্ব বোধ জাগে তাই ইনি ব্রহ্মকেই মা বলতেন 'ব্রহ্মসনাতনী ওমা !' **উপনিষদের ব্রহ্ম আর রামপ্রসাদ রামকৃষ্ণের মা—একই কথা।** ব্রহ্মজ্ঞানের পরও তাই এঁরা যখন তবুও 'মা, মা' করেছেন, জড়বুদ্ধি জড়োপাসক ভক্তবৃন্দ এবং সম্প্রদায়ীরা, প্রথমজীবনে এঁরা যে **পুতুলখেলা** খেলেছিলেন, সেই **পুতুলকেই** কিংবা অনাহতচক্রের Presiding Diety কেই, নিজেদের সীমায়িত বুদ্ধিমত '**মা' বলে Confuse করে বসে আছে !! তারই ফলে যত অনর্থ** !!!

' ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে '?

রামপ্রসাদ (জড়মূর্ত্তি উপাসনা তো দূরের কথা), মাটিকাঠ পাথরের পুতুল পূজা এবং সকল রকমের বহিরাচার এবং পাঁঠাবলিকে কীভাবে ধিকৃত করেছেন দেখ :—

(ঘ) মন, তোর এত ভাবনা কেনে, একবার কালী বলে বসরে ধ্যানে।
জাঁক জমকে করলে পূজা অহংকার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা, জানবে নারে জগজ্জনে,
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে ?
তুমি মনোময় প্রতিমা করি বসাও হৃদি পদ্মাসনে।
আলোচাল আর পাকা কলা কাজ কিরে তোর আয়োজনে,
তুমি ভক্তি সুধা খাইয়ে তাঁরে তৃপ্ত কর আপন মনে।
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো কাজ কিরে তোর সে রোস্নাইয়ে,
তুমি মনোময় মানিক্য জেলে, দাওনা জলুক নিশিদিনে।
মেষ ছাগল মহিষাদি কাজ কিরে তোর বলিদানে,
তুমি জয় কালী জয় কালী বলে, **বলি দাও ষড় রিপুগণে**। ইত্যাদি

(ঙ) মন তোর এই ভ্রম গেল না, কালী কেমন চেয়ে দেখলি না।
ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি মন তা জান না,
মাটির মূর্ত্তি গড়ে রে মন করতে চাও তাঁর উপাসনা ?
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত রত্ন সোনা,
কোন লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয় দিয়ে ছার মাটির গয়না ?
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা ক্ষীর সর মিছরি ছানা

কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস তাঁয় আতপচাল আর মুগ ভিজানা ?
ত্রিভুবন যে মায়ের ছেলে তাঁর কাছে কি পর ভাবনা,
কেমনে বলি দিতে চাস তাঁয় মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা ?
প্রসাদ বলে ভক্তিমন্ত্র কেবল রে তাঁর উপাসনা
তুমি লোক দেখানো করবে পূজা মা তো আমার ঘুষ খাবে না ?

ঐ সমস্ত থেকেও যদি মহাপুরুষ রামপ্রসাদের সাধনার ধারা বুঝতে না পারো, কালীতন্ত্র, উড্ডীশ তন্ত্রের উপর ভিত্তি করে ব্যভিচারী কৌল তান্ত্রিকরা শ্মশানে ভৈরবী চক্রে বসে যে সাধনা করে, তার সঙ্গে তফাৎটা না বুঝতে পারো, তাহলে ভাই মুগুর দিয়ে বোঝালেও তুমি বুঝতে পারবে না।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি, 'বজ্রযান' বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের মত থেকে উদ্ভূত ঐসব তন্ত্রমত 'রুমালের বিড়াল বাখ্যা' বাগীশ পণ্ডিতদের কৃপায় একটা আধ্যাত্মিক রূপ পেলো। রামপ্রসাদাদি মহাপুরুষদের ভাবধারায় পুষ্ট হয়ে সম্প্রদায়ী পণ্ডিতরা এই তন্ত্র মতকে নানা বৈদান্তিক এবং যৌগিক বাখ্যা দিয়ে লোকপ্রিয় করে তুলেছে—তবুও ঐ মত এবং তার সাধনার পদ্ধতিগুলি এক একটি বিষের নাড়ু! বিষ্ণুভক্তদের দশাবতারের অনুরূপ দশমহাবিদ্যা শাক্তরা আবিষ্কার করলো! তোড়লতন্ত্র নামে এক গ্রন্থে লিখে ফেললো—

'তারাদেবী মীনরূপা বগলা কূর্ম্মমূর্ত্তিকা,
ধূমাবতী বরাহঃ স্যাৎ ছিন্নমস্তা নৃসিংহকা।
ভুবনেশ্বরী বামনঃস্যাৎ মাতঙ্গী রামমূর্ত্তিকা—
ত্রিপুরা জামদগ্ন্যঃস্যাৎ বলভদ্রস্ত ভৈরবী।
মহালক্ষ্মী ভবেৎ বুদ্ধো দুর্গাস্যাৎ কল্কিরূপিনী'
স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্ণমূর্ত্তিসমুদ্ভবাঃ'।

তান্ত্রিকদের শিবের নামে গ্রন্থ রচনার কৌশল

সম্প্রদায়ীরা অগ্রপশ্চাৎ না মিলিয়ে 'নিত্যতন্ত্র' বলে আর এক তন্ত্রে লিখলো,

'কৃষ্ণস্ত কালিকাদেবী, শ্রীরামস্তারিণী তথা
ভার্গবঃ ষোড়শী বিদ্যা বামনো ভুবনেশ্বরী।
মৎস্যস্ত বগলাদেবী বরাহশ্ছিন্ন মস্তিকা
ধূমাবতী কূর্ম্মরূপা নৃসিংহো ভৈরবী স্বয়ং।

বুদ্ধরূপা মহালক্ষ্মী মাতঙ্গী কল্কিরূপিণী
এতে দশমহাবিদ্যা অবতারা হরের্দ্দশঃ'।

ভাল করে Mark করো, একই শিবের রচিত যদি তোমাদের ঐ তন্ত্র মহাগ্রন্থ, তাহলে দুটি তন্ত্রে দু'রকম কথা কেন? তোড়ল তন্ত্রে তারা মীনরূপা, আর নিত্য-তন্ত্রে হ'ল শ্রীরামস্তারিণা তথা! এক মাত্র 'মহালক্ষ্মী বুদ্ধরূপ' আর 'কালীকৃষ্ণরূপ'—ঐ দুটি সামঞ্জস্য ছাড়া আর সবই উল্টোপাল্টা!! কারণ, কামাখ্যাতে বসে যে তান্ত্রিকচূড়ামনি শিবের নাম দিয়ে দশ অবতারের সঙ্গে দশ মহাবিদ্যার কল্পনা করেছে। আর বাংলাদেশের যে কৌলাবধূত 'শিবোবাচ' বলে দশমহাবিদ্যাকে দশ অবতারের Representative করে সমন্বযের তারটি' 'Intune করা চেষ্টা করেছে, সেই দুই জনের মধ্যে যোগাযোগ থাকবে কি করে? তাই উভযেই শিবের নাম দিয়ে তন্ত্র রচনা করলেও উভয় শিব বাক্যে মিল নেই!!!

(১) 'কালী হলি মা রাসবিহারী, নটবরবেশে বৃন্দাবনে' (২) হৃদয় রাস-মন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হয়ে'—অনুভবী পুরুষদের এই সব সাম্য এবং সমন্বয়েব বাণীতে সমৃদ্ধ করে, পণ্ডিতদের অঘটন ঘটন পটীয়সী বাখ্যা কৌশল তন্ত্র শাস্ত্রকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। বামাচারের নায়িকা সাধন ও লিঙ্গ গুহ্য পূজাকে, বীরাচারের উর্দ্ধরেতা হওয়ার সাধন প্রণালীতে উন্নীত করবার জন্য এঁরা ব্যর্থ প্রয়াস করেছেন, তার থেকেই দিব্যাচারের নাম দিয়ে পঞ্চমকারের আধ্যাত্মিক বাখ্যা আরোপ করে চৈতন্যময়ী মাতৃসাধনায় সমুন্নত করবাব চেষ্টা করেছেন! কিন্তু, **তবুও হা হতোস্মি! ঐ পাকচক্রময় সাধনা করতে গিয়ে হাজার হাজার সত্যসন্ধানী জৈবলালসার পঙ্কুকুণ্ডে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে!** তথা কথিত 'খিড়কী দোরের সাধনা' করতে গিয়ে 'সদর দরজার'ও সন্ধান পাচ্ছে না, অন্দর মহলেও প্রবেশ করতে পারছে না; 'খিড়কি দোরে' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সারাগায়ে নোংরা মেখে কলুষ মলিন রুগ্ন চিত্তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই 'দুর্ভাগাদের' কাল কাটছে!!!

যাই হোক, কি ভাবে পঞ্চমকারের তত্ত্ব ও ভাব সমৃদ্ধ Interpretation যোজনা করা হয়েছে দেখ:— (১) যদুক্তং পরমং ব্রহ্ম নির্বিকারং নিরঞ্জনং
তস্মিন্ প্রমদনং জ্ঞানং তন্মদ্যং পরিকীর্ত্তিতম্
[কৈবল্যতন্ত্র]

নির্বিকার নিরঞ্জন পরব্রহ্মেতে যোগবল দ্বারা যে প্রমদন (জ্ঞান), তার নাম **মদ্য**।

(২) মা শব্দাৎ রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনাপ্রিয়ে
সদা যো ভক্ষয়েৎ দেবি! স এব **মাংস** সাধকঃ [আগমসার]

(৩) গঙ্গা যমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ—দ্বৌ চরতঃ সদা
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেৎ **মৎস্য** সাধকঃ।

(৪) সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ
আত্মা তত্র বৈ দেবেশি! কেবলং পারদোপমম্।
সূর্য্য কোটি প্রতীকাশং চন্দ্র কোটি সুশীতলং
অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনী যুতম্
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র **মুদ্রা** সাধক উচ্যতে।

(৫) মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধিঃ ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভং।
রেফস্তু কুঙ্কুমাভাসঃ কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতঃ
মকারশ্চ বিন্দুরূপো মহাযোগৌ স্থিতঃ প্রিয়ে।
আকার হংসমারুহ্য একতা চ যদা ভবেৎ
তদাজাতং মহানন্দং ব্রহ্মানন্দং সুদুর্লভং।

অর্থাৎ "এই মিথুন তত্ত্বই সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের কারণ। শরীরাভ্যন্তরে নাভিচক্রস্থিত কুণ্ডমধ্যে কুঙ্কুমাভাস আরক্তবর্ণ রকারে (তেজস্তত্ত্বের) সহিত অকাররূপ হংস অর্থাৎ অজপারূপ শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা যখন আজ্ঞাচক্রস্থিত মহাযোনির (ব্রহ্মযোনি) সহিত বিন্দু স্বরূপ মকারের মিলন অর্থাৎ আত্মা সহস্রারে আত্মাতে রমন বা মৈথুন করে, তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়, ইহাই মৈথুনতত্ত্ব"

দশমহাবিদ্যার মূর্ত্তিগুলির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হ'ল এই:—

কালী—'সৎ' সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী, ত্রিগুণময়ী, অনন্তকালরূপিনী কার্য্যরূপা প্রকৃতি। গলার একশত আট মুণ্ডমালা হ'ল মনের একশত আট পশুবৃত্তি নিধনের প্রতীক। খড়্গ=জ্ঞান-অসি; বিস্তারিত জিহ্বা=অন্তরমুখে খেচরী মুদ্রার প্রতীক।

কোনতত্ত্ব অবলম্বন করে, কি রকম ভাবে সাধনা করলে, অনাহত চক্রের Presiding Diety পাওয়া যায়, তার নক্সা, পুঙ্খানুপুঙ্খচিত্র সুকৌশলে মূর্ত্তি

মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এইভাবেই তারা—'চিৎ' জ্ঞানময়ী তত্ত্বময়ী কারণরূপা প্রকৃতি। ছিন্নমস্তা—প্রচণ্ড বিশ্বপালিকা শক্তির প্রতীক। একটি জীব অপর জীবকে আহার করে পুষ্ঠ হয়, নিজের মুণ্ড কেটে নিজেই রক্তপান, ভোক্তা, ভোগ্য, ভোগ (রক্তের ত্রিধারা) এর লয়, ভয়ঙ্করী ভীষণা ভাবটি এতে প্রকাশিত। ধূমাবতী—মূর্ত্তির মধ্যে কালশক্তির মহাপ্রলয়কারিণী ভাবটি ফোটানো হয়েছে। ভোগশেষ হেতু জরাজীর্ণা বৃদ্ধা, লম্বিত পয়োধরা পক্ককেশা, যমের কাকধ্বজ প্রলয় রথে আরূঢ়া; বিশ্বোদরী, 'কুলা' হস্তে বিশ্বের বীজ সংগ্রহ করে নিজের বিবাট মুখ গহ্বরে ভরছে অর্থাৎ সমস্ত বিশ্ববীজই কারণরূপে উদরে লীন হচ্ছে। ইত্যাদি।

তন্ত্র মত পতনের ঘুর্ণাবর্ত্ত!

এখন ঐ তত্ত্বগুলি বুঝে, মূর্ত্তির মধ্যে যে সমস্ত সাধনার Process দেখানো হয়েছে, তাই ধরে সাধনা করাটাও মূর্ত্তিপূজা নয়! তাতেও একজনকে অন্তর-পথে ডুব দিয়ে, সেই ধ্যানধারণা তত্ত্ববিচারের মধ্য দিয়েই এগোতে হবে। ফুল জলনৈবেদ্য সহ কোন মূর্ত্তির কাছে ঢাকঢোল বাজিয়ে নিশ্চয়ই নয়!!

ঐ সব উচ্চ আধ্যাত্মিত তত্ত্ব বোঝার জন্য যে নির্ম্মল বুদ্ধির প্রয়োজন আর ঐ তত্ত্বসাধনার জন্য যে সদাচার, ব্রহ্মচর্য্য, জিতেন্দ্রিয়তা, তীব্র ঈশ্বরানুরাগ এবং জ্বলন্ত তপোনিষ্ঠার প্রয়োজন, তা ঐ সব তান্ত্রিক কৌলের দল যারা গলায় হাড়মালা, ললাটে ভীষণ সিন্দুর ফোঁটা, হস্তে নরকপাল সহ ঘুরে বেড়ায় কিংবা ভৈরবীচক্রেবশে মদপান করে তাদের মধ্যে নেই। ওদের মধ্যে একটু যারা লেখাপড়া জানা, তারা মদ খেয়ে মত্ত অবস্থাতে রামপ্রসাদের আধ্যাত্মিক গান-গুলিও গায়, মুখস্থ করা তত্ত্ববুলি ভক্তশিষ্যকে কপচায়; কিন্তু তাদের মূর্ত্তিপূজা শ্মশানে বাস, কারণবারি পান, নরকপাল হস্তে ভিক্ষাবৃত্তি, শবমাংস ভক্ষণ এবং ভৈরবীচক্রের অনুষ্ঠান প্রভৃতি জীবনচর্য্যা দেখলেই বোঝা যায়, তারা উচ্ছৃঙ্খল ভোগের পঙ্ককুণ্ডেই ডুবে রয়েছে! তোমরা যারা তাদের মুখের তত্ত্ব বাখ্যা আর রামপ্রসাদী গান শুনে, জবাবিল্বদলে পূজা আর পাঁঠাবলির ধুম দেখে আকৃষ্ট হও, তোমরাও বিভ্রান্তের ঘুর্ণাবর্ত্তে পড়ে পাক খাচ্ছ!

আমি সৌভাগ্যক্রমে সন্তসদ্‌গুরুর কৃপালাভ করায়, ঐ সমস্ত তান্ত্রিক সাধুদের সাধনপ্রণালীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার দুর্ভাগ্য আমার হয় নি। কিন্তু

আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের মুখে ওদের লীলাখেলার কথা শুনেছি। ঐ ভদ্রলোকটি বড় বিদ্বান ছিলেন। এক তান্ত্রিকগুরু করে কামরূপ কামাখ্যা তারাপীঠ ঘুরে ফিরে শেষ জীবনে হৃতসর্বস্ব মদ্যপায়ী, একটি রোগের ডিপোতে পরিনত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলি বর্ণনা করেছিলেন, তন্ত্রগ্রন্থগুলি পড়তে দিয়ে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, "আর যাই করো দাদু কোনদিন কোন তান্ত্রিকের কাছে যেও না। ওদের মুখে তত্ত্বব্যাখ্যা, ভেতরে অনাচারের চুড়ান্ত! কারও যদি রোগ সারানো বা ভাগ্যগননার কোন তুক্ জানা থাকে তো তাই দিয়ে কিংবা পূর্ব্বজন্মের তপস্যার ফলে কুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধা হয়ে একটু আধটু বিভুতি থাকে তো, তাই দিয়ে লোক আকৃষ্ট করে, হ্রীং শ্রীং ক্রীং গোচের একটা মন্ত্র দিয়ে শিষ্য করে ফেলে; তারপর অন্তরঙ্গতা হ'লে ভৈরবীচক্র অনুষ্ঠানে নিয়ে যায়। বীরভুম কামাখ্যা থেকে জ্বালামুখী পর্য্যন্ত সব রকম তান্ত্রিক সাধকদের সাধনার ধারা সম্বন্ধে আমার Practical জ্ঞান আছে। তড়িৎ সিদ্ধিলাভের কামনায়, তন্ত্রসাধনা করে আজ দেখতে পাচ্ছ আমার বিদ্যা মান সম্ভ্রম স্বাস্থ্য সম্পদ সব খুইয়ে রুগ্ন জীর্ণ ঘৃণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছি!" আমি তাঁকে বললাম, "সেকি দাদু! রামকৃষ্ণদেবও যে তন্ত্র সাধনা করেছেন?" ইনি তান্ত্রিকদের উপর পরে এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন যে তান্ত্রিক কাউকে দেখলেই মারতে ছুটতেন! আমার প্রশ্ন শুনে ক্রোধভরে বললেন, "করেছেন ত কি হয়েছে? রামকৃষ্ণের মত লোক করে গিয়েই তো সকলের মাথা চিবিয়ে খেয়েছেন। যেহেতু তিনি করে গেছেন, নিশ্চয়ই কোন সত্য আছে, এই লোভে, তান্ত্রিকদের ব্যভিচারের কথা শুনলেও অনেকে গুহ্য সাধনা করতে ছোটে আর অন্তিমে আমার দশা প্রাপ্ত হয়!! রামকৃষ্ণকেও ভৈরবী মা শবমাংশ মুখে করিয়েছিল, বিবস্ত্রা যুবতী নারীর কোলে বসিয়েছিল। কিন্তু তখন কি অত বুঝি যে বাল্যকালেই যাত্রাদলের শিব সাজতে গিয়ে যার 'ভাব' হয়, সে লোককে মদমাংস শবসাধনা যাই করাক না কেন তাতে তাঁর কি? তাই উলঙ্গ মেয়ের কোলে বসেই তাঁর ভাব সমাধি হয়ে গেছলো। তাই দেখে হাজার হাজার লোক যদি ঐ উচ্চকোটির মহাত্মার মত সাধানা করতে যায়, পূর্ণযুবতী উলঙ্গ মেয়ে, কেউটে সাপ নিয়ে যদি খেলতে যায় তো তার দশা কি হবে? আরে ভায়া, ঐ রামকৃষ্ণঠাকুরটিই তন্ত্রমতকে আর এক ধাপ আস্কারা (Indulgence)

দিয়ে সর্বনাশ করে গেলেন। সেই তো বাপু তোর পিয়াস মেটেনি, তোতাপুরীর কাছে ব্রহ্মদীক্ষা পেয়ে তবে তুই সিদ্ধকাম হলি! প্রথমেই যদি ভৈরবীমাকে ঠেঙ্গা নিয়ে তাড়াতে পারতেন তাহলে আমাদের অনেক উপকার হতো! তন্ত্রসাধনার Practice করে Ramkrishna set a very bad example, an example which may mislead thousands of young aspirants!"

আমার ঐ আত্মীয়টির কথা মনে ছিলো বলে, ঐ যে পুঁটিরাম পাত্র ওখানে বসে আছে, বহু বছর আগে, ও ওর এক তান্ত্রিক সাধুমার অনেক অলৌকিক গল্প করলেও আমি প্রথমে যেতে চাই নি। তারপর ওর অনুরোধে একটিবার গেছলাম। তাঁর অলৌকিক সিদ্ধাই দেখলাম। ভাগ্যগণনা ঔষধ দেওয়া মনের কথা বলা (thought-reading) এ সব তাঁর অভ্রান্ত হতো।

বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ তিনি আমাকে বলে উঠলেন, "আমাকে তান্ত্রিক বলে ঘৃণা করিস্ না। ও সব মূর্ত্তিটুর্ত্তি কিছু নয়। আমার পা পূজা হলে তবে সেই ফুলে মন্দিরে দেবীর পূজা হয়"। এই বলে তিনি নিজের পা পূজা করে দেখিয়েছিলেন। তাঁর এই পা-পূজাকে তিনি বলতেন 'আত্মপূজা'। তিনি বলেছিলেন, 'কুণ্ডলিনী হ'ল গৌরী'। ছয়টা চক্র ভেদ করে ঐ গৌরীকে সহস্রারে সদাশিবের সঙ্গে রমণ করাতে হ'বে, ইত্যাদি…"। রাত্রে তাঁর আশ্রমে শুয়ে আছি, পুঁটিরামও পাসে আছে। মধ্যরাত্রে ঘুম থেকে উঠে দেখি পাশে পুঁটিরাম নেই। পায়খানা বসবার জন্য পুকুরের দিকে যেতে যেতে নিকটবর্ত্তী শ্মশানে কয়েকজন লোকের মৃদুগুঞ্জন শুনে সন্তর্পনে এগিযে গেলাম। দেখলাম সাধুমাও সেই দলে আছেন। ভাবলাম ভক্তবৃন্দকে হয়তো কোন গুহ্য সাধন তত্ত্বের শিক্ষা দিচ্ছেন, disturb করা ঠিক নয়। কাজেই চুপিসারে পুনরায় ফিরে এলাম। পরদিন সকালে পুঁটিরামকে অনেক অনুরোধ করায় সে বললো, "মা আমাদেরকে 'চক্রে' বসিযেছিলেন। শহরের ভক্ত বাবুরাও 'চক্রে' বসেছিলেন। হ্রীং শ্রীং ক্রীং মন্ত্রে শোধন করে নর কপালে তিনি কারণবারী ঢেলে দেন আর জপ করতে করতে আমরা সবাই খাই"। পুঁটিরামকে বললাম, "তুমি মদ খাও?" পুঁটিরাম লজ্জিত হয়ে উত্তর দিল, "শোধন করে মা দেন, তখন ত আর মদ থাকে না। মন্ত্রজপের পর কারণ বারি (!), শহরের বাবুরাও তো খান"। আমি আর কোনদিন ঐ সাধুমার ছায়াও মাড়াই নি। আর ঐ পুঁটিরাম 'সোধন করা কারণবারি' খেয়ে

খেয়ে কি রকম দশাপ্রাপ্ত হয়েছিল নরেশবাবু, গৌরবাবু আপনারা তো দেখেছেন ? আমি অনেক কষ্টে ওকে নানারকম বুঝিয়ে ঐ জঘন্য তন্ত্রসাধনা ছাড়িয়েছি। আজ নতুন জীবনের সন্ধান পেয়ে আনন্দে আছে। আর ঐ কোনে বসে আছেন যে নিয়োগী মশাই, উনিও প্রথম জীবনে তান্ত্রিক সাধনা করেছিলেন, বার বছর কামাখ্যাতে ছিলেন ; তারপর দেশে ফিরেন গলায় হাড়মালা, হাতে করঙ্গ, ভৈরব-মূর্ত্তি সেজে ; এদিকে মদ গিলে গিলে ক্ষয়রোগ দেখাদিয়েছিল। তারপর এক সন্তের সংস্পর্শে এসে আজ স্বাস্থ্য, সম্পদ, শ্রী, আনন্দ সবই ফিরে পেয়েছেন। তান্ত্রিক গুরুর কাছে উনি নাম পেয়েছিলেন সহজানন্দ নাথ। আপনি বলুন তো নিয়োগী মশাই আপনার তন্ত্রসাধনার অভিজ্ঞতাটা, মানে, আপনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরেফিরে. তান্ত্রিক সাধু আর তাদের অনুগামীদের যে সাধন রহস্য দেখেছেন, তার একটু বর্ণনা দিন না দয়া করে। তাহলে হয়ত আমার সরলমতি ভাইদের তন্ত্র-fobia টা যেতে পারে !

নিয়োগী মহশাই (সহজানন্দ নাথ) :— তন্ত্র গ্রন্থগুলি, অন্ততঃ মহর্ষি দয়ানন্দের "সত্যার্থ প্রকাশের" 'বামমার্গ নিরাকরণম্' প'ড়ে দেখলেই এই জঘন্য মত পথের অনেক কিছুই জানা যাবে। তন্ত্র সাধনার নামে যা চলে তা অত্যন্ত অশ্লীল, আমি সর্ব্বত্র ঐ দেখেছি। যাঁদের জন্মান্তরীন সাধন সংস্কার থাকে তাঁরা কিছু কিছু সিদ্ধিলাভ করেন মাত্র। কিন্তু এ সিদ্ধাই ও ষট্‌চক্রের সাধনা করে হয়। ভৈরবীচক্র শ্মশান জপ শব সাধনা কিংবা কোন কালীমূর্ত্তি পূজা করে নয়। তান্ত্রিকরা মুখে বড় বড় তত্ত্বকথা ব'লে, রামপ্রসাদী গান গাইতে গাইতে দরবিগলিত অশ্রু হয়ে যাবে কিন্তু গুপ্তভাবে মদ্যপান এবং ব্যভিচারও করবে। ভৈরবী চক্রের অনুষ্ঠান নানা ধরণের আছে—ভূমিতে একটা সিন্দুর-কৌটা দিয়ে ত্রিকোণ চতুষ্কোণ আদি এঁকে তাতে—মদের কলসী বসায়, অনেক রকমের ক্রীং হ্রীং দ্রং মন্ত্র লিখে পূজা করে ঐটিকে পঞ্চোপচারে। মদে আঙুল ডুবিয়ে বলে 'হে মদ্য ! ব্রহ্মশাপং বিমোচয়' (!) তুমি ব্রহ্মাদির শাপ থেকে মুক্ত হও !! মদ আবার শোধন করলে শুদ্ধ হয় ? তার আবার ব্রহ্মশাপ কি ? কিন্তু কালের রাজত্বের এমনই খেলা যে তখন এ প্রশ্ন, এ বুদ্ধি বিচার মনেও জাগে নি। তারপর স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের যোনিলিঙ্গ পূজা করে। 'ভৈরবোঽহম্ শিবোঽহম্' ইত্যাদি বলে নরকপালে মদ্যপান করে। উন্মত্ত অবস্থায় যা ঘটে, ক্ষমা করবেন

সে অশ্লীল বাক্য বলতে বাধছে। ঐ সব পাপিষ্ঠ তান্ত্রিকদের রচিত সংস্কৃত মন্ত্র থেকেই অনুমান করে নিন—'অহং ভৈরবস্থং ভৈরবীহ্যাবয়োরস্ত সঙ্গমঃ'।

অন্য কেউ যাতে না বুঝতে পারে এ জন্য এরা মদের নাম দেয় 'তীর্থ', মাংসের নাম 'শুদ্ধি', মৎস্যের নাম 'জল তুম্বিকা', মৈথুনের নাম 'পঞ্চমী'। অঘোরীরা মূত্রবিষ্ঠাও ভক্ষণ করে, নাম দেয় 'অজরী বজরী ক্রিয়া'। এরা ভাবে এতেই এদের সিদ্ধিলাভ হবে—চন্দনবিষ্ঠা সমজ্ঞান আসবে! সরলপ্রাণ রামকৃষ্ণকে ভৈরবী ব্রাহ্মণী এই সব করিয়েছিল ['শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ']! এই তো কিছুদিন আগে আপনাদের শহরের এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ শৈলেনবাবুকে পত্র দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছিল, এক তান্ত্রিক সাধু কি ভাবে তাঁকে সিদ্ধাই পাইয়ে দেওয়ার ছলনায় মূত্র বিষ্ঠা ভোজন করিয়েছে! সে পত্র তো গৌরবাবু দেখেছেন। এই ব্রাহ্মণ কিছুদিন যাবৎ পাগলের মত হয়ে গেছলেন। **ভোগ ভোগের পথেই টানে**। Dark side টা বুঝতে পারলেও মদ্যমাংস মৈথুনের প্রলোভন সজ্জন ব্যক্তিকেও নারকীতে পরিণত করে। ঐ ব্রাহ্মণটি এখন লাল কাপড় পরেন, গলায় রুদ্রাক্ষ, হাতে ত্রিশূল। রাত্রিকালে শ্মশানে গিয়ে অর্দ্ধদগ্ধ মৃতদেহের মাংসহাড় নিয়ে নানারকম তান্ত্রিকী কাণ্ড করেন! কিছুদিন আগেও এই জন্য তিনি শ্মশানে মার খেয়েছেন। ইনি নিজেকে 'পূর্ণাভিষিক্ত' বলে দাবী করেন, ছাই ভস্ম হাড় গুঁড়ো দিয়ে কবচ মাদুলি দেন। মূর্খ লোকেরও অভাব নেই, তারাও এই সব গ্রহণ করে। এই ভাবেই সাধু বাবা সাধু মাদের পসার যায় জমে! আমি জ্বালামুখী, বীরভূম, তারাপীঠ, কামাখ্যা সর্ব্বত্র তান্ত্রিকদের আখড়া ঘুরে ফিরে দেখেছি, সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের নামে অনাচারের আবিলস্রোত ; মুখে তত্ত্বকথা, বাইরে সাধুর সাজ, ভেতরে পাপাচরণ!

রুদ্রযামলতন্ত্র থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে আমি এই অশ্লীল প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই, "রজস্বলা পুষ্করং তীর্থং, চাণ্ডালী তু স্বয়ং কাশী, চর্ম্মকারী প্রয়াগ স্যাৎ রজকী মথুরা মতা" ·····ইত্যাদি। পঞ্চমকারের তো আধ্যাত্মিক বাখ্যা দিয়ে তান্ত্রিক পণ্ডিতরা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন কিন্তু নরাধমদের রচিত এই সব তন্ত্রমন্ত্রের কী আধ্যাত্মিক বা তাত্ত্বিক বাখ্যা দেবেন তন্ত্রপন্থী পণ্ডিতরা? যে সব তন্ত্র বাক্যের অনুবাদ করলে অশ্লীলতা দোষ ঘটে তান্ত্রিকদের মতে কি সেগুলিই শিববাক্য?

তান্ত্রিক পাপিষ্ঠরা মদকে শুদ্ধি' 'বললে হ্রীং শ্রীং ক্রীং মন্ত্রে মন্ত্রপূত করলে তা যেমন শোধন হয়ে গঙ্গাজল বা দুধ হয়ে যাবে না, তেমনি রামপ্রসাদাদি মহাপুরুষদের উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবধারায় পুষ্ট করে নানারকম তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিলেও ঐ সব পাপাচরণ ধর্ম্মাচরণে পরিণত হবে না। আপনারা যে "রামকৃষ্ণের মত লোক তন্ত্রসাধনা করে গেছেন" বলে এত চেঁচাতে থাকেন, আমি জিজ্ঞেস করি, কোন মহাপুরুষ যদি বিষ্ঠাময় পথ বা নর্দ্দমার উপর দিয়ে বিষ্ঠাদি-নোংরা-ময়লা থেকে কৌশলে নিজেকে বাঁচিয়ে চলেও যান, তাহলে কি সে নর্দ্দমা আর নর্দ্দমা থাকবে না ? বিষ্ঠা কি চন্দনে পরিণত হয়ে যাবে ?

গ্রন্থাকার— নিয়োগী মশাই, দয়া করে আলোচনা বন্ধ করুন। অলমিতি বিস্তরেন।

পঞ্চম পুষ্প

প্রশ্নঃ— আপনি বলছেন জড়মূর্ত্তি পূজায় কোন পরমার্থ লাভ হবে না। কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিনী কালী মূর্ত্তির পূজা করেই তো সিদ্ধিলাভ করেছিলেন ?

উত্তর ঃ— কোন কিছুই বিচার শূন্যভাবে গ্রহণ করা উচিত নয়,। Cinema, theatre, সাম্প্রদায়িক রচনার কুহেলি ভেদ করে, রামকৃষ্ণ-ভক্তদের আতিশয্যের কুজ্ঝটিকা ভেদ করে, সত্য নির্ণয় যদিও কঠিন, তবুও একটু বিচার করলে দেখতে পাবে, রামপ্রসাদের মতই, তিনিও তোতাপুরীর নির্দ্দেশ মত উপনিষদ প্রতিপাদিত ব্রহ্ম সাধনা করেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, ভবতারিনী কালীমূর্ত্তি পূজা করে নয়।

সত্য বটে, সাধনার অপরিপক্ক অবস্থায় রামকৃষ্ণ কুসংস্কার বশে 'আমলকী গাছের গোড়ায় ধ্যান করলে মনস্কামনা সিদ্ধ হবে' এই আশায় সেখানে গিয়ে ধ্যান করেছেন ["শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" সাধকভাব, ২য় খণ্ড, ১০৩ পৃঃ], কালী মূর্ত্তির চরণতলেও কেঁদেছেন, ভৈরবী ব্রাহ্মণী দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তন্ত্রসাধনার নামে জঘন্য 'নরমাংস ভক্ষণ', 'বিবস্ত্রা নারীর যোনি মন্থনরূপ বীরভাব সাধনাদিও' ["ঐ. ১৯৯ পৃঃ—২০৬ পৃঃ"] করেছিলেন, "শ্রীশ্রীজগদম্বা সময়ে সময়ে শিবারূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন শুনিয়া এবং কুক্কুরকে ভৈরবের বাহন জানিয়া" শেয়াল কুকুরের এঁটোও খেয়েছেন সিদ্ধি লাভের আশায় [ঐ. ২০৬ পৃঃ], 'প্রেমৈক লোলুপা ব্রজরমণীর' ঢং এ, স্ত্রী বেশে মধুর ভাবের সাধনা করতে হয় শুনে, মথুরবাবুর দেওয়া "বহুমূল্য বারানসী শাড়ী, ঘাগ্‌রা, ওড়না, কাঁচুলি, চাঁচর পরচুলা, এক সুট্ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত" হয়ে স্ত্রী বেশে থাকতেন ও বটে [ঐ. ২৫৯ পৃঃ]—কিন্তু তাই বলে ঐ সব ছেলে খেলা এবং সংস্কারাচ্ছন্ন বালকামি দ্বারা মূর্খ গদাধর, ব্রহ্মজ্ঞ রামকৃষ্ণে পরিণত হন নি।

তাঁর অজ্ঞান অবস্থার ঐ সব মূর্খামি এবং প্রকৃত পরমার্থ লাভের উপায় ও সিদ্ধির পরম অবস্থা—দুটোকেই যদি কেউ confuse করে কিংবা সম্প্রদায়ীদের প্রচার বিভ্রাটে সবই 'যুগাবতারের লীলা' বা 'যুগাবতার যখন করে গেছেন তখন ওগুলোও এক একটা পরমার্থের পথ' বলে ভাবে তাহলে, রামকৃষ্ণকে জড়োপাসক কালীমূর্তি পূজক ইত্যাদি বলা যেতে পারে! কিন্তু প্রচলিত লোকপ্রিয় ধারনা তাঁর সম্বন্ধে এবং ঐসাধন পদ্ধতি সম্বন্ধে যাই হোক—এতে কিন্তু আত্মজ্ঞ রামকৃষ্ণের প্রতি অবিচারই করা হবে।

ধর, সুমন্ত মিশ্র এশিয়ার মধ্যে টেনিস্ চ্যাম্পিয়ন; ছোটবেলা শিশুকালে তিনিও কিন্তু ডাংগুলি বা মার্বেল খেলতেন। তাই বলে কি তুমি বলবে, ঐ ডাংগুলি মার্বেল খেলেই তিনি টেনিস্-চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন? না, টেনিস্-চ্যাম্পিয়ন হওয়ার উপায় ঐ ডাংগুলি, মার্বেল খেলা?

সাম্প্রদায়িক প্রচার-বিভ্রাটের মধ্য থেকে বিচার করে, রামকৃষ্ণের জীবনী পড়লে জানা যায়, বাল্যকাল হতেই তাঁর পূর্ব পূর্ব জন্মার্জ্জিত তপস্যার ফলে তাঁর মধ্যে চৈতন্য শক্তির স্ফুরণ হ'তো, তাঁর ভাব সমাধির মত একটা কিছু হ'ত। তারপর তার দাদা যখন রাসমণির পুরোহিতরূপে দক্ষিণেশ্বরে এলেন, তিনিও এলেন তাঁর সঙ্গে; এখানে গঙ্গার তীরে, স্নিগ্ধশান্ত অনুকূল পরিবেশে তাঁর মধ্যে যে সুপ্ত ভাবধারাগুলি ছিলো, তার উদ্দীপন হ'ল। এ তিনি দক্ষিণেশ্বরে না এসে কামারপুকুরে বসে থাকলেও হ'ত, কালীমূর্তির বদলে ষষ্ঠী দেবীর মূর্ত্তি হলেও হ'ত, না হলেও হ'ত। মূর্ত্তির ওখানে কোন Speciality নেই! তবে জন্মার্জ্জিত সংস্কারানুযায়ী ঈশ্বরকে তিনি রামপ্রসাদের মতই মা বলে ডাকতে ভালবাসতেন। তিনি গঙ্গার তীরে, কখনও বা পঞ্চবটিতে 'মা মা' বলে উতলা হ'য়ে পড়তেন, এবং তাঁব মাকে পাওয়ার জন্য যে যেমন বলেছে সিদ্ধিলাভের উপায় হিসাবে **কুসংস্কার বশে পূর্বোল্লিখিত 'ছেলেমানুষি' করে সময় কাটিয়েছেন**! একটার পর একটা গুরুবরনেও তাঁর বিরাম ছিল না, একটার পর একটা অভিনব কিম্ভূত কিমাকার সাধন পদ্ধতি Practice করতেও তাঁর ক্লান্তি ছিলো না!! এ সবের মধ্যে তাঁর যে Sincerity এবং urge প্রকাশ পেত পরমার্থ লাভের জন্য তা appreciate করি। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত তাঁর কোন তত্ত্বজ্ঞ গুরু লাভ না হওয়ায়, সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর কি বস্তু কি ভাবে তাঁকে পাওয়া যায়, বেদ বেদান্তে সত্যলাভের কিরূপ পথ নির্দেশ আছে, সে সব

নিগূঢ় তত্ত্ব কিছুই জানতে পারেন নি। শিশুকাল হ'তেই হিন্দু ঘরের ছেলে-মেয়েরা লক্ষ্মীমূর্ত্তি, কৃষ্ণমূর্ত্তি, কালীমূর্ত্তির চরণতলে ফুল দেওয়া, প্রণাম করা শেখে, ঐ মূর্ত্তিকে ভগবান বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়; পরে বড় হয়েও Subliminal Consciousএ imprinted সংস্কারানুযায়ী, যেমন আজকাল জ্ঞানীগুণী বুড়োরাও করে, তেমনি যে যার মনোমত রুচিমত, কালী কৃষ্ণ শিব দুর্গা যাই হোক একটা মূর্ত্তিকেই ঈশ্বর বলে ভেবে অন্ধ সংস্কার বশে পূজা করে চলে। একটি নক্সার মধ্যে যেমন কোন স্থানের কোন গুপ্তধন পাওয়ার ইঙ্গিত থাকে, সংকেত থাকে, তেমনি একটি মূর্ত্তির রং, বেশভূষা বিচিত্র আকৃতির মধ্যে, ঋষিরা যে কোন্ নিগূঢ় তত্ত্বের কী নিগূঢ় সংকেত রেখে গেছেন, তা না জেনে অধ্যাত্মরাজ্যের শিশুরা বৃথাই একটা জড়মূর্ত্তির চরণতলে ফুল চন্দন চড়িয়ে কেঁদে আকুল হয় আর ভাবে অধ্যাত্ম পথে সে এগুচ্ছে।

রামকৃষ্ণও ঐ রকম এক কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মে শিশুকাল হ'তেই ঐ কালী শিবমূর্ত্তিকে পরমেশ্বর জ্ঞান করতে শিখেছিলেন। একদিকে জন্মান্তরীন্ সাধন সংস্কার আর অন্যদিকে নিজের মূর্খতাসহ একটি গোঁড়া হিন্দু পরিবারের শিক্ষানুযায়ী কুসংস্কার—এই উভয়ের সংঘাত তাঁর প্রাণে খুব অন্তর্দ্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিল; একদিকে ঈশ্বরবিরহ, পরমার্থ লাভের আকুলতা, অন্যদিকে জড়মূর্ত্তির কাছে কেঁদে কেঁদেও কোন সাড়া না পাওয়া—এই সংঘাতমুখর যন্ত্রণা তাঁকে খুব ব্যথা দিত। গঙ্গার তীরে, কখনও বা পঞ্চবটিতে তিনি 'মা মা' রবে কেঁদে কেঁদে আকুল হ'তেন। দুই হাত দিয়ে বুকটা চেপে ধরে অনেক সময় মাটিতে গোড়ালুটি দিতে দিতে তিনি বলতেন, 'ওরে হৃদে, বুকের ভিতরটা আমার গামছা নিংড়ানোর মত যন্ত্রণা হচ্ছে'। যখন যেমন ধরণের সাধু পেয়েছেন, তাঁরই কাছে দীক্ষা নিয়ে, শ্রেয়োবস্তুলাভের জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছেন! এই সময় এলেন তান্ত্রিক সাধিকা ভৈরবী ব্রাহ্মণী। তিনি তাঁকে তন্ত্র সাধনার নামে অনেক জঘন্য ক্রিয়াকলাপ করালেন! তাঁর ঐ সব সাধন-পর্ব্বও সমাধা হয়েছিল **পঞ্চবটির ধ্যানগম্ভীর পরিবেশে**—ভবতারিণী কালীমূর্ত্তির চরণতলে বিল্বজবাদল চড়িয়ে বা কাংসঘণ্টা আরতি বাজনার মধ্য দিয়ে নয়। ঐ সকলের ভিতর দিয়ে যতই সময় অতিবাহিত হতে লাগলো, তাঁর আকুলতা, অন্তরের আবেগও দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হতে হতে, গভীরতর **ধ্যানের তন্ময় অবস্থায়** অনাহত চক্রের Presiding Diety কালীদর্শন তাঁর হয়েছিলো। সূক্ষ্ম জগতের

ঐ কালীদর্শনও তাঁর হয়েছিলো, পঞ্চবটির 'বুনো গাছ গাছড়াময়' নির্জ্জন নিঃস্তব্ধ অন্ধকারময় পঞ্চবটিতে **ধ্যান করে করে**, তোমাদের ঐ **প্রস্তরময়ী কালীমূর্ত্তি পূজা করে নয়।** স্বামী সারদানন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে' পঞ্চবটিতে তাঁর ধ্যান সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়েছেন, নিত্য নিয়মিত ভাবে গভীর রাত্রে ঐ পঞ্চবটিতে রামকৃষ্ণ ধ্যান করতে যেতেন বলে, পেছনে অনুসরণ করে হৃদয় 'ঢিল ছুঁড়ে' নানা ভাবে তাঁকে ভয় দেখিয়েও প্রতিনিবৃত্ত করতে পারতেন না— "একদিন ঠাকুর বৃক্ষতলে যাইবার কিছুক্ষণ পরে নিঃশব্দে জঙ্গল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া (হৃদয়) দেখিল, তিনি পরিধেয় বস্ত্র ও যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়া সুখাসীন হইয়া **ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন।** দেখিয়া ভাবিল 'মামা কি পাগল হইল নাকি?' ..... সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, 'একি হচ্ছে? পৈতে, কাপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে বসেছ যে?' কয়েকবার ডাকাডাকির পরে ঠাকুরের চৈতন্য হইল এবং বলিলেন, 'তুই কি জানিস? এইরূপে পাশমুক্ত হয়ে **ধ্যান** করতে হয়; জন্মাবধি মানুষ ঘৃণা, লজ্জা কুলশীল, ভয়, মান, জাতি ও অভিমান এই অষ্টপাশে বদ্ধ হ'য়ে রয়েছে, পৈতে গাছটাও 'আমি ব্রাহ্মণ, সকলের চেয়ে বড়' এই অভিমানের চিহ্ন এবং একটা পাশ; মাকে ডাকতে হ'লে ঐ সব পাশ ফেলে দিয়ে **এক মনে ডাকতে হয়**, তাই ঐ সব খুলে রেখেছি; **ধ্যান করা শেষ হলে** ফির্‌বার সময় আবার পর্‌ব"। [ঐ সাধকভাব ২য় খণ্ড, ১০৩-১০৪ পৃঃ]

কালীমূর্ত্তি পূজা দ্বারা তাঁর যদি অভীষ্টই সিদ্ধ হতো, তাহলে রাসমণির হর্ম্ম্য-মধ্যে তো মর্ম্মরমূর্ত্তি খাঁড়া হস্তে বিরাজিতাই ছিলেন, তাঁকে ছেড়ে দিয়ে গভীর রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে পঞ্চবটিতে **কেন ধ্যান করতে যেতেন?** পাষাণপ্রিয় ভাই সব, পুতুল প্রেমের মোহটুকু মুছে ফেলে, বিচার করে দেখলেই বুঝতে পারবে রামকৃষ্ণের মাতৃদর্শন হয়েছিল জড় মূর্ত্তিপূজা করে নয়, **ধ্যান করে করে।** এই ভাবে গভীর ধ্যানলব্ধ অনুভূতি লাভে তাঁর সেই 'গামছা নিংড়ানো যন্ত্রনা' কথঞ্চিৎ শান্ত হ'ল; বুঝলেন, তাঁর মা হৃদয় আলো করে আছেন। ভাল করে Mark করো তাঁর কথাগুলি, তিনি বলতেন, 'মাকি আমার কালোরে? কালোরূপা দিগম্বরী হৃদপদ্ম করে আলোরে!' 'মা আমার কোটিসূর্য্য সমুজ্জ্বলা, কোটিচন্দ্র সুশীতলা'। রামপ্রসাদও এই অনাহত চক্রের অধিষ্ঠাত্রীদেবী কালী সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'মায়ের একটু খানি নখের আলো ঐ বিশ্ব বিরাট নীল গগন।' 'নিবিড় আঁধারে মাগো, তোর,

চমকে অরূপ-রাশি'।

এখন বিচার করে, বুঝে, আমাকে বলতো ভাই, তাঁরা মা কালীর যে সৌন্দর্য্যের বর্ণনা দিয়ে গেছেন, তাকি ঐ দক্ষিণেশ্বরের কালীমূর্ত্তি বা কালিঘাটের কালীমূর্ত্তিতে দেখতে পাও ? সেই কালী তো আজও দাঁড়িয়ে আছে যথাস্থানে, তোমাদের মত ভক্তদের কৃপায় তো পূজারও কোন ধূমধামের কম নেই! কৈ লক্ষ লক্ষ ভক্ত, তোমরা যারা ঐ মূর্ত্তি দর্শন কর, তোমরা কি ঐ নৃমুণ্ডমালিনী, লোল-জিহ্বা, দিগম্বরী, ঘোর কৃষ্ণময়ী মূর্ত্তির মধ্যে 'কোটিসূর্য্য সমুজ্জ্বলা, কোটিচন্দ্র সুশীতলা' রূপ দেখতে পাও ? রামপ্রসাদ তাঁর উপলব্ধ কালীকে গানের মাধ্যমে যে ভাবে বর্ণনা করে গেছেন তা কি ঐ জড়মূর্ত্তির রূপের সঙ্গে মেলে ? সংস্কারের বাঁধনটুকু চোখ থেকে খুলে নিয়ে, মোহ কাজল টুকু মুছে ফেলে একটু খানি বিবেক বিচারের আলোক সম্পাতে সবটুকু বুঝতে চেষ্টা কর, স্পষ্টতঃই বুঝতে পারবে, তোমরা লক্ষ লক্ষ লোক যে জড়মূর্ত্তিকে চরম ও পরম ভেবে হৈ চৈ করছো, রামকৃষ্ণ ঐ জড়-মূর্ত্তির পূজা করে কালীদর্শন করেন নি! যা'ই হোক, এই অনাহত চক্রের Presiding Diety কালীকে পাওয়াও তো উপলব্ধির শেষ কথা নয়— পূর্ব্বেই এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। রামকৃষ্ণেরও কালীদর্শন যে সব কিছু নয়, ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করছি। প্রকৃত বস্তূপলব্ধি হয়েছিল না বলেই তিনি মন্দিরের মা কালীতে তার উপলব্ধিকে আরোপ করতেন !!

রামকৃষ্ণ এইভাবে মা কালীকে পেয়ে 'পরমহংস সেজে গেছেন, মধুলোভী ভৃঙ্গের মত ভক্তের দল তখন তাঁর কাছে ভীড় করছে 'সিদ্ধপুরুষ' ভেবে। সাধারণ মানুষ, তিনি যতই বিদ্বান এবং পণ্ডিত হোন না কেন, অধ্যাত্মরাজ্যের বস্তূপলব্ধি যাঁর হয়নি তাঁর পক্ষে কখনই বোঝা সম্ভব নয়, কোন্ অনুভূতি কোন্ স্তরের!

কালী দর্শনের পর ব্রহ্মদীক্ষা লাভ

যাই হোক, এই সময় একদিন রামকৃষ্ণ গঙ্গার ধারে বসে আছেন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীতোতাপুরী সেখানে এসে পৌঁছলেন। তিনি রামকৃষ্ণকে বললেন, 'তোমাকে উত্তম অধিকারী বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি বেদান্ত সাধন করিবে ?' জটাজুটধারী দীর্ঘবপুঃ উলঙ্গ সন্ন্যাসীর ঐ প্রশ্নে তিনি বললেন, 'আমার মা সব জানেন, তিনি আদেশ করিলে পারিব,' এই বলে কালী মন্দিরে গিয়ে ধ্যানস্থ হ'লেন, মা কালী হৃদয়াভ্যন্তরে প্রকট হয়ে আদেশ দিলেন তোতাপুরীর নিকট

ব্রহ্মদীক্ষা নিতে। রামকৃষ্ণের ঐ রকম 'অজ্ঞতা' 'কুসংস্কার' 'ভ্রম' এবং 'ঝুটাজ্ঞান' দেখে তোতাপুরী মনে মনে হাঁসলেন! মা কালীর Permission নেওয়ার জন্য তাঁর ঐ মন্দিরাভ্যন্তরে ছুটে যাওয়া থেকে আমরাও বুঝতে পারি, তখনও তাঁর সেই সর্ব্বব্যাপক ভূমাচৈতন্যের উপলব্ধি হয় নি। "স এবাধস্তাৎ, স উপরিষ্ঠাৎ, স পশ্চাৎ. স পুরস্তাৎ, স দক্ষিণতঃ, স উত্তরতঃ, স এব ইদং সর্ব্বম্ ইতি" (শ্রুতিবাক্য)— বেদান্ত প্রতিপাদ্য এই অনুভূতি কারও লাভ হলে পরিচ্ছিন্ন স্থানে পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি বিশেষে ঈশ্বরত্ব আরোপ সম্ভব নয়!

যাই হোক, ব্রহ্মদীক্ষা লাভে রামকৃষ্ণের আগ্রহ ও সম্মতি দেখে, বিরজা হোমান্তে সন্ন্যাস দিয়ে তোতাপুরী তাঁকে উপদেশ দিতে লাগলেন—"নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব, দেশকালাদি দ্বারা সর্ব্বদা অপরিচ্ছিন্ন একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই নিত্য সত্য। অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া নিজ প্রভাবে তাঁহাকে নামরূপের দ্বারা খণ্ডিতবৎ প্রতীত করাইলেও তিনি কখনও বাস্তবিক ঐরূপ নহেন। কারণ, **সমাধিকালে দেশ-কাল বা নামরূপের বিন্দুমাত্র উপলব্ধি হয় না।** অতএব নামরূপের সীমার মধ্যে যাহা কিছু অবস্থিত তাহা কখনও নিত্যবস্তু হইতে পারে না, তাহাকেই দূরে পরিহার কর। নামরূপের দৃঢ় পিঞ্জর সিংহ বিক্রমে ভেদ করিয়া নির্গত হও। আপনাতে অবস্থিত আত্মতত্ত্বের অন্বেষণে ডুবিয়া যাও। সমাধি সহায়ে তাঁহাতে অবস্থান কর। দেখিবে, নামরূপাত্মক জগৎ তখন কোথায় লুপ্ত হইবে, ক্ষুদ্র আমিজ্ঞান বিরাটে লীন ও স্তব্ধীভূত হইবে এবং অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে নিজ স্বরূপ বলিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিবে। 'যে জ্ঞানাবলম্বনে এক ব্যক্তি অপরকে দেখে, জানে বা অপরের কথা শুনে, তাহা অল্প বা ক্ষুদ্র ; যাহা অল্প তাহা তুচ্ছ— তাহাতে পরমানন্দ নাই ; কিন্তু যে জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া এক ব্যক্তি অপরকে দেখে না, জানে না বা অপরের বাণী ইন্দ্রিয় গোচর করে না, তাহাই ভূমা বা মহান্, তৎসহায়ে পরমানন্দে অবস্থিতি হয়। যিনি সর্ব্বথা সকলের অন্তরে বিজ্ঞাতা হইয়া রহিয়াছেন, কোন্ মনবুদ্ধি তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হইবে?" [ঐ ২৮৬ পৃঃ]

উপদেশ দেওয়ার পর দীক্ষা দেওয়া সুরু হ'ল। গুরু তাঁকে ভ্রূদ্বয়ান্তবর্ত্তী স্থানে মন রেখে ধ্যানস্থ হ'তে উপদেশ দিলেন ; কিন্তু যতবারই তিনি ধ্যানস্থ হবার চেষ্টা করেন, ততবারই তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো কালীমূর্ত্তি! 'নিরাশ হয়ে' রামকৃষ্ণ বললেন, 'হইল না, মনকে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকল্প করিয়া আত্ম-

ধ্যানেমগ্ন হইতে পারিলাম না'। 'কেঁও হোগা নেহি, ওভি ভ্রান্তি হ্যায়, ঝুট্ হ্যায়' বলে গর্জ্জে উঠলেন আত্মবিদ্ গুরু; এক টুকরা কাঁচকে ভ্রূমধ্যে ফুটিয়ে দিয়ে হুকুম করলেন, 'এই বিন্দুতে মনকে গুটাইয়া আন্'। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গেরই বর্ণনানুযায়ী রামকৃষ্ণের নিজের মুখের কথা শোন,— "তখন পুনঃরায় দৃঢ়সংকল্প করিয়া ধ্যানে বসিলাম এবং ৺জগদম্বার শ্রীমূর্ত্তি পূর্ব্বের ন্যায় মনে উদিত হইবামাত্র জ্ঞানকে অসি কল্পনা করিয়া উহা দ্বারা ঐ মূর্ত্তিকে মনে মনে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলাম! তখন আর মনে কোনরূপ বিকল্প রহিল না; একেবারে হুহু করিয়া উহা সমগ্র নাম-রূপ- রাজ্যের উপরে উঠিয়া গেল এবং সমাধিমগ্ন হইলাম" [ঐ, ২৮৭ পৃঃ; গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ, ৩য় খণ্ড ৬০ পৃঃ]। তোতাপুরীর ঐ বেদান্ততত্ত্বোপদেশ এবং নামরূপের অতীত সেই তত্ত্বে রামকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা এবং রামকৃষ্ণেরও ঐ কালীমূর্ত্তি খণ্ড খণ্ড করার বর্ণনা থেকেই আশা করি বুঝতে পারছো। জড়মূর্ত্তি পূজা তো দূরের কথা, সাধনার অপরিপক্ক অবস্থায় ভ্রম বশতঃ তিনি যে কালী কালী করে পাকচক্রে আবর্ত্তিত হতেন—তার থেকে মুক্ত করার চেষ্টা তোতাপুরী করেছিলেন। তবুও যদি রামকৃষ্ণ কালী বা জড়মূর্ত্তির উপাসক বল, তাহলে কি তোমারা বলতে চাও তোতাপুরীর ব্রহ্মদীক্ষা ব্যর্থ হয়েছিল? নামরূপের অতীত মায়াজনীত ভ্রমের অতীত ভূমা সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ অবস্থাতে তিনি উঠতে পারেন নি?

পাষাণপ্রিয় সম্প্রদায়ীদের অতিভক্তির বর্ণনা বিভ্রাট বাদ দিয়ে আমরা জেনে আশ্বস্ত হই, তত্ত্বজ্ঞ গুরুর অশেষ চেষ্টা এবং দয়ায় রামকৃষ্ণ তিন দিন সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন; তাঁর ব্রহ্মানুভূতি হ'ল। এই ব্রহ্মজ্ঞানের পর, আর তিনি কালী মূর্ত্তির কাছে কাঁদতেও যান নি বা ফুলচন্দন রক্ত জবা নিয়ে, নৈবেদ্যের সম্ভার নিয়ে 'মা খাও. মা খাও' করে করজোড়ে মিনতি জানান নি!! রামকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠার জন্য বুড়ো হাজরা খাজাঞ্চি, প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা যাঁরা ঈর্ষা করতেন, তাঁরা Report পাঠালেন মথুর বাবু এবং রাসমণির কাছে যে পুরোহিত রামকৃষ্ণ আর মোটেই কালীপূজা করেন না। হৃদয় ভাবলেন বুঝি মামার চাকরী যায়! জোর করে তিনি কালীমন্দিরে তাঁকে ঢুকিয়ে দিলেন! কিন্তু নামরূপাত্মক সর্ব বস্তুই যাঁর কাছে অস্তমিত হয়ে গেছে, সেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পক্ষে, দ্বৈতবোধে. একটা জড় মূর্ত্তির কাছে পূজার্চ্চনা, কাতর ক্রন্দন

ইত্যাদি সম্ভব নয়। কাজেই তিনি আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, নিজের পূজা নিজেই করতে লাগলেন, নিজের গলায় ফুলমালা নিয়ে, মুখে নৈবেদ্য নিয়ে, হয়ে পড়লেন সমাধিস্থ! সুফী গোবিন্দ রায়ের কাছেও দীক্ষা নেওয়ার পর তাঁর মন যখন তুরীয় নিগুর্ণ ব্রহ্মে লীন হয়েছিল, তখন কালী মন্দিরের মধ্যেও ঢুকতেন না, পূজা তো দূরের কথা! মন্দিরের বাইরে মথুরমোহনের কুঠিতে বাস করতেন [ঐ ৩০১ পৃঃ]। সুখের কথা রাণী রাসমনি এবং মথুরবাবু রামকৃষ্ণের ঐ পরমভাব appreciate করতে পেরেছিলেন।

'বৃদ্ধ ঘেসেড়া প্রসঙ্গ', 'একটি ফড়িংএর যন্ত্রণা', 'পদদলিত নবীন দূর্ব্বাদল', 'নৌকায় মাঝিদ্বয়ের পরস্পর কলহে নিজ শরীরে আঘাত অনুভব'—প্রভৃতি ঘটনা থেকে রামকৃষ্ণের ঐ অদ্বৈতানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় [ঐ ৩০২. ৩০৩ পৃঃ]।

তোমরা ঐ তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে না দেখে, জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে, সদ্‌গুরু লাভের পূর্ব্বে তিনি যে পুতুল খেলা খেলেছিলেন, সেই পুতুল খেলাকেই মনে করছো ঈশ্বরদর্শনের উপায়!! ধ্রুবের জীবনেও দেখা গেছে, তিনি নারদকে সদ্‌গুরুরূপে পাওয়ার পূর্ব্বে গাছ, পাথর, মানুষ, পশু, পক্ষী, জীব, জন্তু যাকেই দেখতেন তাকেই জড়িয়ে ধরে তিনি বলতেন, 'বল, বল, তুমিই কি আমার পদ্ম-পলাশলোচন হরি'? তাই বলে কি তোমরা বলবে, তিনি গাছ, পাথর, পশু পক্ষীকে জড়িয়ে ধরতেন বলেই হরিকে পেয়েছিলেন? কেউ যদি ধ্রুবের মত গাছ, পাথর, পশু, পাখী, যাকেই দেখবে, তাকেই যদি জড়িয়ে ধরতে সুরু করে, তোমাদের মতে কি সে ঐ ভাবেই হরিকে পেয়ে যাবে? যদি বল, ঐ উপায়েই তো ধ্রুব নারদের দর্শন পেয়েছিলেন, এও স্থুলবুদ্ধির কথা! একটু সূক্ষ্মভাবে বিচারকরলেই বুঝতে পারবে, ধ্রুবের ঈশ্বরদর্শনের আকুলতা, Inner urge এর জন্য নারদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হ'ল। আমি সদ্‌গুরুর লক্ষণ এবং সদ্‌গুরুপ্রাপ্তি বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই বলেছি, তিনি ভক্তিবশ; তিনি সব সইতে পারেন, ভক্তবৎসল কিন্তু ভক্তের কান্না সহ্য করতে পারেন না। কারও প্রাণ যখন ঐ ভাবে তাঁর জন্য আকুল হয়, 'গামছা নিংড়ানোর' মত ব্যথা অনুভব হয়, তখন তিনি আসেন, সদ্‌গুরু আসেন, **'when the chela is ready, the Guru appears'!**

[রামকৃষ্ণের সিদ্ধির মূলে প্রাণফাটা কান্না ও সদ্‌গুরুকৃপা]

রামকৃষ্ণও তেমনি রাণী রাসমনি প্রতিষ্ঠিত, জড় কালীমূর্ত্তির পূজা করে তোতাপুরীর দর্শন বা অপরোক্ষানুভূতি লাভ করেন নি। ধ্রুব যেমন আকুল হয়ে ভুল করে হরি ভেবে গাছ পাথর পশু পাখীকে জড়িয়ে ধরতেন, তেমনি রামকৃষ্ণও সাধনার অপরিপক্ক অবস্থাতে, কালীমূর্ত্তিকে পূজা করতেন। কিন্তু তাঁর যে আকুলতা, 'গামছা নিংড়ানো'র মত অব্যক্ত যন্ত্রণার জন্য হৃদয়কে বলতেন বুকটা পুড়ে গেল, সেই প্রাণফাটা কান্নার জন্য, Inner urge এর জন্য (কালীমূর্ত্তি পূজার জন্য তো নয়ই!), Tota puri was sent to him. সদ্‌গুরুলাভের পূর্ব্বে ধ্রুবের মতই তিনি এটা ওটাকে অবলম্বন করেছিলেন বটে, কিন্তু সেগুলোর জন্য তাঁর প্রিয় মিলন ঘটে নি; প্রাণফাটা কান্না এবং সদ্‌গুরু কৃপাই তাঁকে পূর্ণকাম করেছিল।

বর্ত্তমানে রামকৃষ্ণভক্তদলের চেয়ে বিবেকানন্দ নিশ্চয়ই তাঁর গুরুকে বেশী বুঝতেন। ভবতারিণী কালীই যদি সব হ'ত, ঐ জড়মূর্ত্তিই যদি তাঁর গুরুর গুরুত্বের মূল উপায় হ'ত, জড়মূর্ত্তিপূজাতে যদি পরমার্থলাভ হ'ত, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই দক্ষিণেশ্বরের ঐ কালী মন্দির ছেড়ে বেলুড়ে মঠ প্রতিষ্ঠা করতেন না। যদি বল world wide oganisation হওয়ায়, দক্ষিনেশ্বরে স্থান সঙ্কুলানের অভাবে, তিনি বেলুড়ে এসেছিলেন, তাহলে তিনি তোমাদের ঐ 'জাগ্রতা' (!) কালীমূর্ত্তিটিকে বেলুড়ে আনতেন; কিংবা, কালীমূর্ত্তিপূজাই পরমার্থ লাভের উপায়, গুরুর কাছে এই দীক্ষা শিক্ষা পেয়ে থাকলে, তিনি বেলুড়ে কালীমূর্ত্তিই প্রতিষ্ঠা করতেন। কিন্তু তোমরা বেলুড়ে কালীমূর্ত্তি দেখছো কি? তিনি সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর ব্রহ্মস্বরূপ গুরুর প্রতিমূর্ত্তি স্মারক চিহ্ন হিসেবে।

বিবেকানন্দের বহু প্রসিদ্ধ পত্রাবলী, বিশেষতঃ দ্বিতীয় খণ্ড পড়লে বুঝতে পারবে, স্থানে স্থানে তিনি কি ভাবে ঐ তামসী পূজা, বহিরাচার এবং তমোগুণ বৃদ্ধি কারক জড় মূর্ত্তি পূজার বিরুদ্ধে অগ্ন্যুদ্গীরণ করেছেন! আলমোড়াতে তাঁর অদ্বৈতাশ্রমে এক রামকৃষ্ণভক্ত কতকগুলি শালগ্রাম শিলা নুড়ি পাথর নিয়ে পূজা করায় তিনি সেগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন,

(ক) 'একটা স্থানও কি থাকবে না যেখানে এই পাথর পূজা হবে না'?

(খ) "Old forms of religion are like the skeletons of once

mighty animals preserved in museums. They can not satisfy the true cravings of the soul for the Highest, just as a dead mango-tree can not satisfy the craving of a man for a bunch of luscious mangoes" —Vivekanand.

(গ) "আঙ্গুল বাঁকান আর ঘণ্টার বিকট আওয়াজ কিঞ্চিৎ কমি করে, কিঞ্চিৎ গীতা উপনিষদাদি পাঠ করিবে। অর্থাৎ Materialism (জড়োপাসনা) যত কম হয় এবং Spirituality (আধ্যাত্মিকতা যতই বাড়ে, এই কথা আর কি!... ... ...আমরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে সাণ্ডেলের জন্য কি ঘণ্টা বাজাতে এসেছি? সাণ্ডেল কাঁসারী পাড়ায় বাস করুকগে, যদি ঘণ্টা নাড়া তার এতই ভাল লাগে!" [পত্রাবলী, ২য় ভাগ, ৩৯ পৃঃ]

(ঘ) "আর আমি আমূল পরিবর্ত্তনের ঘোরতর পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি। আমি শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফিরবো, পরিবর্ত্তন বিরোধী, থসৃথসে জেলি মাছের ন্যায় ঐ বিরাট পিণ্ডটার কিছু করতে পারি কি না দেখতে। তারপর প্রাচীন সংস্কারগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নূতন করে আরম্ভ করবো। ... .সেকেলে নির্জীব অনুষ্ঠান এবং ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা সকল প্রাচীন কুসংস্কার মাত্র। বর্ত্তমানেও সেগুলোকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা কেন? পার্শ্বেই যখন জীবন এবং সত্যের নদী বয়ে যাচ্ছে, তখন আর তৃষ্ণার্ত্ত লোকগুলোকে নর্দ্দমার পচা জল খাওয়ানো কেন? ইহা মনুষ্য সুলভ স্বার্থপরতা ব্যতীত অপর কিছুই নয়।" [ঐ ৯২ পৃঃ]

(ঙ) "স্মৃতি পুরাণাদি সামান্য বুদ্ধি মনুষ্যের রচনা; ভ্রম, প্রমাদ, ভেদবুদ্ধি ও দ্বেষবুদ্ধি পরিপূর্ণা" [ঐ ২১৯ পৃঃ]

(চ) "যিনি তোমার অন্তরে ও বাহিরে, যিনি সব হাত দিয়ে কাজ করেন ও সব পায়ে চলেন, তুমি যাঁর একাঙ্গ, তাঁরই উপাসনা কর এবং আর সব প্রতিমা ভেঙ্গে ফেল।"

"যাঁতে পূর্ব্ব জন্ম নাই, পরজন্ম নাই, বিনাশ নাই, গমনাগমন নাই, যাঁতে অবস্থিত থেকে আমরা সর্ব্বদা অখণ্ডত্ব লাভ করছি এবং ভবিষ্যতেও করবো, তাঁরই উপাসনা কর এবং আর সব প্রতিমা ভেঙ্গে ফেল।" "হে মূর্খগণ! যে সকল জীবন্ত নারায়ন ও তাঁহার অনন্ত প্রতিবিম্বে জগৎ পরিব্যাপ্ত, তাঁকে ছেড়ে তোমরা

কাল্পনিক ছায়ার পেছনে ছুটেছ! তাঁর সেই প্রত্যক্ষ দেবতারই উপাসনা কর এবং আর সব প্রতিমা ভেঙ্গে ফেল।' [ঐ, ২৪৭ পৃঃ]।

[মূর্ত্তিপূজা ও বহিরাচারের বিরুদ্ধে বেদান্তকেশরীর হুঙ্কার]

(ছ) বেদান্তের যে তত্ত্ব তোতাপুরী রামকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়ে ছিলেন, বিবেকানন্দও যে, বেদান্তের সেই সাধনকেই (কোন কালী পূজাদি নয়!) পরমার্থ লাভের উপায় বলে বুঝতেন—তা তাঁর এক শিষ্যকে লেখা নিচের চিঠিটি থেকে বুঝতে পারবে—

"………যত্তে হৃদয়োদ্বেগকরং মুমুক্ষত্বং লিপিভঙ্গ্যা বাঞ্ছিতম্ তন্ময়া অনুভূতং পূর্ব্বং। তদেব শাশ্বতে ব্রহ্মণি মনঃ সমাধাতুং প্রসরতি। 'নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' জ্বলতু স ভাবনা অধিকমধিকম্ যাবন্নাধিগতানামেকান্তক্ষয়ঃ কৃতাকৃতানাম। তদনু সহসৈব ব্রহ্মপ্রকাশঃ সহ সমস্ত বিষয় প্রধ্বংসৈঃ। ………অভীরভীরিতি ঘোষয়তি বেদান্তডিণ্ডিমঃ। ভূয়াৎ স ভেদায় হৃদয়গ্রন্থীনাং সর্ব্বেষাং জগন্নিবাসিনামিতি—তবৈকান্তশুভভাবুকঃ বিবেকানন্দঃ"

"……লেখনভঙ্গীতে হৃদয়োদ্বেগকর তোমার যে মুমুক্ষত্ব প্রকট হয়েছে- তা আমি পূর্বেই অনুভব করেছি। সেই মুমুক্ষত্বই (কালীপূজা নয়!) ক্রমশঃ নিত্য স্বরূপ ব্রহ্মে (কালী মূর্ত্তিতে নয়!!) মনের একাগ্রতা এনে দেয়। মুক্তিলাভের আর অন্য পন্থা নাই। সেই ভাবনা তোমার উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হোক, যতদিন না সমুদয় কর্ম্মের ক্ষয় হয় সম্পূর্ণরূপে। (কৈ, বিবেকানন্দ ত এখানে বলছেন না, এখন তুমি কালীপূজা করতে থাক, এটা একটা স্তর বা সোপান ?) তারপর তোমার হৃদয়ে সহসা ব্রহ্মের প্রকাশ হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় বিষয় বাসনা নষ্ট হয়ে যাবে। ………ঐ শোন, বেদান্ত দুন্দুভি ঘোষণা করছে, মাভৈঃ, মাভৈঃ, সেই দুন্দুভিধ্বনি নিখিল জগৎবাসীর হৃদয়গ্রন্থিভেদে সক্ষম হোক।"

কুসংস্কারের ক্লেদে এবং মলে যাদের কর্ণপটহ রুদ্ধ কিংবা স্ব সম্প্রদায়ের স্বার্থে নানা অপপ্রচারের ঢক্কানিনাদ যাদের প্রয়োজন, তাদেরই কানে ঐ 'দুন্দুভিধ্বনি' প্রবেশ করে না, তারাই বহিরাচার আর মূর্ত্তিপূজার কুহেলিকায় পড়ে বিভ্রান্ত হচ্ছে!

যদি বল, মঠ মিশন আশ্রমবাসীরা কেন তাহলে প্রতি বৎসর কালীমূর্ত্তি,

দুর্গামূর্ত্তি গড়ে পূজা করে, তার কারণ, লোকপ্রিয় পূজার অনুষ্ঠান করে, একটা উৎসবের মাধ্যমে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করলে, প্রণামী উপচার, চাঁদা আর দক্ষিণায় পঁচিশ হাজার টাকা পাওয়া যায়, প্রচারকার্য্যও ভাল হয়, আত্মজ্ঞানহীন স্বার্থসন্ধী মঠ মিশনদের এটি একটি পলিসি! ওতে লোকের কতকটা মজা, উৎসবের Intoxicating সাময়িক উত্তেজনা, পরস্পর মেলামেশা, ব্যয় অপব্যয় ছাড়া পারমার্থিক লাভ কিছুই হয় না। বরং মানুষ ঐগুলোকেই ধর্ম্মলাভ বলে মনে করে, প্রকৃত সত্যসন্ধানে বিরত থাকে, শিশু ও যুবকদের মনে বহির্ম্মুখতা এবং বহিরাচারের ছাপ পড়ে; বেদান্তের মূর্ত্তবিগ্রহ গুরুর মহিমাও ক্ষুন্ন হয়। এরজন্যই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে তোমরা কালীপূজক, জড়মূর্ত্তি উপাসনাকারী বলে ধরে রেখেছ। সিনেমা থিয়েটারাদির মাধ্যমে প্রচার কৌশলে ঐ বহির্ম্মুখীনতাই প্রচারিত হচ্ছে দিনে দিনে, **বেদান্তের দুন্দুভি ঘোষণা পড়েছে চাপা।**

রামকৃষ্ণ যখনই তাঁর কোন অন্তরঙ্গ শিষ্য বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, লাটু মহারাজ ইত্যাদিকে দীক্ষা দিয়েছেন, তখনই হয়ত কারোও জিহ্বাতে একটা মন্ত্র লিখে দিয়ে কিংবা মাথায় হাত দিয়ে **শক্তিসঞ্চার করে ধ্যানে বসিয়েছেন, পঞ্চবটিতে গিয়ে ধ্যান** করতে বলেছেন। কাউকে কি বলেছিলেন ঐ ভবতারিণী মূর্ত্তিটির পায়ে মাথা ঠুকে পড়ে থাক আর 'কালী কালী' বলে তাণ্ডব নৃত্য কর?

রামকৃষ্ণ এই গানটি প্রায় করতেন—

ডুব দেরে মন কালী বলে
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।

কৈ, কোথাও বলেছেন কি,—

ডুব দেরে মন কালী বলে
রাসমনির ঐ কালীর চরণ তলে?

একজনের মানুষের—তিনি সাধকই হো'ন, আর সাধারণই হো'ন, তাঁর **পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞারই দাম বেশী,** সারা জীবন সাধনা করে করে, বাস্তব জীবনে কিংবা সাধন জীবনে নানা আঘাত সংঘাতে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়, শেষ জীবনের পরিণত বয়সের সেই **Experienced Truth ই, একটি**

লোকের জীবন ও বাণী বিচারে সবচেয়ে—বেশী মূল্যবান। রামকৃষ্ণদেবও সারাজীবনভোর তন্ত্রসাধনা করেছেন কি কালীপূজা করেছেন, মহাবীর কিংবা রামলীলার মূর্ত্তি নিয়ে কেঁদেছেন এটা বড় কথা নয়, শেষ জীবনের জীবনধারা এবং সিদ্ধিলাভের পর তাঁর বাণী-বচনের মধ্যেই তাঁর উপলব্ধ সত্যকে বিশেষ ভাবে চেনা যাবে; বিশেষ করে, **তাঁর মহাসমাধিলাভের পূর্বে তিনি যা বলেছেন, সেই একটি কথাকেই** যদি গভীর ভাবে বিচার করে দেখ, তাহলে বুঝবে, **এই আত্মজ্ঞপুরুষের সাধনা ও উপলব্ধ সত্যের স্বরূপ।**

রামকৃষ্ণ তখন ক্যানসারের উৎকট যন্ত্রনায় মৃত্যুশয্যায় শয়ান। অন্তিম মুহূর্ত্ত, ভক্তগণ আসন্ন বিয়োগ ব্যথায় কাতর; সবাই বুঝতে পারছেন, মহাপুরুষের নরদেহ ত্যাগ করে মহাপ্রয়াণের আর বিলম্ব নেই, কিন্তু ঐ নিদারুণ সময়েও চির-সংশয়ী, চিরবিপ্লবী বিবেকানন্দের মনে অলোড়ন জাগলো, এখন যদি ইনি একটীবার এঁর স্বরূপের পরিচয় দেন, তাহলে বোঝা যায় ইনি কে? অন্তর্য্যামী মহাপুরুষ স্বামীজীর দিকে তাকিয়ে বললেন— "কিরে নরেন, এখনও অবিশ্বাস? যেই রাম সেই কৃষ্ণ, একাধারে রামকৃষ্ণ"!

কৈ এখানে ত, তিনি নিজেকে কালি-কিঙ্কর বা মাকালীর দাসানুদাস বলে পরিচয় দিলেন না?

যে ভূমিতে দাঁড়িয়ে শঙ্করাচার্য্য বলেছিলেন, "অহং নির্বিকল্পো নিরাকারো রূপো, বিভুর্ব্যাপী সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়ানাম্", যে ভূমিতে দাঁড়িয়ে বেদান্তের ঋষি আত্মজ্ঞান লাভেচ্ছু মুমুক্ষু শিষ্যকে উপদেশ দিতেন, "তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ! হংস সোঽহং বিভাবয়", এবং শিষ্যও উপলব্ধি করতেন, "অহং ব্রহ্মাংশ চাণ্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্"—ঠিক সেই আত্মভূমিতে দাঁড়িয়েই রামকৃষ্ণ মহাসমাধিলাভের পূর্বক্ষনে তাঁর স্বরূপোপলব্ধির পরিচয় দিলেন—

আত্মজ্ঞ মহাপুরুষকে কালিকিঙ্কর ভাবলে হেয় করা হয়

"যেই রাম সেই কৃষ্ণ, একাধারে রামকৃষ্ণ"—অর্থাৎ ব্রহ্মরূপী রাম বা কৃষ্ণও যা, স্বরূপ দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণ তা।— কেন না, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। এই হ'ল রামকৃষ্ণের পরিচয়—যারা তাঁকে কালী পূজক বা জড়োপাসনাকারী বলে মনে করে, তাদের দ্বারা তাঁর মহিমা বৃদ্ধি হচ্ছে কিংবা হেয় হচ্ছে—তা সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

আমি ব্যক্তিগত ভাবে তাঁকে 'যুগাবতার' 'পূর্ণ পরমেশ্বর' ইত্যাদি না মানলেও, তিনি যে পরিশেষে (অনেক ধোঁকা খাওয়ার পর) ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে ছিলেন—তা বিশ্বাস করি। কিন্তু অতিভক্ত আর সম্প্রদায়ীরা অত্যল্পকালের মধ্যেই তাঁর সম্বন্ধে যে সব আজগুবি রটনা এবং তাঁর সাধন সম্বন্ধে যে সব অদ্ভুত রসালো কাহিনী প্রচার করছে—সেগুলিকে বিচার বিশ্লেষণ, পরীক্ষা, নিরীক্ষা করতে গিয়ে কিছুটা তিক্ত ও রূঢ় হয়ে পড়ি!

আলোক-তীর্থ

চতুর্থ অর্ঘ্য

প্রথম পুষ্প

প্রশ্ন ঃ— আপনি রামকৃষ্ণ দেবকে স্বয়ং অবতার বলে মানেন কি না? কৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন,

'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'।

ঠাকুর জীবনে ঐ তিনটি কার্য্যই পূর্ণ ভাবে করেগেছেন। এই জন্যই ভৈরবী ব্রাহ্মণী সকলের সামনে ঠাকুরকে অবতার বলে ঘোষণা করেছিলেন (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ, সাধক ভাব, দ্বিতীয় খণ্ড, একশত নব্বই পৃঃ)। আর ঠাকুর তাঁকে 'শ্রীশ্রীযোগমায়ার অংশ সম্ভূতা' বলে নির্দ্দেশ করেছিলেন [ঐ, দুইশত দশ পৃঃ]। তাঁর কথা কি কখনও মিথ্যা হতে পারে? রামকৃষ্ণ সে সময় এসেছিলেন বলে সে সময় হিন্দুধর্ম্ম বেঁচেছিল। নতুবা খ্রীষ্টান মিশনারীদের পাল্লায় পড়ে সব হিন্দুযুবকরা বিধর্ম্মী হয়ে যেত। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় করে গেছেন। তিনি যুগাবতার বৈ কি!

উত্তর ঃ— দেখ ভাই, যে যার গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ বলে মনে করে, এটাই স্বাভাবিক! তুমি রামকৃষ্ণ ভক্ত, তোমার মনে সরাসরি আমি আঘাত দিতে চাই নি। তুমি স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' থেকে, বলতে চাইছো, ব্রাহ্মণী যখন বলে গেছেন 'রামকৃষ্ণ অবতার ছিলেন' আর রামকৃষ্ণ যখন ব্রাহ্মণীকে 'শ্রীশ্রীযোগমায়ার অংশ সম্ভূতা' বলে গেছেন তখন ব্রাহ্মণী বাক্য নিশ্চয়ই authority! কিন্তু বন্ধু, ঐ বই এরই তিনশত তের পৃষ্ঠা তিনশত চৌদ্দ পৃষ্ঠা এবং তিনশত পনের পৃষ্ঠাগুলি একবার খুলে দেখ তো, তাতে "পত্নীর

প্রতি ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ আচরণ দর্শনে ব্রাহ্মণীর আশঙ্কা ও ভাবান্তর", "অভিমান অহংকারের বৃদ্ধিতে ব্রাহ্মণীর বুদ্ধিনাশ", এবং তোমাদের ঠাকুর কথিত 'শ্রীশ্রীযোগ-মায়ার অংশসম্ভূতা' ঐ ব্রাহ্মণীর "নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অপরাধের আশঙ্কা, অনুতাপ ও ক্ষমা চাহিয়া কাশীগমনের" কথা লিখা আছে ! আবার ঐ বই এরই গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ, তৃতীয় খণ্ডের দুইশত পৌঁষট্টি পৃষ্ঠা খুলে দেখ, স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, রামকৃষ্ণ কারও সঙ্গে 'বেশী মেশামেশি করিলে' কিংবা 'কোন ঈশ্বর ভক্ত সাধককে অধিক সম্মান প্রদর্শন করিলে', ঐ 'শ্রীশ্রীযোগমায়ার অংশসম্ভূতা' ব্রাহ্মণীর 'মনে হিংসার উদয় হইত' !

যে ব্রাহ্মণার কথাকে Authority ধরে রামকৃষ্ণকে 'অবতার' বলে উল্লসিত হ'চ্ছ কিংবা যে ব্রাহ্মণীর দীক্ষা শিক্ষায় তোমাদের ঠাকুরের তন্ত্র সাধনা সম্পূর্ণ হয়েছিল বলে 'তন্ত্র তন্ত্র' বলে চেঁচাচ্ছ, ঐ গ্রন্থেই কিন্তু লেখা আছে ঐ 'শ্রীশ্রীযোগমায়া অংশসম্ভূতা'র 'অখণ্ড সচিদানন্দ লাভ' তো দূরের কথা (ঐ ২৬২ পৃঃ)' 'ভৈরবী ব্রাহ্মণী তখনও দিব্যভাবের অধিকারিণী হইতে পারেন নাই' (ঐ ২৬৪ পৃঃ) !! শুধু তাই নয়, 'ঠাকুরের কৃপায়' নাকি তাঁর 'আধ্যাত্মিক অভাব বোধ' হয়েছিল এবং 'ঈর্ষ্যান্বিতা' ব্রাহ্মণী পরে অনুতপ্তা হয়ে 'তপস্যা করতে' গমন করেছিলেন [ঐ ২৬৭ পৃঃ] !!! কাজেই যিনি নিজেই সিদ্ধ হতে পারেন নি, অভিমান, অহংকার, ঈর্ষ্যা সব কিছুই যাঁর ছিল, তাঁর কথাকে প্রামান্য ধরে রামকৃষ্ণকে 'অবতার' বলে স্বীকার করি কি করে? স্বয়ং অসিদ্ধঃ কুতঃপরং সাধয়তি? কিন্তু এহ বাহ্য, রামকৃষ্ণ নিজেকেই নিজে যখন 'ঈশ্বরাবতার' বলে declare করেছেন (ঐ সাধকভাব, ৩৬৪ পৃঃ), তাঁকে ভক্তরা 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর' জ্ঞান করছে কি না তা যখন জিজ্ঞাসাবাদ করে খোঁজ খবর নিতেন এবং ভক্ত পূর্ণচন্দ্র প্রভৃতি কেউ কেউ ভাবের আতিশয্যে তাঁকে 'ভগবান, সাক্ষাৎ ঈশ্বর' বলে ফেলায় তিনি যখন উল্লসিত ও গদগদ হয়ে পড়তেন [ঐ. পঞ্চম খণ্ড, ১৬৯ পৃ], তখন তোমার ঐ প্রশ্ন বিশেষ ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য…' এবং 'পরিত্রাণায় সাধুনাম্'...ইত্যাদি গীতার ঐ দুইটি শ্লোক এবং ভাগবতপুরাণই অবতারবাদের ভিত্তি। বেদে এমন অনেক ঋচা এবং মন্ত্র আছে, যার দ্বারা অবতারবাদ খণ্ডিত হয়েছে। সর্বব্যাপক পরমাত্মা একটা পরিচ্ছিন্ন স্থানে পরিণামশীল দেহ নিয়ে জন্মান না। তবে, সূর্য্য যেমন

কয়লা, পাথর, জল, কাঁচ, স্ফটিক সকল বস্তুতেই কিরণ দেয়, কিন্তু কয়লা পাথরে প্রতিফলন দেখা যায় না, জলে স্বচ্ছ, কাঁচে স্বচ্ছতর এবং স্ফটিকে স্বচ্ছতম ভাবে দেখা যায়, তেমনি পরমাত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপক, সকলেরই হৃদয়স্থিত বলে, সাধু মহাত্মাদের হৃদয় শুচিশুদ্ধ হওয়ায় তাঁদের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ বেশী। তাই বলে সাধু মহাত্মারা কেউ সাক্ষাৎ ভগবান ন'ন। রামকৃষ্ণও একজন সাধু, ভগবৎ-ভক্ত ছিলেন, শিশু সুলভ সরল ছিলেন। পূর্ণ পরমাত্মাই একেবারে গদাধর ওরফে রামকৃষ্ণরূপে জন্মেছিলেন, এ সব সাম্প্রদায়িক প্রচার মাত্র!

সাধুর পরিত্রাণ ও দুর্জনের বিনাশ কোন কিছুই তিনি করেন নি

ভাল, গীতার কৃষ্ণ বাক্যানুযায়ী, সাধুর পরিত্রাণ, দুষ্কৃতের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনই যদি অবতারের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বিচার করে দেখি এস, তোমাদের রামকৃষ্ণরূপী অবতার ঐ তিনটি উদ্দেশ্য পূরণ করেছিলেন কি না।

(ক) 'সাধুর পরিত্রাণের' প্রশ্ন তখনই আসে যখন সাধুরা নির্য্যাতনে থাকেন। রামকৃষ্ণ যে সময় এসেছিলেন, সে সময় ভারতবর্ষে বহু সাধু মহাপুরুষ ছিলেন। বাংলাদেশেই বারদীতে লোকনাথ ব্রহ্মচারী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কাশীতে বিশ্ববিখ্যাত ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ, বেদান্তমূর্ত্তি বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী, গাজীপুরের পওহারী বাবা, ভোলানন্দ গিরি, মহাত্মা গম্ভীরনাথজী, রামদাস কাঠিয়া বাবা, বেদমূর্ত্তি মহর্ষি দয়ানন্দ. আগ্রার পরমসন্ত শিবদয়াল সিংজী (রাধাস্বামী সাহেব) প্রভৃতি আরও অনেক মহাপুরুষ ছিলেন। এঁদের কেউ নির্য্যাতনে ছিলেন বলে তো জানা নেই; বরং এঁরা ছিলেন লোকপূজ্য, জনসাধারণের পরম ভক্তি ভাজন মহাত্মা।

(খ) 'ধর্ম্ম সংস্থাপন' অর্থাৎ ধর্ম্মকে সম্যকরূপে স্থাপনের প্রশ্ন তখনই আসে যখন ধর্ম্ম লোপ পেয়ে যায়, বা ধর্ম্মরাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কিন্তু যে সময় ধর্ম্মরাজ্যে এতগুলি সিদ্ধ মহাত্মা সগৌরবে বিরাজিত, সে তো ধর্ম্মের Glorious period! অগণিত জনসাধারণ এঁদের কাছে গিয়ে শান্তি পেতেন; বহু নাস্তিকও তখন ওঁদের দিব্য শক্তিপ্রভাবে ধর্ম্মে বিশ্বাসী হয়েছিলেন।

(গ) 'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' এই Condition টি বিচার করে দেখতে গেলে, হিরন্যাক্ষ হিরন্যকশিপু, রাবণ কুম্ভকর্ণ বা কংস শিশুপাল বধাদির মত ঐরকম কোন উৎকট সংহারলীলা রামকৃষ্ণ করেন নি। তবে যদি এক গিরিশঘোষের

মদ ও বেশ্যা ছাড়ানোর জন্য ভগবানকে কামারপুকুরে জন্ম নিতে হয়েছিল তবে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

রামকৃষ্ণের জীবনে এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়—যাতে বোঝা যায় তিনি দুষ্কৃতকে ঘৃণা করতেন! কলিকাতার জনৈক যুবক পরমহংস জিলিপি ভালবাসেন শুনে জিলিপি নিয়ে গেছলেন, "শ্রীশ্রীপরমহংস দেব উহা গ্রহন ত করিলেনই না; অধিকন্তু যে স্থানে যুবক জিলিপি রাখিয়াছিলেন, তথাকার মাটি পর্য্যন্ত উঠাইয়া দিয়া সেই স্থানে গোবর ও গঙ্গাজল দিয়া পরিষ্কৃত করিতে বলিলেন" [স্বামী ওঙ্কারানন্দ পরিব্রাজকাবধূত কর্ত্তৃক রচিত "শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল চরিতামৃত" ১০৪ পৃষ্ঠা। শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডাঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জী, ডাঃ মোহিনী মোহন ভট্টাচার্য্য এম. এ, পি. এইচ ডি. বসুমতী (১৩৫৩ জ্যৈষ্ঠ), আনন্দবাজার (২৬।৪।৫৩) যুগান্তর (১৫।৫।৫৩), অমৃতবাজার (১৮।৮।৪৬) প্রভৃতি দ্বারা বইখানি উচ্চ প্রশংসিত]।

তারাপদ নামক জনৈক যুবক রামকৃষ্ণকে দর্শন করতে গেলে তিনি তিরস্কার করে বললেন, " 'তুই গোহত্যা না ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিস্ শীঘ্র বল্, তোকে দেখিয়া অবধি আমার গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে'। ইহা শুনিয়া হতভাগ্য তারাপদ নিজের জন্মদোষ প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। পরমহংসদেব তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। ... ...তাঁহার স্থান ত্যাগের পর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণকে তারাপদর বসিবার স্থান হইতে এক কোদাল মাটি খুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সেই স্থানে গঙ্গাজল দিতে আদেশ করিলেন" ['শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল লীলামাধুরী' (মধ্যলীলা) ১৬৪ পৃঃ, নিত্যপরমানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক রচিত, এবং রেণু মিত্র এম. এ রচিত 'সমন্বয় মূর্ত্তি শ্রীনিত্যগোপাল' ২৯ পৃঃ]

তোমাদের 'পতিত পাবন ভগবান যুগাবতারের' ওগুলি কি দুষ্কৃত বিনাশের নমুনা ?

(ঘ) অলৌকিক দিব্য শক্তি বা দিব্য বিভূতির দিক দিয়ে বিচার করতে গেলেও লোকনাথ ব্রহ্মচারী, গোঁসাইজী, রামদাস কাঠিয়া বাবা, ভাস্করানন্দ এবং ত্রৈলঙ্গস্বামীর মত রামকৃষ্ণের জীবনে দিব্যবিভূতির অজস্র প্রকাশ দেখা যায় না। ত্রৈলঙ্গস্বামী, বিশেষ করে ভাস্করানন্দের খ্যাতি তো সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছিল। আর

নিকোলাই পর্য্যন্ত ভাস্করানন্দের কাছে এসেছিলেন। মার্কটোয়েনের মত লোক ভাস্করানন্দকে 'Eighth wonder of the world' বলে অভিহিত করেছিলেন।

সে যুগের মহাপুরুষদের কাছে তিনি ঋণী ছিলেন

(ঙ) আরও বিচার করে দেখ, ঐ সব অন্তর্য্যামী, ঈশ্বরদর্শী মহাপুরুষরা যদি বুঝতে পারতেন যে, তাঁদের ধ্যানের বস্তু দক্ষিণেশ্বরে 'মা কালী মা কালী' করে কাঁদছেন, তাহলে তাঁরা তো নিশ্চয়ই মানুষী তনুধারী ভগবানের লীলা দেখে ধন্য হওয়ার জন্য ছুটে আসতেন? কিন্তু তাঁরা কেউ আসেন নি। বরং রামকৃষ্ণই সকল সাধুকে দর্শন করবার জন্য ছুটে যেতেন। মহর্ষি দয়ানন্দকে দর্শন করতে গিয়ে ভয়ে বাক্যালাপই করেন নি! ত্রৈলঙ্গস্বামীকে কাশীতে দর্শন করে বলেছিলেন 'কাশীতে সচল বিশ্বনাথ দেখে এলুম। ত্রৈলঙ্গস্বামী কাশী আলো করে বসে আছেন'। বৃন্দাবনে গিয়ে নিধুবনের গঙ্গামাতার কাছে তো থেকে যেতেই চেয়েছিলেন; মথুরবাবু শেষে তাঁর মায়ের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তোমাদের 'ভগবানকে' ভুলিয়ে এনেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে!

অবশ্য ঐ সময় অনেক সাধু সন্ন্যাসী প্রায়ই রাণী রাসমনির অতিথি-শালায় আসতেন। তাও তাঁরা ঐ "ভগবানকে দেখবার জন্য নয়; গঙ্গাসাগর ও জগন্নাথ দর্শনের পথে ঐ কালীবাড়ী; স্নান, আহার, বিশ্রাম এবং 'দিশা-জঙ্গল' (শৌচাদির সুবিধা) এর সুযোগ সুবিধার জন্যই তাঁরা আসতেন ["শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গঃ" ১৪২ পৃঃ (সাধক ভাব) ঐ, গুরু ভাব, উত্তরার্ধ ৫১ পৃঃ]। তাঁদের মধ্যে আবার যাঁকেই রামকৃষ্ণের ভাল লাগতো তাঁরই কাছে তিনি দীক্ষা নিয়ে বসতেন। এইভাবেই তিনি কেনারাম ভট্টাচার্য্য [ঐ ৯৯ পৃঃ], জটাধারী [ঐ ২২৯ পৃঃ], সুফি গোবিন্দ রায় [ঐ ২৯৯ পৃঃ], ভৈরবী ব্রাহ্মণী, তোতাপুরী এবং আরোও অনেকের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। এটা কি তোমাদের কাছে তাঁর "যুগাবতারত্বে"র প্রমাণ?

(চ) রামকৃষ্ণ না এলে সব হিন্দু যুবকরা খ্রীষ্টান হয়ে বিধর্ম্মী হয়ে যেতেন, একথাও অমূলক! খ্রীষ্টানধর্ম্মও একজন মহাপুরুষের উপলব্ধ সত্য। এমন কিছু তা গর্হিত নয়, ভগবানের চোখে তা বিধর্ম্ম, অধর্ম্ম হওয়ারও কথা নয়! কাজেই তাড়াতাড়ি তাঁকে ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে, বাংলার কতিপয় হিন্দু যুবককে খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রভাব থেকে বাঁচাবার জন্য জন্মাতে হয়েছিল, একথাও

হাস্যকর। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই জানেন, রামকৃষ্ণ কোন 'বিধর্মী' যুবককে 'শুদ্ধিযজ্ঞ' করে হিন্দু করেন নি, বা, সে সময় যে কয়জন রামকৃষ্ণের 'followers' হয়েছিলেন, তাঁরা রামকৃষ্ণের পদচ্ছায়ায় এসে পৌঁছেছিলেন বলেই সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেছলেন, নতুবা তাঁরা খ্রীষ্টান হয়ে 'বিধর্মী' হয়ে যেতেন, এমন কোন প্রমাণ নেই। বরং রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজই সে সময় হিন্দুযুবকদেরকে বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করেছিল। ব্রাহ্ম সমাজের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশব সেনের আমোঘ প্রভাবেই Christianity spread এর অন্তঃরায় হ'য়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহু প্রতিভাধর পুরুষ জন্মেছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, নানা বিভ্রান্তিকর বহিরাচারের বেড়াপাকে, সমাজের যে কতো সর্ব্বনাশ হচ্ছিল তা তাঁদের চোখে ধরা পড়েছিল। তাই তাঁরা বিদ্রোহ করেছিলেন হিন্দুধর্ম্মের গোঁড়ামি এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে; ইতিহাসে এই সময়টাকে বলা হয়, **'Revolt of Light against Darkness.'**

খ্রীষ্টান মিশনারীদের নব প্রচারিত ধর্ম্মের উদারতা শিক্ষিত যুবকদেরকে আকৃষ্ট করেছিল; অনেকে খ্রীষ্টানও হয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ঠিক ঐ সময় মহর্ষি দয়ানন্দ এবং ব্রাহ্মসমাজ বেদবেদান্ত প্রতিপাদিত শুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করে তৎকালীন জ্ঞানপিপাসু যুবকদেরকে দিয়েছিলেন আলোকের সন্ধান। ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ প্রভৃতি মহাত্মারাও যোগশক্তির প্রভাব দেখিয়ে ভারত ও ভারতের বাইরেরও জ্ঞানী গুণীদেরকে চমৎকৃত করে হিন্দুধর্ম্ম এবং যোগদর্শনের সারবত্তা নূতনভাবে প্রমাণ করেছিলেন। ওখানেও রামকৃষ্ণের কোন Credit নেই।

(ছ) স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোর ধর্ম্মসভায় অবজ্ঞাত হিন্দুধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলে প্রমাণ করছিলেন এই জন্য যদি রামকৃষ্ণের 'যুগাবতারত্ব' demand কর, সেদিকে তো বিবেকানন্দেরই কৃতিত্ব! রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে খুব সাধতেন। ভাবদৃষ্টিতে অনুভব করেছিলেন যে বিবেকানন্দ হলেন দিব্য অখণ্ডমণ্ডলের 'দিব্য জ্যোতিঃঘনতনু, সপ্তর্ষির অন্যতম; রামকৃষ্ণ নিজমুখে বলেছিলেন যে তিনি নাকি আসার সময় ওঁকে 'আবাহন করে' এসেছিলেন [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ', পঞ্চম খণ্ড, একানব্বই-বিরানব্বই পৃষ্ঠা]। বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্য ছিলেন বলে যদি কৃতিত্বটা গুরুর প্রাপ্য হয়, তাহলে রামকৃষ্ণের অসংখ্য গুরুমণ্ডলি, বিশেষ করে, তোতাপুরী কি অপরাধ করলেন? তোমরা রামকৃষ্ণ ভক্তরা তো, তাঁর গুরু

ব্রাহ্মনীমা এবং তোতাপুরীকেই রামকৃষ্ণের কাছে down হওয়ার রসালো লীলাকথা রচনা করেছ! ব্রাহ্মণীকে বলেছ 'অপূর্ণ' 'অহংকারী'। তোতাপুরীকে বলেছ "অজ্ঞ" [ঐ, তৃতীয় খণ্ড, দু'শত নব্বই পৃষ্ঠা] !! "যুগাবতারের" গুরুরাই যদি "অপূর্ণ" এবং "অজ্ঞ" হ'ন, তাহলে তাঁর "যুগাবতারত্ব" দাঁড়ায় কি করে? ম্যাট্রিকপাশ একজন শিক্ষকের কাছে ও পড়ে কি কেউ এম, এ পাশ করতে পারেন? ভক্তির আতিশয্যে তোমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন !!!

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়, একটা ক্লীবের আপোষ নয়।

(জ) এইবারে থাকে 'সর্বধর্ম্ম সমন্বয়ের' প্রশ্ন। আচ্ছা, সব ধর্ম্মই যদি তাঁর চোখে এক ছিলো, তাহলে আমাদের জাতির গৌরব মহাকবি মাইকেল মধুসূদন যখন রামকৃষ্ণের সঙ্গে আলাপ করতে যান, তখন তিনি নিজে প্রথমে গেলেন না। তাঁর অন্তরঙ্গ বিশ্বাসভাজন শাস্ত্রীকে পাঠালেন। শাস্ত্রী ঐ মহামনীষীকে কি বলিছিলেন তার বর্ণনা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' থেকেই শোন, "কি! এই দুই দিনের সংসারে পেটের দায়ে নিজের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা? এ কি হীন বুদ্ধি! মরিতে তো একদিন হইবেই, না হয় মরিয়াই যাইতেন। ইঁহাকেই আবার লোকে বড়লোক বলে এবং ইঁহার গ্রন্থ আদর করিয়া পড়ে, ইহা ভাবিয়া শাস্ত্রীজীর মনে বিষম ঘৃণার উদয় হওয়ায় তিনি তাঁহার সহিত আর অধিক বাক্যালাপে বিরত হ'ন" [ঐ, ৪র্থ খণ্ড, ৯৪ পৃঃ]। তাঁরই প্রতিভূ হয়ে বাক্যালাপ করতে গিয়ে শাস্ত্রী যে 'বিধর্ম্মী' বলে অতবড় মহামনীষীকে 'ঘৃণা' করলেন, এজন্য কিন্তু তোমাদের 'সমন্বয়কারী ভগবান' তাঁকে কিছু বললেন না; বরং 'বিধর্ম্মী' দেখে তাঁরও মুখ চাপা হয়ে গেল !! তোমাদের সর্বধর্ম্মসমন্বয়কারী পতিত পাবন যুগাবতারের শ্রীমুখের উক্তি, "আমার মুখ যেন কে চেপে ধরলে—কিছু বলতে দিলে না।" [ঐ,৯৫ পৃঃ) !!!

শুধু তাই নয়, মাইকেল চলে যাওয়ার পর তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর স্বধর্ম্মত্যাগ নিয়ে কটু আলোচনা করা হয় এবং শাস্ত্রী, "স্বধর্ম্মত্যাগ করা যে অতি হীন বুদ্ধির কাজ", একথা ঠাকুরঘরে ঢুকবার দরজার পূর্বদিকের দালানের গায়ে একখণ্ড কয়লা দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লিখে রাখেন; বহুদিন যাবৎ রামকৃষ্ণ ভক্তরা তাই দেখে "কৌতূহলাক্রান্ত" হতেন [ঐ, ৯৫ পৃঃ]। কিন্তু তথাপিও তোমাদের "সর্বধর্ম্মসমন্বয়কারী যুগাবতার" সে সম্বন্ধে কিছু সমন্বয়ের বাণী বলে

ভক্তবৃন্দের ভ্রান্তি মোচনের কোন চেষ্টা করেন নি! তোমাদের ভগবান ভারতীয় হিন্দু বলে খ্রীষ্টান ধর্ম্মটা বুঝি 'বিধর্ম্ম' 'অপধর্ম্ম' হয়ে গেল?

'অ্যাঁও ঠিক, অঁ-ও ঠিক, এটাও হয়'—ওঠাও হয়'—এ ধরণের যে সমন্বয়ের বাণী, তা সমন্বয় নয়, একটা সমন্বয়ের খিঁচুড়ি! **কিংবা বলতে পারো, লঙ্ক-ভূমিকম্পের অভাবে এ হ'ল ক্লীবের আপোষ**!! সমন্বয়ের মহাসত্য যিনি উপলব্ধি করেন, তিনি সেই নির্ভীক সত্যকে প্রচার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। ধর্ম্ম জগতে একটাই। অজ্ঞরাই ধর্ম্মের বহুত্ব দেখে এবং নিজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিবদ্ধ ধর্ম্মের বাইরে সব কিছুকে 'বিধর্ম্মী' ও 'বিধর্ম্ম' বলে মনে করে।

সবাই সেই পরমদয়ালের সন্তান, তাঁর চোখে জাতপাত বর্ণ বিভেদ নেই; এই সমন্বয়েব মহাবাণী, সাম্য ও প্রেমের অভেদ মন্ত্র বরং দ্বিধাহীনভাবে অক্লান্তভাবে, দৃপ্ততেজে, সমদৃষ্টি নিয়ে, প্রচার করে গেছেন কবীর সাহেব। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান ইত্যাদি ধর্ম্মের যে শ্রেণীভেদ আর তাই নিয়ে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে জেহাদ, পরস্পরের মধ্যে বিষাক্ত বিদ্বেষ—এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন কবীর। সর্ব্ববিধ কুসংস্কার আর মূর্ত্তিপূজার, বহিরাচারাদির অন্তঃসার শূন্যতা দেখিয়ে দিয়ে, ধর্ম্মরাজ্যে যে সমস্ত দুর্নীতি কলুষতা এসেছিল, তার মূলে রূঢ় আঘাত হেনে, কবীর প্রকাশ করেছিলেন মহাসত্যকে, মানুষকে দিয়েছিলেন আলোক ও অমৃতের সন্ধান।

এজন্য তাঁকে কত নিন্দা, কত নির্য্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল, তবুও তিনি সত্য—কেবল সত্যকেই, অভেদ সাম্য ও প্রেমের মহাসমন্বয়বাণীকেই প্রচার করেছিলেন। কুসংস্কার, লোকমত, কুলাচার ও দেশাচারের সঙ্গে কাপুরুষের মত আপোষ করে সত্যকে তিনি বিকৃত করতে চান নি বা মিথ্যাচারের সঙ্গে কোন আপোষ করে সস্তায় লোক বন্দনা বা করতালি গ্রহণ করেন নি; নিজেকে 'পূর্ণ ভগবান' বলে declare ও করেন নি। 'যুগাবতার', 'স্বয়ং ঈশ্বর,' বললে গদগদ হয়ে পড়ার মত লোকও তিনি ছিলেন না।

কবীর, নানক, দাদু পল্টুসাহেব প্রভৃতি সন্তরাই মানুষে মানুষে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যোগসাধনার জন্য অপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। হিন্দু যখন মেতে থাকে আপন আচার বিচার স্মৃতি শাস্ত্রের অনুশাসন নিয়ে, মুসলমান থাকে নিজের কোরাণ হদিস্ শরীয়তী নিয়ে, তখন কে এই উভয় দলকে যুক্ত করবে? তখন ঐ মধ্য

যুগের সন্তরাই সাম্য প্রেম আর সমন্বয়ের বাণী নিয়ে আবির্ভূত হয়ে ছিলেন। তাঁরা বললেন, **"যতদিন তোমরা আপন আপন শুষ্ক কাগজের দপ্তরকেই বিশ্ব মনে করছো, ততদিন তোমাদের মিলবার কোন সম্ভাবনাই নেই, চেয়ে দেখ, সবাই একই দয়ালের সন্তান। ধর্ম্মভেদ নিয়ে ও সব কী মিছে গোলমাল করো**! একই বিন্দু একই মলমূত্র চামড়া, একই ইন্দ্রিয়—এক পরম জ্যোতিঃ থেকেই সবাই উৎপন্ন ; কেই বা ব্রাহ্মণ কেইবা শূদ্র।"

সন্তদের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

'একৈ বুংদ একৈ মলমূতর, এক চাম, এ গূদা,
এক জ্যোতি থৈঁ সব উৎপনা কৌন ব্রাহ্মণ কৌন সূদা। (কবীর)
'সব ঘট একৈ আত্মা ক্যা হিন্দুক্যা মুসলমান'—(দাদুবাণী)

সাম্প্রদায়িক ভেদ রহিত যে পথ, তাই হ'ল পূর্ণ পথ—

'দৈ পথ রহিত পংথ গহি পূরা'। (দাদূ)
'অলহ্ রাম ছুটা ভ্রম মেরা
হিন্দু তুরক ভেদ কুছ নাহি' (ঐ)

হিন্দুও মরে, রাম রাম করে, মুসলমানও মরে, খোদা খোদা করে, এই সব ভেদ বুদ্ধির মধ্যে যে না পড়বে সেই বাঁচবে।

হিন্দু মুয়ে রাম কহি মুসলমান খুদাই
কহে কবীর সো জীবতা দুহ মৈ কাঁদন জাই। (কবীর)

কবীর সাহেব বললেন, "এক এক জাতির এক একজন স্রষ্টা অর্থাৎ হিন্দুর একজন ঈশ্বর আর মুসলমানের আর একজন ঈশ্বর নেই। পণ্ডিত, কাজী আর সম্প্রদায়ীরাই মিলতে দেয় না নিজ নিজ স্বার্থে। তোমরা জাতপাত বণ, সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছেড়ে, শরীয়তী স্মৃতি শাস্ত্রের শেকল ছিঁড়ে এগিয়ে চল, সেই পরম সত্যের দিকে।" কবীরের সমন্বয়ের বাণীতে অনুপ্রাণিত পরবর্ত্তী সন্তরাও কবীর বাণী প্রচার করতে লাগলেন, "সকল সঙ্কীর্ণ আচার সংস্কার থেকে মুক্ত হও, তবেই ঐক্যের পথ সহজ হবে ; সকলের মধ্যে সেই এক মহাসত্যকে উপলব্ধি করে তোমারা মিলিত হবে বিশ্বপিতার চরণতলে।"

চিৎ শুদ্ধ হৈ ভক্তিসে স্নানাদিসে দেহ
জিস্‌কো হৃদে ভক্তিরাজে, বন্ধু! স্বাগত দেব গেহ! (কবীর)

তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ঈশ্বর ভিতরে কি বাহিরে, কোথায় তিনি বিরাজিত ? কবীর উত্তর দিলেন,

ঐসা লো নহিঁ তৈসা লো
মৈঁ কহি বিধি কঁহৌ গম্ভীরা লো।
ভিতর কহুঁ তো জগময় লাজে, বাহার কহুঁ তো ঝুটা লো।

তাই আচার্য্য ক্ষিতি মোহন সেন শাস্ত্রী সশ্রদ্ধ চিত্তে ঠিকই বলেছেন, "এক ক্ষুধা-তৃষ্ণা-অভাবেই সমভাবে সবাই ব্যাকুল এই কথা বলে এই যুগে সাম্যবাদ প্রচারিত হয়েছে রাশিয়ায়। আর **তখন কবীর দাদু** প্রভৃতি সাধকরা এই কথা বলেই, ভগবানের সঙ্গে সবার সমান সম্বন্ধ দেখিয়েই **সর্বমানবের সমতার** কথা প্রচার করে গেছেন" [ভারতের সংস্কৃতি ৬৮ পৃঃ]।

'পূরব দিশা হরি কো বাসা, পশ্চিম আল্লাহ্ মোকামা,' হিন্দু মনে করে পূর্ব দিকে হরির মন্দির, মুসলমান ভাবে পশ্চিমেই আল্লার নিবাস, উভয় সম্প্রদায়ের এই ভেদ দৃষ্টির জন্য কবীর কতো দুঃখ করেছেন। সেই পরম সত্যকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বলে মহাসমন্বয়ের বাণী তাঁর মধ্যে স্বতঃই স্ফুরিত হয়েছিল —এবং সেই সত্য প্রচার করতে গিয়ে অনেক নির্য্যাতনও তিনি মাথা পেতে নিয়ে ছিলেন, তথাপিও তিনি সমন্বয়ের নামে সমন্বয়ের খিঁচুড়ি করে যান নি অর্থাৎ রামকৃষ্ণের মত তন্ত্রের নামে জঘন্য ক্রিয়া কলাপ করে 'নরমাংস' 'কারণবারি' খেয়ে ওটাও ঠিক, আবার মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষা নিয়ে 'গোমাংস ভক্ষন' করতে চেয়ে— এটাও ঠিক অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়ের সকল আচার, বিচার, ভেদ বিভেদ সত্য, এই বলে, ভেদ বিভেদকে জিয়িয়ে (বাঁচিয়ে) রেখে যান নি !!

শোনা যায়, মহাপুরুষ কবীর সাহেব যখন হিন্দু মুসলমান সাধনার মিলন সম্বন্ধে এই সব অভেদ মন্ত্র প্রচার করেছিলেন, তখন পণ্ডিতের দল গিয়ে বাদশাহের কাছে অভিযোগ করলো, 'এই লোক মুসলমান হয়ে আমাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করছে'। আর মোল্লার দল অভিযোগ করলো, 'এই লোক মুসলমান কুলে জন্মেও হরি রাম ইত্যাদি বলে, হিন্দু মুসলমান সব এক বলে, ইসলামের অপমান করছে'। বাদশাহের দরবারে কবীর সাহেবকে তলব করা হ'ল। কবীর গিয়ে দেখলেন সেখানে অভিযোক্তার কাঠ গোড়ায় পণ্ডিত ও মোল্লা একত্রে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি হেঁসে উঠলেন। দরবারের

সবাই তাঁর ঐ রকম আচরণের কৈফিয়ৎ দাবী করলো ; তিনি বললেন, "এইটেই তো আমি চেয়েছিলাম, তবে ঠিকানামেঁ থোড়ি গলতি হো গঈ ! চেয়েছিলাম তো উভয়ের মিলন, হিন্দুমুসলমান উভয়েই একই মহাসত্যকে যথাযথ বুঝে সেই বিশ্বপিতার চরণতলে মিলিত হোক, এই তো আমার ইচ্ছা, কিন্তু তারা তা না করে জগতের এক তুচ্ছ রাজার দরবারে এক সঙ্গে মিলিত হয়েছে ! তাই বলছি, ঠিকানামেঁ থোড়ি গলতি হো গঈ" !

কবীরের সর্বধর্ম্মসমন্বয়, অভেদ—প্রেমদৃষ্টি

কবীর সাহেবের বাণী কত বজ্রসার—অগ্নিক্ষরা—আলোকময় ।

একাদশী মেঁ হিন্দু ভোলা হ্যায়, যবন ভোলা হ্যায় রোজা,
মঠ দর্শনমে যতি ভোলা হ্যায়, অন্তর নেহি খোঁজা ।
পাঁজি পুঁথিমে পণ্ডিত ভোলা হ্যায়, অন্তে ভোলা হ্যায় কথনি,
জান্ শুনকো যো ভোলা হ্যায়, সো শমনকো সাথনি ।
হিঁয়া হুঁয়া মৎ ঢুঁড়োহি কহে কবীর বোলা
হৃদমন্দিরমেঁ যো খোঁজা হ্যায়, সো পাওয়ে প্রীতমলালা । (কবীর)

সেই এক পরমদয়ালকে জানাই পরম পুরুষার্থ, সেই প্রাতম্ প্রিয়তমকে জানতে হবে ; সবাই তাঁর সন্তান এজন্য সবাইকে সমদৃষ্টিতে ভালবাসতে হবে—এই হ'ল কবীরের সত্য। তিনি 'বিধর্ম্মী' বলে কাউকে উপেক্ষাও করেন নি, কিংবা কারও 'জন্মদোষ' নিয়ে কাউকে সকলের সামনে অপমান করে, তার বসার স্থানের মাটিটাকে খুঁড়ে ফেলে দিতে বলেন নি ! তোমাদের যুগাবতারের মত সমন্বয়ের নামে 'মুড়ি-মিছরি, জড়-চৈতন্য, সাচ্চা-ঝুটা সব এক' বলে **সমন্বয়ের কোন Special mixture করে যান নি** ! সহজ সরল সত্যকে কবীরজী যেমন ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তা যেমন দৃপ্ত তেজে তিনি ঘোষণা করেছেন, তেমনি সমান শক্তিতে মিথ্যার মুখোস্ খুলে দিতেও তাঁর বজ্রকণ্ঠ কোনদিন স্তব্ধ হয় নি। সত্য, প্রেম, সাম্য আর সমন্বয়ের বাণীগুলি তাঁর কী অপূর্ব ! তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "আচার বিচার মন্দির, বিগ্রহ, জড়মূর্ত্তি, কর্ম্মকাণ্ড, সংস্কার সবই বাহ্যিক-এগুলি ঠিক কাঁটার মত। **এই কাঁটা মুক্ত হয়ে মিলিত হতে হবে ; এই কাঁটায় কণ্টকিত হ'য়ে আলিঙ্গন করতে গেলে, তা হ'বে সজারুর আলিঙ্গনের মত** ! সত্য দেবতা আছেন

অন্তরে, মানুষই জীবন্ত হরি মন্দির, অন্তরমুখী হও, **অন্তরে মহাসত্যে ফিরে এসো—সেখানে বৈচিত্র্য আছে, বিরোধ নেই। এই অন্তরের মন্দিরে জ্বলছে, মানব সাধনার নিত্যদীপ, সেই আলোকই আমাদের গুরু, সংস্কার মুক্ত হলে, এই গুরুবাণী নিত্য পাবে শুনতে।"**

সকল ধর্ম্মমতের আচার ও সংস্কারের Special mixtureকে ধর্ম্মসমন্বয় বলে না

কবীরের বাণী ও জীবনী বিচার করলেই বোঝা যায় তাঁর দৃষ্টি কত সহজ, কত দিগন্তপ্রসারী, অথচ সার্ব্বভৌম। মহাসত্যের কোন দিক বাদ দিয়ে, 'অ্যাঁও ঠিক, অঁ-ও ঠিক, কালী জপলেও হ'বে, পোড়া কপালী জপলেও হবে'—এই ধরণের আপোষ মূলক বাণীতে মহাসত্যের কোন দিকটাই তিনি সুলভ বা সস্তা করে দেন নি। মহাসত্যের কোন দিকটাই তিনি চাল'কি দিয়ে এড়া'তে চান নি।

সমন্বয় ও সমদৃষ্টির এ সব কথা কবীরেরও পূর্বে বেদ উপনিষদে পাই,

(ক) "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্ (ঈশোপনিষদ্)

(খ) যস্তু সর্বানি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে [উপনিষদ্]।

(গ) এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ [ব্রহ্মবিন্দুপনিষদ্]

(ঘ) অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টঃ
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্ম
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ [কঠ ৫, ৯]

(ঙ) সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্য্যং করবাবহৈ [ঐ]

(চ) সমানো মন্ত্রঃ সমিতি সমানীঃ [ঐ]

বুদ্ধদেবের ও ঐ একই রকমের মৈত্রী ভাবনা ও সমন্বয় মূলক প্রেমদৃষ্টি—

মাতা যথা নিজং পুত্তং আয়ুসা এক পুত্তমনুরকখে।
এবং পি সর্ব্বভূতেষু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।
মেত্তঞ্চ সর্ব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।। [সুত্তনিপাত] ইত্যাদি

"মাতা যথা প্রাণ দিয়াও আপন একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করেন এইরূপই সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণে প্রেমভাব জন্মাইবে, সর্বলোকের প্রতি অপরিমাণ মৈত্রীভাব

জন্মাইবে,, উর্ধ্বদিকে, অধোদিকে, চতুর্দ্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কি দাঁড়াইতে কি চলিতে, কি বসিতে, কি শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে তাবৎ এই মৈত্রীভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে, ইহাকেই বলা হয় ব্রহ্মবিহার।"

বেদ উপনিষদের সমন্বয়বাণী

মুনি রাম সিংহ (একহাজার খৃষ্টাব্দ) রচিত 'পাগুড দোহা'তেও কবীরের মূল সত্য, সেই সমন্বয় ও অভেদ দৃষ্টির কথা আমরা দেখতে পাই—'ভেখ বদলালে কি হবে? সাপ তো খোলস বদলায় কিন্তু তার বিষটুকু ছাড়ে কি? কাজেই ভেখ, আচার যা মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তা ছাড়। ওরে যোগী, যার জন্যে তুই তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াস, সেই শিবস্বরূপ তো তোরই সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তবু তুই পেলি না তাঁর নাগাল [দোহা ১৭৯]! আগে পাছে দশ দিকে যেদিকে তাকাই শুধু তাঁকেই দেখি, 'অগ্গঁই পচ্ছইঁ দহদিহহিঁ জহিঁ জোবউঁ তহিঁ সোই' [দোহা ১৭৫]। কেউ তো পর নয়, তাই আপনাকে যেমন প্রেম করি, সর্বজীবে সেইরকম প্রেম করা চাই, ঝগড়া হবে কার সঙ্গে? যেখানেই দেখি, সেইখানেই দেখি আপন আত্মাকে—

······কলহ কেন সম্মানউ'
জহিঁ জহিঁ জোবউঁ তহিঁ অপ্পানউ' [দোহা ১৩৯]।

সমন্বয় ও সমদৃষ্টির ঐ মহত্তম ভাবধারা বসবকৃত বীর শৈবদের বসব পুরাণে, সরহপাদের 'দোহাকোষে', ভবিষ্যপুরাণ, মৈত্রেয়োপনিষৎ এবং বজ্রসূচিকোপনিষদেও পাই। যে জাতিভেদ, বহিরাচার, জড়োপাসনা বিভেদ সৃষ্টি করেছে, এই সব গ্রন্থে সে সব কঠোর ভাষায় খণ্ডন করা হয়েছে।

'যে দিকেই দেখি না কেন দ্বিজ-শূদ্রে কোন ভেদই তো দেখা যায় না। না বাইরে না ভিতরে, না সুখে না ঐশ্বর্য্যে, না বীর্য্যে, না আকৃতিতে, না আয়ুতে না অঙ্গ পুষ্টিতে, না দৌর্ব্বল্যে, না স্থৈর্য্যে, না চপলতায়, না প্রজ্ঞায়, না ভেষজে না স্ত্রীগর্ভে, কোথাও ব্রাহ্মণ শূদ্রে, মানুষ মানুষে ভেদ নেই—

তস্মান্ন চ বিভেদোঽস্তি ন বহির্নান্তরাত্মনি।
ন সুখাদৌ ন চৈশ্বর্য্যে না জ্ঞায়াং না ভয়েষপি'

[ভবিষ্যপুরাণ, ব্রাহ্মপর্ব ৪১, ৩৫-৩৮]

'ব্রাহ্মণও কিছু চন্দ্রমরীচির মত শুক্ল ন'ন, ক্ষত্রিয়রাও কিছু কিংশুক পুষ্পবর্ণ ন'ন, বৈশ্যরাও কিছু এই সংসারে হরিতালবর্ণ ন'ন, শূদ্ররাও তেমনি অঙ্গার সমবর্ণ ন'ন। চারবর্ণই যখন এক পরমপিতারই সন্তান, তখন তাদের সবারই এক জাতি। সব মানুষের পিতা যখন এক, তখন একই পিতার সন্তানদের মধ্যে আবার জাতিভেদ থাকবে কি করে?

চত্বার একস্য পিতুঃ সুতাশ্চ
তেষাং সুতানাং খলু জাতিরেকা।
এবং প্রজানাং হি পিতৈক এব,
পিত্রৈকভাবান্ ন চ জাতিভেদঃ [ঐ, ব্রাহ্মপর্ব, ৪১, ৪৫]

আত্মদৃষ্টি না হলে ঐ সমদৃষ্টি বা সমন্বয়বোধ জীবনগত হয়ে উঠবে না। আচার, বিচার, ভেক, মূর্ত্তিপূজা এবং ইষ্টের তারতম্য নিয়েই এই ভেদ চলে আসছে। সব আচার, বিচার, ভেদনীতি সমর্থন করতে গেলে সত্য প্রকাশ হবে না। অসাম্য ও বিভেদ রয়েই যাবে। তাই মৈত্রেয়োপনিষৎ স্পষ্টভাষায় প্রকাশ করলেন—

পাষাণ লোহমনি মৃন্ময় বিগ্রহেষু
পূজা পুনর্জ্জনন ভোগকরী মুমুক্ষোঃ।
তস্মাদ্ যতিঃ স্বহৃদয়ার্চনমেব কুর্য্যাদ্
বাহ্যার্চনং পরিহরেদ পুনর্ভবায [ঐ, ১১৮ পৃঃ]।

'হরমন্দির এহি শরীর হ্যায়, জ্ঞানরতন প্রগট হোয়ে' (নানক)

শাঁস ও ছোঁবড়ার Equation কষে দিলে ধর্ম্মসমন্বয় হয়ে যাবে না।

এই দেহের মধ্যেই তিনি বিরাজিত, জ্ঞানদৃষ্টিতে বোঝা যায়। নিজের মধ্যে তাঁকে দেখে বুঝে সকলের মধ্যে তাঁরই প্রকাশ দেখা যায়, তখন আসে সত্য সাম্য প্রেম ও সমদৃষ্টি। স্থূলে দৃষ্টি দিয়ে, ভেখ, আচার নিয়ম বিচার নিয়ে পড়ে থাকলে কিংবা এই সব বিভেদকারী জড়োপাসনা বহিরাচারকে support করলে 'সমন্বয়' কথাটা পুঁথি কেতাব আর বক্তৃতায় থেকে যাবে। **তা জীবনগত হয়ে উঠবে না।** Inner Spirit টাকেই গ্রহণ করতে হবে, Forms গুলোকে নয়। শাঁস শাঁসই, ছোবড়া ছোবড়াই। **শাঁস ও ছোবড়া দুটোকেই এক বলে সমন্বয়ের Equation কষে দিলে তা সমন্বয় হয়ে যাবে না।** ছোবড়াটা না উঠিয়ে দিলে, ফেলে দিলে, শাঁস পাওয়া যাবে না।

সারসত্ত্বা (Substance, Kernel, Inner Spirit) সব গুলোর মধ্যে Realise করতে নাপারলে, আস্বাদন করতে না পারলে, বিভিন্ন নাম বিভিন্ন আকৃতিগত ভেদ অনুযায়ী জাতি পাঁতি বর্ণ নিয়ে বিভেদ লেগেই থাকবে। **প্রেমদৃষ্টি-সমদৃষ্টি দানকারী বস্তু আর বিভেদকারী বস্তু**—এই দুটো Positive এবং Negative কে এক বলে বসাটা বা একই সঙ্গে **দুটোকেই সমর্থন করাটা সমন্বয় নয়!** সকলের মধ্যে, তোমার আমার মধ্যে, পরস্পরের মধ্যে, তাঁর মধ্যে আর সকলের মধ্যে যে গুলো বাধার প্রাচীর, আত্মগত সমরস মিলনের পথে যেগুলো **অন্তরায়**—সেই **'বাধার প্রাচীর'** এবং **'অন্তরায়' গুলোকে support করা, জিয়িয়ে রাখা কি সমন্বয়?**

সন্তরা ঐ 'অন্তরায়' ও 'বাধার প্রাচীর' যা কিছু, তা রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সকলের মধ্যে যাতে অভেদ প্রেমভাব, আত্মগত মিলন এবং সমদৃষ্টি জন্মে সেই জন্য যা সত্য, তা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশ করে গেছেন। **কোন আপোষ করেন নি** বা **জোড়াতালিও দেন নি!**

অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে, ন্যায় অন্যায় দুটোকেই এক বলা, পুণ্যকে আলিঙ্গন করে পাপের সঙ্গেও মিতালী করা—এ ধরণের যে সমন্বয় **তা সমন্বয় নয়!**

বেদ উপনিষদ, পাহুড়দোহা, দোহাকোষ, বুদ্ধদেবের বাণী বিশেষ করে কবীর নানক প্রভৃতি সন্তদের বাণী বচনে যে সমদৃষ্টি, অগ্নিময় সত্যের প্রকাশ এবং সমন্বয়ের পরিচয় পাওয়া যায়, তাই হ'ল যথার্থ সমন্বয়। "মধ্যযুগে গুরু রামানন্দের সাধনা ও কবীরের তপস্যার পর এই সব কথা আর একবার জেগে ও কিছুদিন প্রবল থেকে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপর আবার জাগরণ ঘটল পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সমাগমের পর। তখন ভারতের এই সব চিরন্তন সত্যই রামমোহন দয়ানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষেরা আবার ব্যক্ত ধ্বনিত করলেন। তাঁরা নূতন কাণ্ড কিছুই করলেন না। যুগে যুগে যা চিরদিন ভারতে ঘটে এসেছে, এই যুগে তাঁরা তাই পুনরায় বিঘোষিত করলেন" ['ভারতের সংস্কৃতি'—আচার্য্য ক্ষিতিমোহন]

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বাণীতে যে মানবতার জয়গান ফুটে উঠেছিল সত্য ও সমন্বয়ের মহামন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল সেও "নতুন কাণ্ড" নয়। শঙ্করাচার্য্যের "জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ," সাধক চণ্ডীদাসের "সবার উপরে মানুষ সত্য

তাহার উপরে নাই", "দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ (মৈত্রেয়োপনিষৎ)", "সর্ব্বেঃ সুখিনঃ ভবন্তু সর্ব্বেঃ সন্তু নিরাময়াঃ। সর্ব্বেঃ ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাক্ ভবেৎ", প্রিয়জন তো বটেই, যে আমাব শত্রু তারও কল্যাণ হোক, শ্রেয়োলাভ ঘটুক 'যশ্চ মাং দ্বেষ্টিলোকেস্মিন্ সোঽপি ভদ্রানি পশ্যতু", "ন ত্বাং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং ন পুনর্ভবং, কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণীনাং আর্ত্তিনাশনম্"—ইত্যাদি বিশ্বোদাব মহামন্ত্র এবং সার্বভৌম মানবতা-বাদেরই প্রতিধ্বনি মাত্র! যদি এজন্য ঐ সব ঋষিদেরকে (তাঁরাও অনেকেই লোকহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন) অবতার বলা না হয়, তাহলে বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণকেই বা 'যুগাবতার' বলা হবে কোন্ যুক্তিতে ?

যুগে যুগে নানা সংস্কৃতির সমাগমে ও সমন্বয়ে ভারতের সংস্কৃতিতে এবং ধর্ম্মে একটা উদার মানবতাবাদ এবং নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা বাববার জেগে উঠেছে। যখন জাতি নানা কারণে রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতির জন্য ঘুমিয়ে পড়ে তখন এই সব উদার ভাব চাপা পড়লেও, পরে এক একজন মহাপুরুষ আবার আসেন, ঘুমন্ত জাতিটাকে পুনরায় তাঁরা জাগিয়ে দেন উদ্বোধনীব তড়িত সংঘাতে। মধ্যযুগে **কবীর সাহেব সকলরকমের কুসংস্কার, ক্লেদ এবং সঙ্কীর্ণ গণ্ডীআচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যে সত্য ও সমন্বয়ের মহামন্ত্র নির্ভীক ভাবে প্রচার করে গেছলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন, দয়ানন্দ, রাধাস্বামী সাহেব পুনরায় সেই সত্যকে জাতির মর্ম্মদেশে প্রতিষ্ঠা করলেন, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনগত আচরণের দ্বারা দুর্গত মানবের সেবা পূজা সংকার করে মানুষের সেবাই যে ভগবানের সেবা, নরই নারায়ণ, এই মানবতা বাদের মহত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।** যে মাইকেলকে উপদেশ দিতে গিয়ে তোমাদের 'যুগাবতাবের' গলা আটকে গেছলো, সেই মাইকেলকে কতোভাবে সেবা সাহায্য বিদ্যাসাগর করে গেছেন। সে যুগে হাজার হাজার নর-নারীকে সেবা করে, সব রকম কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, **শুদ্ধ মানবতাবাদ** যদি কেউ আচরণ করে দেখিয়ে গিয়ে থাকেন, **তিনি হলেন দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর।** এই জন্য মহাকবি মাইকেল তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন,"He has the wisdom of an ancient sage, energy

of an Englishman and heart of a Bengali Mother." রামকৃষ্ণও, নরেন্দ্র দত্ত, কেশবসেন ও আরও বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোকের সংস্পর্শে আসার পর, এঁকে দেখতে গিয়ে বলেছিলেন 'খানা ডোবা নদী পেরিয়ে এবার সাগরে এসে মিশলুম'। রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে 'ক্ষীর সমুদ্র' 'অমৃত সমুদ্র' বলে অভিহিত করেছিলেন। কৈ, এজন্য তো দয়ার সাগর, মহাবিপ্লবী, **শ্রেষ্ঠ মানব প্রেমিক বিদ্যাসাগরকে** তোমরা 'যুগাবতার' বল না !

অমূলক প্রচার মাত্র !

অজ্ঞের ভ্রূকুটি যাঁর ভীতি উৎপাদন করে, কিংবা যিনি প্রতিষ্ঠা লিপ্সু অথবা যিনি উপলব্ধির পরম ভূমিতে গিয়ে দৃঢ় নিশ্চয় হ'ন নি, সেই লোকই যা লোকপ্রিয় তাই বলেন এবং এই আপোষ রক্ষা করতে গিয়ে, "নর্দ্দমাতে স্নান করলেও যা গঙ্গাতে স্নান করলেও তা', 'হরেকৃষ্ণ বললে'ও যা, ফরেকৃষ্ট বললেও তা', 'God বললেও যা dog বললেও তা', 'মূর্ত্তি পূজাও ঠিক, অদ্বৈততত্ত্বও ঠিক'— এই ধরণের so-called সমন্বয়ের কথা বলে যান ! নির্ভীক সত্য প্রকাশ করতে এই সব so-called সত্যদর্শী, সমন্বয়-বাদীদের সঙ্কোচ লাগে !! রামকৃষ্ণের সমন্বয়, ঠিক এই ধরণের সমন্বয়।

রামকৃষ্ণ মুসলমান ধর্ম্ম সাধনার সময়, "গোমাংস ভক্ষণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, মুসলমানের হাতে খেয়েছেন" ['শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' দ্বিতীয় খণ্ড, ৩০০—৩০১ পৃঃ], খ্রীষ্টান ধর্ম্মের সাধনা করার সময়, "তাঁর দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা বিলীন হয়ে, ঈশার সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জাগলো" [ঐ, ৩৬০ পৃঃ], তন্ত্র সাধনার সময় কুকুর শেয়ালের এঁটো খাওয়া ও অন্যান্য জঘন্য কৌল-আচার অনুষ্ঠান করেছিলেন, মধুর ভাবের সাধনার সময় তিনি বারানসী শাড়ী, গহনা, ঘাঘরা, ওড়না পরে মথুরবাবুর অন্দর মহলে মেয়েদের মধ্যে থাকতেন, মথুরবাবুর জামাই এর শয়ন ঘরে রাত্রিতে মথুরবাবুর কন্যাকে সখীর ন্যায় হাত ধরে পৌঁছে দিয়ে আসতেন [ঐ, ২৬০ পৃঃ], ঐসময় তাঁর নাকি স্ত্রী শরীরের ন্যায় উপর্যুপুরি তিন দিন শোনিত স্রাব হ'ত [ঐ, ২৬৬], মহাবীরের সাধনার সময় তাঁর এক ইঞ্চি লাঙ্গুল বৃদ্ধি (Enlargement of the coccyx) হয়েছিল, তিনি 'রঘুবীর' 'রঘুবীর' বলে চিৎকার করতেন, গাছের উপরেই অনেক সময় থাকতেন [ঐ, ১৩৯]— এই সব সর্বধর্ম্ম

সাধনার জন্য নাকি রামকৃষ্ণের বেশী credit! এ জন্যই নাকি তিনি 'যুগাবতার' !!

কিন্তু ভাই, ধর্ম্ম কি কতকগুলো? ধর্ম্ম এবং সত্য এক, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী, আচার এবং সংস্কারের আবরণই সেই সত্যকে ঢেকে রেখেছে। সবার অন্তরালে সেই মহাসত্যকেই যদি রামকৃষ্ণ অনুভব করেছিলেন, আহলে খ্রীষ্টান তাঁর কাছে 'বিধর্ম্মী' হয় কেন? 'গোমাংস ভক্ষণ' তাঁর কাছে, মুসলমান ধর্ম্মের অঙ্গ বলে মনে হয় কেন? কোরাণশরীফে তো 'গোমাস ভক্ষণ' essential বলা নেই! ওটি বহিরাচারী বহির্ম্মুখ মুসলমানদের আচার! হনুমান সম্বন্ধেই বা তাঁর ঐ বিরাট অজ্ঞতা কেন? হনুমান জী কি বর্ত্তমান শাখামৃগদের মত লাঙ্গুলধারী বৃক্ষচারী মর্কট ছিলেন? বেদ উপনিদ্ বিরোধী বহিরাচার কুসংস্কার যা সত্য ধর্ম্মকে ঢেকে রেখেছে, সে সম্বন্ধে কোন উচ্চ বাচ্য তিনি করেন নি কেন? বরং বিভিন্ন ধর্ম্মমতের মনগড়া সাধনা করতে গিয়ে hypersensitive brain এর প্রতিক্রিয়ার ফল-স্বরূপ, তিনি যে সব idocyncracy এর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সেগুলিকে সত্যবলে, বলে গেছেন (ক্ষমা করবেন, তাঁর লীলা সহচর স্বামী সারদানন্দের বর্ণনানুযায়ীই বলছি), তদনুযায়ী কি, তাহলে 'শেয়াল কুকুরের এঁটো খাওয়া' 'যোনি মন্থন' 'নরমাংস খাওয়া', 'গোমাংস ভক্ষনের ইচ্ছা প্রকাশ করে মুসলমান পাচকের হাতে খাওয়া', 'নারীবেশে নারীমহলে বাস করে ফষ্টি নষ্টি করা, নারীর মত ঋতুস্রাব হওয়া' এবং পরিশেষে 'বানরের মত লাঙ্গুল বৃদ্ধি' এগুলিকে কি তাহলে সবই সত্য বলে, সত্য-উপলব্ধির পন্থা বলে সাধক মাত্রকেই আচরণ করতে হবে? একেই কি বলে সর্ব্বধর্ম্ম—সমন্বয়?

মাধ্ব-সম্প্রদায়ের একজন শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা, ভারত বিখ্যাত পণ্ডিত, ডাঃ আর, কে, নাগরাজ শর্ম্মা এম, এ, পি, এইচ, ডি; ডি, লিট্, তর্কচূড়ামণি, জ্ঞান ভাস্কর—তাঁর 'Religion and Monopoly of Truth' নামক প্রবন্ধে রামকৃষ্ণের ঐ সব বিভিন্ন সাধনার কাণ্ডকারখানা সম্বন্ধে অতি সংযত ভাষায় মন্তব্য করেছেন—

"......Nor would it be corrected attitude to take that one is at liberty to practise all the religions in succession. Thus, one may be a Christian in January, Muslim in February,

Vedantin in March and so on, so that he may live all religions. This is bound to be nothing **but Reductis ad-absurdum** of **all religious values and religious loyalties.** Ramkrishna is said to have lived through all religions and realised God differently. That may be so. But I am not sure of the corrcetness or legitimacy of such an approach at all". ['Indian philosophy and **Culture'** (**Magazine**) June '57]

দ্বিতীয় পুষ্প

প্রশ্ন :— বেদ উপনিষদ এবং সন্তসাধু মহাপুরুষদের বাণীবচন থেকে যে আপনি 'মানবতাবাদ' humanitarian out—look) দেখাচ্ছেন, তাঁদের সেটা নিতান্তই পুঁথিগত ছিল। জনসমাজের সঙ্গে মিশে, দুর্গত জনসাধারণকে সেবা করবার জন্য কোন Positive work করে যান নি! অধিকন্তু অধিকাংশ মহাত্মারা বাণীবচনে মানবপ্রেমিক হলেও সন্ন্যাসধর্ম্মকেই সমর্থন করতেন। সংসার ত্যাগ করে, বিবাহ না করে আত্মমুক্তির জন্য তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন! রামকৃষ্ণের 'জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করবি' এবং বিবেকানন্দের 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর' প্রভৃতি ভাবধারা পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষদের থাকতে পারে এঁদের কথা বেদ-উপনিষদ্ থেকে 'borrowed' হতে পারে কিন্তু সংসারে থেকেও ভগবান লাভ এবং সন্ন্যাসী না হয়ে আত্মমুক্তি তুচ্ছ করেও জীব সেবার আদর্শ রামকৃষ্ণই বিবেকানন্দকে শিখিয়েছিলেন। তদনুযায়ী বিবেকানন্দের প্রেরণায় 'রামকৃষ্ণ মিশন' কতো সেবা কার্য্য করে চলেছে। তার পূর্ব্বে কি কোন ধর্ম্মসঙ্ঘকে সেবা করতে দেখেছেন? করুণাপারাবার বুদ্ধদেব প্রেমমৈত্রীর বাণী প্রচার করেছেন সত্য 'কিন্তু তিনিও সংসার ত্যাগী ভিক্ষুসঙ্ঘ গড়ে ছিলেন'। 'জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ', বললেও 'কৌপীনবন্তঃ' 'খলু ভাগ্যবন্তঃ' এই আদর্শ শঙ্করাচার্য্য প্রচার করে গেছেন! যুগ প্রয়োজনে সেবার আদর্শ রামকৃষ্ণ প্রচার করে গেছেন, শুধু 'ভগবান ভগবান' বলে মেতে থাকবার জন্য, বিবাহ না করে সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য ভিক্ষু বা কৌপীনবন্ত হওয়ার জন্য তিনি বলে যান নি, এজন্য তিনি নিশ্চয়ই যুগাবতার।

উত্তর :— জীব সেবার আদর্শ প্রচার করে' পাশ্চাত্য দেশে পাঞ্চজন্য নির্ঘোষে বেদান্তবাণী প্রচার করে স্বামী বিবেকানন্দ যে মহত্তম কাজ করে গেছেন এজন্য তিনি নমস্য। কিন্তু তাই বলে তিনি বা তাঁর গুরু কেউ-ই সাক্ষাৎ ঈশ্বর বা যুগাবতার হয়ে যাবেন না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধু মহাপুরুষদের

[জীবসেবা ও মানবতাবাদ ভারতীয় ঋষিদের আচরিত ধর্ম্ম]

মানবতাবাদ কেবল পুঁথিগত ছিল, রামকৃষ্ণবিবেকানন্দ এসেই জনহিতকর কার্য্যের প্রেরণা দিয়ে Positive করে গেছেন—এ তোমার একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা। **পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপুরুষরাও কেবল আত্মমুক্তি নিয়েই মেতে থাকতেন না,** জনসাধারণের সঙ্গে মিশে দুর্গতদের সেবা করে পরহিতব্রতে যে আত্মোৎস্বর্গ করে গেছেন কিংবা নিজ শিষ্য কোন রাজা মহারাজাকে দিয়ে যে জনহিতকর কাজ করে গেছেন তার অজস্র প্রমাণ আছে। **'ব্রহ্মজ্ঞান ট্যাঁকে গুঁজে' অনেক মহাপুরুষই জীব কল্যাণ করে গেছেন।** হৃদয়ে বিশ্বপ্রেম. মস্তিষ্কে প্রজ্ঞা, ব্রহ্মজ্ঞান এবং বাহুতে বিপুল কর্ম্মশক্তি—এই হ'ল ভারতবর্ষের বহু প্রচারিত এবং আচরিত পুরাতন আদর্শ।

বুদ্ধদেবের ভিক্ষু সঙ্ঘ এবং আচার্য্য শঙ্করের 'কৌপিন বন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ' কথাটি নিয়ে তুমি কটাক্ষ করেছ! এ তোমার অজ্ঞতা। কেন যে তাঁরা বা অন্যান্য সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করতে বলতেন, তার মর্ম্ম তুমি বুঝতে পারো নি। ঘর সংসার নিয়ে আসক্তির জালে বদ্ধ হয়ে মানুষ সাধারণতঃ আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থপর হয়ে পড়ে বলেই তাঁরা বিবাহিত জীবনের বন্ধন অপেক্ষা অবিবাহিত মুক্ত জীবনের ত্যাগাদর্শকে তাঁরা সমর্থন করতেন। কালক্রমে, সন্ন্যাস ধর্ম্মের মধ্যে ব্যভিচার এসেছে—সন্ন্যাসের নামে শুধু Red-Coloured Beggars সৃষ্টি হয়েছে—তাই বলে পূর্ব পূর্ব আচার্য্যেরা দোষী ন'ন। একান্তভাবে পরহিতব্রতে অত্মোৎসর্গ যাতে করতে পারে এজন্যই সন্ন্যাস-জীবন। আর এই সন্ন্যাসজীবন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দেরও অভিপ্রেত ছিল। 'বিবাহ না করা' 'সংসার না করা'কে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দও অত্যন্ত বেশী পছন্দ করতেন। 'কামিনী কাঞ্চনত্যাগ'—এ তো রামকৃষ্ণেরই কথা। কোন ভক্ত বিবাহ করেছেন শুনলে রামকৃষ্ণ হতাশ হয়ে পড়তেন। তাঁর কাছে যাঁরা আসতেন, বিবাহ করেন নি শুনলে, তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হ'তেন আর কেউ বিবাহ করে ফেলেছেন জানলে তিনি 'মনমরা' হয়ে 'পুত্রশোকের মত' কাঁদতেন; ছোট নরেন্দ্র বিবাহ করেছেন শুনে তিনি "অজস্র রোদন" করেছিলেন॥

বিবেকানন্দের পত্রাবলী পড়ে দেখ তিনি একজনকে লিখেছেন, "... ... ...মান্দ্রাজীরা অপেক্ষাকৃত চট্‌পটে ও দৃঢ়তা সহকারে একটা বিষয়ে

লাগিয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু হতভাগাগুলি সকলেই বিবাহিত! বিবাহ! বিবাহ !! বিবাহ !!! পাষণ্ডেরা যেন ঐ একটা কর্ম্মেন্দ্রিয় লইয়া জন্মিয়াছে—যোনিকীট—এদিকে আবার নিজেদের ধার্ম্মিক ও সনাতন পথাবলম্বী বলিয়া পরিচয়টুকু দেওয়া আছে। অনাসক্ত গৃহস্থ হওয়া উত্তম কথা কিন্তু এখন উহার ততটা প্রয়োজন নাই, চাই এখন অবিবাহিত জীবন!" [বিবেকানন্দ রচিত ৩০১ পৃষ্ঠা]

যে আসক্তিত্যাগ, শ্রেয়োলাভের সুবিধা এবং মুক্ত জীবন নিয়ে একান্তভাবে পরহিতব্রতে আত্মোৎসর্গ করবার জন্য রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিবাহিত জীবন অপেক্ষা অবিবাহিত জীবন Prefer করতেন, ঠিক ঐ একই কারণে প্রাচীন ঋষি মহাপুরুষেরাও অবিবাহিত জীবন, ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসাদর্শকে সমর্থন করে গেছেন। রামকৃষ্ণকে ঐজন্য 'যুগাবতারের' সম্মান দিয়ে একই কারণে সংসার ত্যাগের প্রেরণা তাঁরা দিতেন বলে, বেচারা ঋষিরা কি তোমার কটাক্ষের পাত্র? ভেবে দেখ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি রামকৃষ্ণ লীলাসহচরগণ সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন বলেই না জীবকল্যাণে আত্মোৎসর্গ করতে পেরেছিলেন?

বিবাহিত জীবন যাপন স্ত্রীকে সঙ্গে রেখে সংসারে থেকেও যে ঈশ্বর লাভ করা যায়—এটি কিছু রামকৃষ্ণের অভিনব অভূতপূর্ব আচরণ নয়! এজন্য তাঁর 'যুগাবতারত্ব' সিদ্ধ হবে না। কারণ প্রাচীন যুগের অত্রি, বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, জনক, ব্যাস প্রভৃতি অধিকাংশ ঋষিই বিবাহিত জীবন যাপন করে, স্ত্রীকে সঙ্গে রেখেই পরব্রহ্মবিদ্ হতে পেরেছিলেন; জীবকল্যাণেও তাঁদের অবদান কম নয়। বর্ত্তমান যুগেও কবীর, নানক রাধাস্বামী সাহেব প্রভৃতি বিবাহিত ছিলেন, গিরিগুফাবাসী হয়ে নির্ব্বানলাভের অধীর আগ্রহে পরোপকার ও জীবনকল্যাণকে উপেক্ষা করে, নির্জন পর্বতের অন্ধকার গুহায় জীবন দীপ নির্বাণ করে দেন নি! সংসারে থেকেই তাঁরা ঈশ্বরদর্শী হয়ে ছিলেন। **রামকৃষ্ণও ঐ প্রাচীন আর্য্য আদর্শ, ঋষি প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে ঋষিপদবাচ্য হতে পারেন, 'যুগাবতার' হয়ে যাবেন না!**

রামকৃষ্ণ যে যুগে এসেছিলেন, সে যুগে আমি পূর্ব্বেই বলেছি **রামমোহন রায়, শ্রেষ্ঠ মানব প্রেমিক দয়ালু বিদ্যাসাগর** প্রভৃতিই **মানবতাবাদ প্রচার, দেশের কল্যাণ সাধন এবং সেবা বিষয়ে পথিকৃৎ। স্কুল**

কলেজ হাসপাতাল স্থাপন স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন সর্ব্ববিষয়েই তাঁরা অগ্রণী ছিলেন। আর মিশন বা সেবাসঙ্ঘ গঠন করে দুর্গত জনসাধারণের সর্ব্ববিষয়েই যদি সেবার কথা বল, তাহলে সন্ন্যাসী হয়েও, আবাল্য ব্রহ্মচারী, পরমতপস্বী, সর্ব্ববিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপোষহীন নিরলস যোদ্ধা, সাক্ষাৎ বেদমূর্ত্তি দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত আর্য্য সমাজই ঐ সব বিষয়ে অধিকতর কৃতিত্ব ও প্রশংসার অধিকারী। মহর্ষি দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজ যে, সে সময় দেশেরও সমাজের কি বিপুল কল্যাণ করেছিলেন তা তোমাদেরই রামকৃষ্ণ-লিটারেচার থেকে বর্ণনা দিচ্ছি শোন—"শিক্ষাপ্রচারে ও সমাজ সংস্কারে আর্য্য সমাজ সমগ্র উত্তর ভারতে যে যুগান্তর আনিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। লোকহিতব্রতী আর্য্যসমাজ শিক্ষাপ্রচারে, বিশেষতঃ স্ত্রী শিক্ষা ও নারী জাতির উন্নতি বিধানে, বিধবাশ্রম ও অনাথালয় প্রতিষ্ঠায়, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ ও মারীভয়ে সেবাকার্য্যে, **শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্ব্বেই** কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গত অর্দ্ধশতাব্দীতে আর্য্যসমাজের বহু লোক হিতকর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে" ['বিবেকানন্দ-চরিত'—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ৩৮১ পৃঃ]।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, লালালাজপথ রায় প্রমুখ শক্তিমান নেতারা আর্য্য সমাজী ছিলেন ; এঁরা সমাজের কি বিপুল সেবা করে গেছেন, তা সবারই জানা। এ জন্য যদি ওঁদের গুরু, আর্য্য সমাজ প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দয়ানন্দকে অবতার বলা না হয়, তাহলে বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণ মিশনের ইষ্ট, রামকৃষ্ণকেই বা যুগাবতার তোমরা বল কোন যুক্তিতে ?

দেখভাই, কাউকে uphold করতে গিয়ে কাউকে degrade করা শোভন নয়। আমি কাউকে uphold বা degrade ও করছি না। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ থেকে আরম্ভ করে রামমোহন বিদ্যাসাগর দয়ানন্দ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রভৃতি সকলেই যে যার ভূমি থেকে দেশের ও সমাজের কল্যাণ করে গেছেন, তার জন্য ঐ সব মানব প্রেমিকগণ নমস্য ও বরেণ্য হ'তে পারেন, কেউ অবতার বা ঈশ্বর হয়ে যাবেন না।

তোমরা বিবেকানন্দ বিবেকানন্দ করে খুব চেঁচাও, as if, বিবেকানন্দ তোমাদের মিশনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ! বেদান্তকেশরী বিবেকানন্দ অধ্যাত্মভারতের অন্যতম শক্তিশালী নেতা। কোন মহাপুরুষকে যখন সম্প্রদায় বা গণ্ডীর মধ্যে

টানা হয় তখন তাঁকে ছোটই করা হয়। এই জন্যই, পূর্বেই আমি বলেছি সম্প্রদায় হ'ল সত্যের কবর। যে বিবেকানন্দের গুরু হিসেবে রামকৃষ্ণের এত মর্য্যাদা তোমরাও সেজন্য রামকৃষ্ণকে 'অবতার' বানিয়ে ফেলেছ, সেই বিবেকানন্দই কিন্তু রামকৃষ্ণকে অবতার বলে প্রচার করার পক্ষপাতী ছিলেন না!

দয়ানন্দ অ্যাংলো—বৈদিক কলেজের অধ্যক্ষ লালা হংসরাজ আর্য্য সমাজীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "লালাজী" আপনারা যে বিষয় লইয়া এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাকে আমরা Fantacism বা গোঁড়ামি আখ্যা দিয়া থাকি। **সম্প্রদায়ের সত্বর বিস্তৃতি সাধনে যে ইহা বিশেষ সহায়তা করে,** তাহাও আমি জানি। আর শাস্ত্রের গোঁড়ামি অপেক্ষা **মানুষের (ব্যক্তি বিশেষকে অবতার বলিয়া তাঁর আশ্রয় লইলেই মুক্তি—এইরূপ প্রচার) গোঁড়ামী দ্বারা আরও অদ্ভুতরূপে ও অতিশীঘ্র সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি হয়, ইহাও আমার বিলক্ষণ জানা আছে।** আর আমার হস্তে সে শক্তিও আছে। **আমার গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ঈশ্বরাবতাররূপে প্রচার করিতে আমার অন্যান্য গুরুভাইগণ সকলেই বদ্ধ পরিকর, একমাত্র আমিই ঐরূপ প্রচারেরবিরোধী।** [ভারতে বিবেকানন্দ, ৪৮১ পৃঃ বিবেকানন্দ চরিত ৩৮২ পৃঃ]

'ব্যক্তি বিশেষকেঅবতার বলে প্রচার করার মূলে কি কি দুরভিসন্ধি থাকে' ?—বিবেকানন্দ

তাহলে যে যুগাবতারত্ব প্রচারের বিরোধী স্বয়ং বিবেকানন্দ ছিলেন, তোমরা রামকৃষ্ণ ভক্তরা, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা, সেই শ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ ভক্ত বিবেকানন্দের আদর্শকে ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছ কি কারণে? **কি অভিসন্ধিতে?** ঐ পুরুষসিংহ কথা প্রসঙ্গে "অদ্ভুতরূপে ও অতিশীঘ্র সম্প্রদায় বিস্তৃতির" যে **কূট কৌশলের ইঙ্গিত করে, তা অনুচিত বলে মত প্রকাশ করেছিলেন,** তাঁর তিরোধানের পর রামকৃষ্ণকে "ঈশ্বরাবতাররূপে প্রচার করিতে" অত্যুৎসাহী "অন্যান্য গুরুভাইগণ" এবং তোমরা তাহলে, **'সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি "সাধন" এবং প্রচার-প্রতিষ্ঠার জন্যই "ব্যক্তিবিশেষকে অবতার" বলে প্রচার করা রূপ 'গোঁড়ামী'র আশ্রয় নিয়েছ কি বল?**

শ্রীহরিপদ বসু :—দেখুন, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে tcuch করে কালী দেখিয়ে দিয়েছিলেন, নির্বিকল্প সমাধির আস্বাদন দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের বুকে

তিনি পাদুটো তুলে দিতেই স্বামীজীর কালীদর্শন হ'ল। অবতার পুরুষ ছাড়া, এ কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

উত্তর :—যে বিবেকানন্দের অনুভূতিলাভ নিয়ে রামকৃষ্ণের অবতারত্ব demand করছেন, সেই বিবেকানন্দই যে তাঁকে "ঈশ্বরাবতাররূপে প্রচারের বিরোধী" ছিলেন, সেটা দয়া করে ভেবে দেখছেন না কেন? সাধে কি বিবেকানন্দের মত সূক্ষ্মদর্শী বলেছিলেন যে, "ব্যক্তিবিশেষকে অবতাররূপে প্রচার করতে পারলে সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি সাধন অতি শীঘ্র হয়!" হয়েছেও, তাই; তাঁর "অন্যান্য গুরুভাইদের" প্রচার মহিমায় রামকৃষ্ণের অবতারত্ব আপনাদের মর্ম্মমূলে দানা বেঁধে গেছে! আপনারা বিবেকানন্দকে মানেন অথচ তাঁর কথা মানেন না!

যাদুকর পি, সি, সরকারও 'লাইট হাউস' এবং 'নিউ এম্পায়ারে' হাজার হাজার লোককে ভূতের নৃত্য দেখান। কাজেই রামকৃষ্ণের মত যোগিপুরুষও কাউকে, ইচ্ছা করলে মূর্ত্তির মধ্যে কালী দেখাতে পারেন কিন্তু সে দর্শনের জন্যই যদি রামকৃষ্ণের অবতারত্ব সিদ্ধ হয় তাহলে ত্রৈলঙ্গস্বামীও ঠিক ঐ সমসাময়িক কালে তাঁর বাঙ্গালী ভক্তকে মূর্ত্তির মধ্যে জীবন্ত কালী দেখিয়েছিলেন, কৈ সেজন্য তো তাঁকে 'অবতার' বলা হয় না? তাছাড়া ঐ ধরণের দর্শনগুলি মিথ্যাদর্শন। প্রকৃত দর্শন কালে, দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শন, জ্ঞেয় জ্ঞাতা জ্ঞান, ধ্যেয়-ধ্যাতাধ্যান—এই ত্রিপুটির হয় লয়, বিবেকানন্দের কি সে সময় তা হয়েছিল? রামকৃষ্ণ বুকে পা দিতেই বিবেকানন্দের কালী দর্শন হয়ে গেল, এ কথা কোথায় পেলেন? শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গে ত বরং এ কথাই আছে যে, পা দেওয়ায় বিবেকানন্দের মনে হ'ল, "দেওয়ালগুলির সহিত গৃহের সমস্ত বস্তু" বেগে ঘূর্ণমান হতে হতে যেন তাঁর "আমিত্ব এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার" হয়ে ছুটে চলছে। "দারুন আতঙ্কে অভিভূত হয়ে," "মরণ সম্মুখে অতি নিকটে," এই মৃত্যুভয়ে বিবেকানন্দ চীৎকার করে বলে উঠলেন, "ওগো, তুমি আমার একি করলে, আমার যে বাপ মা আছেন!" রামকৃষ্ণ তখন বললেন, "তবে এখন থাক্, কালে হবে" [ঐ ৫ম খণ্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা]

রামকৃষ্ণ Touch করেই স্বামীজীকে কালী দেখিয়ে দেন নি!

কোন পরমাত্মবস্তু দর্শনকালে কি ভীতি সন্ত্রাস আসে নাকি? উপনিষদ প্রভৃতি কিন্তু অন্য কথা বলে—

যদৈতমনু পশ্যতি আত্মানং দেবমঞ্জসা,

ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে [বৃহদারণ্যক ৪, ৪, ১৫-১৬]

'যখন ভূত-ভবিষ্যতের ঈশান পরমাত্মদেবের সাক্ষাৎ দর্শন হয় তখন মন ভয়ের অতীত হয়, কোন সন্ত্রাস আসতে পারে না'।

"ধম্মং দেসিয়মানে চিত্তং পকৃখন্দতি, পসীদতি সংতিট্‌ঠতি বেনিঞ্‌চতি" (মজ্ঝিমনিকায়), তখন চিত্ত উদ্বুদ্ধ হয়, প্রসন্ন হয়, সন্তুষ্ট হয়, ভীতি রহিত হয়, আক্ষোভিত হয়। বিবেকানন্দের এটি যদি কোন Spiritual vision হ'ত তাহলে, তাঁর "মৃত্যুভয়ের দারুণ আতঙ্ক" আসে কেন?

দ্বিতীয়বারে, শুনি, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের বাহ্য সংজ্ঞা লোপ করে তিনি কে, কোথা হ'তে এসেছেন, কেন এসেছেন, এই সব তাঁরই মুখ দিয়ে জেনে নিয়েছিলেন (ঐ. ৯০ পৃঃ)। যাঁরা Hypnotism, Mesmerism করে Auto-Suggestion এর দ্বারা কোন ব্যক্তির মুখ দিয়ে তার অনেক কথা, এমন কি তার Sub-conscious স্তরের চিন্তা-তরঙ্গগুলি জেনে নেন, রামকৃষ্ণের সেদিনের কাণ্ডটিও ঐ রকম কিছু; যোগী মাত্রেই Strong will power exhert করে যে কোন লোকের মুখ দিয়ে ঐ ধরণের অনেক কথাই জেনে নিতে পারেন। ওটাও আধ্যাত্মিক বস্তু দর্শন নয়!

'যুগাবতার' সিনেমাতে Film-Director দেখিয়েছেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে দীক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিবেকানন্দ দেখতে পেলেন, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বুদ্ধ, রাম, কৃষ্ণ---ইদানীং রামকৃষ্ণরূপে তাঁর সামনে বসে!! যতই দিন যাবে, কালে কালে হয়ত আরও কত আজগুবি ঘটনার সন্নিবেশ হবে, তার ইয়ত্তা নেই। বিবেকানন্দের মত একজন "Dynamic Personality" সম্বন্ধে এত অল্পকালের মধ্যে যে ভাবে বিকৃত প্রচার চলেছে—তাতে পরবর্ত্তীকালে তাঁর ওজস্বী, বজ্রসারচরিত্র হয়তো নীরিহ ভক্তরূপে, নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবরূপে চিত্রিত হবে, দেখতে পাবো!

মুণ্ডকোপনিষদে আছে,

ভিদ্যন্তে হৃদয়-গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মানি, তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।

[ঐ, ২, ২, ৮]

'সেই পরমবস্তু অনুভব করলে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয় (চৈতন্য ও অহংকারের তাদাত্ম্য-ভাব নষ্ট হয়ে যায়, **সর্বসংশয় ছিন্ন হয়**, আর প্রারব্ধ কর্ম ব্যতীত আর সব **কর্মেরই** নাশ হয়'।

স যো হবৈতৎ পরমং ব্রহ্মবেদ
......গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তঃ অমৃতো ভবতি।
ঐ, ৩, ৯]

'যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানতে পারেন, তিনি গুহাগ্রন্থি হ'তে মুক্ত হয়ে **অমৃত** হন'।

যে পূর্ব্বং দেবা ঋষয়শ্চ তদ্ বিদুঃ
তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ। [শ্বেতাশ্বতর ৫, ৬]

'দেবতা বা ঋষি পূর্বতন যাঁরাই তাঁকে জেনে ছিলেন, তাঁরা তন্ময় হয়ে **অমৃত** হয়েছিলেন'।

ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাৎ লোকাৎ অমৃতা ভবন্তি [কেন, ২, ৫]।

দিব্য অপরোক্ষানুভূতি হলে, ঐ অমৃতত্বের সন্ধান পেলে পরম আনন্দ লাভ হয়, অত্যন্ত সুখের অবস্থা হয়, "সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তম্ সুখমশ্নুতে" [গীতা ৬, ২৮] "স ব্রহ্ম যোগযুক্তাত্মা সুখম্ অক্ষয়ম্ অশ্নুতে" [গীতা ৫, ২১]।

ঐ আনন্দের অবস্থাকে উপনিষদে বলেছে, "অতিঘ্নীম্ আনন্দস্য" (Acme of bliss)! **এই অবস্থাতে কোন বিষাদ দুঃখ অশান্তি চঞ্চলতা সংশয় বা ক্ষোভের** অবস্থা থাকতে পারে না। কেননা, ছান্দোগ্য বলছেন—"ইতি যস্য স্যাৎ, অদ্ধা ন বিচিকিৎসা অস্তি" (৩, ১৪, ৪), **যাঁর এই অবস্থা হয়, তাঁর কখনও সংশয় (বিচিকিৎসা) হতে পারে না**। 'The illusion when once it has been penetrated can no longer delude'.

উপনিষদের প্রতিটি কথা ঋষিদের পরীক্ষিত সত্য; অপরোক্ষানুভূতিলব্ধ সারসত্য। আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে উপনিষদের ঐ আলো আমাদেরকে সাহায্য করুক।

বিবেকানন্দকে রামকৃষ্ণ Touch করার সঙ্গে সঙ্গে, দীক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর যখন কালীদর্শন এমন কি নির্বিকল্প সমাধিলাভ পর্য্যন্ত হয়ে গেছলো, তখন তাঁর সর্বসংশয় ক্ষয় হওয়ারই কথা; অমৃত আনন্দলাভ, শান্তিলাভও হয়ে

গেছলো, তা আশা করা যায়, কি বলেন ? এখন বিচার ক'রে দেখি আসুন, (রামকৃষ্ণের জীবদ্দশাতেই যদি ঐ সব পরম অনুভূতি তাঁর লাভ হয়েছিল), বিবেকানন্দের 'সর্ব্বসংশয় ক্ষয়', 'delusion' এর ইতি হয় অমৃত-আনন্দের সমুদ্র উথলে উঠেছিল কি না !

রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দের সম্পর্কটা ভেবে দেখলে দেখা যায়, বিবেকানন্দ যেন রামকৃষ্ণকে সাধেন নি, রামকৃষ্ণই বরাবর বিবেকানন্দকে সেধে এসেছেন ! **রামকৃষ্ণের প্রতি বিবেকানন্দের সংশয় বরাবর ছিল।** আজকালকার এঁদো ভক্তদের মত, অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে, কোন জিনিষ যাঁচাই না করে তিনি গ্রহণ করতেন না। তাঁর ঐ বৈশিষ্ট্যের জন্য এক মনীষী তাঁকে 'The first sceptic child of the 'Nineteenth century' বলে অভিহিত করেছেন। গুরুর প্রতি কথা যাঁচাই করে নেওয়া দোষের নয়, রামকৃষ্ণও বলতেন, 'গুরুকে বাজিয়ে নিবি'। কিন্তু যখন গুরুর দয়ায়, কোন প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করা যায়, তখন গুরুর প্রতি কোন সংশয় থাকে না। Experience creates faith—অভিজ্ঞতা, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি থেকেই বিশ্বাস দৃঢ় হয়। বিবেকানন্দকে যখন কালী দর্শন থেকে আরম্ভ করে নির্ব্বিকল্প সমাধি পর্য্যন্ত অনুভূতি রামকৃষ্ণ করিয়ে দিয়েছিলেন, তখন রামকৃষ্ণের প্রতি বিবেকানন্দের আর কোন সংশয় থাকার কথা নয়, গুরুকে আর 'পরখ্' করবারও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেছে, তাঁর এ **সংশয়** পরিপূর্ণভাবেই ছিল। গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের বিষাদময় দিনটি পর্য্যন্ত তিনি সংশয়মুক্ত ছিলেন না। রামকৃষ্ণ তখন ক্যানসারের যন্ত্রনায় মুমূর্ষু, তাঁর সেই মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রনা ভোগ দেখে এবং অন্তিমসময় ঘনিয়ে আসছে বুঝে, অন্যান্য ভক্তরা যখন শোকে কাতর তখনও ঐ ভক্ত-কেশরীর মনে সংশয় দেখা দিয়েছে; বিবেকানন্দের চিন্তাধারা বুঝে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "কি নরেন, এখনও তোর অবিশ্বাস ? যে রাম যে কৃষ্ণ, ইদানিং সেই রামকৃষ্ণ"। কিন্তু হায়, তথাপিও তাঁর অবিশ্বাস বা সংশয় যায় নি !

রামকৃষ্ণের দেহান্তের পর পরিব্রাজক অবস্থায় ভ্রমণ করতে করতে বিবেকানন্দ যখন গাজীপুরে পওহারীবাবার সংস্পর্শে আসেন, তখন তিনি তাঁর প্রভাবে এতদূর মুগ্ধ হয়ে ছিলেন যে তাঁকেই গুরুপদে বরণ করতে গিয়েছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের (রামকৃষ্ণের দেহান্ত হয়েছিল ১৮৮৬।১৫ আগষ্ট) ৪ঠা ফেব্রুয়ারী

তিনি এক চিঠিতে পওহারীবাবার সম্বন্ধে লিখছেন, "বহু ভাগ্যফলে বাবাজীর সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইনি অতি মহাপুরুষ—বিচিত্র ব্যাপার এবং এই নাস্তিকতার দিনে ভক্তি ও যোগের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার নিদর্শন। আমি ইঁহার শরণাগত হইয়াছি; আমাকে আশ্বাসও দিয়াছেন, সকলের ভাগ্যে ঘটেনা" [বিবেকানন্দ-চরিত, ১৫৮ পৃঃ]।

পওহারীবাবার কাছে শান্তিলাভের জন্য বিবেকানন্দের দীক্ষা প্রার্থনা

একবার, দু'বার নয়, সাতাশবার, তিনি পওহারীবাবার কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করেছিলেন, যোগশিক্ষার জন্য, শান্তিলাভের জন্য তাঁর শরণাগত হয়েছিলেন। তখনও পর্য্যন্ত যে তাঁর শান্তিলাভ অমৃতলাভ হয়নি, তা বিবেকানন্দের নিজের কথাতেই সুস্পষ্টভাবেই জানা যায়—"ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের অহেতুক কৃপার অধিকারী হইয়াও **আজ পর্য্যন্ত শান্তি পাইলাম না কেন? হয়তো এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সাহায্যে আমি শান্তিলাভ করিতে পারিব** " [বিবেকানন্দ-চরিত, ১৬০ পৃঃ]

যদি তাঁর, পূর্ব্বেই রামকৃষ্ণ-প্রদত্ত-দীক্ষায় নির্বিকল্প সমাধি বা কালীদর্শন হয়েছিল তা হলে কেন তাঁর ঐ অশান্তি ও সংশয় ছিল! শান্তি লাভের জন্য, সত্যবস্তু লাভের জন্য, অন্য গুরু বরণের প্রয়োজন, কেন তিনি অনুভব করেছিলেন?

সামান্য মাত্র অতীন্দ্রিয় জগতের অনুভূতি পেলে শিষ্য তো গুরুচরণে নিজেকে বিকিয়ে দেয়, অমৃতের আস্বাদনে তৃপ্ত হয়, দীপ্ত হয়, যদি সর্ব্বোত্তম অবস্থা নির্বিকল্প সমাধিও তার হয়ে গিয়েছিল, তবে কেন তিনি রামকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করে পওহারী বাবার কাছে দীক্ষাপ্রার্থী হয়েছিলেন? শান্তি যে তিনি তখনও পর্য্যন্ত পান নি তাতো তাঁর কথাতেই বুঝতে পারছেন! ভেবে দেখুন, **কত বড় সংশয় থাকলে তবে বিবেকানন্দের মত লোক গুরু পর্য্যন্ত ত্যাগ করে ফেলতে চান?** অথচ সকল উপনিষদের এক বাক্যে স্থির সিদ্ধান্ত হ'ল, পরম অনুভূতি লাভ হ'লে 'ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ' 'য এতদ্ বিদুঃ **অমৃতাস্তে** ভবন্তি' [কঠ ২, ৬] 'অত্যন্তম্ সুখম্ অশ্নুতে', 'ন বিচিকিৎসা (সংশয়) অস্তি' [ছান্দোগ্য ৩,১৪,৪]। সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে দয়া করে একটু বিচার করে দেখুন।

অবশেষে, যেদিন তিনি পওহারীবাবার কাছে দীক্ষা নিবেন স্থির করলেন, তার পূর্বদিন রাত্রে রামকৃষ্ণ প্রকট হ'লেন, জ্যোতির্ম্ময়রূপে; তাঁর চক্ষু দুটিতে

মৃত্যুর্ভৎসনা এবং কাতর মিনতি ফুটে উঠেছিল। যা কিছু Divine Realisation বলুন, স্বামীজির ঐ দিনই হ'ল; তিনি শান্তি পেলেন, সংশয় মুক্ত হলেন। তাঁর গুরুর চরণে ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করে সংকল্প প্রকাশ করলেন, "না, আমি আর কাহারও নিকট গমন করিব না। হে রামকৃষ্ণ! তুমিই আমার একমাত্র আরাধ্য, আমি তোমার ক্রীতদাস" [বিবেকানন্দ-রচিত, ১৬২ পৃঃ]।

অতদিন ধরে তো স্বামীজী অশান্তির দাবদাহে, শান্তিলাভের আকুতিতে অস্থির হয়ে ছুটে বেড়িয়েছেন, যেরূপ উপলব্ধি হ'লে মানুষ সংশয় মুক্ত হয়, অমৃতের আস্বাদন হয়, সেরূপ উপলব্ধি তাঁর হয় নি কেন বা রামকৃষ্ণ তাঁকে দেন নি কেন? পওহারীবাবার সংস্পর্শে আসার পর যখন হ'ল, তখন তার মূলে যে ঐ ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষেরই দয়া এবং মহিমা নেই, তা কে বলতে পারে? বিবেকানন্দকে দিয়ে লোককল্যাণ হবে, অন্য মহৎ উদ্দেশ্য সাধন হ'বে, তাই নির্জ্জন গুহাতে তাঁকে যোগ সমাহিত না করে, লোকচক্ষুর অন্তঃরালে না রেখে, তাঁর গুরুর প্রতি তাঁর নিষ্ঠা দৃঢ় করে দেওয়ার জন্যই, যেরূপ অনুভূতি লাভ হলে গুরুর স্বরূপ প্রকট হয়—তা যে পওহারীবাবাই দয়া করে, করে দেন নি, বিবেকানন্দের পর্দ্দা খুলে দেন নি, তা কে বলতে পারে? কেন না, স্বামীজী যে এঁর 'শরণাগত' হয়েছিলেন, ইনিও যে তাঁকে accept করেছিলেন, তা তো পূর্বেই দেখেছি। স্বামীজী বারবার এঁর কাছে ঋণ স্বীকার ক'রেছেন, নিজে পওহারীবাবার জীবন চরিত লিখে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন—"বর্ত্তমান লেখক এই পরলোকগত মহাত্মার নিকট গভীরভাবে ঋণী—তজ্জন্য তদীয় প্রেমাস্পদ ও তৎসেবিত শ্রেষ্ঠতম আচার্য্য দিগের মধ্যে অন্যতম এই মহাত্মার উদ্দেশ্যে, তাঁহার অযোগ্য হইলেও পূর্ব লিখিত কয়েক পংক্তি তৎকর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত হইল" ['পওহারীবাবা' — বিবেকানন্দরচিত ২৮ পৃঃ]।

পওহারীবাবা গুহা থেকে বেরিয়ে এসে জগতের কল্যাণ কেন করছেন না, এ প্রশ্ন করায় স্বামীজীকে উনি উত্তর দিয়েছিলেন, "তুমি কি আমাকে এইরূপ আর একটি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা দেখিতে চাও? তুমি কি মনে কর, স্থূলদেহ-দ্বারাই কেবল অপরের উপকার সম্ভব? একটি মন শরীরের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া অপরের মন সমূহকে সাহায্য করিতে পারে, ইহা কি সম্ভব বিবেচনা কর না?" [ঐ ,২৩ পৃঃ]

যে নীরব শক্তি বিস্তারের দ্বারা পওহারীবাবা স্বামীজীর চোখের পর্দা খুলে তাঁকে উপলব্ধির উত্তুঙ্গ ভূমিতে উন্নত করেছিলেন, যে নীরব শক্তিবিস্তার সাহায্যে জীবকল্যাণের কথা তিনি প্রকাশ করেছিলেন, চিরসংশয়ী বিবেকানন্দ তাঁর সেই "নীরবশক্তি বিস্তারের" প্রমান চারিদিকে লক্ষ্য করেছিলেন [ঐ ২৫ পৃঃ]।

আশা করি, ঐ সব ঘটনা বিশ্লেষণ থেকে বুঝতে পারছো, 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে 'Touch করে কালী দেখিয়েছিলেন কিংবা নিবিকল্প সমাধির অবস্থা পাইয়ে দিয়েছিলেন'—এগুলি জনশ্রুতি বা সাম্প্রদায়িক প্রচার মাত্র, বাস্তবতঃ কোন যুক্তিসিদ্ধ কথা নয়!

নির্ব্বিকল্প সমাধির লক্ষণ

আজকাল 'সমাধি' কথাটা ডাল ভাতের মত সস্তা হয়ে গিয়েছে, হাটে মাঠে ঘাটে মঠে যেমন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের ছড়াছড়ি, তেমনি সবিকল্প নির্বিকল্প সমাধি ইত্যাদি কথাগুলোও সাধারণের মুখে মুখে! 'সমাধি' সম্বন্ধে' সাধারণের জ্ঞানের অভাবেই ঐ সব হাস্যকর কথা শোনা যায়! একটি গান শুনে কেউ যদি হাত পা খিঁচে পড়ে গেল, ভক্তবৃন্দ প্রচার করে দিলেন, "বাবার সমাধি হয়ে গিয়েছে"! একজন সাধুমাকে দেখেছি, তাঁকে কেউ দুরূহ কোন বেদান্তের প্রশ্ন করলেই, তিনি এলিয়ে নেতিয়ে পড়ে, শুয়ে পড়েন চুপ করে: ভক্তরা বলেন, "ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন করলেই মা ভাবস্থ হয়ে পড়েন"! অবশ্য দু'চার মিনিট পরে তাঁর ভাব কেটে যায়! এক রামভক্ত সাধু, গলায় খড়ম মালা ঝোলা পিক-দানিও বোধহয় একটি আছে, তুলসী মাহাত্ম্য, না হয়, ব্রাহ্মণই যে শ্রেষ্ঠজাত অন্য জাতি অপাংক্তেয়' এই ধরণের বর্ণাশ্রমের গোঁড়ামী প্রচার করতে করতে, বঁড়শীর খিঁচ্ দেওয়ার মত দু'একবার ঝাঁকুনি দিয়েই মাইকের সামনে চুপ করে যান! ভক্তগণ বলেন, "বাবার সমাধি হয়ে গেছে, নির্বিকল্প সমাধির stage থেকে বাবা এইজড়ভূমিতে নেমে আসতে পারেন না" !! অবশ্য চার পাঁচ মিনিট পরেই যথারীতি বক্তৃতা দেন, পনেরকুড়ি মিনিট পরেই, " মেঘ সেজে আসছে, গাড়ী প্রস্তুত কর " —বলে অন্যত্র যাওয়ার জন্য তৈরি হ'ন !!! কারও দিকে হয়ত তাকিয়ে বললেন 'বাবা তুমি এত চঞ্চল কেন, উপদেশ শোনার সময় তুমি এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলে" ?

'সমাধি' সম্বন্ধে সাধারণের কোন ধারণা নেই বলেই যে কোন একটা মূর্চ্ছাগ্রস্ত Cloroformic stage বা কম্পন, ঝাঁকুনি, খিঁচুনি বা নিঝুম অবস্থা দেখে, সবিকল্প নির্বিকল্প যে কোন একটা সংজ্ঞা দিয়ে দেয়; বুজরুকদেরও ঐ সুযোগে প্রচার-প্রতিষ্ঠা লাভের সুবিধা হয়। সমাধি কাকে বলে, সবিকল্প নির্বিকল্প সমাধি হ'লে কি রকম অবস্থা হয়, এ সম্বন্ধে অনুভবী পুরুষ শাস্ত্রমুখে কি বলছেন মন দিয়ে শুনুন এবং অনুধাবন করুন —

উপেক্ষ্য নামরূপে দ্বে সচ্চিদানন্দ বস্তুনি।
সমাধিং সর্ব্বদা কুর্য্যাদ্ হৃদয়ে বাথবা বহিঃ॥

স বিকল্পোঽবিকল্পশ্চ সমাধির্দ্বিবিধো হৃদি।
দৃশ্যশব্দানুবেধেন সবিকল্পঃ পুনর্দ্বিধা॥

কামাদ্যাশ্চিত্তসাদৃশ্যাস্তৎ সাক্ষিত্বেন চেতনাম্।
ধ্যায়েদ্দৃশ্যানুবিদ্ধোঽয়ং সমাধিঃ সবিকল্পকঃ॥

অসঙ্গঃ সচ্চিদানন্দঃ স্বপ্রভো দ্বৈতবর্জ্জিতঃ।
অস্মীতি শব্দবিদ্ধোঽয়ং সবিকল্প সমাহিতঃ॥

স্বানুভূতিরসাবেশাদ্দৃশ্য শব্দানুপেক্ষ্য তু।
নির্ব্বিকল্প সমাধিঃ স্যান্নিবাতস্থলদীপবৎ॥ [শঙ্কর ভাষ্য]

অর্থাৎ "সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই একমাত্র সত্যবস্তু। নামরূপ কল্পিত বা মিথ্যা; এইটে নিশ্চয় করে, নামরূপকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অন্তরে বা বাহ্যে, সর্ব্বদাই সমাধি আশ্রয় করবে। আন্তর সমাধি—সবিকল্প নির্বিকল্প ভেদে দুই প্রকার, আবার সবিকল্প সমাধিও দুই প্রকারের (১) দৃশ্যানুবিদ্ধ (২) শব্দানুবিদ্ধ। ভাবাভাব চিত্তের কামাদি বৃত্তিগুলিও ভাব অভাব ধর্ম্মযুক্ত। কারণ চিত্তের সদ্ভাবে তাদের সদ্ভাব চিত্তের অভাবে তাদের অভাব। জাগ্রতাবস্থায়, ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বৃত্তিগুলি প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ একবৃত্তির পর অপর বৃত্তির উদয় হয়। চিত্ত কখনও বৃত্তিশূন্য থাকে না, এক বৃত্তির লয় হ'লে আবার অন্যবৃত্তির উদয় হয়। পরন্তু সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাদি অবস্থাতে চিত্তের লয় হওয়ায় আর কোন বৃত্তিরও উদয় হয় না। সেই চিত্তবৃত্তির বিবিধ প্রকার বিকৃতাবস্থা। তার ভাব ও অভাব এবং তদুভয়ের সন্ধিস্থল যিনি স্বপ্রকাশরূপে প্রকাশ করেন, তিনি প্রত্যক চৈতন্যস্বরূপ আত্মা। অপরোক্ষভাবে এটি অবগত হয়ে তাঁর

ধ্যান করবে—ইহাই **দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি।** এই দৃশ্যানুবিদ্ধ সমাধি দ্বারা প্রত্যক্ চৈতন্যস্বরূপ আত্মার অনুভূতি দৃঢ় হ'লে, সেই অসঙ্গ, অদ্বিতীয়, স্বপ্রকাশ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্য উপলব্ধি হয়ে থাকে। এইরূপ দৃঢ় ভাবনাকে **শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি** বলে। পূর্ব্বোক্ত দৃশ্য ও শব্দানুবিদ্ধ সমাধি দ্বারা চিত্ত যখন সুস্থির হয়ে স্বরূপের সঙ্গে একত্ব লাভ করবে, তখন দৃশ্য ও শব্দ উভয়ই অন্তর্হিত হ'য়ে যাবে। তখন কেবল স্বয়ংসাক্ষী ও সাক্ষ্যভাবরহিত অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ পূর্ণানন্দরসে নিমগ্ন থাকবে, চিত্ত নির্বাত দীপকলিকার ন্যায় নিশ্চল হয়ে তদাকার অবস্থা প্রাপ্ত হবে, এই হ'ল নির্বিকল্প সমাধি।"

যে অবস্থাতে পৌঁছলে **সব সমাধান হয়, অর্থাৎ পূর্ণতম প্রজ্ঞা পূর্ণতম আনন্দলাভ হয়, তাই সমাধি। সমাধি—সমভাবে অধিষ্ঠান;** সব সময়, সর্বত্র, যে কোন অবস্থাতেই সেই অখণ্ড পরমানন্দ, সমরস, রসস্বরূপ, জ্যোতিঃস্বরূপে **সমভাবে, নিরবচ্ছিন্নভাবে অধিষ্ঠিত থাকাই সমাধি।** উপলব্ধির তারতম্য অনুযায়ী অনেকে জড় সমাধি ভাব সমাধি সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির নাম উল্লেখ করে গেছেন। নির্বিকল্প সমাধিই সর্ব্বোচ্চতম অবস্থা বলে কথিত।

উপরের কথাগুলির মর্ম্ম ভাল করে বুঝে রাখলে, 'সমাধি' সম্বন্ধে একটা Clear idea পাবেন, কারও যাতা অবস্থা দেখে, ভক্তির আতিশয্যে, সবিকল্প নির্ব্বিকল্প সমাধি ইত্যাদি বলে আর ভুল করবেন না।

প্রশ্ন :—বিবেকানন্দ ধার্ম্মিক সাধুদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, 'তুমি ভগবান দেখেছ'? কেউ উত্তর দেয় নি। কিন্তু রামকৃষ্ণের কাছে এসে প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, "হ্যাঁ দেখেছি। তোকেও দেখাতে পারি, তোকে যেমন বলবো, তেমন যদি আচরণ করিস্।" এই রকম দৃঢ়প্রত্যয় তো আর কোন সাধুর মুখে শুনি নি; স্বামীজীও রামকৃষ্ণের কাছে আসার পূর্ব্বে কেউ তাঁকে ঐ রকম দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহ ঈশ্বরদর্শনের কথা বলেন নি। অবতার না হলে এ রকম সম্ভব নয়।

উত্তর :—যে কোন ঈশ্বর-দর্শী পুরুষ অপর একজন ভক্তকে ঈশ্বরদর্শনের উপায় বলে দিতে পারেন, ঈশ্বরদর্শনও করিয়ে দিতে পারেন, তাতে যে তিনি সাক্ষাৎ পূর্ণ পরমাত্মা হয়ে যাবেন, এ তুমি কোন্ যুক্তিতে বলছো? 'হ্যাঁ তাঁকে

দেখেছি', রামকৃষ্ণের ঐ বাক্যেই স্পষ্ট হচ্ছে, রামকৃষ্ণাখ্য দেহটি ছাড়াও আর একজন 'তিনি' আছেন। ঐ বাক্যে কি রামকৃষ্ণই সাক্ষাৎ ঈশ্বর সে কথা প্রমাণ হয়?

আর যে 'দৃঢ়প্রত্যয়ের' কথা আর কোন সাধুর মুখে তুমি শোন নি বা স্বামীজী শোনেন নি বলে বলছো, এও তোমার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের পরিচয়।

উপনিষদের ঋষি যখন বলছেন·—

শৃন্বন্তু সর্ব্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ!
আযে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ.
বেদাহমেতম্ পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি,
নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়। [শুক্লযজুর্বেদ ৩১, ১৮]

'অমৃতের পুত্রগণ, তোমরা শোন। তমসার পরপারে সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষকে জেনেছি, সেই অমৃতময় পুরুষকে জেনে তবে মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, অয়নের অন্য কোন পথ নাই'।

বেদ ও উপনিষদের যুগের যে কোন ঋষির কাছে যখন কোন আত্মতত্ত্বজ্ঞানলাভেচ্ছু শিষ্য গিয়েছে তিনি এই ভাবেই দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা বলেছেন এবং তত্ত্বসাক্ষাৎ করিয়ে কৃতকৃত্য করেছেন, এ যুগেও এবং রামকৃষ্ণের যুগেও বহু মহাপুরুষ এবং সাধুসন্ত ছিলেন, যাঁরা অতি বড় নাস্তিক ও অবিশ্বাসীকেও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়েছেন, তাদের Challenge গ্রহণ করে ঈশ্বর দর্শন করিয়েছেন—এর অজস্র প্রমাণ আমরা জানি। সম্প্রদায়ের গণ্ডীটুকু পেরিয়ে এসে তুমিও যদি স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ঐ সময়ের ইতিহাস হাতড়াও, আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারবে।

কবীরসাহেবের স্পষ্ট ঘোষণা ছিল, "**কহেঁ কবীর, নির্ভয় হো হংসা, কুঁজী বতা দুঁ তালা খুলন কো**", 'হে হংস! নির্ভয় হও, সেই পরমদয়ালকে যাতে জানতে পারো এ জন্য সেই আলোকরাজ্যের তোরণদ্বারের তালা খুলে দেবো, চাবিকাঠি হাতে দিয়ে দিয়েদেবো'। সন্তদের আশ্রিত ভক্তদের জীবন পর্য্যা-লোচনা করে দেখা গেছে, তাঁরা সন্তসদ্‌গুরুর কৃপায় **এই জন্মেই ঈশ্বর দর্শন**

করেছেন ; সন্তদের এই বিশেষ অবদান, দয়া এবং বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। সন্তদের কৃপাশ্রিত বহু লোকেই ঈশ্বরদর্শন করে পরমানন্দ-লাভ করেছেন ; এমন কি মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত যখন অন্যান্য সবাই কাঁদছে বিয়োগ-ব্যথায় তিনি হাঁসতে হাঁসতে হাততালি দিতে দিতে আনন্দে পরমধামে চলে গিয়েছেন—

(ক) "হম নহিঁ মরে, মরে সংসার
হমকো মিলা জিলাবনহার"।

'আমি মরছি না, জগতই বরং তাঁকে না পেয়ে মৃত অবস্থায় কাল কাটায়। যিনি জীবন দাতা, প্রাণাধার সেই চৈতন্যময় পরমপুরুষের সঙ্গে আমি একাত্ম'।

(খ) 'হমনে দর পর্দ্দা তুঝে
শমস্ জবী দেখ লিয়া'

'আমি পর্দ্দা খুলে তেমার সূর্য্য করোজ্জ্বল দীপ্তি দেখে নিয়েছি'।

(গ) দর্শন কর্ মেরী গতি হুই কৈসী,
মীন মগন হোয় জল মেঁ জৈসী।
দুর হুঁয়ে দুঃখ সারী হো॥

'প্রভুর দর্শন করে আমার কি গতি হ'ল ? ঠিক যেন একটি মাছ জলের মধ্যে মগ্ন হ'ল, আমার সকল দুঃখ দুর হয়ে গেল'।

—এই হ'ল সন্তসদ্গুরুর কৃপাশ্রিত শিষ্যের স্পষ্ট ঘোষণা, **অপরোক্ষানুভূতি-লাভের পরিচয়। সদ্গুরু মাত্রেই শিষ্যকে অপরোক্ষানুভূতি দিতে পারেন**। কিন্তু তাই বলে পূর্বযুগের বা এখনকার কোন ঋষি মহর্ষি সাধু সন্ত নিজেকে পূর্ণ পরমাত্মা বা অবতার বলে demand করেন নি, আমরা তাঁদের কাউকে অবতাব বলি না। তবে, এবিষয়ে বামকৃষ্ণের বিশেষত্ব কোথায় ? পূর্ণ ভগবত্তা প্রমাণের ঐ কি তোমাদের প্রমাণ ? কৈ, তোতাপুরী বা রামকৃষ্ণের অন্যান্য গুরুবৃন্দও তো যে যার জ্ঞানমত রামকৃষ্ণকে উপলব্ধি করিয়েছিলেন—এ জন্য তোমরা তো তাঁদের কাউকে অবতার বল না ?

বিবেকানন্দ সকল সাধুর কাছ থেকে ফিরে এসে রামকৃষ্ণের কাছেই কেবল প্রত্যক্ষানুভূতির Gurantee পেয়েছিলেন, তোমার এ কথাও কোন যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়! তুমি যদি মেদিনীপুরের কয়েকজন পুরোহিত বা

কালীবাড়ীর পূজারীকে ধরে ধরে জিজ্ঞাসা কর, "তোমরা ভগবান দেখেছ"? মাথাপুর শ্মশানের কয়েকজন ভিক্ষোপজীবি সন্ন্যাসবেশধারী সাধুকে জিজ্ঞাসা কর, "তুমি কি ভগবান দেখাতে পার"?—আর তাতে যদি কোন সন্তোষজনক উত্তর না পাও, তাদের মুখ থেকে কোন দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা না শোন, তাহলে কি বলবে, "কোন সাধুই আজকাল ঈশ্বর দর্শন করাতে পারেন না"?

টালিগঞ্জ থেকে এঁড়ে দহ দক্ষিণেশ্বরই সমগ্র বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষ নয়! ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন তত্ত্ববাগীশ সাধককে কিংবা এক একজন বাক্যবাগীশ খ্রীষ্টান মিশনারীকে ধরে ধরে ভগবৎ-তত্ত্ব জিজ্ঞেস করা আর তাঁদের কাছে কোন দৃঢ়প্রত্যয়ের কথা না পেয়ে, রামকৃষ্ণের 'হ্যাঁ আমি দেখেছি'—এই কথায় কি ভারতবর্ষের সমগ্র সাধুমণ্ডলীর মধ্যে রামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয়? পরম-সন্ত রাধাস্বামীসাহেব, আগ্রার হুজুর মহারাজ, রামদাস কাঠিয়া বাবা, ত্রৈলঙ্গস্বামী, পওহারীবাবা, গম্ভীরনাথজী প্রভৃতি যে সমস্ত সন্ত মহাত্মা সে সময় প্রকট ছিলেন, বিবেকানন্দ যদি, তাঁদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে এসে রামকৃষ্ণের দ্বারা পূর্ণকাম হ'তেন, তাহলে নাই তো রামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করা যেত—তাও মহাপুরুষ হিসেবে; তাতেও 'অবতারত্ব' প্রমাণিত হয় না!

বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের কাছে আসার পূর্ব্বে ঐ সব ঈশ্বরদর্শী মহাপুরুষের সঙ্গ করে আসেন নি। এমন কি বারদীতে যে যোগিরাজ লোকনাথ ব্রহ্মচারী ছিলেন, তাঁকেও দেখে Test করে আসেন নি। যে কয়জন খ্রীষ্টান মিশনারী বা ব্রাহ্মসমাজীর সঙ্গ করেছিলেন, তাঁরা নিজেরাই ঈশ্বনদর্শন করেন নি, তাঁরা আবার বিপ্লবী নরেন দত্তের ভ্রম ও সংশয় ঘুচাবেন কি করে? এঁদের চেয়ে রামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি তপস্বী এবং অনুভবী পুরুষ ছিলেন—এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য; সেইজন্যই নরেনদত্ত surrender করেছিলেন তাঁর কাছে। **তাই বলে রামকৃষ্ণকে 'যুগাবতার' বলে ঢক্কা নিনাদ করা, ঠিক যেন—কতক-গুলো কানার মধ্যে যিনি ঝাপসা দেখেন, তাঁকেই অলৌকিক দৃষ্টি সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ দিব্যদর্শী বলার নামান্তর !!**

তৃতীয় পুষ্প

প্রশ্ন ঃ— যাই বলুন, রামকৃষ্ণের মত এমন সর্ববিষয়ে সিদ্ধ মহাপুরুষ ভারতবর্ষে কখনও আসেন নি। তিনি কোন মতকেই উপেক্ষা করেন নি, যখন যেটা ধরেছেন, তাতেই সিদ্ধ হ'য়ে গেছেন। তাঁর চিন্তা ও ধ্যানশক্তির এমন গাঢ়তা ছিল যে, যখন যে দেবতাকে ইষ্ট বলে ধরেছেন, তাঁর ধ্যানেই সেই ধ্যেয়বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন। যখন মহাবীরের ধ্যান করতেন সেই সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর শ্রীমুখের বর্ণনা শুনুন—"ঐ সময়ে আহার বিহারাদি সকল কার্য্য হনুমানের ন্যায় করিতে হইত—ইচ্ছা করিয়াই যে করিতাম তাহা নহে, আপনা আপনিই হইয়া পড়িত। পরিবার কাপড়খানাকে লেজের মত করিয়া কোমরে জড়াইয়া বাঁধিতাম, উল্লম্ফনে চলিতাম, ফলমূলাদি ভিন্ন অপর কিছুই খাইতাম না — তাহাও আবার খোসা ফেলিয়া খাইতে প্রবৃত্তি হইত না, বৃক্ষের উপরেই অনেক সময় অতিবাহিত করিতাম এবং নিরন্তর 'রঘুবীর, রঘুবীর' বলিয়া গম্ভীর স্বরে চীৎকার করিতাম। চক্ষুদ্বয় তখন সর্ব্বদা চঞ্চল ভাব ধারণ করিয়া ছিল এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, মেরুদণ্ডের শেষ ভাগটা ঐ সময়ে প্রায় এক ইঞ্চি বাড়িয়া গিয়াছিল" [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা]।

উত্তর ঃ— তোমাদের ভক্তির আতিশয্যে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যা কিছু ভাবতে পারো, তবে তাঁর মত সিদ্ধ মহাপুরুষ ভারতবর্ষে কখনও আসেন নি—তোমাদের এই অতিশয়োক্তির সঙ্গে সবাই একমত হ'তে পারবেন না। রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমার যথাযথ ধারণা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করেছি। একজন ধ্যানী পুরুষ তাঁর ধ্যানের গাঢ়তায় ধ্যেয় বস্তুর আকার পেতে পারেন, এও বিচিত্র নয়; "যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি," প্রাণী জগতেও এই সত্য দেখা যায়, তেলে পোকা কাঁচ পোকার কথা চিন্তা করতে করতে কাঁচ পোকার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়ে থাকে—

যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলাং ধিয়া
স্নেহাৎ দ্বেষাৎ ভয়াৎ বাপি যাতি তত্তৎ স্বরূপতাম্।
কীটঃ পেশকৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ
যাতি তৎ সাত্মতাং রাজন্, পূর্ব্বরূপং সংত্যজন্।

প্রেম, দ্বেষবুদ্ধি বা ভয় বশতঃই হোক, দেহী একাগ্র চিত্তে নিরন্তর যে বস্তুর ধ্যান বা ভাবনা করে, তার তৎস্বরূপত্ব লাভ হয়ে যায়। শাম্ব তো দ্বেষবুদ্ধিতে নিরন্তর কৃষ্ণ চিন্তা করতে করতে কৃষ্ণের মতই নীরদবরণ চতুর্ভূজ হয়ে গেছলেন! কাজেই ধ্যানী পুরুষ রামকৃষ্ণদেব তোমাদের কথানুযায়ী, সব মতের সত্য উপলব্ধি করার সখ বশতঃ যদি কোন সময় মহাবীর হনুমানের ধ্যান করে তৎস্বরূপত্ব লাভ করেন, তাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নেই। কিন্তু হনুমানের কি লাঙ্গুল ছিল যে তাঁর লেজ গজিয়ে গেল হনুমৎ চিন্তায়? অজ্ঞ পুরাণকার এবং বাংলা রামায়ণের বর্ণনানুযায়ী, জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে রামকৃষ্ণ তাহলে নিশ্চয়ই হনুমানকে লাঙ্গুল বিশিষ্ট বৃক্ষারূঢ় শাখামৃগের ন্যায় অনুমান করে, ধ্যান করেছিলেন! আর সেজন্য লাঙ্গুল বৃদ্ধি হ'য়ে রামকৃষ্ণদেবের যখন দৈহিক উন্নতি হ'ল কঠোর তপস্যার ফলে, তাহলে সলাঙ্গুল রামকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি গড়ে তোমরা পূজা করলেই পার!!

সারা ভারতবর্ষে, আজ, এই দুর্দ্দশাই দেখছি! সাধু পরমহংস মণ্ডলেশ্বর, মহামণ্ডলেশ্বরদের প্রতিষ্ঠিত হনুমান মন্দিরে সলাঙ্গুল হনুমানজী পূজা পাচ্ছেন!! ঐ সব মহাপুরুষদের দশ বিশ হাজার শিষ্যও আছে, তাঁরা সর্ব্বজ্ঞ বলে শিষ্য সমাজে প্রচারিত এবং সম্মানিত, কিন্তু ঐ সব 'সর্ব্বজ্ঞ'দের মহাবীর সম্বন্ধে অজ্ঞতা দেখে হাস্য সম্বরণ করা অত্যন্ত কঠিন।

ত্যাগ, তপস্যা, অচ্যুত ব্রহ্মচর্য্য, অমিত শক্তি আর প্রজ্ঞার যিনি আধার ছিলেন, তাঁকে লাঙ্গুল বিশিষ্ট না করলে, তোমাদের সাধু পরমহংস পুরাণকার আর ধর্ম্মাচার্য্যদের সর্ব্বজ্ঞতা এবং ত্রিকালদর্শিতা প্রমাণিত হবে কি করে? আজকাল যাত্রা, থিয়েটার, হিন্দী সিনেমাদিতে যখন রাম বিষয়ে কোন ছায়াচিত্রে হনুমান বেশী নটের পেছনে বিরাট লাঙ্গুল-যোজনা দেখি, তখন লজ্জায় মাথা নত হয়। আমাদের দেশের মহা মহা বিদ্বানদের তরফ থেকেও এর কোন প্রতিবাদ হয় না! বিদ্বানদের কথা নয়ত বাদ দিলাম, তাঁদের পুঁথিগত বিদ্যা জনশ্রুতি আর পুরাণ বর্ণিত বিষয়ের কুজ্ঝটিকার আবরণ ভেদ করতে

অক্ষম হ'তে পারে, কিন্তু যাঁরা নাকি সর্ব্বান্তর্য্যামী, যুগাবতার, যুগদেবতা, দ্রষ্টাপুরুষ বলে কথিত, তাঁদের সর্ব্বত্রগামিনী বুদ্ধিটি সত্য মিথ্যা নির্ণয়ে অক্ষম হয় কেন? **মহাবীর হনুমান সাধারণের প্রচলিত ধারণানুযায়ী, দীর্ঘ পুচ্ছসমন্বিত লোমশ বৃক্ষারূঢ় মর্কট ছিলেন না।**

হনুমানজী মানুষ ছিলেন, রামকৃষ্ণের কুধারণানুযায়ী তাঁর লেজ ছিল না

আমার দোষ এই যে, তোমাদের মত সরল বিশ্বাসে সাধু পরমহংসদের কথা বা পুরাণ কথা মেনে নিতে পারি না, অভ্রান্ত সত্যরূপে; দাতা দয়াল যেটুকু বুদ্ধি বিবেক দিয়েছেন, তাই দিয়ে বিচার করে দেখি। মহাবীর হনুমান সম্বন্ধে আমার ধারণা, তিনি শৌর্য্যে বীর্য্যে ত্যাগ তপস্যায় মহত্বে একজন মানবশ্রেষ্ঠ ছিলেন—তাঁর মানুষের মতই মূর্ত্তি (Human figure) ছিল। মূলবাল্মীকি রামায়ণ সহ রামায়ণের সর্ব্ব প্রাচীন টীকা রামায়ণ কতক, রামবর্ম্মণের তিলক টীকা, গোবিন্দরাজের শৃঙ্গার তিলক টীকা, মহেশ্বর তীর্থ, বরদরাজ, মৈথিল ও নাগেশ ভট্টের রামায়ণের টীকা, ত্রম্বকযজ্বনের ধর্ম্মকূট, রামানন্দ তীর্থের রামায়ণকূট ইত্যাদি টীকাগুলি তন্ন তন্ন করে, জ্ঞানবুদ্ধিমত অনুসন্ধান করে, রামায়ণ-বর্ণিত **বালী সুগ্রীব হনুমানাদি যে মানুষ ছিলেন,** এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। তোমরাও যদি সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে সব বিচার করে দেখ, তাহলে আশা করি, আমার সঙ্গে এক মত হবে।

বাল্মীকি রামায়ণে পাই, যখন সীতা হরণের পর সীতান্বেষণে রাম লক্ষণ, সুগ্রীব হনুমানাদি যেখানে ছিলেন সেখানে পৌঁছলেন, তখন সুগ্রীবের নির্দ্দেশে হনুমান এগিয়ে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে যে বুদ্ধিমত্তা সৌজন্য ও শিষ্টাচার সহ আলাপ করলেন, তাতে তিনি যে একজন শাখামৃগ মর্কটাকৃতি ছিলেন, এ ধারণা তোমাদের একমাত্র সাধু পরমহংস পুরাণকারের দল ছাড়া আর কেউ করতে পারবেন না। হনুমানের বাক্যালাপে, অতুলনীয় বাচনভঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে রামচন্দ্র লক্ষণকে ঐ বাক্যজ্ঞ, সুগ্রীব—অমাত্যের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ মধুর বাক্যে আলাপ করতে নির্দ্দেশ দিলেন—

তমভ্যভাষ সৌমিত্রে সুগ্রীবং সচিবং কপিম্

বাক্যজ্ঞং মধুরৈর্বাক্যৈঃ স্নেহযুক্তমরিন্দমম্। [বাল্মীকি রামায়ণ, তৃতীয়সর্গ ২৭]

হনুমানের বচন পারিপাট্যে মুগ্ধ হ'য়ে রামচন্দ্র লক্ষণকে বলছেন,—"নিশ্চয়ই ইনি

মহাপণ্ডিত ; ঋগ্বেদ সামবেদ যজুর্ব্বেদে পারদর্শী না হলে কেউ এরকম জ্ঞানগর্ভ বাক্যালাপ করতে পারে না। ইনি নিশ্চয়ই সমগ্র ব্যাকরণ শাস্ত্রও অধিগত করেছেন, আমার সঙ্গে এত কথা বললেন, তবুও একটিও অপশব্দ প্রয়োগ করেন নি,—

> নানৃগ্বেদ বিনীতস্য না যজুর্ব্বেদ ধারিণঃ
> না সামবেদ বিদুষঃ শক্যমেবং প্রভাষিতুম্।
> নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম্।
> বহু ব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্॥ [ঐ, কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড, তৃতীয়সর্গ]

সীতান্বেষণে সুগ্রীব যখন চারিদিকে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে পাঠালেন, তখন বিশেষকরে এই মহাবীর হনুমানকেই সম্বোধন করে বললেন—

> তদ্‌যথা লভ্যতে সীতা তত্ত্বমেবোপপাদয়,
> ত্বয্যেব হনুমন্ অস্তি বল বুদ্ধিঃ পরাক্রমঃ।
> দেশ কালানুবৃত্তিশ্চ নয়শ্চ নয় পণ্ডিতঃ॥ (ঐ)

'বীর হনুমন্, যাতে সীতার অনুসন্ধান পাওয়া যায়, তা অবশ্যই করো। তুমি রাজনীতিবিদ্, বল বিক্রম বুদ্ধি শৌর্য্য সবই তোমাতে আছে। দেশ কাল পাত্রানুযায়ী কখন কি করতে হ'বে, এ সব নীতিতত্ত্বে তুমি বিশারদ'।

কাজেই, ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে, তোমরা মহাবীর হনুমানের সলাঙ্গুল বিকৃত মুখ প্রতিমূর্ত্তি গড়ে পূজা করলেও এবং ঐ বিকৃত রূপের ধ্যান করতে করতে, 'as you think so you become'—এই theory অনুযায়ী, তোমাদের সকলেরই লাঙ্গুল গজিয়ে উঠলেও বেদজ্ঞ সর্বশাস্ত্রার্থবিদ্, মহাবিক্রমী, পরম তপস্বী হনুমানজীকে তোমাদের মত শাখামৃগ বানর পর্য্যায়ে ফেলা আমার পক্ষে অসম্ভব।

প্রশ্ন :— ভারী তো মজার কথা, রামায়ণে তো আমরা বানরের লেজ আছে দেখি, তারা মানুষের মত জীব হবে কি করে? তাহলে নল নীল সুষেন এমন কি ভল্লুক রাজ জাম্বুবানও কি তাহলে আপনার মতে মানুষের মত জীব? যদি ওরা পশুই না হবে, তাহলে রামচন্দ্র বনের পশুকেও কোল দিয়েছিলেন, এ কথা চলে আসছে কেন? হনুমানের যদি লাঙ্গুলই না ছিল তাহলে লঙ্কাদাহ করলো কি দিয়ে?

উত্তর :— আমি পূর্ব্বেই বলেছি, মূল পুস্তকে এক রকম থাকে আর পুরাণ

উপপুরাণে তার অতিরঞ্জন এবং অনুরঞ্জন ঘটে। মহর্ষি বাল্মীকির রামায়নে দু'এক স্থানে লাঙ্গুলের কথা আছে বটে কিন্তু পুরাণকারেরা এবং অজ্ঞ জন সাধারণ পূর্বাপর বিচার না করেই, হনুমান বলতেই লাঙ্গুল বিশিষ্ট বর্ত্তমানে যে মর্কট বানরদল গাছে গাছে দেখা যায়, তাদেরই সমগোত্র ভেবে বসলো। এই ভাবে একই প্রজাপতি গোত্র হলেও যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর গরুড়াদি সুপর্ণ নাগ সবাইকে মনুষ্যেতর কিম্ভুত কিমাকার জীবে ভেবে বসে আছে। একটা বদ্ধমূল ধারণা চলে আসছে এমন ভাবে যেন, নাগ বললেই বিষধর সাপ, উদ্যত করালফণা নিয়ে দংশন করতে আসছে, কিন্নর বলতেই যেন ঘোড়ার মত মুখ কামচর্চ্চাকারী এক প্রকার জীব আর রাক্ষস বলতেই বিকট দর্শন রক্তপিপাসু, নরখাদক দস্যু নারীহরণ করা আর গোটা গোটা মানুষ জীব জন্তু গিলেফেলাই তাদের স্বভাব! অথচ ঐ সব যক্ষরক্ষ সুপর্ণদের যে শৌর্য্য বীর্য্য পাণ্ডিত্য ও তপোবলের পরিচয় পাওয়া যায়, তারা যে একই পিতা কশ্যপ থেকেই জন্মেছে, তারা মনুষ্যেতর পশুপাখী সাপ কি করে হ'বে, সে সব ভেবে দেখবে না; মনুষ্য মাতাপিতার শুক্রশোণিত সংযোগে সাপ ভালুক পাখী বানরাদির কি করে জন্ম সম্ভব তাও একবার বিবেচনা করে দেখবে না! এ অজ্ঞতা যে কবে দেশ থেকে দূর হ'বে, তা জগদীশ্বরই জানেন, **স্বাধীন চিন্তাধারার প্রসারতা না ঘটলে এ অজ্ঞতা কোনদিনই যাবে না।**

হনুমানাদি বানর, গরুড়াদি পক্ষী, তক্ষকাদি নাগ, রাবনাদি রাক্ষস এঁরা সবাই মানুষের প্রতিবেশী মানুষই ছিলেন, কেবলমাত্র গুণগত, আচার ব্যবহারগত পার্থক্য ছিল।

রামায়ণে দেখি, বানরগণ যখনই একে অপরের কাছে রামচন্দ্রের পরিচয় দিয়েছেন, তখনই তাঁরা এইভাবে পরিচয় দিয়েছেন, "ইক্ষাকুনাং কুলে জাতঃ", কৈ, "মনুষ্যানাং কুলে জাতঃ"—একথা তো কোথাও বলেন নি? আমরা যেমন কারও পরিচয় দিতে গিয়ে বলি, ইনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বংশধর, কিংবা, লোকমান্য তিলকের বংশধর, কখনও কি বলি, ইনি মানুষের বংশে জন্মেছেন? মানুষ মানুষের পরিচয় দিতে গিয়ে কখনও এরকম ভাবে বলে না। বানরজাতি যদি মানুষ হ'তে পৃথক একটা জাতি হ'ত, তাহলে 'ইক্ষাকুর বংশে ইনি জন্মেছেন' না বলে, 'মানুষের বংশে জন্মেছেন'—এই কথাই বলতেন।

অশোক কাননে হনুমান সীতাকে প্রশ্ন করছেন—

সুরানাম্ অসুরানাঞ্চ, নাগগন্ধর্ব্ব রাক্ষসাম্
যক্ষাণাং কিন্নরাণাঞ্চ কা ত্বং ভবসি শোভনে !

[বাল্মীকি রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড ৩৩ অধ্যায়, ৫ শ্লোক]

'ঐয়ি শোভনে ! সুর, অসুর, নাগ গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ কিন্নর কোন্ কুলে আপনি জন্মেছেন' ? তাহলেই বেশ বোঝা যাচ্ছে, সুর অসুর নাগ গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ কিন্নর এবং মানুষের মধ্যে শারীরিক গঠনের বৈষম্য ছিল না। তাহলে সেই Particular demarcating feature থেকেই (অর্থাৎ রাক্ষসের লম্বা লম্বা রক্তাক্ত দাঁত, কিন্নরের অশ্বমুখ প্রভৃতি !!) তিনি সহজেই বুঝতে পারতেন। লক্ষ্য করুন, ঐ শ্লোকে 'মানুষ' কথাটি নেই। কারণ, হনুমান নিজেও মানুষ ছিলেন, তিনি অপর মানুষ দেহধারী আর একজনকে তিনি মানুষ কিনা এ অবান্তর প্রশ্ন করবেন কেন ? দেব যক্ষ রক্ষ কিন্নর আর মানুষে আকৃতিগত কোন অমিল ছিল না, পারস্পরিক বৈষম্য ছিল শুধু শৌর্য্যে বীর্য্যে শিল্পকলায় আচার বিচার আর ধর্ম্ম-বিশ্বাসে, তাই হনুমান সীতাকে ঐ ভাবে প্রশ্ন করছেন, যেমন আমরা কাউকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি চীনা, না জাপানী ? বুলগেরিয়ান, না, হাঙ্গেরিয়ান ? ইংরেজ, না, ফরাসী ? বৌদ্ধ, না, খ্রীষ্টান ? ইত্যাদি।

মানুষ যে তারই প্রতিবেশী, সমগোত্র, বানর সুপর্ণ যক্ষ রক্ষকে হীন কদাকার কিম্ভূত কিমাকার জীব রূপে যে রটনা করেছে, এ বড় লজ্জার কথা !

যাক্, এবার তোমার আসল প্রশ্নে আসা যাক্। তুমি বলছো, রামায়ণে দু'এক স্থানে লেজের বর্ণনা দেখেছ। পুরাণ উপপুরাণ কৃত্তিবাসাদি বাংলা রামায়ণের কথা বাদ দাও, কল্পনাদেবীর অকৃপণ দয়ায়, যে কোন আজগুবি গাল-গল্প রচনায় তো এঁদের জুড়ী মেলা ভার ! এঁরা তো হনুমান বা অঙ্গদের লেজকে কোথাও কোটি কোটি যোজন লম্বা করে দিয়েছেন, কোথাও বা লেজের কুণ্ডলি এমন পাকিয়ে দিয়েছেন যে তা আকাশ স্পর্শ করলো !! হনুমান প্রভৃতি বানর এবং যক্ষ রক্ষরা যখন ইচ্ছা যে কোনরূপ ধারণ করতে পারে, এ বর্ণনাও এঁরা দিয়েছেন, হনুমান তো কখনও মক্ষিকার মত ক্ষুদ্রাকৃতি হ'চ্ছেন, আবার কখনও বা তাঁর এত বিরাট কলেবর হয়ে গেল যে তাঁর মাথাটা গিয়ে আকাশে ঠেকলো।

ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়, (আপনারাও পরবর্ত্তী বর্ণনা থেকে বিচার করে দেখুন) হনুমানজীর লাঙ্গুল বা আকাশচারী গরুড়ের **পক্ষদ্বয়** শূন্যে যাতায়াত করার উপযোগী কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ছিল। হনুমান যখন সমুদ্র লঙ্ঘন করছেন, তখন মহর্ষি বর্ণনা দিচ্ছেন—

উৎপপাতাথ বেগেন বেগবান্ বিচারয়ন্
সুপর্ণমিব চাত্মানং মেনে স কাপকুঞ্জরঃ।

হনুমানের লাঙ্গুল, শূন্যে গমনাগমনের জন্য ব্যোমযান বিশেষ!

'বেগশালী হনুমান তখন **মহাবেগে আকাশে উড়ে চললেন,** নিজেকে তখন তিনি সুপর্ণ গরুড়ের ন্যায় ভাবলেন'।

হনুমানের লাঙ্গুল যদি ব্যোমযানের মত যন্ত্র বিশেষ না হবে, তাহলে তাতে উড়া যায় কি করে? বর্ত্তমানেও তো বানরের বা অন্যান্য জীবজন্তুর লেজ দেখতে পাই, তার দ্বারা তারা তো কৈ উড়তে পারে না? তাই আমার মনে হয়, মহাবীর হনুমানের ত্যাগ তপস্যা পরাক্রম মহাপাণ্ডিত্য আদি চিন্তা করে, সবদিকের সঙ্গতি রেখে তাঁকে লাঙ্গুল বিশিষ্ট একটি জন্তু না ভেবে, তাঁর লাঙ্গুলটি যে একটি বায়ুচালিত যন্ত্র বিশেষ, এই ধারণা করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। আমার এ ধারণা আরও দৃঢ়তর হয় মূল রামায়ণের পরবর্ত্তী বর্ণনায়—

তস্য বানর সিংহস্য প্লবমানস্য সাগরম্
পক্ষান্তরগতো বায়ু জীমূত ইব গর্জ্জতি।

'সাগর লঙ্ঘনকারী প্লবমান হনুমানের পক্ষান্তরগত বায়ু মেঘের মত গর্জ্জন করছে'। বর্ত্তমানে আকাশে এরোপ্লেন উড়লে যে শব্দ হয়, ঐ বায়ুগর্জ্জন সেই ধরণের কোন কিছু স্মরণ করায় না কি?

আরও ভেবে দেখ, তাঁর ঐ লাঙ্গুল **কৃত্রিমভাবে দেহের সঙ্গে সংযুক্ত** ছিলো বলেই রাক্ষসরা লেজে আগুন দিলেও হনুমানের গায়ে তাপ লাগে নি। ধরো তোমার আঙ্গুলে যদি এই ফাউন্টেনের খাপটা ঢুকিয়ে দিয়ে তাতে দিয়েশালাইএর কাঠি জ্বালি, চট্ করে কি তোমার আঙ্গুল পুড়ে যাবে? তুমি প্রজ্জলিত খাপটা আঙ্গুলে তাপ লাগবার পূর্ব্বেই জলে ডুবিয়ে নিভিয়ে ফেলতে পার, তেমনি হনুমানের লাঙ্গুলটি কৃত্রিম ছিল বলে, কৃত্রিমভাবে **দেহের সঙ্গে**

সংযুক্ত কোন যন্ত্র বিশেষ বলেই, তিনি লঙ্কাদাহের পর সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে তা নিভিয়ে দিতে পেরেছিলেন ঐ জন্যই তিনি অক্ষত ছিলেন।

তোমার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশে বলেছ, 'বনের পশুকেও রামচন্দ্র কোল দিয়েছিলেন' এ কথা তাহলে চলে আসছে কেন? কিংবদন্তী হিসেবে অনেক কিছুই চলে আসতে পারে, রামচন্দ্র মৈত্রী ও করুণার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন—তিনি আব্রহ্মচণ্ডাল কাউকে ঘৃণা করতেন না, এ জন্যও ও কথাটা প্রচলিত হ'তে পারে, তাই বলে বালী সুগ্রীব হনুমানকে পশু হ'তে হবে, এ কোন যুক্তিযুক্ত কথা নয়। চিন্তা করে দেখ না, ক্ষত্রকুলতিলক মহাযোদ্ধা রামচন্দ্র কি কয়েকটা 'পশুজাতি' বানরের সাহায্য চেয়ে ছিলেন দেবদৈত্যরণজয়ী মহা-পরাক্রমশালী শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ রাবণের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য? সামান্য শাখামৃগের সঙ্গে মিতালী করেছিলেন? মন্ত্রণা গ্রহণ করতেন একটা ভল্লুকের? ধীরবুদ্ধি, প্রাজ্ঞ জাম্বুবান কি, বর্ত্তমানে যে ভল্লুক দেখা যায় সেই জানোয়ারের সমগোত্র হবেন বলে মনে হয়?

শ্রীকৃষ্ণ, যাঁকে তোমরা ভগবান জ্ঞান কর, তিনি কি জাম্ববতীকে অর্থাৎ একটা মূকপ্রাণী ভালুকীকে বিয়ে করেছিলেন? ইন্দ্রের পুত্র বালী, সূর্য্যের পুত্র সুগ্রীব, পবনপুত্র হনুমান—বালী সুগ্রীব হনুমান যদি বন্য বানর শ্রেণীর জন্তু হ'ন, তাহলে কি তোমাদের দেবতারা বানরীর সঙ্গে সহবাস করেছিলেন বলতে চাও? অহো, অবিদ্যার মহিমা কী অপার! বিশ্বকর্ম্মাপুত্র **নল** সমুদ্রের উপর **সেতু নির্ম্মাণে যে উন্নত ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার** পরিচয় দিয়েছিলেন তা কি বন্য বানর হলে সম্ভব? বর্ত্তমান Medical Science এর কতো উন্নতি হয়েছে, তবুও মরা মানুষকে বাঁচাবার ঔষধ আজও শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করতে পারেন নি, **সুষেন** কিন্তু **মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা দ্বারা ঐ অঘটন ঘটাতে** পারতেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে এই অদ্ভুতজ্ঞান, সুষেন একটা বন্য বানর হলে কি তা সম্ভব হ'ত? জ্ঞানবিজ্ঞানে সমুন্নত এমন যাঁরা, তাঁদেরকে মানুষেরই সমগোত্রীয়, সমশ্রেণীর জীব না ভেবে বন্য বানর, পশু, বল কোন্ যুক্তিতে?

দেখ ভাই, সুগ্রীব হনুমানাদি বানররা বন্য বানর ছিলেন না; গুণ, ব্যবহার, আচার, ধর্ম্মাচরণ প্রভৃতি ব্যাপারে প্রভেদ অনুযায়ী, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সুর, অসুর,

নয়, বানর এই রকম নাম মাত্র—একই মানুষ জাতি—এই ভাবেই মহর্ষি বাল্মীকি কিষ্কিন্ধ্যায় তৎকালে যাঁরা বাস করতেন, তাঁদেরকে **'বানর' নামে অভিহিত** করেছেন। কিন্তু কল্পনা প্রিয় পুরাণ, উপপুরাণ, বাংলা রামায়ণ রচয়িতারা 'বানর' বলতে লাঙ্গুলবিশিষ্ট বন্য বানর বলে Confuse করেছে। বন্য বানররাও সে সময় ছিল। লঙ্কাকাণ্ডে আছে, ওষধি সংগ্রহের জন্য হনুমান যখন সমুদ্র-লঙ্ঘন উদ্দেশ্যে, ত্রিকূট পাহাড় থেকে লাফ দিলেন, তখন ত্রিকূটের বৃক্ষ সকল ভগ্ন, শিলাগুলি বিকীর্ণ এবং পর্বত বিঘূর্ণিত হতে থাকলে বানরগণ তার উপর থাকতে পারলো না—

(ক) তস্মিন্ সম্পাড্যমানে তু ভগ্নক্রম শিলাতলে
ন শেকুর্বানরাঃ স্থাতুং ঘূর্ণমানে নগোত্তমে ।৩৯

(খ) স বৃক্ষখণ্ডাংস্তরসা জহার
শৈলান্ শিলা প্রাকৃত বানরাংশ্চ। [৪৮, লঙ্কাকাণ্ড, ৭৪ অঃ]

একটা এরোপ্লেন আকাশে উড়লে, তাব মহাশব্দে যেমন বানররাকে 'হুঁপ্ হাঁপ' শব্দে গাছে গাছে লাফিয়ে পড়তে দেখি, তেমনি হনুমানজীর বেগ প্রভাবে বৃক্ষচূড়া ধ্বসে পড়লো, বন্য বানররা ভয়ে সমুদ্রজলে লাফিয়ে পড়লো। এই বন্যবানরদের সমপর্য্যায়ে কিষ্কিন্ধ্যাবাসী দেবসন্তান বালী সুগ্রীব হনুমানাদিকে পশুশ্রেণীর ভেবে বসা কি যুক্তিযুক্ত? **শক, হুন, বেদুইন, মঙ্গোলিয়ান, দ্রাবিড়, গ্রীক যেমন এক একটা জাতি, রীতি, নীতি, আচার. ব্যবহারে তফাৎ থাকলেও, দেশ অনুযায়ী নামের পার্থক্য থাকলেও এঁরা সবাই যেমন মানুষগোত্র, আকৃতি গঠনে মানুষ** (Human being) **তেমনি, কিষ্কিন্ধ্যায় রাজত্ব করতো যে বানর জাতি, বালী, সুগ্রীব, হনুমান, নল, নীল, সুষেণ যে জাতির গৌরব, তাঁরাও সবাই মনুষ্যদেহধারী ছিলেন, মানুষ ছিলেন**।

বাল্মীকি রামায়ণে এঁদের **বিদ্যা, জ্ঞান, উন্নত শিল্পকলা, সঙ্গীত চর্চা, বহুমূল্য বেশভূষা, অলঙ্কার প্রসাধন পারিপাট্যের** যে পরিচয় পাই, তাতে এঁদেবকে কি ভাবে এতকাল ধরে, আমাদের দেশের জ্ঞানীগুণী পরমহংসের দল থেকে সাধারণ লোক পর্য্যন্ত বন্য বানর, পশু-জন্তু ভেবে এসেছেন—এইটেই আশ্চর্য্যের বিষয়!

সুগ্রীব, বালী প্রভৃতি মনুষ্য গোত্রীয় বানরজাতির কেমন সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য্য, বিলাসব্যসন এবং অভিজাত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, দেখ—

বানরেন্দ্র গৃহং রম্যং মহেন্দ্রসদনোপমম্,
স সপ্তকক্ষ্যা ধর্ম্মাত্মা যানাসনসমাবৃতাঃ।
দদর্শ সুমহৎ গুপ্তং দদর্শান্তঃপুরং মহৎ। [ঐ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৩৩, ১৯]

ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ বানররাজ সুগ্রীবের **ইন্দ্র ভবন সদৃশ যান আসন** সমাবৃত সপ্ত কক্ষ বিশিষ্ট **মনোহর গৃহ** এবং **সুরক্ষিত অন্তঃপুর** দর্শন করেছিলেন। সেখানে **তাল মান লয় ও পদ সংযুক্ত সুমধুর সঙ্গীতও** যে হচ্ছিল, **লক্ষণ** তাও শুনেছিলেন—

"তন্ত্রীগীত সমাকীর্ণং সমতাল পদাক্ষরম্।"

অন্তঃপুরের মধ্যে গিয়ে সুগ্রীবকে দেখলেন, **স্বর্ণ সিংহাসনে, সুদৃশ্য, বহুমুল্য আস্তরণোপরি সমাসীন**—

ততঃ সুগ্রীবমাসীনং কাঞ্চনে পরমাসনে
মহার্হাস্তরনোপেতে দদর্শাদিত্য সন্নিভম [বাল্মীকি রামায়ন ৩৩, ৬০]

শুধু তাই নয়, **তাঁদের মধ্যে শবদাহ, অগ্নিহোত্রানুযায়ী প্রেতকার্য্যের** যে বিবরণ পাই, তাতে বেশ বোঝা যায়, তাঁরা মানুষই ছিলেন।

বালীরাজার মৃতদেহ সংকারেব বর্ণনাটা দেখ—

বালীর অগ্নিহোত্রানুযায়ী প্রেতকার্য্য

দিব্যাং ভদ্রাসনযুক্তাং শিবিকাং স্যন্দনোপমম্,
পক্ষিকর্ম্মভিরাচিত্রাং দ্রুম কর্ম্ম বিভূষিতাম্। ২১
আচিতাং চিত্রপত্তীভিঃ সুনিবিষ্টাং সমন্ততঃ।
বিমানামিব সিদ্ধানাং জাল বাতায়নাযুতাম্। ২৩
ঈদৃশীং শিবিকাং দৃষ্ট্বা রামোলক্ষ্মণমব্রবীৎ।
ক্ষিপ্রং বিনীয়তাং বালী প্রেতকার্য্যং বিধীয়তাম্। ২৪
[বাল্মীকি রামায়ন কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড]

বালীর প্রেতকার্য্যের জন্য যে শিবিকাটি আনা হ'ল তার চারিদিকের কাঠে নানাবিধ কারুকার্য্য, পক্ষীচিত্র, জাল, বাতায়ন ও পতাকাশোভিত ছিল, সেটি সিদ্ধদের বিমানের মত সুদৃশ্য ছিল।

আমরা যেমন শবযাত্রার সময় সাধ্যমত পয়সা ছড়াই, বালীরাজার শববাহী শিবিকার আগে আগে তেমনি **বানরগণ বহু ধনরত্ন ছড়াতে ছড়াতে যাচ্ছিল**—

বিশ্রানয়ন্তো রত্নানি বিবিধানি বহূন চ
অগ্রতঃ প্লবগা যান্তি শিবিকা তদনন্তরম্। [ঐ, ২৫, ৩১]

হিন্দুগণ যেমন মৃতদেহ কোন নদী তীরে নির্জ্জনস্থানে নিয়ে গিয়ে, চিতা প্রস্তুত করে শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী শবদাহ করেন, পরে, দাহ শেষে নদীজলে উদকক্রিয়া বা প্রেতোদ্দেশ্যে তর্পণাদি কার্য্য করেন, **বানরগণও** তেমনি নির্জ্জন গিরি-নদীতটে চিতা প্রস্তুত করে, মৃতদেহ তাতে স্থাপন করে, অগ্নিসংস্কার করলেন। পরে, দাহ শেষে নদীতে গিয়ে প্রেতাদ্দেশ্যে **তর্পণাদি করলেন**—

পুলিনে গিরি নদ্যাস্তু বিবিক্তে জল সংবৃতে
চিতা চক্রুঃ সুবহবো বানরাঃ বনচারিণঃ।
অবরোপ্য ততঃ স্কন্ধাচ্ছিবিকাং বানরোত্তমাঃ। ৩৮।
ততোঽগ্নিং বিধিবৎ দত্বা সোপসব্যং চকার হ। ৪০।
আজগ্মুরুদকং কর্ত্তুং নদীং শুভজলাং শিবাম্। ৫১।

[ঐ, কিষ্কিন্ধ্যা, ২৫ সর্গ]

এইভাবে, মূল রামায়ণে বর্ণিত, বানর জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত শিল্পকলা, ঐশ্বর্য্য, আভিজাত্য, পরাক্রম, ধর্ম্মসংস্কার এবং শাস্ত্রাচারের কথা বিচার করে, তাঁদেরকে সলাঙ্গুল বন্যবানর জন্তু শ্রেণীর, জানোয়ার না ভেবে, মানুষ ভাবলে কি দোষ হবে? অবশ্য, তাতে তোমাদের "যুগাবতারের" লাঙ্গুলবৃদ্ধির কোন যৌক্তিকতা support করা যাবে না, এই যা!!!

বিচার করে বোঝ, ওঁরা যদি মানুষ না হয়ে, বন্য বানর শ্রেণীই হতেন, তাহলে ক্রম বিবর্ত্তনের ধারানুযায়ী (Theory of Evolution), বর্ত্তমানের বানর শ্রেণীর মধ্যেও ঐ সব বলবিক্রম শিক্ষা সংস্কৃতির, বরং আরও উন্নততর পরিচয় পাওয়া যেত, তা পাওয়া যায় কি?

মহাভারতের আদিপর্বের সপ্তম অধ্যায়ে ৬৬ নং শ্লোকটি লক্ষ্য কর—

রাক্ষসাশ্চ পুলস্ত্যস্য বানরাঃ কিন্নরাস্তথা।
যক্ষাশ্চ মনুজ ব্যাঘ্র! পুত্রাস্তস্য চ ধীমতঃ।

'হে মনুজ ব্যাঘ্র, মহারাজ জন্মেঞ্জয়! রাক্ষস্ **বানর**, কিন্নর ও যক্ষসকল **মহাজ্ঞানী পুলস্ত্য ঋষির পুত্র**'। পুলস্ত্য ঋষির পুত্র **বানর** নিশ্চয়ই মনুষ্যাকৃতি, পশ্বাকৃতি মর্কটমুখ বন্য জন্তু নয়, আশা করি, অতি নির্বোধের মাথাতেও এ কথাটা ঢুকবে।

চতুর্থ পুষ্প

সত্যদাস নলিনীকান্ত :—আপনার অকাট্য যুক্তি প্রমান শুনে বালী সুগ্রীব হনুমানাদি বানর বলতে তাঁরা যে মনুষ্যাকৃতি, মানুষেরই সমগোত্র ছিলেন, শাখামৃগ জন্তু নয়, তা বেশ বোঝা গেল। যক্ষ রক্ষ দৈত্য দানব গন্ধর্ব্ব কিন্নর রাক্ষস—এঁরা যে মনুষ্যাকৃতি কিংবা মানুষের দৈহিক সৌন্দর্য্যের চেয়েও আরও রূপবান ছিলেন, সে সম্বন্ধে মহাভারত এবং অন্যান্য শাস্ত্রেও প্রমান পাওয়া যায়। মহর্ষি কশ্যপের ঔরষে, দিতির গর্ভে দৈত্যরা, দনায়ুর গর্ভে দানবরা জন্মেছিলেন, এঁরা ব্রাহ্মণ ছিলেন; এইজন্য বৃত্রাসুরকে বধ করায় ইন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হ'তে হয়েছিল। দৈত্য দানব অসুরদের সঙ্গে, মানুষের বিবাহ সম্বন্ধও ছিল, যযাতি দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেছিলেন। দৈত্য অসুর দানবরা অনেক সময় সুন্দরী মনুষ্য রমণীগণকে হরণ করে নিয়ে যেত—ইত্যাদি বর্ণনাও পাওয়া যায়। এঁরা জ্ঞান বিজ্ঞান পরাক্রমে মহা উন্নত ছিলেন। গানে পারদর্শী ছিলেন বলেই গন্ধর্ব্ব বলা হয়। দক্ষ প্রজাপতির কন্যা অরিষ্টার পুত্রগণই গন্ধর্ব্ব নামে খ্যাত। মহাভারতের আদিপর্ব্বে ৬৫ অধ্যায়ে, মহর্ষি কশ্যপের কপিলা নাম্নী পত্নীর গর্ভেও গন্ধর্ব্বরা জন্মেছিলেন -- এরূপ বর্ণনা আছে। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ অর্জ্জুনের বন্ধু ছিলেন—ইনিই কাম্যকবনে দুর্য্যোধনকে সপরিবারে বন্ধন করেছিলেন। সঙ্গীত বিদ্যার যে কোন শাখায় গন্ধর্ব্বদের প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। মহর্ষি পুলস্ত্যের যে সকল পুত্র হিমালয়ের উত্তরস্থ কিম্পুরুষবর্ষ- (তিব্বত) বাসী ছিলেন তাঁদেরকেই যক্ষ এবং কিন্নর বলা হ'ত, কুবের ছিলেন যক্ষরাজ। মহাভারত বিষ্ণুপুরাণ অগ্নি-পুরাণাদি পাঠ করে, এ বিশ্বাস আমার হয়েছে যে ঐ সব দৈত্য দানব অসুর যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নরদের সম্বন্ধে যতই কাল্পনিক আজগুবি গল্প প্রচার করা হোক না কেন, এঁরা যে মনুষ্যাকৃতি, মানুষেরই সমগোত্রীয়, উন্নত ছিলেন, সে বিষয়ে

কোন সন্দেহই নেই। বিশ্বশ্রবা ঋষির ঔরষে নিকষার গর্ভজাত সন্তানগণের জ্ঞান তপস্তাপরাক্রমের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে কে ধারণা করবে যে রাক্ষসরা মনুষ্য ছাড়া কোন বিকটাকার জীব ছিলেন! রাবণ ছিলেন ত্রিলোকবিজয়ী, রাজনীতির শ্রেষ্ঠ আচার্য্য, তাঁর স্বর্ণলঙ্কা আর যে ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে বর্ত্তমানের যে কোন উন্নত নগরীও হীনপ্রভ! এঁর পাণ্ডিত্য, পরাক্রম ও রূপকে শত্রুরাও appreciate করতেন। হনুমান লঙ্কাতে প্রবেশ করে রাবণকে যখন দেখলেন, তখন সবিস্ময়ে বলছেন—

অহো! রূপমহো ধৈর্য্যম্, অহো! সত্ত্বমহো দ্যুতিঃ
অহো! রাক্ষস রাজস্য সর্ব্বলক্ষণ যুক্ততা।

দেব দৈত্য গন্ধর্ব কিন্নর মানব সবাই ছিলেন এঁর পদানত; মেঘনাদ ইন্দ্রজিতের যোগবল ও বিক্রমও পরমাশ্চর্য্য। এঁরা সবাই ছিলেন কামচারী, কেবল জাতিতে রাক্ষস। মনুর পুত্র মানব এবং তাদের বংশধর—(সব মিশিয়ে এখন আমরা মানুষ যাদেরকে বলি) এবং অন্যান্য জাতিকে ওঁরা নির্য্যাতন করতেন বলেই মানব-সৃষ্ট গ্রন্থে এঁদের বিরুদ্ধে অনেক কুমন্তব্য করা হয়েছে। পুরাণকার এবং অন্যান্য অর্ব্বাচীন গল্প রচয়িতারা তাই থেকে নানারকম উদ্ভট বর্ণনা দিয়েছে। কিন্তু তবুও যে কোন লোক একটু ধীর স্থিরভাবে বিবেচনা করলে বুঝতে পারবেন যে, যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর দৈত্য সবাই ঋষিপুত্র ছিলেন মনুষ্যাকৃতি ছিলেন, কোন বিকট বদন বিকট দশন জীব নয়! মানুষের মধ্যে যেমন গুণ এবং কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সূদ্র শ্রেণীভেদ আছে, তাই বলে ব্রাহ্মণ বৈশ্য ক্ষত্রিয় শূদ্রের মধ্যে কোন আকৃতিগত ভেদ নেই, সবাই মনুষ্যাকৃতি-বিশিষ্ট, তেমনি, 'যক্ষতে পুজ্যতে ইতি যক্ষঃ', 'রক্ষস্তস্মাৎ রক্ষ এব রাক্ষসঃ',—

"দৃষ্টা তু বিকলান্ ব্যঙ্গাননাথান্ রোগিনস্তথা
দয়া ন জায়তে যস্য স রক্ষ ইতি মে মতিঃ"

বিকলাঙ্গ, অনাথ ও রোগিগণকে দেখে যাদের মনে দয়ার উদয় না হয়, তারাই রাক্ষস—

"পরদারাভিমর্ষিত্বং পরার্থেঽপি চ লোলুপাঃ
স্বাধ্যায় এ্যম্বকে ভক্তি র্ধর্ম্মোঽয়ং রাক্ষসাঃ স্মৃতাঃ"।

'পরদারাভিগমনে অভিলাষ, পরের ধনে লিপ্সা, বেদাভ্যাস, শঙ্করে ভক্তি—এই

হ'ল রাক্ষসদের ধর্ম্ম'। এই ভাবেই গুণকর্ম্মানুসারে যক্ষ রাক্ষস গন্ধর্ব্ব কিন্নরাদি নাম হয়েছে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং এক সম্প্রদায়ের গ্রন্থে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লেখা—এই কুৎসিৎ দ্বন্দ্ব আবহমান কাল ধরেই চলে আসছে। কালী সিংহের মহাভারত এবং অন্যান্য শাস্ত্র পড়ে এটা বেশ বোঝা যায় ওঁরা সবাই মনুষ্যাকৃতি মানুষ ছিলেন। কিন্তু বানব, নাগ এবং সুপর্ণ (পক্ষী)রাও যে মনুষ্যাকৃতি ছিলেন, এ বিশ্বাস কিছুতেই করতে পারিনি। এখন আপনার অকাট্য প্রমান যুক্তি পেয়ে বুঝতে পারলাম, রামায়ণে যেসব অদ্ভুতকর্ম্মা বানরের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁরা সবাই মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাই বলে নাগ ও সুপর্ণরাও কি মনুষ্যাকৃতি, মানুষেরই সমগোত্রীয় ছিলেন ?

উত্তর :—আপনি ঠিকই বলেছেন যে, মানুষের বুঝবার ভুল আর সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে বিদ্বেষ এবং কুৎসিৎ দ্বন্দ্ব চলে আসছে, তারই ফলে শাস্ত্রের নানারকম বিকৃত অর্থ এবং বিকৃত ভাব চলে আসছে। মনুর সন্তান মানব গোষ্ঠীর যাঁরা বিরোধী ছিলেন, মানব-প্রণীত শাস্ত্রে তাঁদেরকে ঐভাবে অসভ্য, বর্ব্বর, কোথাও পশু জন্তু কিংবা অর্দ্ধনর, অর্দ্ধপশু, লাঙ্গুলবিশিষ্ট জানোয়ার ইত্যাদি ভাবে চিত্রিত করেছে। এখনও দেখুন, আমাদের দেশের গোঁড়া (Dogmatic) যাঁরা তাঁরা ইউরোপ, আমেরিকাবাসীকে ম্লেচ্ছ, মুসলমানদেরকে 'যবন' বলেন, তাঁদেরও মধ্যে যাঁরা গোঁড়া এবং অনুদার তাঁরাও আমাদেরকে 'কাফের', 'নেটিভ', 'নিগার', 'হিদেন' প্রভৃতি বিশেষণে আপ্যায়িত করেন! কিন্তু তাই বলে ইউরোপ, আমেরিকা, আরব বা ভারতবর্ষের অধিবাসীরা কি মানুষ নয় ?

এ বিষয়ে আমাদের পুরাণকার এবং অর্বাচীন অন্যান্য গ্রন্থকার যাঁরা এই সব বেদ-উপনিষদ মহাভারতাদির উপর ভিত্তি করে, plot বেছে নিয়ে. গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তাঁদের অঘটনঘটন-পটীয়সী কল্পনাশক্তির অবদানও ঐ সব ভ্রান্তির মূলে কম নয়!

(খ) দ্বিতীয় কারণ ধর্ম্ম বিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লব। গ্রীস তুরস্ক পারস্য তাতার মোগল প্রভৃতি বহিরাগত জাতির আক্রমণে এদেশের বহু কীর্ত্তিকলাপ ধ্বংস হওয়ার মত বহু প্রামাণিক মূল গ্রন্থও নষ্ট হয়ে গেছে। শুনেছি আওরঙ্গজেব নাকি হিন্দুর ভাল ভাল গ্রন্থগুলিকে মুসলমান পণ্ডিত দিয়ে উর্দ্দু পারসীতে অনুবাদ করিয়ে ঐ মূল গ্রন্থগুলিকে নষ্ট করে দিয়েছিলেন, যাতে ভবিষ্যৎ বংশধররা বোঝেন,

ঐ সমস্ত অমূল্য গ্রন্থ রচনার গৌরব মুসলমানদের। ঐ সমস্ত আক্রমণকারীর দল শুধু এদেশের রত্ন সম্পদই অপহরণ করেনি, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণবস্ত, জ্ঞানভাণ্ডার গ্রন্থগুলিকেও অপহরণ বা নষ্ট করে দিয়েছিল। তারপর, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম, ইসলাম, খ্রীষ্টান বহু ধর্ম্মের উত্থান-পতনে, নানা ক্রমবিকাশ এবং ক্রম-পরিবর্ত্তনের সংঘাত থেকে ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিকে বাঁচাবার চেষ্টায়, কোথাও বা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠা বজায়ের জন্য, যুগ যুগ ধরে, বহু গ্রন্থকার, সত্যদ্রষ্টা ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রের কোথাও বা অনুরঞ্জন, অতিরঞ্জন, ভেজাল মিশিয়ে এমন ভাবে অদলবদল করেছেন যে 'সাত নকলে আসল খাস্তা' হয়ে বসে আছে। মূল গ্রন্থ দু'চারটি যা-ও-বা আছে, তাতে এত বেশী প্রক্ষিপ্ত অংশ, স্ব স্ব মতবাদ সম্প্রদায় সিদ্ধির জন্য ঢোকানো হয়েছে যে তা বর্দ্ধিত পরিবর্দ্ধিত হ'তে হ'তে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, তার থেকে, মূল মর্ম্মার্থ-নির্ণয় প্রায় অসম্ভব। শ্রুতিস্মৃতি মনুসংহিতা সব শাস্ত্রেরই এই অবস্থা, সকলের মধ্যেই প্রক্ষিপ্তাংশের বাহুল্য অত্যন্ত বেশী।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব আলোচনাতে দেখিয়েছি, এক বাল্মীকি রামায়ণের উপর ভিত্তি করে কত আজগুবি রামায়ণ সৃষ্টি হ'য়েছে; সাধারণ লোক ঐ সব রামায়ণের অলৌকিক কাল্পনিক ঘটনাগুলিকেই বাল্মীকি-বাক্য মনে করে বদ্ধমূল ধারণা পোষণ করে বসে আছেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র শাস্ত্রের প্রক্ষিপ্ত অংশগুলির আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, মহাভারতের লক্ষ শ্লোকের উপর আরও দশ হাজার শ্লোক বেশী আছে। রাজা ভোজ রচিত 'সঞ্জীবনী' নামক গ্রন্থে, এক ব্রাহ্মণ কিভাবে মহাভারতের মধ্যে সহস্র সহস্র শ্লোক রচনা করে ব্যাসদেবের নাম দিয়ে চালিয়ে গেছেন, তাও তো পূর্ব্বেই পড়েছেন।

(গ) তার উপর, কোষকার, ভাষ্যকার, টীকাকারদের বাখ্যা বিভ্রাট; তুলসীদাস, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীদাস, বংশীদাস, অনন্তকন্দলি, রঘুনন্দন কবিচন্দ্র এবং অদ্ভুতাচার্য্য প্রভৃতি কবিগণের বর্ণনা বিভ্রাট, অতিরিক্ত রূপক ও কল্পনার আশ্রয়ই যত কিছু বিভ্রান্তি এবং কুসংস্কারের মূলে।

মূল মহাভারত যদি সংস্কৃত বলে কেউ পড়তে নাও পারেন, দয়া করে শুধু যদি কালীসিংহের অনুবাদ বাংলা মহাভারতখানির অনুক্রমনিকাধ্যায়ে বৈশম্পায়ন যেখানে সুরাসুরদের জন্মমরণ সৃষ্টির বর্ণনা দিয়েছেন, সেইটুকু ভাল করে পড়ে

দেখলে বুঝতে পারবেন, একই **পিতা মহর্ষি কশ্যপ থেকেই দেবদৈত্য মানুষ বানর সুপর্ণ নাগাদির জন্ম হয়েছিল**। মহর্ষি কশ্যপ অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রধা, বিশ্বা, বিনতা, কপিলা, মুনি ও কদ্রু, এই তেরটি দক্ষ কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। এই তের জনের গর্ভে দেব দৈত্য দানব অসুর মানব গন্ধর্ব্ব অপ্সরা নাগ সুপর্ণ প্রভৃতি জন্মেছিলেন। কশ্যপ ঋষির অপর এক ভার্য্যা তাম্রাদেবীর গর্ভে কাকী, শ্যেনী, ভাষী, শুকী প্রভৃতি কন্যা জন্মেছিলেন।

ভাষ্যকার, টীকাকার, পুরাণকার আর কবির দল নাগ বলতেই সাপ, সুপর্ণ বলতে পাখী, বানর বলতে জন্তু, রাক্ষস দৈত্য বলতে অত্যাচারী শয়তান এবং কাকী, শ্যেনী, শুকী বলতে কাক চিল শকুন, শুকপাখী বুঝে বসে আছে !!

(১) শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, তস্মাৎ কাশ্যপ্য ইমাঃ প্রজাঃ [শত. ৭. ৫. ১. ৫] কশ্যপ হতেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীব সকল অর্থাৎ যাবতীয় খেচর ভূচর জলচর ভূত পিশাচ রাক্ষস বানর পশু পক্ষী সর্প কীট পতঙ্গ মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ উদ্ভিদাদি স্থাবর জঙ্গম, সব কিছুই সৃষ্টি হয়েছিল।

(২) মহাভারতের আদিপর্ব্বে আছে—

'মরীচেঃ কশ্যপো জাতঃ কশ্যপাৎ তু ইমাঃ প্রজাঃ'

[সম্ভব পর্বাধ্যায়, ৬৫ অ]

মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপ হ'তেই এই সকল প্রজার সৃষ্টি হয়েছে। এই বলে, তারপরেই কশ্যপের বিভিন্ন পত্নীর গর্ভে কি ভাবে দৈত্য দেবতা গন্ধর্ব্ব কিন্নর অনন্ত, বাসুকী, তক্ষক প্রভৃতি নাগগণ, তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমী গরুড় প্রভৃতি সুপর্ণ (পক্ষী) গণ জন্মেছিলেন, তার ধারাবাহিক বিবরণ আছে।

পুরাণকার, টীকাকার, কোষকারদের ব্যাখ্যা বিভ্রাট

প্রথম শ্লোকের (শতপথে) **কশ্যপ অর্থে পরমাত্মা**। 'কশ্যপঃ কস্মাৎ পশ্যকো ভবতীতি' [নিরুক্ত, অ২, খ, ২] সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের নাম কশ্যপ; কারণ, তিনি পশ্যক অর্থাৎ 'পশ্যতীতি পশ্যঃ পশ্য এব পশ্যকঃ', চরাচরের সব কিছুই তিনি অভ্রান্তভাবে দেখেন। 'আদ্যন্ত বিপর্য্যয়শ্চ'—মহাভাষ্যের এই সূত্রানুযায়ী আদি অক্ষর অন্তে এবং অন্ত্য অক্ষর আদিতে আসায় 'পশ্যক' এর স্থানে 'কশ্যপ' হয়েছে। **কশ্যপ অর্থাৎ পরমাত্মা** যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম প্রাণীর

স্রষ্টা, এই **পরমাত্মাবাচক কশ্যপকে** মহাভারতে বর্ণিত **মরীচির পুত্র মহর্ষি কশ্যপের** সঙ্গে টীকাকার ভাষ্যকার আর অর্বাচীন গ্রন্থকার, পুরাণকাররা confuse **করে ফেলেছেন** তার ফলে মহর্ষি কশ্যপের ঔরষে কদ্রুর গর্ভে অনন্ত বাসুকী তক্ষক প্রভৃতি নাগকে সাপ, বিনতার গর্ভজাত গরুড় সুপর্ণকে পক্ষী, ভেবে নিয়ে সর্বনাশ হয়েছে। পরমাত্মা কশ্যপ সাপ নামক হিংস্র প্রাণী এবং খেচর পক্ষীকুলের স্রষ্টা হলেও **মহর্ষি কশ্যপের পুত্রগণ সাপ, শকুন, চিল, শুক, পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী নয়।**

অমরকোষ বিশ্বকোষ প্রভৃতি কোষগ্রন্থ যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা সুপর্ণের প্রতিশব্দ দিয়েছেন পক্ষী, নাগের প্রতিশব্দ দিয়েছেন সাপ; পরবর্ত্তীকালের অর্বাচীন গ্রন্থকাররা তাই দেখে আর পূর্বাপর গভীরভাবে বিবেচনা না করে পরমাত্মাবাচক কশ্যপ আর মহর্ষি কশ্যপ (পরমাত্মা কশ্যপ মহর্ষি কশ্যপ এবং তস্য পিতা পিতামহেরও স্রষ্টা!)— দুই একই অর্থবোধক ভেবে নিয়ে, স্ব স্ব প্রণীত গ্রন্থে, এমন ভাবে রূপক ও কল্পনার সাহায্যে আজগুবি সরস বর্ণনা দিয়েছেন যে, সাধারণ মানুষ তাই পড়ে, ঐ কাল্পনিক কথাগুলিকেই অভ্রান্ত সত্য বলে মেনে চলে আসছেন। **ঐ সব অর্বাচীন পুরাণকার গ্রন্থলেখকগণ তাই মৎস্য থেকে মৎস্যগন্ধা, দ্রোণ থেকে অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য, শরবন থেকে কার্ত্তিক, শুকপক্ষিনী থেকে জীবন্মুক্ত শুকদেব, উলুকী বা পেচকী থেকে বৈশিষিক দর্শন প্রনেতা কনাদ,** মণ্ডুকী বা **ভেকীর গর্ভে মণ্ডুক উপনিষদ্ রচয়িতা মাণ্ডুক্য মুনি** প্রভৃতির **আজগুবি, মিথ্যা, কাল্পনিক জন্মবৃত্তান্ত ঘটা করে বর্ণনা করে গেছেন!**

সামাধিবান ঋষি প্রণীত শাস্ত্রের ঠিক ঠিক মর্ম্ম ।মাধিবান পুরুষই বুঝতে পারেন। ঐ সব অর্বাচীন গ্রন্থকাররা ঋষি প্রণীত শা ্র কদর্থ করে 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' চাপিয়ে দিয়ে সর্বনাশ করে গিয়েছেন। আমাদের দেশের সর্বজ্ঞ সাধু, পরমহংস, তর্কতীর্থ ন্যায়াচার্য্য স্মৃতিরত্নের দলও, যেহেতু মুনি ঋষির নামে গ্রন্থ রচিত, যেহেতু মুনি ঋষিদের ব্যাপার, এ জন্য সবই সম্ভব, সবই লীলা বলে, ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে তা মেনে আসছেন! কেউ চোখে আঙুল দিয়ে ভ্রান্তি-অপনোদন করে দিতে চাইলেও এমন একদল গোঁড়া একগুঁয়ে পণ্ডিত বা সাধু আছেন, যাঁরা 'ধর্ম্ম গেল! শাস্ত্র গেল! বর্ণাশ্রম

গেল'! বলে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই বুকে হাত চাপড়াতে থাকবেন !!

সর্বত্রগ বিষ্ণুর বাহন গরুড়কে বরং পাখীর মত ডানায় শোভিত করে (!) মহাবীর হনুমানকে লাঙ্গুল শোভিত করে (!), পূজা করে বরং অশ্রুজলের বান ডেকে দেবেন, দিনের পর দিন, মহাবীর ও গরুড়ের প্রতিমূর্ত্তি লাঙ্গুল বা ডানা দুটিতে তেলসিন্দুর, ঘৃত, চন্দন পুষ্পভার সাজিয়ে পূজা করে যাবেন, তবুও একবার বিচার করে দেখবেন না, স্বরূপতঃ তাঁরা কে এবং কি ছিলেন !!! তাঁদের যে বলবীর্য্য তপোবলের পরিচয় পাওয়া যায় তা কি সামান্য পক্ষীরূপ খেচর বা বন্য বানর রূপ জন্তু হ'লে সম্ভব হত? একটিবার ভেবে দেখবে না, **ঋষির ঔরষে, ঋষিকন্যার গর্ভে, মানুষ মানুষীর শুক্রশোনিত সংযোগে** সরীসৃপ, পক্ষী, শলভ সিংহ, ব্যাঘ্র, কাক, শ্যেন, গৃধ্র, হংস চক্রবাক এবং শুকপক্ষীর প্রজনন কি করে সম্ভব হতে পারে?

বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম এবং বৈজ্ঞানিক সত্য এই যে, শুক্রশোনিত সম্বন্ধ যোগে **সমজাতীয় প্রাণী হতে সমজাতীয় প্রাণীরই উদ্ভব হ'তে পারে।** মাছের পেট থেকে রূপসী কন্যা, ভেকীর পেট থেকে মানুষ, শরবণ থেকে মানুষ কিংবা মানুষের পেটে শেয়াল, শকুন, সাপ, গাছ কখনই জন্মাতে পারে না। আমাদের দেশের সাধারণ লোক আদৌ চিন্তা করে দেখেন না, ছাপার অক্ষরে যা দেখেন, তাই বেদবাক্য বলে মনে করেন! আর একদল আছেন, যাঁরা ঐ সব কাক, সাপ, বানর, ভেকীকে "অপ্রাকৃত" বলে বরং সাম্প্রদায়িক বাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তবুও সত্য তত্ত্ব ও তথ্য জানতে বা মানতে চাইবেন না !! সত্য নির্ণয়ের প্রশ্ন এলেই কানে আঙ্গুল চাপা দেবেন, কেননা, জ্ঞানের কথা শুনতে নেই !!!

গরুড়-জটায়ু-সম্পাতি সুপর্ণরা মানুষ ছিলেন, পাখী ন'ন।

একটু চিন্তা করে দেখুন, গরুড় জটায়ু সম্পাতির যে সব কীর্ত্তিকলাপ, পরাক্রম এবং পাণ্ডিত্যের কথা শুনি, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায়, ওঁরা মনুষ্যাকৃতি মানুষই ছিলেন। মহর্ষি কশ্যপের ঔরষে, বিনতার গর্ভে, তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, গরুড়, অরুণ প্রভৃতি সুপর্ণ জন্মেছিলেন। অরুণের ঔরষে শ্যেনীর গর্ভে বীর্য্যবান্ সম্পাতি এবং জটায়ু জন্মেছিলেন। যেহেতু মহাবীর গরুড়ের সঙ্গে কদ্রুনন্দন তক্ষক, অনন্ত বাসুকী আদি নাগদের যুদ্ধ হয়েছিল এবং গরুড় অনেক নাগকে ধ্বংশ করেছিলেন, যেহেতু পৃথিবীতে গরুড় নামক একরকম পাখীকে সর্পভক্ষণ

করতে দেখা যায়, অর্বাচীন টীকাকার ও গ্রন্থকারেরা কশ্যপের পুত্র গরুড় এবং নাগগণকে খেচর গরুড় পাখী এবং সরীসৃপ সাপের সমগোত্র করে বর্ণনা দিয়ে সর্ব্বজ্ঞতার (সর্ব্ব-অজ্ঞতার) পরিচয় দিয়েছেন !!!

জটায়ু সম্পাতি গরুড়ের পাখা সংযোগ করে তাঁদের সম্বন্ধে আজগুবি ভ্রান্তমত প্রচার করা হয়েছে। অথচ একটু বিচার করলেই বুঝতে পারবেন, **গরুড় জটায়ু সম্পাতিরা খেচর পাখী ছিলেন না**। গরুড়ের যে মাতৃভক্তি, তপোবন এবং বিশ্ববিজয়ী ক্ষমতার পরিচয় পাই, তা কি খেচরে সম্ভব? জটায়ুর সঙ্গে দশরথের মিত্রতা ছিল, ইনি সীতাকে রাবণের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য যুদ্ধ করে মুমূর্ষু হয়েছিলেন। রাম লক্ষণ যখন সীতার অনুসন্ধান কংতে করতে জটায়ুর রক্তাক্ত দেহ দেখলেন, জটায়ু তাঁদেরকে রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণের বৃত্তান্ত জানালেন—

> যেন জাতো মুহূর্ত্তেন সীতামাদায় রাবণঃ,
> বিপ্রনষ্টং ধনং ক্ষিপ্রং তৎ স্বামী প্রতিপদ্যতে ॥
> বিন্দো নাম মুহূর্ত্তোঽয়ং স চ কাকুৎস্থ ! নাবুধৎ ॥ [বাল্মীকি, অরণ্যকাণ্ড]

'রাবণ যে মুহূর্ত্তে সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছে, ঐ মুহূর্ত্তটির নাম বিন্দো, এই লগ্নে কোন বস্তু অপহৃত হলে, স্বত্বাধিকারী তা শিঘ্রই ফিরে পায়। রাবণ তা জানে না; কাজেই রামচন্দ্র, তুমি সীতাকে শিঘ্রই ফিরে পাবে এবং রাবণ সবংশে ধ্বংশ প্রাপ্ত হ'বে'। এই বলে জটায়ু দেহরক্ষা করলেন। **জ্যোতি-বিজ্ঞানে ঐরূপ পারদর্শিতা কি সামান্য খেচরে সম্ভব? দশরথ কি** একটা খেচর পাখীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন ?

বেদমন্ত্রে, স্বস্তি বচনে, ইন্দ্রাদি দেবগণের সঙ্গে বিনতা নন্দন তার্ক্ষ্য এবং অরিষ্টনেমিরও স্তুতি আছে। আমাদের দেশের তর্কচঞ্চু, বেদান্তবাগিশের দল নিশ্চয়ই নিত্য কর্ম্মকালে এই স্বস্তিবাচন মন্ত্র নিত্য পাঠ করেন—

> স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ
> স্বস্তি ন স্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। (ঋগ্বেদ,১,৮৯,৬)

অর্থাৎ ইন্দ্র বৃদ্ধশ্রবা পূষা বিশ্ববেদা তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমি ও বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল করুণ। **তার্ক্ষ্য এবং অরিষ্টনেমি পাখী হলে কি বেদমন্ত্রে তাঁদের বন্দনা থাকতো?**

মূঢ় টীকাকার আর তথাকথিত গ্রন্থকাররা ঐ সব না বুঝতে পেরে, কল্পনার সাহায্যে, গরুড়, জটায়ু তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমি প্রভৃতি মানুষের সমগোত্র ঋষি সন্তানগণকে পাখী বলে বর্ণনা দিয়েছে! তারফলে, মহাভারতে বিনতার গর্ভে যে ডিম্বোৎপত্তির বর্ণনা নেই, ঐ সব মূঢ়রা তাদের স্বরচিত গ্রন্থে অর্ধপক্ক ডিম্বোদ্ভুত সূর্য্য সারথি অরুণের জন্মবৃত্তান্তের সরস বর্ণনা দিয়ে বসে আছে!! যাত্রাথিয়েটারেও ঐ ডিম্বকাহিনী দেখানো হয়!!!

তক্ষক বাসুকী প্রভৃতি নাগেরাও মানুষ ছিলেন

এইবার কদ্রুনন্দন **অনন্ত বাসুকী শেষ নাগ তক্ষক** প্রভৃতি যে **সাপ ছিলেন না, মানুষ ছিলেন**, জ্ঞানে বিজ্ঞানে ঐশ্বর্য্যে এবং তপস্যায় উন্নত ছিলেন, তা একে একে প্রমাণ করে দেখাচ্ছি।

"তক্ষক—কর্কোট – প্রভৃতি দেবযোনি মর্নুষ্যাকারঃ"—ইতি ভারত

কৈ এখানে ওঁদেরকে সরীসৃপ জাতীয় সর্পাকার বলছেন কি? মৃগব্যাধ, **সর্প**, নিঋতি, অজৈকপাৎ, অহিবুধ্ন, পিনাকী, ঈশ্বর, দহন, কপালী, স্থানু এবং ভগবা—এই হ'ল একাদশ রুদ্রের নাম। এখানে **সর্প নামক রুদ্র** কি সাপ? Venomous Snake?

মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে,

'শকা যবন কম্বোজাঃ পারদা পহ্লবাস্তথা
কোলি সর্পা মাহিষকা দার্ব্বাশ্চোলাঃ স—কেরলা।

'মহারাজ সগর, শক, যবন, কম্বোজ, পারদ, পহ্লব, কোল, **সর্প, মহিষ**, দার্ব, চোল, কেরল প্রভৃতি জাতিকে ধর্ম্মচ্যুত এবং বেশভূষা বিহীন করলেন'। শক, যবন, কোল, কেরল জাতির মত সর্প এবং মহিষও এক একটা জাতি—সবাই মানুষ। মূর্খগণ তা না বুঝে সর্প অর্থে সাপ আর মহিষ অর্থে চতুষ্পদ জন্তু বুঝে বসে আছে!

মহাভারতে দেখা যায়, শেষ নাগ কদ্রুর প্ররোচনা মত বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণকে হিংসা করতে চাইলেন না। তিনি, "জননী কদ্রুকে ত্যাগ করে বায়ুভক্ষ, ব্রতপরায়ণ, একাগ্রচিত্ত, জটাবল্কলধারী এবং জিতেন্দ্রিয় হ'য়ে গন্ধমাদনে বদরিকাশ্রমে, গোকর্ণ, পুষ্কর এবং হিমবান প্রভৃতি পুণ্য তীর্থে গমন করে অতি কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন—

তেষাং তু ভগবান শেষঃ কদ্রুংত্যক্তা মহাযশঃ।
উগ্রং তপঃ সমাতস্তে বায়ুভক্ষো যতোব্রতঃ।। ২
গন্ধমাদনমাসাদ্য বদর্য্যাঞ্চ তপোরতঃ।
গোকর্ণে পুষ্করারণ্যে তথা হিমবতস্তটে।। ৩
তপ্যমানং তপোঘোরং তং দদর্শ পিতামহঃ।
সংশুষ্ক মাংসত্বক স্নায়ুংজটাচীর ধরং মুনিম্।।" ৬

[মহাভারত, আদিপর্ব, ৩৬ অধ্যায়]

ব্রহ্মা তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হ'য়ে বর দিতে চাইলে তিনি বলেন, "হে পিতামহ! যেন **ধর্ম্মে, শমগুনে এবং তপস্যায়** আমার অচলা ভক্তি থাকে" [ঐ]।

ঐ **জটাবল্কলধারী তপস্বী শেষনাগকে**, 'নাগ' কথাটা আছে বলেই সরীসৃপ জাতীয় সাপ বলে মনে হয় কি?

মহাভারতের আদিপর্বে ৩৮ অধ্যায়ে দেখি ভীম, দুর্য্যোধনাদির দ্বারা বিষপ্রয়োগে, অচৈতন্য অবস্থায় জলে ভাসতে ভাসতে নাগদের দেশে এসে পৌঁছলেন। নাগরাজ বাসুকী আর্য্যক সহ তথায় এসে মহাবাহু ভীমসেনকে স্বদৌহিত্র কুন্তীভোজের দৌহিত্র জেনে আলিঙ্গন করলেন এবং উত্তম বেশভূষা উত্তম ভোজ্য দিয়ে আপ্যায়ণ করে মহামূল্য পালঙ্কে শয়ন করবার ব্যবস্থা করে দিলেন—

তদা দৌহিত্র-দৌহিত্রঃ পরিষক্তঃ সুপাড়িতম্।
সুপ্রীতশ্চাভবৎ তস্য বাসুকীঃ স মহাযশাঃ।।

[ঐ আদিপর্ব, ১২৮, ৬৫]

ততস্তু শয়ণে দিব্যে নাগদত্তে মহাভুজঃ
অশেত ভীমসেনস্তু যথাসুখমরিন্দমম্। [ঐ, আদিপর্ব, (সম্ভবপর্ব), ৭২]

নাগেরা ত যে মানুষ ছিলেন—তার প্রমাণ

নাগরাজের দৌহিত্রের দৌহিত্র যদি ভীম হন, ভীম মানুষ হলে, নাগরাজ কি সরীসৃপ জাতীয় সাপ হয়ে যাবেন?

নাগরাজ বাসুকীর ভগিনীকে জরৎকারু মুনির সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। বিখ্যাত আস্তিক মুনি তাঁরই গর্ভজাত। অর্জ্জুনও নাগরাজ কৌরব্য কন্যা উলুপীকে বিবাহ করেছিলেন, তাঁদের ইলাবন্ত নামে পুত্র হয়েছিল। নাগরা যদি মানুষই না হবেন, তাহলে কি জরৎকারু মুনি এবং অর্জ্জুন সাপিনীকে বিবাহ করেছিলেন? সরীসৃপের সঙ্গে তাঁদের যৌনসম্পর্ক হয়েছিল?

ভাগবতকার কৃষ্ণের কালীয় দমনের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে কালীয় নাগকে সরীসৃপ জাতীয় একটা বিষধর সাপ বলে বর্ণনা করেছেন। সে জলে বাস করে, কৃষ্ণ ঝাঁপ দিয়ে সেই জলে পড়লেন, কালীয় তাঁকে দংশন করবার জন্য 'সৃক্কনীদ্বয় লেহন করতে করতে' আক্রমণ করলো, কিন্তু কৃষ্ণ তার মস্তকস্থ ফণা সকলের উপর আরোহণ করে তাকে দমন করলেন; কালীয় দমনের যে চিত্র ভাগবতে আছে কিংবা বাজারে যে ছবি বিক্রয় হয়, তাতেও সাপের মাথায় কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন, এই রকম দৃশ্য দেখা যায়! মূঢ় গ্রন্থকারের বিকৃত বর্ণনা দোষে জনসাধারণের মধ্যে কি রকম ভ্রান্ত ধারণা চলে আসছে, তা ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়।

সংস্কৃত হরিবংশে কিন্তু এই কালীয়দমন অধ্যায় এমনভাবে বর্ণিত আছে, তা পড়লে যে কোন লোক বুঝতে পারবেন, ঐ কালীয় নাগ ভাগবতকারের বর্ণনানুযায়ী বা জনশ্রুতি অনুযায়ী সরীসৃপ জাতীয় সাপ ছিলেন না। হরিবংশের বর্ণনা এইরূপ —"শ্রীকৃষ্ণ কালীয় নাগকে বাহুযুদ্ধে পরাজিত করে তাঁর কণ্ঠ চেপে ধরলেন;

নাগপত্নীগণের কর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল, মস্তকে দীর্ঘ বেণী

কালীয় ঝলকে ঝলকে রক্ত বমন করতে থাকলেন; তখন কালীয় নাগের পত্নীগণ **কর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল মস্তকে দীর্ঘ বেণী নানাবিধ অলঙ্কার ও সূক্ষ্ম বস্ত্র** পরিধান করে **হস্তে ধনরত্ন ও নানাবিধ উপহার নিয়ে** কৃষ্ণের স্তব করে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাইলেন। তিনি তখন দয়া করে কালীয় নাগকে প্রাণে বধ না করে, বৃন্দাবন ত্যাগ করে রমনকদ্বীপে সপরিবারে বাস করার আদেশ দিলেন।"

যে নাগ বাহুযুদ্ধ করে, যে নাগ-পত্নীগণের কুণ্ডল পরার কান, বেণী পরার মাথা থাকে, তারা কি সরীসৃপ জাতীয়?

ভারতের ইতিহাসে নাগবংশের বর্ণনা পাওয়া যায়। পান জিনিষটা এই নাগেদের কাছেই পাওয়া, এই জন্য পানের অপর নাম 'নাগবল্লী'। প্রাচীন ইতিহাস রাজতরঙ্গিনীতে উল্লেখ আছে, কাশ্মীরের রাজা দুর্লভ বর্দ্ধন কর্কোটক নাগের ঔরসে জাত পরমারূপসী কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। অথচ আমাদের দেশে বেহুলা-লখিন্দরের উপাখ্যানের মাধ্যমে প্রচার হয়ে আসছে বিষহরি মনসা সাপিনী দেবী! তাঁর পূজা না করলেই তাঁর অনুচর সাপেরা

এসে দংশন করবে !! তাই আমাদের দেশে মনসা গাছে দুধ ঢেলে মনসা পূজার ঘটা দেখি, সাপের পূজাও হয় !!!

রূপক, কল্পনা আর অজ্ঞতার দোষে যে ভাবে ভ্রান্তমত পথ চলে আসছে, তা দেখে একটি পাঠশালার গল্প মনে পড়ে। ঐ পাঠশালার পণ্ডিত মশাই বসে বসে ঘুমে ঢুলতেন ; কোন ছাত্র তাঁর মাথার পাকাচুল বাছতো, কেউবা পা হাত টিপে দিত। কোন ছাত্র হয়ত সাহিত্যের পাঠ জিজ্ঞেস করলো, তিনি ঢুলতে ঢুলতেই বললেন, বেশ সুন্দর হয়েছে, অঙ্কটা ঠিক কষেছিস্, এবার সবাই ধারাপাত পড়। সবাই তখন সুর করে দুলে দুলে, কড়া ডাকতে সুরু করলো, 'এক কড়া, দুই কড়া, তিন কড়া, চার কড়ায় এক গণ্ডা'। একটি ছাত্র রামাকে প্রায়ই দেখা যেত, সেও ঐ সুযোগে, পণ্ডিত মশাই এর সুযোগ্য ছাত্র হিসেবে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সময়ের সদ্ব্যবহার করতো! ঘুমে ঢুলতে ঢুলতেই সে সকলের কোরাস্ সুরে বেশ টেনে কড়া ডেকে যেত। অন্যান্য ছেলেরা যখন বলছে, 'চল্লিশ কড়ায় দশ গণ্ডা', রামা তখন তন্দ্রাভরে দুলতে দুলতে বলে চলেছে 'তিন কড়া, চা-র ক-ড়ায় এক গ-ণ্ডা'। ঘুমটা যখন আর একটু গাঢ় হ'ত তখন অন্যান্য ছেলেরা যখন সুর করে টেনে বলছে 'চৌষট্টি কড়ায়—ষো-ল গ-ণ্ডা', সে তখন বলে বসতো, 'এক কড়া…তিন—কড়া— …অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁণ্ডা' !!

অন্যান্য ছাত্ররা খিল্ খিল্ করে হেঁসে উঠে বলতো, "পণ্ডিত মশাই", রামা গণ্ডাকে অ্যাঁণ্ডা বলছে, তখন ঘুমুতে ঘুমুতেই পণ্ডিত মশাই বলতেন, "রহিম, কটা অ্যাঁণ্ডা (ডিম) এনেছিস্ রে আজ ? আচ্ছা বেশ হয়েছে, কাঠা হয়ে গেল, এবার নামতা পড়" !!!

ঐ ফাঁকিবাজ মূর্খ পণ্ডিত মশাইটি যেমন ঘুমুতে ঘুমুতে জ্ঞান দান করতেন, রামকে রহিম, গণ্ডাকে অ্যাঁণ্ডা শুনেই ডিমের লোভে লোভাতুর হতেন, কড়াকে কাঠা শুনে, নামতা পড়ার হুকুম দিতেন, আমাদের পুরাণকার এবং so-called গ্রন্থকারদের দশাও ঠিক ঐ পণ্ডিতের মত! আর সাধারণ লোক ঠিক ঐ ঘুমকাতুরে রামার মত গণ্ডাকে অ্যাঁণ্ডা বলে চলেছে!

যে কেউ একটু গভীর ভাবে মূলগ্রন্থগুলি পর্য্যালোচনা করে দেখলে বুঝতে পারবেন. সুপর্ণ, নাগ, বানর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ রক্ষ কিন্নররা কে ছিলেন, কোন জাতীয়

জীব ছিলেন, আর নানারকম পুরাণ উপপুরাণ, তাঁদের সম্বন্ধে কি রকম সব ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করেছে!

কারও নাম যদি **চম্পা** থাকে, সে কি **চাঁপা** ফুল? **সমীরণ** বাবু বা **পবন** বাবু কি **বাতাস,** Vapour মাত্র? **গঙ্গানামে স্ত্রীলোকটি** কি **গঙ্গা-নদীর মত জলস্রোত মাত্র? পঙ্কজ বাবু** কি **পদ্ম ফুলটি? রামকান্ত নাগ** কি একটা **বিষধর সাপ বিশেষ? কালীপ্রসন্ন** সিংহ বলতে কি একটা **সিংহ** (Lion) মাত্র? **জলধর বাঘ বলতে কি ব্যাঘ্র** (Tiger)?

বানর সুপর্ণ কেউই মনুষ্যেতর প্রাণী ন'ন

চম্পা বা গোলাপ নামের মেয়ে দুটিকে ফুল ভাবলে, **পটল** বাবুকে তরকারীর উপকরণ ভাবলে, সমীরণ বাবুকে বাতাস ভাবলে, নাগ, সিংহ বাঘ উপাধি ধারীগণকে **মনুষ্যেতর প্রাণী ভাবলে** যে **বিভ্রাট ঘটে** বা **পাগলামি হয়,** পুরাণ উপপুরাণকার এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে বই লিখে গেছে, যে সব অর্বাচীনরা, তারাও তেমনি জ্ঞানে, গুণে, তপস্যায়, সভ্যতা এবং সংস্কৃতিতে মহীয়ান্ বালী সুগ্রীব হনুমানাদিকে বন্য বানর ভেবে, গরুড়কে সামান্য পক্ষী আকৃতি প্রাণী ভেবে, তক্ষক বাসুকী কালীয় অনন্ত প্রভৃতি নাগগণকে সাপ ভেবে **ঠিক সেই রকম অনর্থ এবং পাগলামি করে গেছে।**

" সঞ্জীবনী " নামক ইতিহাস হতে জানা যায়, বেদব্যাসের নাম দিয়ে এক ব্রাহ্মণ মার্কণ্ডেয় ও শিবপুরাণ রচনা করায় রাজা ভোজ মুনি ঋষির নাম দিয়ে গ্রন্থ রচনা করে সরলপ্রাণ জনসাধারণের মধ্যে ভ্রান্ত বিশ্বাস উৎপাদন করার দোষে, দণ্ডস্বরূপ ঐ ব্রাহ্মণের হস্তচ্ছেদন করে দেন এবং আদেশ প্রচার করেন, ' অতঃপর প্রাচীন মুনি ঋষিদের নাম দিয়ে কেউ গ্রন্থ রচনা করতে পারবে না '। রাজাভোজের ন্যায় পূর্বের শাসনকর্ত্তাগণও যদি ঐ ভাবে মিথ্যা গ্রন্থরচয়িতাদের কঠোর দণ্ড বিধান করতেন, বর্ত্তমানেও গভর্ণমেণ্ট যদি আইন করে ঐ রকম অলীক ধর্ম্মগ্রন্থগুলির পঠনপাঠন নিষিদ্ধ করে, শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করেন, তাহলে কুসংস্কার আর ভ্রান্তবিশ্বাসের ভাব-পঙ্কে নিমজ্জিত জনসাধারণ, প্রতারক ধর্ম্মপ্রচারক এবং ধর্ম্মব্যবসায়ীদের কবল থেকে রক্ষা পেতে পারেন।

পঞ্চম পুষ্প

ডাঃ বঙ্কিম চৌধুরী :—আপনি যদি কাউকে 'পূর্ণব্রহ্ম, সাক্ষাৎ ঈশ্বর', বলে না মানেন, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, হজরত, চৈতন্য, কবীর, নানক, রামকৃষ্ণ যিনি যত বড়ই হোন, তিনি ব্রহ্মবিদ, পরব্রহ্মবিদ, সন্ত, সন্তসদ্‌গুরু, ভক্ত, মহাত্মা যাই হোন না কেন, তাঁদেরকে যদি অবতার বলে না মানেন, উপলব্ধির তারতম্য থাকলেও—একই পরমাত্মার ভক্ত, (আপনার ভাষায় 'সবাই সেই পরমদয়ালের, দাতা দয়ালের সন্তান') বলে যদি মনে করেন, তাহলে কি আপনি অবতারবাদ মানেন না ?

উত্তর :—অবতার বলতে আপনার কি ধারণা, দয়া করে আমায় বুঝিয়ে দিন ।

ডাঃ চৌধুরী :—অবতার বলতে আমরা বুঝি তাঁর অবতরণ। ভগবান জন্মগ্রহণ করেন, এই মর পৃথিবীতে, মরণশীল মানুষ যাতে তাঁকে দেখতে পায়, জানতে পারে, মানুষীদেহ ধারণ করে তিনি আসেন লীলারসাস্বাদনের জন্য, সীমাবদ্ধ জীব যাতে সেই অসীমতত্ত্বকে জানতে পারে। গীতাতে-ত এই জন্যই আছে—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।

সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু রাবনাদি দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য তিনি এসেছিলেন ।

উত্তর :—হ্যাঁ, গীতার ঐ দুইটি শ্লোক শ্রীকৃষ্ণ বলে গেছলেন ভাগ্যিস্, তাই তো আমাদের দেশে অবতারের ভীড় পড়েগেছে ! রাজর্ষি ব্রহ্মজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ আত্মভূমিতে দাঁড়িয়ে ঐ দুইটি শ্লোক বলেছিলেন, যেমন সমাজ জীবনে তেমনি ধর্ম্মরাজ্যেও যখন

নানা বিশৃঙ্খলা এবং অনাচার দেখা দেয়, তখন সমাজে যেমন সংস্কারক বিপ্লবী দেখা দেয়, তেমনি ধর্ম্মরাজ্যেও অনেক মহাত্মার ভিতর দিয়ে ভগবানের বিভূতি প্রকাশ হয়—তাঁরা সত্য দৃষ্টি, সম্যগ্ জ্ঞান, সত্য বিচার এবং আলোক বাণী শুনিয়ে জনসাধারণের চেতনার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক কল্যাণস্থ পরিবর্ত্তন এনে দেন। **তাই বলে তাঁরা যে ' পূর্ণ ভগবান ',—তা ন'ন।**

অবতারবাদ বেদবিরুদ্ধ

সাক্ষাৎ পরমাত্মা সেই সর্ব্বব্যাপক মহাচৈতন্য কোন দিন জন্মগ্রহণ করেন না। **যিনি অসীম, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা, তাঁর পক্ষে একটি ক্ষুদ্র গর্ভাশয়ে আসা অসম্ভব।**

(১) অজ একপাৎ [যজু ৩৪, ৫৩]

(২) স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রন—
—মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু—
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ।।

(ঈশ, ও যজুঃ ৪০, ৮)

"ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী, শোকরহিত, **স্থূলদেহরহিত**, পূর্ণ, পবিত্র, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাশ্রয়; তিনি বহুবৎসর ব্যাপিয়া সত্য বিষয় সমূহের প্রকাশ করেছেন।"—ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বর জন্মগ্রহণ করেন না। ' মরণশীল মানুষ যাতে তাঁকে দেখতে পায় ' এজন্য তাঁব একটি নরদেহ ধারণের কোন প্রয়োজন নেই। একটি বিশেষ সম্প্রদায় একমাত্র যুক্তি উপস্থাপিত করেন, " অচিন্ত্য শক্তিত্বাৎ " — অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে তিনি যদি সবই পারেন, তাহলে মানুষ দেহ নিতে পারবেন না কেন? ঠিক ঐ যুক্তিতেই আপনারা বুঝতে পারেন, তিনি ' অচিন্তশক্তিপ্রভাবে ', মানুষ দেহ গ্রহণ না করেও কেন না, মরণশীল মানুষকে—ভক্তকে দর্শন দিতে পারবেন?

মুমুক্ষুভক্তজন সমাধিধৌত হৃদয়ে, তাঁকে দর্শন করেন। উপনিষদ বলছে –

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেন নিত্যম্,
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রঃ, পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ।

সত্য, ব্রহ্মচর্য্য এবং তপস্যা প্রভাবে নির্ম্মলহৃদয় যতিগণ অন্তঃশরীরে সেই জ্যোতিঃস্বরূপ পুণ্যময় পরমাত্মাকে দর্শন করেন। ফুলের মধ্যে যেমন সুগন্ধি, কাঠের মধ্যে যেমন আগুন, দুগ্ধে যেমন ঘৃত থাকে, তেমনি সকলের মধ্যেই সেই সর্বব্যাপক পরমাত্মা বিরাজিত। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণে যেমন অগ্নির প্রকাশ হয়, দুগ্ধকে মন্থন করে জাল দিলে যেমন ঘৃত পাওয়া যায়, তেমনি ধ্যানদণ্ড-মন্থনের দ্বারা যম নিয়ম ধ্যান ধারণা সমাধি গুরুকৃপা ভূমিতে যোগী বা ভক্তের হৃদয়ে তিনি প্রকট হ'ন, প্রেমিক ভক্তকে দর্শন দেওয়ার জন্য তাঁকে মানুষ দেহ গ্রহণ করতে হয় না। শৈবালাচ্ছন্ন পুষ্করিণীতে বা ধূলি মলিন আয়নাতে যেমন চন্দ্র বা সূর্যের প্রকাশ দেখা যায় না (দেখা না গেলেও যে তাতে চন্দ্র ও সূর্যের কিরণ বা প্রতিবিম্ব পড়ে না তা নয়, পড়ে, কেবল আবরণের জন্য দেখা যায় না), কিন্তু ঐ শেওলা বা ধূলির আবরণ দূর হলেই যেমন চন্দ্র এবং সূর্য্যের পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায়, তেমনি ঈশ্বর সকলের হৃদয় আলো করে থাকলেও কোটি কোটি জন্মের কর্ম্মের আবরণ, বাসনার জাল, মানুষের চিত্তরূপ হ্রদ বা দর্পণ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সাধন প্রভাবে ঐ আবরণ দূর হলেই মুমুক্ষু প্রেমিকভক্ত সেই হৃদয়স্থ পরমাত্মাকে, অমৃত-স্বরূপকে পেয়ে জেনে কৃতকৃত্য হ'তে পারেন এবং হয়েও থাকেন। তার জন্য শ্রীভগবানের অবতারবাদ স্বীকার করে, তাঁর পরিণামশীল দেহ গ্রহণ আর জঠর যন্ত্রণা ভোগ করার কথা না স্বীকার করলে ভক্তদের কিছু ভক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হবে না।

অনন্তজলরাশির কোন কোন অংশ যেমন শৈত্যের সংস্পর্শে জমে বরফ হয়, তেমনি ভক্তি-হিমের সংস্পর্শে, ভক্ত-হৃদয়ে সেই স্বতঃপ্রকাশ, অনন্ত পরমাত্মা ভক্তমনলোভা বাঞ্ছিতরূপ গ্রহণ করে প্রকট হ'ন, ভক্তহৃদয়ে তাঁর Manifestation হয়। ভক্ত যখন তাঁকে দর্শন করেন, তখন তিনি স্থূল দেহধারী হলেও, ইন্দ্রিয়-পরিচ্ছিন্ন দেহের মধ্যে তাঁর মন বা চিত্ত থাকে না, **ভূমার ভূমিতে** উধাও হয়ে যায়; পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মনচিত্তাদি অন্তরেন্দ্রিয়—**কোন ইন্দ্রিয় দিয়েই সেই ইন্দ্রিয়াতীতকে জানা যায় না। জীবাত্মা, ইন্দ্রিয়ের সীমাগণ্ডী অতিক্রম করে,** পঞ্চকোষের আরবণ ভেদ করে—তার **চিন্ময় সত্তা দিয়েই,** সেই পরমাত্মবস্তুকে অনুভব করে। কাজেই ভক্তকে দর্শন দেওয়ার জন্য সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মারও স্থূলদেহ ধারণের, 'মানুষীতনু আশ্রয়ের' কোনও প্রয়োজন নেই।

আকাশ ব্যাপক বলে তা যেমন কোথাও যায় না, আসেও না, সর্ব্বত্র সমভাগে বিদ্যমান, তেমনি সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মাও কোথাও যান-ও না, আসেনও না। "তিনি সর্ব্বব্যাপক বলে তাঁর গমনাগমন সিদ্ধ হতে পারে না ; যে স্থানে যা নেই, সেই স্থানেই তাঁর গমনাগমন হ'তে পারে, যিনি নিত্যপূর্ণ, সর্ব্বব্যাপী, তিনি কি গর্ভাশয়ে ব্যাপক ছিলেন না যে অন্য স্থান থেকে আসলেন ? (মহর্ষি দয়ানন্দ) "তিনি পরিচ্ছিন্ন দেহ গ্রহণ করে জন্মগ্রহণ করেন বললে তাঁর ব্যাপকত্ব এবং অসীমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়, যিনি দেহ ধারন করে আসেন, তিনি কখনই সেই সর্ব্ব-ব্যাপক পরমাত্মা হ'তে পারেন না।" [সোঽহংস্বামী]

যাঁদেরকে আপনারা অবতার বলে পূজা করেন বা ভক্তিতে গদগদ হ'ন, তাঁদের মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ প্রভৃতি একেবারে কাল্পনিক, বাস্তবে তাঁদের কোন দিনই অস্তিত্ব ছিলনা, আর রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রভৃতি ঈশ্বরদর্শী মহাপুরুষ হ'তে পারেন, সাক্ষাৎ পরমাত্মা কেউ কখনই ছিলেন না। **যে যার সম্প্রদায়—প্রতিষ্ঠার জন্য, বিশ্বাস বা মোহগ্রস্ত মনে বহু অবতার কল্পনা করে, কল্পনার আতিশয্যে যিনি অজ, তাঁকে জন্মগ্রহণ করিয়ে, যিনি নিত্য পূর্ণ তাঁকে খণ্ড করে, যিনি ব্যাপক তাঁকে পরিচ্ছিন্ন করে, মনোমত কল্পনার বিচিত্র রং এ চিত্রিত করে বসে আছে!** অবিবেকী যারা—সেই সব কল্পনাপ্রিয় ভক্তদল যদৃচ্ছা কল্পনা করতে পারেন, তাঁরা তাঁদের ভগবানকে শিখিপুচ্ছধারী, গোচারণ রত, স্ত্রী বিহনে কেঁদে আকুল, শোকাচ্ছন্ন, পরকীয়া প্রেমরত, নানারকম উৎকট বিকট কার্য্যকারী, এমন কি সাপ শকুন ব্যাঙ ভালুক কচ্ছপ শূকর বরাহ বা নরপশু রূপে কল্পনা করে ফেলতে পারেন, তাঁদেরকে পূর্ণ ভগবান জ্ঞানে প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়ে, পুষ্প-চন্দন নৈবেদ্য-ডালি দিয়ে ধূলি ধূসরিত হয়ে গোড়ালুটি দিতে পারেন—কিন্তু বিবেকী জনের কাছে তা অগ্রাহ্য। কেননা, সর্ব্বজনমান্য বেদ-উপনিষদের সিদ্ধান্ত হ'ল—

'তিনি অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ',—'অমূর্ত্তঃ'।

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনঃ শুভ্রোহ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥

[মুণ্ডকোপনিষদ ২, ১, ২]

দিব্য, শুদ্ধ, অমূর্ত্ত, সকলের মধ্যে পূর্ণ, অন্তরে বাহিরে নিরন্তর ব্যাপক,

অজ জন্ম-মরণ-শরীর ধারণাদি রহিত, শ্বাস-প্রশ্বাস-শরীর-মন-সম্বন্ধ রহিত প্রকাশ স্বরূপ—ইত্যাদি পরমেশ্বরের বিশেষণ; তিনি 'অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ'।

পরমাত্মার এই ধরাধামে অবতীর্ণ হওয়ার দ্বিতীয় কারণরূপে আপনি বলছেন "লীলারসাস্বাদনের জন্য"! কৈ কৃষ্ণ তো অর্জ্জুনকে কোথাও বলছেন না যে, "আমি গোচারণের জন্য, পরের বাড়ীর ক্ষীর সর ছানা ননী চুরি করে খাওয়ার জন্য, পরনারীর বস্ত্র হরণ করে তাদের ঈষৎ অক্ষত যোনি (ভাগবত মতে !) দর্শন করে কৃতার্থ হওয়ার জন্য, কিংবা গভীর নিশীথে কামবর্দ্ধন বাঁশী বাজিয়ে, পরস্ত্রীকে জঙ্গলে এনে তাদের সঙ্গে শৃঙ্গারলীলা করবার জন্য—ইত্যাদি নানারকমের নানা ছলবলকৌশলরূপলীলা রসাস্বাদনের জন্য কিংবা পরবর্ত্তীকালে আমাগত-প্রাণ-ভক্তগণ যাতে সখীবেশ ধারণ করে, কিশোরীভজন নায়িকাভজনাদি পরকীয়া প্রেমের মধুর রস আস্বাদন করতে পারে, এই জন্য—কেবল তাদেরই মুখ চেয়ে, যে কোন লীলা খেলা যাতে তারা আমার সৎদৃষ্টান্ত (!) অনুযায়ী সমর্থন করতে পারে, এ জন্য আসি। আমি অবতীর্ণ হই" !! বর্ত্তমানে নানা লীলারসাস্বাদনকারী ভক্তরাজগণকে চুপিসারে তাঁদের কৃষ্ণচন্দ্র যা বলে গেছেন, তা সেই নরঋষির অবতার প্রাণপ্রিয় সখা অর্জ্জুনের কাছে বলেন নি কেন? তাঁর অবতীর্ণ হওয়ার কারণ স্বরূপ "লীলারসাস্বাদনের" ঐ সব বিচিত্র ঘটনার বর্ণনা করতে তিনি কিঞ্চিৎ লজ্জা অনুভব করেছিলেন বুঝি?

যখন কোন ভক্ত তাঁকে দর্শন করেন, তখন সেই প্রেমিক ভক্তের যৎযৎ বস্তুতে দৃষ্টি পড়ে, সকলের মধ্যেই দেখেন, তাঁরই চিন্ময় সত্ত্বার প্রকাশ বিকাশ,—"সদ্‌গুরু নুর তামাম্" (কবীর); সর্ব্বভূতে তখন তিনি তাঁকেই দেখেন, প্রতিঘটনার পশ্চাতে দেখেন তাঁরই মহান্ ঐশী লীলা, সর্ব্বত্রই এক দিব্য সুষমা, দিব্য শৃঙ্খলা, সবই ছন্দোময়, সবই সত্য শিবসুন্দর; প্রতি কর্ম্মই তখন তাঁর পূজা হয়ে ফুটে ওঠে, প্রতি ধূলিকণা অণুপরমাণু পর্য্যন্ত তাঁর কাছে আনন্দের অভিব্যক্তি, আনন্দময়, আনন্দ-পরিপ্লুত বলে মনে হয়—ফলে, প্রত্যেক বস্তুতে, প্রত্যেক কর্ম্মেই তাঁর হয় সেই সচ্চিদানন্দ ভাগবত-সত্ত্বার রসাস্বাদন, ভক্ত-ভগবানে এ লীলা নিত্যই চলেছে। অণুর মধ্যে সেই মহতোমহীয়ানের দিব্য প্রকাশ লীলা বা বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর খেলার—অনুভূতি দেওয়ার জন্য পরমাত্মাকে স্থূল মানবদেহ ধারণ বা মৎস্য কূর্ম্ম বরাহরূপ গ্রহণের কোনও প্রয়োজনই হয় না। 'তিনি যেহেতু

অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন—এজন্য তিনি মানুষ হয়ে জন্মান'—এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করে, বেদ-উপনিষদ বিরুদ্ধ, অনুভব-বিরুদ্ধ ধারণার ঘূর্ণিপাকে ঘূর্ণমান—বিভ্রান্ত হওয়ার চেয়ে—তিনি যেহেতু অচিন্তশক্তিসম্পন্ন—সেইজন্য তিনি জন্মগ্রহণ না করেও, সব ভক্তকে, সব সময়, সমকালে, সমভাবে ধন্য করতে পারেন। পূর্ণকাম করতে পারেন. এই ধারণা করতে কি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ক্লেদাক্তহৃদয়ে ব্যথা লাগে? তাঁর অচিন্ত্যশক্তির এই মর্ম্ম গ্রহণ করলে সম্প্রদায় টিকে না বুঝি? 'লোকানুগ্রহার্থ', নিজ মায়াকল্পিত দেহধারণ করে, জনম মরণশীল জীবের ন্যায়, উৎপন্ন. বৰ্দ্ধিত, কর্ম্মানুষ্ঠানরত এবং পরিশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ারূপ লীলা—পরমাত্মা করেন না; তবে তাঁতে ওগুলি আরোপ করে, ব্যক্তিবশেষকে অবতার বলে প্রচার করে প্রতিষ্ঠালাভ এবং সম্প্রদায়ের বিস্তৃতিসাধনের কূট কৌশল—ঐ সব ভক্তদেরই লীলাখেলা বলতে পারেন।

অবতারবাদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা-খণ্ডন

অবতারবাদের এবার তৃতীয় কারণটি পর্যালোচনা করা যাক্। গীতানুসারে বলা হয়, সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য এবং দুষ্কৃতকারীর বিনাশের জন্য, সর্বব্যাপী, অসীম, অনন্ত যিনি, তনি জন্মগ্রহণ করেন! যিনি সর্বশক্তিমান্, তিনি কি মানুষরূপে জন্মগ্রহণ না করে কি সাধুকে রক্ষা করতে পারেন না? **তাঁর 'সর্ব্বশক্তিমত্তা' এবং 'অচিন্ত্যশক্তির' কতো** সংকীর্ণ অর্থ করা হয়েছে দেখুন! ধর্ম্ম লুপ্ত হলে তবে সংস্থাপন অর্থাৎ সম কৃরূপে স্থাপনের প্রশ্ন আসে; কিন্তু সতের উপর ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, সত্য এবং পরমাত্মা একই অর্থ বোধক। পরমাত্মা সত্যস্বরূপ, ধারণাৎ ধর্ম্মমিত্যাহুঃ, সেই জগদাধার অনন্ত চৈতন্য সত্ত্বাই অখিল ব্রহ্মাণ্ড, সমগ্র জীবজগৎকে ধারণ করে আছেন। তিনি কি মাঝে মাঝে লুপ্ত হ'ন, না, ধ্বংস হয়ে যান যে ধর্ম্মকে সংস্থাপনের প্রয়োজন হয়? অবশ্য যদি 'সংস্থাপন' বলতে 'সম্প্রদায় স্থাপন' বোঝায়, তাহলে অবশ্য বহু ব্যক্তিগত ভগবানের উৎপন্ন হওয়া এবং অবতরণ সিদ্ধ হয়!!

'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'—দুর্জন বিনাশের জন্য নাকি নিত্য, পূর্ণ, সর্বব্যাপী ভগবানকে জঠর যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়! একটু গভীরভাবে বিচার করে দেখুন,—ঐ দেদীপ্যমান্ সূর্য্যের চেয়ে অনেকে লক্ষ লক্ষ গুণ বৃহত্তর তারকা নক্ষত্র আছে, এই সৌরমণ্ডলের সূর্য্য যেমন ঐটি, তেমনি বহু সৌরমণ্ডলে

বহু সূর্য্য আছে, তাদের চেয়ে বহু কোটী কোটী গুণ বৃহদাকার তারা আছে; এই অসংখ্য গ্রহ তারকারাজি সূর্য্য সহ সৌরমণ্ডল তাঁরই বিরাট অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর শক্তির অনুপাতে কারণজগৎ (Causal universe) কিছু নয়, কারণ জগতের তুলনায় সূক্ষ্মজগৎ ক্ষুদ্রতর, সূক্ষ্মজগতের (Subtle universe) তুলনায় ঐ অসংখ্য গ্রহতারামণ্ডল সমন্বিত স্থূলজগৎ (Gross universe) নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর; সমগ্র স্থূলজগতের তুলনায় সূর্য্য একটি বিন্দু মাত্র, আমাদের পৃথিবী আবার এই সূর্য্যের তুলনায় একটি বিন্দু (dot) মাত্র! এই পৃথিবীর কোটী কোটী জীবের তুলনায় একটিমাত্র জীবের অস্তিত্ব (তিনি যত বড়ই হোন)—নিতান্তই নগণ্য! ঐ একটা মানুষকে সর্বশক্তির মূলাধার পরমাত্মার সঙ্গে তুলনা করাই বাতুলতা; এহেন একটা নগণ্য জীবকে—হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু রাবণ কংসাদিকে বধ করবার জন্য পূর্ণ পরমেশ্বরের অবতরণ কল্পনা একেবারে প্রলাপোক্তি!

তিনি সর্বব্যাপক বলে ঐ সব দুষ্কৃতকারীর মধ্যেও আছেন—ইচ্ছাকরলেই তিনি অতি সহজেই তাদের যবনিকাপাত ঘটাতে পারেন; তাছাড়া কালবশে সবাইকেই মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়, কাজেই পরমেশ্বর কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করলেই, স্বাভাবিক কালবশেই তারা মৃত্যুমুখে পতিত হ'ত কিংবা কোন উৎকট ব্যাধির বীজাণু বিশেষকে হুকুম করলেই ভগবানের বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ —এই মহৎকার্য্য অনায়াসেই সম্পন্ন হতে পারতো, তার জন্য দয়াল হরিকে কচ্ছপ শূকর নরপশু বা বিভিন্ন মানুষ মূর্ত্তি গ্রহণ করার কষ্ট স্বীকার করতে হ'ত না, সত্যসন্ধ ঋষিদের নিকট বেদ উপনিষদমুখে 'অজ একপাৎ' ইত্যাদি যে সত্য প্রকাশ করেছিলেন, এক এক অবতারে, ভিন্ন ভিন্ন পরস্পর বিরোধী বাক্য বলে স্বমত খণ্ডন বা মণ্ডনও করতে হ'ত না !!!

এই অবতারবাদ দেশের বহু সর্বনাশ করেছে। এই অবতারবাদের জন্যই বিভিন্ন সম্প্রদায়, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দ্বেষাদ্বেষী, এক সম্প্রদায়ের অবতার অন্য সম্প্রদায়ের মান্য নয়, বহু স্বকপোলকল্পিত গ্রন্থ রচিত হয়ে নানা বিকৃত সত্য-পরিবেশন চলে আসছে। চিন্তা করে দেখ, যত অবতার এসেছেন—এই ভারতবর্ষে। কেন? ভারতবর্ষেই কি শুধু সাধু জন্মান এবং তাঁরা দুর্জনদের দ্বারা নির্য্যাতীত হ'ন? এইজন্য কি বেছে বেছে কেবল ভারতবর্ষেই

কি ভগবানকে বারবার 'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' জন্ম নিতে হয়েছে? শুধু ভারতবর্ষেই কি ধর্ম্ম মাঝে মাঝে রসাতলে চলে যায়, এইজন্য 'ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়' তাঁকে এই খানেই আসতে হয়? আশ্চর্য্য, ঈশাবতারে ভগবান যা বলে গেলেন, মুসাবতারে তার বিরোধীবাক্যে শোনা যায়— খ্রীষ্ট ভগবানের ভক্তগণ, মহম্মদ ভগবানের কথা মানতে রাজী নয়! রাম অবতারে তিনি যা বলে যান, কৃষ্ণ অবতারে তাঁর উক্তিতে অন্য রকম দেখা যায়! একই ভগবানের বারবার জন্মগ্রহণের ফলে বুঝি যোগচ্যুতি ঘটে? স্মৃতিভ্রংশ দেখা যায়? বুদ্ধরূপে তিনি এসে যা বলে যান এই ভারতবর্ষে, শঙ্কররূপে জন্মগ্রহণ করে তিনি আবার তা খণ্ডন করেন! চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে আবার পূর্বজন্মের কথা ভুল বলে, 'মায়াবাদীর মিথ্যা উক্তি' বলে খণ্ডন করে যান! এইরকম এক একটি ব্যক্তিগত অবতারের দল এসে এমনভাবে এক একটা মতবাদের সৃষ্টি করে যান, যাতে তাঁরই পরমবাক্য বেদ উপনিষদও পাত্তা পায় না। ভগবান এক একবার জন্মে এক এক অবতাররূপে স্বীয় ভক্তগণকে যা বলে যান, অন্য অন্য অবতারের ভক্তরা তাতো মানেই না, বরং পরস্পর পরস্পরকে 'নাস্তিক', 'পাষণ্ডী', 'মায়াবাদী', 'অসুর' ইত্যাদি মুখরোচক বাক্যে আপ্যায়িত করে থাকেন !!

অবতারবাদ দেশের সর্বনাশ করেছে

ভগবান নাকি মৎস্যরূপে, কূর্ম্মরূপে, বরাহরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; Theory of Evolution অনুযায়ী তাই বলে কিন্তু মৎস্য কূর্ম্ম বরাহের বংশগুলি উন্নত বা দিব্যরূপ হতে পারে নি কিংবা ভগবান ঐ সব রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন বলে ঐ গুলি প্রতীকরূপে কোথাও পূজিতও হয় না। বরং ভক্তরা ভগবানের ঐ মূর্ত্তি—মৎস্য কূর্ম্ম বরাহাদির বংশগুলিকে 'হৃদয়স্থ' না করে 'উদরস্থ' করতে ব্যগ্র! হৃদয় বিহারী ভগবান 'লীলারসাস্বাদনের' নিমিত্ত যে সব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছিলেন, ভক্তরাজগণ সেগুলি 'উদরবিহারী' হলে কেমন হয় সেই রসনার তৃপ্তিকর রসাস্বাদন করে চলেছেন !!!

অন্যান্য অবতারদের অবশ্য মূর্ত্তি, অর্চ্চা, খড়া, চূড়া, জুতা, জামা, দাঁত, হাড় সকল কিছুরই পূজা হয়, আবার বলা হয় এগুলি নাকি নিত্য! চিন্ময়! অপ্রাকৃত! এক একদল উপাসক আবার Measurement করে কোন্ ভগবান এক আনা, কোনটি দু' আনা, চারি আনা, ছয় আনা,

বার আনা, কোনটি পূরাপূরি ষোল আনা তাও নিখুঁতভাবে পরিমাপ করে ফেলেছে !!

প্রত্যেকেই নিজ নিজ উপাস্য অবতারকে নিত্য ভেবে ভগবানের অন্য অবতারবৃন্দকে কোন্ যুক্তিতে উপেক্ষা বা হেয় করে? যদি সকল অবতারের দেহ 'নিত্য, অপ্রাকৃত' হয় এবং সকলেই স্ব, স্ব, ধামে পরিকর সহ 'নিত্যলীলার রসাস্বাদনে' ব্যাপৃত থাকেন, তাহলে জগৎকারণ পরমেশ্বরের বহু নিত্য-দেহে অধিষ্ঠান স্বীকার করতে হয়! কিন্তু ভগবানের বহুত্ব স্বীকার্য্য কি? শুধু ভারতবর্ষের প্রতিই শ্রীভগবানের পক্ষপাতিত্ব আছে—তাই এইখানের সাধুগুলিকেই পরিত্রাণ এবং দুর্জ্জনের বিনাশের জন্য তাঁকে বারবার অবতীর্ণ হওয়ার শ্রম স্বীকার করতে হয়, তিনি যে কেবল ভারত-উদ্ধারের জন্যই Duty-bound—এমন কি স্বীকার করা যায়? যদি বলেন যে, না—না, তিনি সর্ব্বত্রই জন্মাচ্ছেন এবং শুধু এই ব্রহ্মাণ্ডের নয়, অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডেরও সাধু-পরিত্রাণ, দুর্জ্জন-বিনাশরূপ পবিত্র কর্ম্ম তাঁকে করে মরতে হয়, এবং প্রতি জন্মের প্রতিবারের দেহই যদি নিত্য হয়. তাহলে বেচারা শ্রীভগবানেরই ত Cycle of birth and death এর গোলকচক্রে ঘুরে মরতে হচ্ছে !! 'সর্ব্বজ্ঞ' পুরাণকাররা এবং 'লীলারসাস্বাদনকারী' ভক্তরাজ প্রভুপাদরা ছাড়া এই 'অপ্রাকৃততত্ত্ব' কোন যুক্তিবাদী বিবেকী পুরুষের হৃদয়ঙ্গম হওয়া শক্ত!

মৎস্য অবতারের বর্ণনায় পুরাণকার বলছে—প্রলয়ঙ্কর প্লাবনে পৃথিবী ধ্বংশ হওয়ার সময়—মনু যখন তর্পণ করছিলেন, হঠাৎ পরমেশ্বর পুঁটি মৎস্যরূপে তাঁর অঞ্জলি মধ্যে পতিত হ'লেন। দেখতে দেখতে পুঁটি ভগবানের কলেবর বিংশতি অযুত যোজন ব্যাপী বড় হ'ল আর জলমগ্না পৃথিবীর সকল প্রাণী এই পুঁটি ভগবানের পিঠে চড়ে আত্মরক্ষা করলো! তারপর ভগবান কূর্ম্মরূপে মন্দারপর্ব্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করলেন, দেবদৈত্য প্রাণপণে সমুদ্র মন্থন করলো, শ্রীভগবানকেও ভক্তানুগ্রহ করে মন্থনাঘাতে কিরকম রসের সঞ্চার হয়—সেই রসটুকু আস্বাদনের জন্য মন্থনদণ্ডাঘাত সহ্য করতে হ'ল! অহো! অবিদ্যাগ্রস্থ ভক্তদের জন্য ভক্তবৎসল প্রভুকে কতো না দুঃখ ভোগ করতে হয়! ঐ মন্থনদণ্ড যন্ত্রণা ভোগের পুরস্কারও ভগবান পেলেন—সমুদ্রমন্থনকালে শ্রীদেবী সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়ে মুকুন্দকে বরণ করলেন। তারপর অমৃত নিয়ে দেব দৈত্যে লাগলো বিরোধ। শ্রীভগবান পরমাশ্চর্য্য।

মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করলেন! আশ্চর্য্য! শ্রীভগবানের এই মোহিনীমূর্ত্তি দেখে অসুরদের মনে সত্ত্বগুণের উদয় হওয়ার পরিবর্ত্তে তারা কামোন্মত্ত হয়ে উঠলো!! মুগ্ধ হয়ে তারা অমৃতকুম্ভটি মোহিনীর হাতে দিয়ে বিরোধ মীমাংসা করে দেওয়ার প্রস্তাব করলো। দেব ও অসুররাকে দুই পৃথক পংক্তিতে বসিয়ে, ঐ মোহিনী ওরফে শ্রীভগবান দৈত্যদেরকে নানা ছলাকলায় ভুলিয়ে, বঞ্চিত করে, দুরস্থ দেবতারাকে অমৃত পান করালেন [ভাগবত ৮ স্কন্ধ] —এই না হ'লে লীলা! রাহু ছদ্মবেশে অমৃতপান করে ফেলেছিলো, চন্দ্র সূর্য্য তা চিনিয়ে দিতে, সর্বজ্ঞ কামিনী-ভগবান তখন জানতে পেরে, নিজমূর্ত্তি ধারণ করে চক্রদ্বারা রাহুর মাথা কেটে ফেললেন! কিন্তু সে অমৃতপান করেছিল, তাই মরলো না এবং সেই আক্রোশে আজও রাহু চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রাস করে থাকে [ভাগ, ৮ স্কন্ধ]!! এখানে ভূগোল এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে সবজান্তা পুরাণকারের কিঞ্চিৎ বিরোধ দেখা যাচ্ছে! তা হলোই বা, এখানে "নিখিলশাস্ত্র রাজচক্রবর্ত্তী" (বৈষ্ণবমতে) ভাগবতের কাছে বিজ্ঞানের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী!

অবতার কল্পনার মূলে কতখানি মিথ্যা

তারপরেই ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র থেকে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বরাহ শিশু ওরফে বরাহ-ভগবানের উৎপত্তি!

"ইত্যভিধ্যায়তো নাসা বিবরাৎ সহসা অনঘ।
বরাহতোকো নিরগাদঙ্গুষ্ঠ পরিমানক॥"

হিরণ্যাক্ষ্য বধ, পৃথিবীর গর্ভে নরক নামক অসুর-উৎপাদন আর জলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধারসাধন—এই তিনটি মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানেই বরাহ-ভগবানের লীলা-পর্য্যাবসান! হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে মাদুরের ন্যায় জড়িয়ে শুয়েছিল। বরাহভগবান "ঘ্রাণেন পৃথ্বাঃ পদবীং বিজিঘ্রন্"—পশুর ন্যায় ঘ্রান নিতে নিতে ঘোঁত্ ঘোঁত্ করতে করতে (!!) দৌড়ে এসে তার মস্তকের নিম্নদিক দিয়ে পৃথিবীকে দন্তে তুলে ধরলেন। বিষম যুদ্ধ, অন্তে হিরণ্যাক্ষ বধ। "হিরণ্যাক্ষবধ ভগবানের পক্ষে সহজ সাধ্য। পৃথিবী শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, কাজেই তার গর্ভে পুত্রোৎপাদনও সম্পূর্ণ ব্যাকরণ সঙ্গত!" [সোঽহং স্বামীর শ্লেষ]॥

শ্রীভগবানের ঐ লীলাদর্শন দর্শন করে, স্মরণ করে এবং পাঠ করে, 'অপ্রাকৃত' ভক্তজনের অবিরলধারে অশ্রুবর্ষণ ও লীলাস্ফুরণ অসম্ভব নয়।—

কিন্তু আমাদের মত যে সব প্রাকৃতজন 'অপ্রাকৃত' ভক্ত হয়ে বিবেক বস্তুটি শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড বা যমুনার জলে বিসর্জন দিয়ে বসে নি, তাদের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে—পৃথিবীকে যদি মাদুরের মতই জড়িয়ে হিরণ্যাক্ষ শুয়েছিল, তাহলে সে কিসের উপর দাঁড়িয়ে বরাহ ভগবানকে ভীষণ গদাপ্রহারে 'লীলারসাস্বাদনের' সুযোগ দিয়েছিল ? ভগবানের কথা বাদ দিলাম, কেন না 'লীলারসাস্বাদনকারী' 'অপ্রাকৃত' ভক্তগণ তাঁরজন্ম বুক পেতে দিতে পারেন ! কিন্তু ভক্তবৃন্দেরই আশ্রয় ভূমি কি ছিল ?

তারপর দয়াময় ভগবান বিকট নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করে হিরণ্যকশিপুর নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন করলেন। কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্রহ্মা যে এভাবে মাঝে মাঝে অসুর গুলোকে বর দিয়ে তাঁকে অবতীর্ণ হ'তে বাধ্য করেন, এজন্ম মৃদু তিরস্কার করলেন। যে প্রহ্লাদের ঊর্দ্ধতন একুশপুরুষ ছিলই না, লীলাবৈকল্যে, ভক্ত প্রেমে বিগলিত অর্দ্ধনর-অর্দ্ধপশু শ্রীভগবান তাঁর ঊর্দ্ধতন একুশ পুরুষেরই উদ্ধারের ব্যবস্থা করে ফেললেন !! পুরাণকারদেরই মতে—'সত্যযুগে পূর্ণং পুণ্যং পাপং নাস্তি'—তবুও সত্য যুগে ভগবানকে ভাগবতকার চার চার বার জন্মগ্রহণ করিয়ে ছেড়ে দিয়েছে ! সত্যযুগে পাপই যদি ছিল না, তাহলে পৃথিবীকে দু' দু'বার জলমগ্ন করে পাপ প্রক্ষালনের রহস্যটা যে কি তা কেবল ভাগবতকার এবং "অপ্রাকৃত লীলাবিগ্রহের অপ্রাকৃত ভক্তজনেরই" সহজ বোধ্য !!!

ত্রেতাযুগে ভগবান বামনরূপে কশ্যপ গৃহে জন্ম নিলেন। এই অবতারে সত্যস্বরূপ শ্রীভগবান, "সদা সত্যনিষ্ঠ স্বধর্ম্মনিরত বিশ্ববিজয়ী বদান্যবর বলীকে যাচক বেশে ছলনা করিয়াছিলেন; এবং তাহার সাম্রাজ্য কাপুরুষ গুরুপত্নীগামী পাষণ্ড ইন্দ্রকে প্রদান পূর্ব্বক পৌরাণিক ভগবানোচিত সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ছিলেন !" [সোঽহং স্বামী]॥ দান করে বলি হ'লেন পাতালস্থ ! তখানে যদি তিনি পাষণ্ড ইন্দ্রকে দলন করে বলীকে পুরস্কৃত করতেন, তাহলে বরং দুষ্কৃতের বিনাশ এবং সাধুর পরিত্রাণ যথার্থ ভাবে হ'ত। ব্রহ্মা যখন বললেন— "হে ভূতেশ! এই হৃত সর্ব্বস্ব বলীকে মোচন করুন। এ নিগ্রহ যোগ্য নয়। সত্যরক্ষার জন্য অকাতরে সর্বসম্পদসহ নিজেকেও আপনার চরণে বিলিয়ে দিয়েছে"। তদুত্তরে ভাগবতকারের ভগবান বললেন—

ব্রহ্মণ.! যমনুগৃহ্নামি তদ্বিশং বিধুনোম্যহম্।
যন্মদঃ পুরুষঃ স্তব্ধো লোকং মাঞ্চাবমন্যতে। (ভাগ ৮, ২২, ২৪)

—"হে ব্রহ্মণ্! আমি যাকে অনুগ্রহ করি, তাকে সকল সম্পদ হ'তে বঞ্চিত করি। কারণ, পুরুষ সম্পদে মত্ত ও অবিনীত হয়ে সমস্ত লোককে, এমন কি, আমাকেও অবজ্ঞা করে।" ভগবানের এই প্রাণতোষিণী অমৃত বাক্য শ্রবণ করে ভক্তদের প্রাণ ঠাণ্ডা হ'তে পারে, কিন্তু প্রাকৃতজনদের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে—তাহলে কি তিনি বলীকে সর্বহারা পাতালবাসী করে অনুগ্রহ করে অনুগ্রহ (!) করলেন আব ইন্দ্রকে করলেন নিগ্রহ (!) স্বর্গদান করে? পূর্ব অবতারে যে ইনি মোহিনী মূর্তি ধারণ করে দৈত্যরাকে বঞ্চিত করে দেবতারাকে অমৃত দিলেন এও কি অসুরদের প্রতি তাঁব 'অনুগ্রহ' আর দেবতাগণকে অমৃতদান 'নিগ্রহের' নামান্তর? কী অপূর্ব্ব লীলা! প্রভু কি তাহলে বলীর সর্বসম্পদ হরণ করলেন, পাছে বলী মত্ত হ'য়ে অবিনীত হয়, তাঁকে অবজ্ঞা করে? কিন্তু বলীর চরিত্রে তো, অন্ততঃ সেদিনকার ব্যবহাবে কোন দম্ভ বা দুর্বিনীত ভাব দেখা যায় নি! ভগবানকে অবজ্ঞা কবা তো দূরের কথা, বামনদেব বলীর যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হওয়া মাত্রই, তিনি তাঁর পাদদ্বয় ধৌত করে, পাদোদক মস্তকে ধারণ করে, ভক্তি-বিনম্র চিত্তে আবাহন জানিযে বলেছিলেন—

অদ্য নঃ পিতরস্তৃপ্তা অদ্য নঃ পাবিতং কুলম্
অদ্য স্বিষ্টঃ ক্রতুরয়ং যদ্-ভগবানাগতো গৃহান্।

[ভাগ, ৮, ১৮, ৩০, ৩২]

অবতারতত্ত্বের অসার ভিত্তি!

'অদ্য আমার পিতৃগণ তৃপ্ত হ'লেন, কুল পবিত্র হ'ল, এই যজ্ঞ সার্থক হ'ল, যেহেতু আপনি আমার গৃহে আগমন কবেছেন।" বলির এই কথাগুলি কি সম্পদমত্ততা বা দম্ভের লক্ষণ? বামনাবতার বিনিময়ে বর দিলেন—"এখন সুতলে বাস কর, সাবর্ণি মণ্বন্তরে তুমি ইন্দ্র হ'বে"। দয়াময় হরির কী অপূর্ব্ব দয়া! যে ইন্দ্রত্ব বলী নিজেই পৌরুষবলে অর্জ্জন করেছিলেন আবার যে ইন্দ্রত্ব স্বেচ্ছায় দান করে দিচ্ছেন, ভাগবতকারেব ভগবান তাঁকে সাবর্ণিমণ্বন্তরে—সেই ইন্দ্র হওয়ার বর দিয়ে চরিতার্থ করছেন! **পুরাণকারদের এই অবতারতত্ত্ব শুনে ভক্তের রোমাঞ্চ হ'তে পারে, প্রেমাশ্রুও ঝরতে পারে কিন্তু যার বিবেক আছে, তিনি নিশ্চয়ই রক্তে উষ্ণতা অনুভব করবেন,**

পৌরাণিক ভগবানের এই আচরণ এবং পুরাণকারের অজ্ঞতা দেখে।

পরশুরামরূপে ভগবানকে এবার অবতীর্ণ করালেন পুরাণকার। এই অবতারে প্রভু মাতৃহত্যা এবং ক্ষত্রিয়দের আবালবৃদ্ধবনিতাকে একুশটিবার নাকি কুঠারে করে কেটে কুচি কুচি করেছিলেন! এই অবতারে তিনি বীভৎস উগ্র ও ভয়ানক রসের লীলা প্রকাশ করেছেন! কিন্তু এও বাহ্য—ইনি বেঁচে থাকতে থাকতেই শ্রীভগবান অর্দ্ধাংশে রাম, সিকি অংশে ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন দু' দু' আনা অংশে জন্মালেন! কী ভীষণ প্রহেলিকা! পরশুরামরূপে ভগবান জন্মগ্রহণ করে কুঠার হস্তে মার মার কাট কাট লীলা যখন করে চলেছেন, তখনই আবার তিনি চারি অংশে জন্ম নিলেন! রাম V৭ পরশুরাম, দুই ভগবানে যে একবার শক্তি পরীক্ষাও যে হয়েছিল, রসিক ভক্তজন তারও রসাল বর্ণনা দিয়েছে। বাল্মীকির রামচন্দ্র আদর্শ মানব, সম্প্রদায়ীরা তাঁকেই 'অবতার' 'পূর্ণভগবান' বলে খাড়া করেছে। তাঁর দেহান্তকালে নাকি গরুগাধা, শিয়াল, শুকুন, তির্য্যকযোনি সবাইকে ব্রহ্মা শতকোটী দিব্য বিমান এনে স্থাবর জঙ্গম প্রাণী সহ বৈকুণ্ঠে নিয়ে গেলেন! অথচ এই সর্ব্বজ্ঞ প্রভুর পত্নী বিরহে বিলাপ, পথে ঘাটে প্রান্তরে 'হা সীতা, হা সীতা' বলে ক্রন্দনের সুন্দর আলেখ্য, উপাসনারত শম্বুক বধ (শূদ্র বলে!) এবং কিঞ্চিৎ ছলনা করে বালীবধ—ইত্যাদিরও বর্ণনা আছে! ঘরে ঘরে তাই চলেছে রামের মূর্ত্তিপূজা, সলাঙ্গুল হনুমানও মন্দিরে মন্দিরে পূজিত! বাল্মীকি যে সত্যসন্ধ, মহাব্রত, পিতৃভক্ত, প্রজাবৎসল, মানবপ্রেমিক রামের বর্ণনা দিয়েছেন—সেই মহত্তম আদর্শ সম্প্রদায়ী ভক্তরা গ্রহণ করে নি।

তারপর ভগবানকে জন্মাতে দেখি হলধর বলরাম ও কৃষ্ণরূপে। বলরামরূপে প্রভু সদাই কাদম্বরী সুরাপানে মত্ত থাকতেন! নিরীহ বৃদ্ধ সুতহত্যা, কৃষ্ণের গোপিনীদের সঙ্গে সরসলীলা, যমুনা জল ক্রীড়া করতে রাজী না হওয়ায় হলদ্বারা জোর করে আকর্ষণ করার পৌরাণিক ভগবান সুলভ বিক্রম প্রকাশাদি ছাড়া আর কোন লীলাবিস্তার করেছিলেন কি না পুরাণকার সে বর্ণনা দেয়নি। অবতারতত্ত্ব প্রতিষ্ঠাকারী পুরাণকারের মতে এতে 'চাংশ কলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'। কৃষ্ণরূপে পরমাত্মা বস্ত্রহরণ, রাসলীলাদি সাধ্বী পরিত্রাণমূলক অনেক গোপন লীলারসের অনুষ্ঠান করে তাঁর ভক্তদের সামনে 'পূর্ণভগবত্ত্বা' প্রমাণ করে গেছেন! ঐ

সব অশ্লীল লীলারসাস্বাদনে অপ্রাকৃত রসিক ভক্তদের তৃষিত প্রাণ এমনই পরিতৃপ্ত যে, তারা এঁর, নিত্যবৃন্দাবনে 'বেদবিধির অগোচর রতনবেদিকোপরি' শ্রীমতীর সঙ্গে পরকীয়া প্রেমাপ্লুত অবস্থার, ধ্যানে রসাবিষ্ট !! "যৎযদাচরতে শ্রেষ্ঠঃ—শ্রেষ্ঠ জন যা আচরণ করে যান, ইতর জন তাই অনুসরণ করে"—এই কৃষ্ণবাক্যানুযায়ী, সেজন্য কৃষ্ণভক্তগণও দিকে গোপন রাসলীলা এবং পরকীয়া প্রেমের অনুসরণ ও অনুকরণ করে কতো যে প্রাকৃতজনের ভববন্ধন মোচন করে চলেছেন—তার ইয়ত্তা নেই !! [মনে রাখবেন, এ সব ভাগবতকারেরই সৃষ্টি—মহাভারতে বেদব্যাস এ সব লিখেন নি]।

এক একটি ব্যক্তিগত ভগবান সৃষ্টির মূলে জঘন্য সাম্প্রদায়িকতা

ভাগবতকার বুদ্ধকেও ভগবানের অবতার বলে বর্ণনা করে বলেছে—তিনি 'নাস্তিকাবতার'। "ভগবান বুদ্ধাবতার হ'য়ে পাষণ্ডবেশে অসুরদিগকে নানা উপধর্ম্মের উপদেশ দেন" [ভাগ ২য় স্কন্ধ ৭ অধ্যায়]। তাহলে, করুণাঘন বুদ্ধদেব যাঁদেরকে উপদেশ দিয়ে গেলেন, তাঁরা অসুর? পাষাণ্ড? পৃথিবীর চারিদিকে যত বৌদ্ধ জৈন তাঁরা সবাই পাষণ্ড, অসুর, আর একমাত্র যারা গোপীজনবল্লভের সেবায় সখী অনুগত ভজন করছেন সেই সব কৃষ্ণভক্তরাই বুঝি একমাত্র প্রকৃত ভক্ত? একই ভগবান এক একবার জন্মে বুঝি খামখেয়ালি করে যান? **এই অবতারবাদের মূলে যে জঘন্য সাম্প্রদায়িকতা, স্বার্থবোধ এবং কুৎসিত বিদ্বেষভাব আছে, তা সহজেই অনুমেয়।**

এইবার দশম অবতার কল্কির আসার কথা! পুরাণকারদের মতে এইবার ভগবান কল্কিরূপে জন্মে 'অশ্বমাশুগমারুহ্য অসিনাঽসাধুদমনম্' অর্থাৎ দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে অসিহস্তে দুষ্কৃতগণকে দমনকরে লীলা দেখাবেন! তিনি যে বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণের ঘরে শম্ভল গ্রামে জন্মাবেন—এ সমস্তও তিনি বোধ হয় কোন অপ্রাকৃত Telephone যোগে (!) জানিয়ে দিয়েছেন। তবে, ভক্তদের মনোভিলাষ এবং অসার ভবিষ্যদ্‌বাণী পূরণের জন্য কেন যে এখনও তিনি জন্মাচ্ছেন না, সেইটে ভাবনার বিষয়! মনে হয়, অজ্ঞ পুরাণকারদের অস্ত্রজ্ঞানের দৌড় ত অসি পর্য্যন্ত, কাজেই তারা তো অসি হস্তে অবতীর্ণ হওয়ার ভবিষ্যদ্‌বাণী করে চলে গেছে, ইতিমধ্যে যে প্রাকৃত জন্য অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমাদি ভীষণ মারাত্মক আগ্নেয় অস্ত্র আবিষ্কার করে ফেলেছেন! সামান্য অসি হস্তে

এই সমস্ত অসাধুদের (!) সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব হ'বে কি না, হয়ত সেই চিন্তাতে তিনি ভাবিত আছেন! তাছাড়া, সময়ও তো এখনও আছে, পুরাণকারের মতে কলির পরিমাণ ৪২০০০০ বছরের মধ্যে ৫০০০ বছর গত হয়েছে মাত্র। কিন্তু তাঁর ঐ দীর্ঘসূত্রতা এবং ভীতির জন্য তো আর সাধুর পরিত্রাণ, দুষ্কৃত বিনাশ কিংবা ধর্মসংস্থাপনাদি কার্য্য বন্ধ থাকতে পারে না!! কাজেই তাঁকে এখন নারদ ব্রহ্মাদি অমাত্য সহ শলাপরামর্শ করার সময় দিয়ে, তাঁর ভক্তরাই ইত্যবসরে বহু অবতার সৃষ্টি করে ফেলেছে!!! এক এক সম্প্রদায় তাদের উপাস্য বা প্রতিষ্ঠাতাকেই স্বয়ং ভগবান অবতার বলে দাঁড় করিয়েছে। চৈতন্য, রামকৃষ্ণের অবতারত্ব, নানা কল্পিত যুক্তি প্রমাণ বলে সিদ্ধ করা হয়েছে। **বিশ্ববন্দ্য মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে যে ঈশ্বর বিরহ, সমদৃষ্টি, প্রেমভাব এবং কঠোর তপশ্চরণের দৃষ্টান্ত দেখা গেছে ভক্তরা তা গ্রহণ করে নি; কেবল 'পূর্ণঅবতার' প্রমাণ করবার জন্য ব্যগ্র।**

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি!
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাই।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈল এক ঠাঞি॥

[চৈ, চঃ আদি ৪র্থ পর্ব]

চৈতন্যদেব নাকি তাঁর শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করতে আসায় রায় রামানন্দকে বলেছিলেন—

গৌর অঙ্গ নহে মোর, রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥

[চৈ, চ মধ্য ৮ম]

চৈতন্যচরিতামৃতে একবার বর্ণনা দিচ্ছে—রাধা কৃষ্ণের মিলিত দেহ চৈতন্যের, পরক্ষণেই তাঁর মুখ দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে—তিনি যেন রাধা, গোপেন্দ্রসুত, কৃষ্ণ ছাড়া কেউ স্পর্শ করলে চৈতন্যরূপী শ্রীমতী সতীত্ব যাবে! অন্যান্য অবতারের ভাবও যে ইনি গ্রহণ করতেন তার বর্ণনা সম্প্রদায়ীরা দিয়েছে—

বরাহ আকার প্রভু হইলা সেই ক্ষণে
স্বানুভাবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে।

গর্জ্জে যজ্ঞ বরাহ প্রকাশ খুর চারি।
প্রভু বলে মোর স্তুতি বলহ মুরারী ॥

[চৈতন্য ভাগবত মধ্য ৩য় পর্ব]

সম্প্রদায়ীরা কিভাবে শ্রীচৈতন্যকে হেয় করেছে

হনুমানের ধ্যান করতে গিয়ে রামকৃষ্ণের যেমন লেজ বেরিয়েছিল, চৈতন্যদেবেরও বরাহভাবে যে 'চারটি খুর' বেরিয়েছিল— সম্প্রদায়ীরা তার বর্ণনা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, আমরা সবাই জানি, মহাপ্রভু সে সময় অধঃপতিত বাংলাদেশের অস্পৃশ্যতা জাতিভেদ প্রভৃতি পাপ প্রেমের প্লাবনে প্রক্ষালন করেছিলেন ; তাঁর অভয় অমৃত প্রেমময় কোলে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সবাইকে টেনে নিয়ে প্রচার করেছিলেন, "ভক্তের জাতিভেদ, বর্ণবিচার নেই। চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ"। কিন্তু সম্প্রদায়ীরা তাঁকে পূর্ণ অবতার বলে declare করে তিনি যে জাতিভেদ মানতেন—তার বর্ণনা দিয়েছে—

(১) তিনি নাকি কটক হ'তে বৃন্দাবন যাত্রার পথে যে গ্রামে ব্রাহ্মণ থাকতেন সেখানে ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করতেন। যেখানে ব্রাহ্মণ থাকতো না সেখানে তাঁর সঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রান্না করে দিতেন। [চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৭।৫৮-৬১]

(২) তাঁর ভক্তদের মধ্যে হরিদাস ও সনাতন মুসলমান ও জাতিভ্রষ্ট ছিলেন বলে, তাঁদের সঙ্গে তাঁর আচরণে নাকি বৈষম্য প্রকাশ পেত! হরিদাসের জন্য উদ্যানের একপাশে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছিল—তাঁর প্রতি নাকি মহাপ্রভুর নির্দ্দেশ ছিল—

মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম।
এই ঠাঁঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন ॥ [ঐ]

সনাতনের জন্যও ঐ ব্যবস্থা—

এই মত সনাতন রহে প্রভুর স্থানে।
জগন্নাথের চক্র দেখি করেন প্রণামে ॥

[ঐ অন্ত্যলীলা]

(৩) ভক্তবৎসল শ্রীচৈতন্য অন্যান্য ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে একাসনে বসতেন কিন্তু ঐ দুজনকে একটু দূরে দূরে রাখতেন—

ভক্তগণ লৈয়া প্রভু বসিলা পিণ্ডার উপরে।
হরিদাস সনাতন বসিলা পিণ্ডার তলে॥

[ঐ অন্ত্যলীলা ৪র্থ ২৩]

(৪) সম্প্রদায়ীরা ঐ সমদর্শী মহাপুরুষের মুখ দিয়ে কেমন উক্তি করিয়েছে শুনুন :—বৃন্দাবন হ'তে ফিরবার সময় প্রয়াগে বল্লভ ভট্ট রূপ ও অনুপমকে আলিঙ্গন করতে গেলে, তাঁরা দূরে সরে গিয়ে বলেন, 'অস্পৃশ্য পামর মুঞি না ছুঁইহ মোরে'। তাঁদের এটা বৈষ্ণবোচিত দৈন্য হতে পারে কিন্তু মহাপ্রভু তাদের ঐরূপ দূরে সরে যাওয়ার কারণস্বরূপ বল্লভ ভট্টকে বললেন— "দোঁহা না স্পর্শিহ ইহো জাতি অতিহীন।
বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীন॥" [ঐ মধ্য ১৯]

অবতারবাদী সম্প্রদায়ীদের ধন্য অবতার-অবতরণ করানোর লীলা!

তারপরের অবতার বাংলাদেশের শ্রীরামকৃষ্ণ! এঁর মতো অবতার নাকি ভূভারতে কখনও কেউ আসেন নি! তাই এঁর প্রণাম মন্ত্র রচিত হয়েছে— "অবতার—বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ" !! স্বামী অভেদানন্দ রচিত স্তোত্র-রত্নাকর (শ্রীরামকৃষ্ণপূজাপদ্ধতি) নামক পুস্তকের পরিচিতিতে লেখা হয়েছে, স্বামী অভেদানন্দ নাকি, "একদিন গভীর ধ্যানে দর্শন করিলেন, দেবদেবী ও অবতারাদি বিরাট জ্যোতির্ম্ময় শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে একে একে মিলিয়া যাইতেছে।" ঐ বইটি যে ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি, পুরোহিত দর্পণ, জগন্মোহন তর্কালঙ্কার এবং শ্যামচরণ কবিরত্নের "পূজাপদ্ধতি" প্রভৃতি বইএর অনুসরণে লেখা হয়েছে— "পরিচিতি"তে তার উল্লেখ করে আসনশুদ্ধি জলশুদ্ধি পুষ্পশুদ্ধি মাতৃকান্যাস, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন মৎস্যমোচন অর্ঘমর্ষণ প্রভৃতি প্রত্যেকটিতে রামকৃষ্ণ-সারদামণি নাম ঢুকিয়ে সস্ত্রীক রামকৃষ্ণের পূজাপদ্ধতি ধ্যান প্রণামমন্ত্র স্তোত্র এমন কি গায়ত্রী পর্য্যন্ত রচনা করা হয়েছে! খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে পণ্ডিত, রমেশচন্দ্র শাস্ত্রী যেমন রাজা কংস নারায়ণ খাঁর অনুরোধে নূতন পূজা পদ্ধতি বিধিব্যবস্থা মন্ত্রতন্ত্র রচনা করে বাহন, পরিকর, অস্ত্রশস্ত্র সহ দেবীদুর্গার পূজা ব্যবস্থা করে গেছলেন—তেমনি সাঙ্গোপাঙ্গসহ রামকৃষ্ণ-সারদামণির পূজা ব্যবস্থা ঐ বই এ আছে। সারদামন্ত্র ও গায়ত্রী রচনার কৌশল দেখলেই বুঝতে পারবেন। (১) "ওঁ ঐং হ্রীং জগন্মাতৃস্বরূপিণ্যৈ শ্রীসারদাদেব্যৈ নম ইত্যস্য মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রী-

ছন্দঃ জগন্মাতৃস্বরূপিনী সারদাদেবী দেবতা ঋষ্যাদি ন্যাসে বিনিয়োগঃ (২) ওঁ সারদায়ৈ বিদ্মহে মহাদেব্যৈ ধীমহি তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ"। [ঐ]

অভেদানন্দ নিজেই নিজের পূজার মন্ত্র রচনা করে গেছেন,—"ওঁ ঐং এতে গন্ধপুষ্পে বিবেকানন্দাভেদানন্দাদিভ্যো নমঃ" !!! [ঐ ৮৯ পৃঃ]

কি ভাবে একজনকে অবতার বানানো হয়

স্বামী সারদানন্দ রচিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ" (২য় খণ্ড) থেকে আমরা জানতে পারি, রামকৃষ্ণাবতারে প্রভু সাধক অবস্থায় শিয়াল কুকুরের উচ্ছিষ্ট ভোজন নরমাংসের স্বাদ গ্রহণ, গোমাংস ভোক্ষণের উদ্যম, হনুমৎ সাধনায় লাঙ্গুল বৃদ্ধি, ওড়না, ঘাঘরা শাড়ীপরে স্ত্রী বেশে মথুর বাবুর অন্দর মহলে কিছুদিন বাস প্রভৃতি লীলা করেছিলেন! শুধু তাই নয়, রামকৃষ্ণের মত শিশুবৎ সর লমানুষকে অবতার বানাতে গিয়ে ভক্তের বর্ণনা শুনুন :—স্ত্রীবেশে থাকাকালে, "স্বাধিষ্ঠান চক্রের (লিঙ্গমূলের) অবস্থান প্রদেশের রোমকূপ সকল হইতে তাঁহার (রামকৃষ্ণের) এই কালে প্রতিমাসে নিয়মিত সময়ে বিন্দু বিন্দু শোণিত-নির্গমন হইত এবং স্ত্রীশরীরের ন্যায় প্রতিবারই দিবসত্রয় ঐরূপ হইত! তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়নাথ আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, তিনি উহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন এবং পরিহিত বস্ত্র দুষ্ট হইবার আশঙ্কায় ঠাকুরকে উহার জন্য এইকালে কৌপীন ব্যবহার করিতেও দেখিয়াছেন!" [ঐ ২৬৬ পৃঃ] রামাকৃষ্ণাবতারে প্রভুর এই লালার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন! যাই হোক সিনেমা থিয়েটার, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এবং অন্যান্য অতিভক্তদলের কৃপায় রামকৃষ্ণের "অবতারত্ব" ঘুচায় কে ?

এদিকে আবার চৈতন্য ও রামকৃষ্ণেরও অবতার অর্থাৎ অবতারের অবতারও হাজারে হাজারে গজিয়ে উঠছেন! "কলৌবামাবতারেণ", এই বাক্যবলে একদল অবতার বলে বামাক্ষেপাকে mean করে তো, আনন্দময়ীর ভক্তরা বলেন, আনন্দময়ীই বামাবতার, মানে বামারূপে অবতার! মাও কৃপা করে ভক্তগণকে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনিই "পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ", পরক্ষণেই নিজের স্ত্রীলিঙ্গত্ব মনে পড়ায় সামলিয়ে নিয়ে বলেছেন "নারায়ণী," "মহাদেবী" ইত্যাদি। [গুরুপ্রিয়াদেবী রচিত "শ্রীশ্রীআনন্দময়ী", নবম ভাগ, ৩৪ পৃঃ] হরিবাবা নামক জনৈক সাধু নাকি জেনে ফেলেছেন, "এবারে মহাপ্রভু গুপ্তভাবে লীলা করছেন (আনন্দময়ী রূপে)" [ঐ ৭০ পৃঃ] 'আনন্দময়ী মা যে স্বয়ং মহাপ্রভু'

তা নাকি আরও একজন সাধু (নামোল্লেখ নেই!) জেনে ফেলেছেন। [ঐ ১০৯ পৃঃ] মহাপ্রভুর আরও কতকগুলি modern সংস্করণ আছেন। যাই হোক্ ভক্তরা বলেন আনন্দময়ী মা 'মহাআদ্যাশক্তি'! কিন্তু হায়! ওদিকে আবার শ্রীঅরবিন্দ মাদাম রিশারকেই মহাকালী মহাসরস্বতী মহা মহা আদ্যাশক্তির Incarnation বলে 'The Mother' রূপে পণ্ডিচেরীতে প্রতিষ্ঠা করে আনন্দময়ী-Group এর কিঞ্চিৎ অসুবিধা করে গেছেন!!

শ্রীঅরবিন্দকে একদল 'পুরুষোত্তম' বলেন তো, আর একদল ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকেই 'পুরুষোত্তম' বলে এমন ভাবে মিথ্যা আজগুবি কাহিনী প্রচার করছেন যে গোয়েবল্‌স্‌ও এঁদের কাছে মিথ্যা প্রচারের বেসাতিতে শিশু! সবচেয়ে মজা হয়েছে রামকৃষ্ণকে নিয়ে! এঁকে তো তাঁর এখন বিপুল প্রতিষ্ঠা, তার উপর তিনি যে আবার আসবেন, একথা বলে গেছলেন! আর যায় কোথা, চারিদিকেই রামকৃষ্ণের Enlarged Edition, Pocket Edition এর ভীড় অনুকূলচন্দ্রের সম্প্রদায় ভৃগু সংহিতার quotation রচনা করে প্রচার করছেন পূর্ব্বজন্মের কালীসাধক রামকৃষ্ণই মরে এজন্মে হিমায়েৎপুরে অনুকূলচন্দ্র রূপে জন্মেছেন। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শিষ্য প্রতিঋত্বিক শ্রীঅনিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 'গুরুবাদ-ঋষিবাদ' নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা তুলে দিচ্ছি :— (শ্রীশ্রীভৃগুসংহিতা বিবরণ) —"আসীৎ পূর্ব্বভবে কশ্চিৎ মূর্দ্ধজ বঙ্গখণ্ডকে। স্বধুনী সমীপে তাত! শ্যামাঙ্গ নাতি দীর্ঘকং॥ তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ বিদ্যাহীনঃ মহামতি। গীতনাদে পরাপ্রীতি জনকেনৈব তাড়িতঃ॥.. পরমহংস পদারূঢ়ঃ জন্মজন্মান্তরাজ্জিতঃ।. সমাধৌ চ ব্যথা তাত! প্রমদা, কাঞ্চনাদিভিঃ। স্পর্শমাত্রে বিকৃতাঙ্গ শূলবিদ্ধবৎ তদা॥ এবং বিচেষ্টিতং তস্য কদাপি সময়ে মুনে। ব্রহ্ম-বার্ত্তা দদৌ শূদ্রে অচানক স্নেহযোগতঃ। শক্তিহীনোঽভবৎ তস্মাৎ গলরোগাৎ মৃত্যোত্তরে॥..রামাৎ রামে যথা তেজঃ এবং তস্য মহামুনে! পুনর্জন্ম ধরাপৃষ্ঠে বিস্মৃত্য পূর্ব্বগৌরব॥ মহর্ষি ভৃগুপ্রদত্ত শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের পূর্বজন্মের এই পরিচয় পাঠ করিলে নিঃসন্দেহে ও নির্বিচারে জানা যায় যে তিনি পূর্ব্বজন্মে সর্বজনপূজ্য ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব রূপে বঙ্গ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন" [ঐ, ৫৯-৬২ পৃঃ] এদিকে ঐ অনুকূলচন্দ্রের আর এক শিষ্য প্রচার করেছেন, অনুকূলচন্দ্রের মা নাকি আগ্রার হুজুর মহারাজের খুব সেবা করায় তিনি বর

সীতারামদাসের পিতৃদত্ত নাম প্রবোধ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিষ্যরা ভাষ্য করেছেন তাঁর গুরুর পদবী যখন মুখোপাধ্যায়, তখন অচ্যুতানন্দের ভবিষ্যৎ বাণী 'মুখোপাধ্যায়' ঠিকই আছে। ঐ বই এরই ২—৩ পৃষ্ঠায় ভূজেন্দ্র নাথ সরকার নামে তাঁর একটি শিষ্যের চিঠি ছাপা হয়েছে তাতে তিনি এই 'মুখোপাধ্যায়' কেন চট্টোপাধ্যায় কুলে জন্মালেন—সে সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

চিঠিটি এইরূপ :—"(কটক ১১-৩-৪৪ বাং) প্রণাম সংখ্যাতীত নিবেদন মিদং গুরুদেব! রাজসংহিতায় আরও যাহা পাওয়া গিয়াছে সমস্ত একত্র করিয়া মূল ও অনুবাদ পাঠাইলাম। সর্বস্থানেই আপনার নামের পর মুখোপাধ্যায় লেখা আছে। ইহার তাৎপর্য্য ঠিক বুঝিবার ক্ষমতা নেই [**ভক্তদের 'তাৎপর্য্য' নির্ণয়ের ক্ষমতা থাকলে ধর্ম্মরাজ্যে এত অবতারের উৎপাত হবে কি করে?**] অনেকে বলেন যে নকল করিবার সময় ভুল হইয়া থাকিবে [**যেখানেই গুরুদেবের অবতারত্ব প্রমাণ করা কঠিন সেখানেই ভক্তদের এবংবিধ কৌশল!**] কিন্তু ভুলটি সকল স্থানেই কি একপ্রকারের সম্ভবপর মনে হয়? আবার কেহ কেহ বলেন যে গুরু বা পরমগুরু হয়ত মুখোপাধ্যায় ছিলেন, সেই কারণেই 'মুখোপাধ্যায়' বলিয়া উল্লেখ করা হয়েছে। [**এমন কি পরমগুরুর পরমগুরুর দেশে কেউ 'মুখোপাধ্যায়' থাকলেও চলবে—কি বলেন?**] ...মহাপ্রভু অচ্যুতানন্দের মতে আপনাকে এখনও আমরা পনের ষোল বৎসর সেবা করিতে পারিব—ইহাতে আমার বড় আনন্দ হইয়াছে ..ইত্যাদি শ্রীচরণাশ্রিত, ভুজেন্দ্র।"

তাহলে, 'অচ্যুতানন্দের ভবিষ্যৎবাণী' সহ, সীতারাম এবং তদীয় শিষ্যগণের মত যদি মানতে হয়, তাহলে উনি পূর্বজন্মে দ্রাবিড়ে পীতাম্বর পাড়ির পুত্র ছিলেন, ক্রোধবশে নীরিহ মৃগশিশুবধের জন্য খোঁড়া হ'য়ে জন্মেছেন; অচ্যুতানন্দের মতে তাহলে উনি পূর্বজন্মে রামকৃষ্ণ ছিলেন না! অথচ "দিব্য জীবন" গ্রন্থে, ওঁকে পূর্বজন্মের 'রামকৃষ্ণ'—বলে চালানো হচ্ছে, এক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতও Certify করেছেন এ কথাকে, রামকৃষ্ণই যে মরে সীতারাম দাস হয়েছেন সে সম্বন্ধে নাকি তাঁর কাছে প্রমান আছে। প্রমানটা যে কি, তা তিনি ব্যক্ত করেন নি, তবে সীতারাম যে অবতার সে Lebel তিনি এঁটে দিয়েছেন!

অনুকূলচন্দ্র ও সীতারাম দুজনেই জীবিত—দুজনেই পূর্ব্বজন্মে রামকৃষ্ণ

ছিলেন বলে প্রচারিত! একই রামকৃষ্ণ, অনুকূলচন্দ্র রূপে প্রচার করেন 'রাধাস্বামী'ই তাঁর নাম আর সীতারাম দাস রূপে প্রচার করেন 'রামনাম'ই একমাত্র তারকব্রহ্ম নাম !!

আরও লক্ষ্য করার বিষয়, ভুজেন্দ্র সরকারের চিঠিটি ১১।৩।৪৪ (বাংলা) তারিখে লেখা, তিনি, 'অচ্যুতানন্দের ভবিষ্যৎবাণী' অনুযায়ী, ঐ তারিখ হ'তে পনের ষোল বৎসর 'আরও সেবা করতে' পাবেন এ আশা প্রকাশ করেছেন, কাজেই ১৩৬০ সালে সীতারামরূপী ভগবানের লীলাসম্বরণ হওয়া উচিত ছিল, (ভগবান করুন, তিনি তাঁর ভক্তদের ভববন্ধন শিথিল করবার জন্য আরও হাজার বছর বা কল্পকাল বাঁচুন—আমাদের তাতে আপত্তি নেই), কিন্তু এখনও তিনি 'বহাল তবিয়তে' 'জীবোদ্ধার' করে চলেছেন, 'অচ্যুতানন্দের ভবিষ্যৎবাণী' যে Fictitious, সাজানো মিথ্যা কথা—তার 'জলজ্যান্ত' প্রমাণরূপে !!!

এইভাবে ধীর মস্তিষ্কে পূর্বাপর সব বিচার করে দেখলে Socalled অবতারদের ভক্তবৃন্দের পরস্পর বিরুদ্ধ রটনার অসারতা ও অসামঞ্জস্য ধরা পড়বে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এক একজন বিখ্যাত বিরাট পণ্ডিত আছেন, তাঁদেরকে ধরে declare করানো হয় এক একজন সন্ন্যাসীর সপক্ষে। Thermometer এ যেমন তাপ মাপা যায়, Barometer এ যেমন বোঝা যায় Cyclone, anti-cyclone এর গতি, তেমনি ঐ সব ধুরন্ধর পণ্ডিতদের হাতে নিশ্চয়ই এমন কোন যন্ত্র বা ফিতা মাপ আছে, যা দিয়ে ওঁরা বুঝে ফেলেছেন কে পূর্ণভগবান! মনে হয় ভগবানের সঙ্গে এঁদের Telephone Connection আছে, ধরাধামে অবতীর্ণ হওয়ার পুর্ব্বেই তিনি পূর্বাহ্নে জানিয়ে আসেন—ডুমুরদহে জন্মাবেন কিংবা হিমায়েৎপুরে !!!

রামকৃষ্ণ যে বলেগেছলেন, 'বায়ুকোনে আর একবার আমার দেহ হ'বে' (কথামৃত, ৪র্থ ভাগ, ৩১৪ পৃ)—এ কথার উপর ভিত্তি করে একদল বলেন, 'চন্দন নগরের সাধুই সেই রামকৃষ্ণ', অপর দল সিউড়ীর রামকৃষ্ণভক্ত সাধুকেই রামকৃষ্ণের আধুনিক Incarnation বলে দাবী করেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীবারীণ ঘোষ একবার বলেছিলেন,—'এ যুগে একজন যুগপুরুষ আছেন'। আর যায় কোথায়? রাজ্যের সাধু ও অবতাররা তাঁকে নিয়ে **"টানাটানি করতে"** সুরু করে দিয়েছেন! ঐ চন্দননগরের সাধু ও তাঁর দলবল, বালক ব্রহ্মচারীর দল, ঐ বৃদ্ধ বিপ্লবীর কাছে গিয়ে, তাঁকে সভাপণ্ডিত করে আশ্রমে টেনে নিয়ে এসে তাঁকে দিয়ে 'অবতারের

Certificate' নেওয়ার চেষ্টা করছেন। [দৈনিক বসুমতী ২।১২।৫৭

পণ্ডিতরা অবতার হবার Certificate দেন!

কাশীর মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের কাছে যেমন বিশ্বের জ্ঞানী গুণী আসেন তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা নিয়ে, তেমনি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, দুরভিসন্ধি-পরায়ণ, প্রতিষ্ঠালিপ্সু অবতার পদপ্রার্থী সাধু এবং তাঁদের দলবলের ভীড় লেগেই আছে; যদি কোনমতে ওঁকে দিয়ে একটা বইএর ভূমিকা লিখানো যায় বা 'অবতারের Certificate' একখানা আদায় করা যায়! শ্রদ্ধেয় বারীণ ঘোষ এবং শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মশাই—দুজনেই নিঃস্বার্থ, দুজনেই তপস্বী—কিন্তু এঁদের যুধিষ্ঠিরের দশা! সেই যে একবার যুধিষ্ঠিরকে বলা হয়েছিল একজন দুষ্টলোক বেছে আনতে—তিনি সারাদিনেও কাউকে খুঁজে পান নি! কিন্তু একজন সাধুলোক বেছে আনার কথা বলতেই, তিনি যাঁকেই দেখেন, তাঁকে সাধু বলে ধরে আনতেন —ঠিক সেই রকম ওঁরা নিজেরা সাধু, তাই সর্বত্র সবাইকে সাধু বলে Certify করেন! কিন্তু ওঁদের একটা কথা বা দু'কলম লেখার ফলে, দুরভিসন্ধিপরায়ণ অবতার ও তার ভক্তবৃন্দের প্রচারের ফলে কতো সাধারণ লোক যে বিভ্রান্ত হয় তার ইয়ত্তা নেই।

যাই হোক, ভারতবর্ষে নানাকারণে, নানাভাবে অবতারের সংখ্যা দিনদিন বেড়েই চলেছে, অবতারদের সবচেয়ে প্রাদুর্ভাব এবং উপদ্রব বাংলাদেশে! এক রামকৃষ্ণই তো মরে চার ছয় জন 'সাধুবাবা'রূপে আবির্ভূত হয়েছেন, মানুষী তণু পরিগ্রহ করে সাধু পরিত্রাণ (!) আর দুষ্কৃতের বিনাশ (!!) করে চলেছেন! বুদ্ধদেব ছিলেন ত্যাগের আদর্শ, তাঁর Modern-সংস্করণ, New Incarnation প্রাসাদে বাস করেন, তিনদিনে ৫ লাখ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে উঠাতে হয় হাত খরচের জন্য! তাঁর বিলাসব্যসন দেখে অতিভোগী রাজা মহারাজাদেরও চক্ষু কপালে ওঠে! মনে হয় সে জন্মে জরামরণব্যাধি দেখে জীবের দুঃখে বিচলিত হ'য়ে তথাগত যে ত্যাগের মহান্ আদর্শ স্থাপন করে গেছলেন, বর্ত্তমানে বুঝি, সেই সমস্ত ফেলে আসা ভোগ-ব্যসন সুদে আসলে পুষিয়ে নিচ্ছেন! কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের মন্ত্র-উদ্গাতা রামকৃষ্ণ মরে গিয়ে এবারে যে সমস্ত শরীরে আবির্ভূত হয়েছেন বলে শোনা যায়, তাঁদের মধ্যে একজনের ত কামিনীকাঞ্চন, রৌপ্যরমণী সম্ভোগ-উপভোগ কোনটাতেই অরুচি নেই! রামকৃষ্ণ নিজের স্ত্রীকে মা

বলে পূজা করে গেছলেন, তাঁর বর্তমান সংস্করণদের একজনও কয়েকটি বিবাহ করে কেবল লীলাবশে, নিষ্কামভাবে কয়েক গণ্ডা পুত্রকন্যা উৎপাদন করেছেন !! যে চৈতন্যদেব এমন কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা ছিলেন যে তাঁর বসনভূষণের ঠিক ছিল না। তাঁর modern-সংস্করণ যিনি, তাঁর বহুমূল্য স্বর্ণভূষণ, কয়েকটি হীরকাঙ্গুরীয়, সুবর্ণ খঞ্জনী, বহু সুগন্ধিদ্রব্য সহ প্রসাধন পারিপাট্য-তৎসহ ক্ষয়রোগটি দেখলে বেশ বোঝা যায়—ঐ কৃষ্ণ প্রেমীটি কে !!! এ সবই ভগবানের লীলা, কি বলেন ?

বুদ্ধ চৈতন্য রামকৃষ্ণ থেকে Modern অবতারদের জীবনী লক্ষ্য করলেই দেখা যায় এঁরা কিরকমভাবে **প্রথমে সাধক, পরে সিদ্ধ, তৎপরে অবতাররূপে ক্রমোন্নতি লাভ করেছেন**! সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে কেউ যদি পারম্পর্য্যক্রমে বিচার করে দেখেন, সহজেই বুঝতে পারবেন, এই অবতারবাদের মূলে কতখানি অজ্ঞতা, কুৎসিৎ স্বার্থবোধ আর অন্ধ বিশ্বাস আছে। **অজ্ঞের হৃদয়ে অন্ধ বিশ্বাস উৎপাদন করে, সম্প্রদায় স্থাপন, ' সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি ' এবং ' প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের ' জন্যই [বিবেকানন্দের কথাই ঠিক !] ব্যক্তি বিশেষকে অবতার বলে প্রচার করে নানা আজগুবি ঘটনার সন্নিবেশে—ধর্ম্ম নিয়ে বানিজ্য চলছে। ব্যাপক আকাশকে মুঠোয় ভরা যেমন কল্পনা মাত্র, তেমনি অসীম অনন্ত পরমেশ্বর নিজের আনন্ত্যত্ব এবং ব্যাপকত্ব ধ্বংস করে, (সংক্ষেপতঃ আত্মহত্যা করে !) — মানুষীর ক্ষুদ্র গর্ভকোষে জন্মগ্রহণ করেন— এ কল্পনাও তেমনি আজগুবি মিথ্যা !!**

দেশে হাজার গণ্ডা অবতার—তবু কেন এই দুর্দ্দশা ?

যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব তখন অজ্ঞাতবাসে। দুর্য্যোধন চর পাঠাচ্ছেন, তাঁদের সন্ধানলাভের জন্য। কেননা অজ্ঞাতবাসের মধ্যে তাঁদের খোঁজ পাওয়া গেলে, শপথ অনুযায়ী, পাণ্ডবদেরকে আরও বার বছর অজ্ঞাতবাস করতে হবে। চর যখন যাচ্ছে, তখন ভীষ্ম বলছেন, " যুধিষ্ঠির যেখানে থাকবে সেখানে শান্তির বাতাস বইবে. কোন রোগশোক জরা অকল্যাণ থাকবে না, মেঘ সকল প্রচুর বৃষ্টি দেবে, বৃক্ষ সকল হবে ফলভারে আনত, সেখানের লোকেরা স্বধর্ম্মনিরত, নীরোগ, সত্যব্রত এবং বিশুদ্ধ চরিত্র হবে, প্রচুর শস্য-ধন ও সমৃদ্ধি সেখানে বিরাজ করবে।"

প্রিয়বাদী সদা দান্তো ভব্যঃ সত্যপরোজন ।
হৃষ্টপুষ্টঃ শুচির্দক্ষো যত্র রাজা যধিষ্ঠিরঃ ।।১৬
সদা চ তত্র পর্জন্যঃ সম্যগ বর্ষী ন সংশয়ঃ ।
সম্পন্ন শস্যা চ মহী নিরতঙ্কা ভবিষ্যতি ।।
গুনবন্তি চ ধান্যানি রসবন্তি ফলানি চ,
গন্ধবন্তি চ মাল্যানি শুভশব্দা চ ভারতী ।। ২০
গাবশ্চ বহুলাস্তত্র ন কৃশাঃ ন চ দুর্বলাঃ ।
পয়াংসি দধি সর্পীংসি রসবন্তি হিতানি চ ।। ২২
গুনবন্তি চ পেয়ানি ভোজ্যানি রসবন্তি চ
তত্র দেশে ভবিষ্যন্তি যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ।। ২৩

[মহাভারত, বিরাটপর্ব, ভীষ্মবাক্য ২৮ অধ্যায়]

একজন রাজ্যভ্রষ্ট রাজা ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলে যদি এই প্রভাব হয়, তাহলে **আমাদের দেশে এত অবতারদের ভীড় সত্ত্বেও কেন এই দুর্দ্দশা, কেন চারিদিকে হাহাকার, আর্ত্তনাদ ?** আজ যেদিকেই তাকাই সেদিকেই দেখি দলাদলি, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বঞ্চনানীতি, কালোবাজারীদের বীভৎস শোষণে, স্বৈরাচারী শাসনে সবাই উৎপীড়িত—চারিদিকে নিরন্ন নিরাশ্রয়দের ভীড়, 'ম'রে ভুখাহুঁ' এই করুণ রবে আকাশ বাতাস ক্রন্দিত। এতই যদি অবতার এসেছেন, মানুষীতনু পরিগ্রহ করে ভগবান যদি আমাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাহলে কেন হয় না, এই দুঃখের অবসান ? শুচিতা সততা সতীত্বের মর্য্যাদা আজ লুণ্ঠিত, দারিদ্র্যের দুঃসহ দহনে, নৈরাশ্যের নিষ্ঠুর নিপীড়নে সকলের অন্তরাত্মা আজ জর্জ্জরিত, সত্য পদদলিত, ধর্ম্ম কলুষিত। "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্"—যে সব অবতার, যুগপুরুষ, যুগদেবতারা এসেছেন, পারেন তারা করতে এর প্রতীকার ? স্পষ্টই বোঝা যায়, এদের ভণ্ডামি, সহজেই ধরা পড়ে 'অবতার' সম্বন্ধে অলৌকিক মিথ্যা প্রচার।

ভারতবর্ষে, বিশেষ করে এখন বাংলাদেশে ত এত 'অবতারদের' ভীড়, কিন্তু এজন্য অন্যান্য দেশের চেয়ে ভারতীয়দের বা বাঙ্গালীর জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অধিকতর কিছু Speciality দেখা যাচ্ছে কি ? অন্যান্য দেশ দয়াময়ের শ্রীচরণে কি অপরাধ করেছে ? সেই সমস্ত দেশের 'সাধুপরিত্রাণ'

'দুষ্কৃতের বিনাশ সাধনাদি' কোনও কর্ত্তব্য কি বিশ্বনাথের নেই? না, অন্যান্য দেশ শ্রীভগবানের অবতরণরূপ অনুগ্রহ ছাড়াই সাধুর পরিত্রাণ দুষ্কৃতের বিনাশ সাধন করতে সমর্থ? তাই বুঝি, "নাবালক পক্ষে গার্জ্জেন পিতা" স্বরূপ শ্রীভগবান ভারতবর্ষে, বিশেষ করে সমস্যা জর্জ্জরিত বাংলাদেশে বারবার জন্মাচ্ছেন? কিন্তু আমার মনে হয় এ তাঁর পণ্ডশ্রম মাত্র। কেন না, এক একবার জন্মে গুটিকয়েক ভারতীয় দুষ্কৃতের বিনাশ সাধন করলেই যে ধরিত্রীর দুঃখমোচন হবে, তার উপায় নেই। কারণ, এক একবার ভূভার হরণ করে তিনি তিরোভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে দুর্জ্জনদের আবির্ভাব ঘটে। কাজেই শ্রীভগবান 'অসীম, অনন্ত, অজ, অকায়' হয়েও তাঁর 'অচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ' বার বার জঠর যন্ত্রনা ভোগ করে গুটিকয়েক দুষ্কৃতকারী ধ্বংশের পরিবর্ত্তে, যদি তাঁর 'অচিন্ত্যশক্তিটা', দুষ্কৃতির এবং দুষ্কার্য্যসাধনের প্রবৃত্তিটার চিরতরে বিনাশ সাধন করতেন, তাহলে পৃথিবী ধন্য হ'ত। পূর্ণ পুণ্যময় সত্যযুগে বার চারেক অবতীর্ণ হয়ে (!), বার দুই পৃথিবীকে জলমগ্ন করে পাপপ্রক্ষালনের মিথ্যা আড়ম্বর না করে, শ্রীভগবান যদি বারেক ঐ সব পুরাণকার, ভণ্ড সাধু এবং অবতার বেশী ধূর্ত্তগুলিকে বেছে বেছে জলমগ্ন করতেন, তাহলে সংস্কারের শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে, বিভ্রান্ত পথহারা মানুষ সত্যদৃষ্টি, সম্যগ্‌ জ্ঞান এবং বিমল বোধিশক্তি লাভ করে সত্যপথের সন্ধান পেত।

আলোক-তীর্থ

পঞ্চম অর্ঘ্য

প্রথম পুষ্প

মূর্ত্তিধ্যান-মূর্ত্তিচিন্তনে মনের খেলা-Illusion !

দেরাদুন একবার আমি সৎসঙ্গ ক'রতে গিয়েছিলাম। আমার এক বন্ধু বল্‌লো "ভাই, আমার মা বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিতা পরম ভক্তিমতী। তিনি হা চৈতন্য দয়াল নিতাই ব'লেই সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। কখনও কাঁদেন. কখনও হাঁসেন। কখনও বা ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম ক'রে নাচতে নাচতে অজ্ঞান হয়ে যান। একবার তাঁকে দেখতে যাবে চল"। আমি সানন্দে তাঁকে দেখতে গেলাম। তখন তিনি যথেষ্ট প্রকৃতিস্থা; তাঁর ঠাকুর ঘরের সামনে ব'সে তখন তিনি ফুলের মালা গাঁথছিলেন গৌর নিতাই এর জন্য। বন্ধুর কাছে সারা রাস্তা তাঁর মায়ের কথা শুনেছিলাম; ইনি অহরহ ঠাকুর সেবা পূজা, মালাগাঁথা, চন্দন ঘোটা যাইহোক একটা নিয়ে থাকেন; ভোগ রান্না ক'রে ঠাকুরকে দেন, নিজে খান, আবার ধ্যান-ভজন-স্মরণ মননেই থাকেন। যাই হোক, যাওয়ার পর বন্ধুটি আমার পরিচয় দিয়ে বললেন "মা ইনি তোমার গৌর-নিতাই দর্শন করতে এসেছেন।" খুব আনন্দে আমাকে বসতে বললেন। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পরই ডুক্‌রে কেঁদে উঠলেন—কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ আলু থালু ভাবে নাচতে লাগলেন—চোখ বেয়ে অঘোরে জল গড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ এসময় বন্ধুর স্ত্রী (ঐ সাধিকার বৌমা) আমাদেরকে ডাকতে আসছিলেন খাওয়ার জন্য। ঘর থেকে এসে একটি উঠোন পেরিয়ে এসে ঠাকুর মন্দির। বন্ধুপত্নী অতি সন্তর্পনে এসে উঠোনে দাঁড়ালেন। আমি পাছে মায়ের ভাব ভঙ্গ হয় এজন্য ইঙ্গিতে জানালুম—

আমাদের পিছনে এসে তাঁকে বসতে। কিন্তু তিনি কিছুতেই বসলেন না—বরং অতি কুণ্ঠাপূর্ণভাবে চা জলখাওয়ার হয়েছে এইটি বন্ধুকে জানিয়েই, ফিরে যেতে লাগলেন। মা এতখন আমাদের দিকে পিছন ফিরে তাঁর গৃহাভ্যন্তরস্থ ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কাঁদছিলেন আর নাচছিলেন। হঠাৎ আমাদের দিকে তাকিয়ে বৌমাকে দেখতে পেয়ে "সর্ব্বনাশী! কালনাগিনী! তুই আমার ঠাকুর দালানে এসেছিলি। গেল, গেল, সব গেল—সব অপবিত্র হয়ে গেল"! বলেই দাঁত মুখ খিঁচিয়ে যেন তেড়ে মারতে যান আর কি! তারপর গঙ্গাজল গায়ে ছিটিয়ে 'জয় গৌর গৌর হে' ব'লে আবার নাচা কাঁদা ভাবরসে ভাসা সুরু ক'রলেন। আমি বন্ধুসহ তার বাড়ীর মধ্যে এলাম। জল খেয়ে আমরা গল্প করছি, মা-টী আমাকে ডেকে পাঠালেন। গল্প করতে লাগলেন গুরুর কথা, স্বপ্নে দীক্ষালাভের কথা। কি ভাবে গৌর নিতাই তাঁকে দেখা দেন—তার বেশ শ্রুতিমধুর কাহিনী! মাঝে মাঝে ছেলেটা যে বৌমার পাল্লায় প'ড়ে পাষণ্ড অভক্ত হয়ে গেল—একথাও তিনি জানিয়ে দিলেন। গৌর নিতাইএর মধুর লীলারস স্মরণ ক'রতে ক'রতে যখন তাঁর চক্ষু অশ্রু সিক্ত—তখন বৌমার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতেও তাঁর কোন ভাবের ব্যত্যয় ঘটছেনা!! তিনি আরও আমাকে জানালেন—'গৌর নিতাইকে আমি বাবা কখনও রাত্রে স্বপ্নে কিংবা ধ্যানে বসেও দেখতে পাই। আহা কি সুন্দর মূরতি! চারিদিকে খোল করতাল বাজছে বৃত্তাকারে সবাই দাঁড়িয়ে কীর্ত্তন করছে — মাঝখানে মহাপ্রভু দয়াল নিতাইকে নিয়ে দু'বাহু বাড়িয়ে নেচে নেচে আসছেন — আহা, — আহা, — জীবের দুঃখে তাঁদের চোখ বেয়ে জল পড়ছে" এই বলে কাঁদতে লাগলেন। একটু প্রকৃতিস্থ হ'তে জিজ্ঞেস করলাম—মা চৈতন্য এবং নিত্যানন্দ দেখতে কি রকম? তিনি বললেন আহা—কী সুন্দর মধুর মূরতি! গুরু বলছেন খুব উজ্জ্বল আলোকের মধ্যে—দাঁড়িয়ে দুজনে নাচছেন এইটি ধ্যান করতে আর নাম জপ করতে। আমি তাই করি—এবং স্বপ্নে—কখনও বা ধ্যানে দেখতে পাই। তবে বাবা পাপমুখে বলতে নাই, দয়াল নিতাই এর শরীরটি চৈতন্যের চেয়ে রোগা। গৌরাঙ্গের মূর্ত্তিটি বেশ নধর কান্তি। সুন্দর!! ঐ যে দেখ না বাবা, ফটোতেও তো দেখছো নিতাই—গৌরাঙ্গের চেয়ে একটু রোগা। যে ফটোর এত ঘটা করে পূজা করেন—তা দেখলাম। ঐ রাত্রে বন্ধু দুঃখ করে বল্লো—

পড়েছেন বটে তবে, কলা-কৌশল, বচন-বিন্যাস গুলো এখনও রপ্ত করতে পারেন নি”!! বলাবাহুল্য, অধীর একটু দুঃখিত হ'ল আমার কথায়। পরদিন অসীম মল্লিকের বাসায় অধীর এসে বললো, “দেখ্, কাল রাত্রিতে দিদিকে অনেক অনুরোধ করায় বলেছেন—গৌর নিতাইএর রূপের অবধি নেই। কৃষ্ণ বিরহে কেঁদে কেঁদে গৌরাঙ্গের শরীর একটু কৃশ। গৌরের চেয়ে নিতাইসুন্দরের বয়সও বেশী। বেশ হৃষ্টপুষ্ট নাদুস্‌নুদুস্ নধরকান্তি”! অধীরকে অনুরোধ করলাম, “তোর দিদি গৌর নিতাইএর যে Photo বা মূর্ত্তি ধ্যান করে, কোনমতে একবার দেখবার সুযোগ করে দে।” যাই হোক, ২।৪ দিনের মধ্যেই একদিন তিনি ভাগবত পাঠ শুনতে যখন উদ্ধারণ মঠে গেছলেন, তখন অধীরের চেষ্টায় তাঁর ঠাকুর ঘরে যুগল শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের সুযোগ এল, দেখে তো অবাক! বাংলা সিনেমাতে “ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য” নামে যে ছবিটি দেখানো হয়েছিল, তাতে বসন্তকুমার সেজেছিলেন চৈতন্যদেব, আর নিত্যানন্দের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন পাহাড়ীসান্যাল; বসন্ত-পাহাড়ীরই সেই সময় গৌর নিতাই এর রূপসজ্জায় যে যুগল Photo তখন বাজারে বেরিয়েছিল—সেই Photo কিনে বাঁধিয়ে বৈষ্ণবী মা ধ্যানসেবাকেলি অর্চ্চনাতে মগ্ন থাকেন!!!

এঁর গৌরাঙ্গ রোগা, নিত্যানন্দ স্থুলোদর মোটা!

কৌতূহল বশতঃ সব কথা লিখে দেরাদুনের বন্ধুকে পত্র লিখলাম—“এখানে তো স্থূলতনু পাহাড়ী সান্যাল নিত্যানন্দরূপে এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকায় বসন্ত চৌধুরী গৌরাঙ্গ সুন্দর রূপে ভক্তগণকে নিত্যলীলার রসাস্বাদন করাচ্ছেন! তোমার মা যে বলেছিলেন, তাঁর গৌরাঙ্গের চেয়ে নিত্যানন্দ একটু রুগ্ন শীর্ণ বেশে দর্শন দেন, তার মূলে এই রকম ধরণের কোন রহস্য নেই ত”? রমেন চিঠি লিখলো, “মায়ের গুরু হুকুম করেছিলেন আগ্রা থেকে মার্বেল পাথরের গৌর নিতাই এর শ্রীমূর্ত্তি গড়িয়ে আনতে। আমি কোনমতে তাঁর বৃন্দাবনস্থ শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য একশত টাকা নগদ দক্ষিণা দিয়ে (মাধুকরী!!) এই দুর্দ্দিনে হাজার টাকার খরচ বাঁচাই, তিনিও Photo-পূজার হুকুম দেন! “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য” নামে যে হিন্দী সিনেমা হয়েছিল তাতে ভারতভূষণ সেজেছিল চৈতন্য আর নিত্যানন্দ যে সেজেছিল—সে ভদ্রলোক অত্যন্ত রুগ্ন শীর্ণ। বাজারের সেই Photo-ই কিনে সোনালি ফ্রেমে বাঁধিয়ে দিয়েছিলাম, তাঁর গুরুদেব দেখে খুব খুসী হ'ন, ঘটা করে

প্রতিষ্ঠা করে—চিড়া ভোগের মহোৎসব লাগিয়ে যাও তার সেবা বন্দনা করে চলেছেন।"

একই প্রেমাবতার দেরাদুনে এক মূর্ত্তিতে আর কোলকাতাতে অন্য মূর্ত্তি ভক্তের কাছে প্রকট হ'য়ে নিত্যলীলা করছেন!. এতেই বেশ তোমরা বুঝতে পারছো, Photo বা মূর্ত্তি পূজায় যে সমস্ত দর্শন হয়, সেগুলি কিরকম দর্শন! যে রূপ, ছবি বা মূর্ত্তি, ভক্ত নিয়ত ধ্যান করবে প্রাণের অনুরাগ মিশিয়ে, Intense thinking এবং desire এর ফলে, নিদ্রায় বা ধ্যানে, **যখন বহিশ্চৈতন্যের সুষুপ্তি হ'বে, তখন ঘটবে অন্তশ্চৈতন্যের লীলা বিলাস। যে ভাব ও সংস্কার, রূপ ও প্রতিচ্ছবির** স্মরণ চিন্তনে **মন রত থাকবে, তদাকার বৃত্তি** নিয়ে, সেই সব **রূপ ও মূর্ত্তিই দর্শন হবে। তাই বলে তা সত্যকারের ঈশ্বরদর্শনও** নয়, কোন আধ্যাত্মিক **অনুভূতিও** নয়! **মনেরই function গুলি** !! **Hyper-sensitive brain** এ প্রতিক্রিয়ার ফলে **hallucination** মাত্র !!!

যেমন একটি ছেলে খুব ফুটবল খেলতে ভালবাসে; সারাদিন খেলার চিন্তাতে কাটে, রাত্রিতেও—তার পর দিন মাঠে গিয়ে কিভাবে বলটা score করবে, কি কৌশলে বলটা কেড়ে নিলে কর্ণার সট্ অব্যর্থ ভাবে করা যাবে, এই চিন্তা করতে করতেই সে ঘুমিয়ে পড়লো। পাশেই বাবা শুয়ে আছেন। Intense thinking এবং Desire এর ফলেই, এবারে তার মনোভূমিতে এবং Sub-conscious Region এ, যে সমস্ত Idea imprinted হ'য়ে রয়েছে, চিত্তবৃত্তি একটু শান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো, Foot ball Ground, খেলা চলছে—চারিদিকে দর্শকদের বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টির সামনে প্রতিপক্ষকে হতচকিত করে সে ক্ষিপ্রবেগে নিয়ে চলেছে বল গোলের দিকে। এই Picture তার কাছে এত Living, এত Concrete যে, সে ঘুমের ঘোরেই 'গোল গোল' বলে চীৎকার করে লাথি মেরে বসলো পাশেই নিদ্রামগ্ন বাবার মাথায়! ইচ্ছাকরে তো সে আর বাবার মাথায় লাথি মারছে না, তার মধ্যে কোন অসৎভাব বা ভণ্ডামি নেই। তেমনি, সম্প্রদায়াদের প্রচার কৌশলে—অবতারাখ্য মহাপুরুষদের Photo এঁকে মূর্ত্তি গড়ে নিয়ত সেবা পূজা স্মরণ চিন্তন করেন যে সব ভক্তরাজ—তাঁদেরও স্বপ্নে বা ধ্যানে ঐ রকম ধ্যেয় বস্তুর দর্শন লাভ হয়! সাময়িক হয়তো

ওতে একটা সুখানুভূতি ও তন্ময়ভাব জন্মাতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা আধ্যাত্মিক অনুভূতিও নয়—ঈশ্বরদর্শনও নয়। যে ঈশ্বর দর্শনে সচ্চিদানন্দময়ত্ব লাভ হয়, মুছে যায় ত্রিতাপের জ্বালা—ঐ জড়মূর্ত্তির পূজা বা ধ্যানে তা হবে না।

ঠিক ঐ ভাবেই অনেক বাড়ীতে রাম বলে পূজা চলছে—কর্ণক কুণ্ডলধারী ধনুর্বান হস্তে রামচন্দ্রবেশী প্রেমআদিবের মূর্ত্তি! অনেকের বৈঠকখানা আলো করে আছে সোনার ফ্রেমে বাঁধানো রামকৃষ্ণরূপী গুরুদাসের মূর্ত্তি!! অকপট ধ্যান, অহরহ স্মরণ মননের ফলে, তার Sincerity of Purpose থাকলেও, মূর্ত্তিপূজক ভণ্ডদের কুশিক্ষায় বিপথে পরিচালিত হয়ে, রামভক্ত দর্শন করবে প্রেমআদিবকে! রামকৃষ্ণ ভক্তের মানসপটে উদিত হবেন গুরুদাস! জড়বুদ্ধিরা এই ভাবে ভববন্ধন শিথিলের প্রত্যাশায় জড়মূর্ত্তি ফটো প্রভৃতি পূজা করে এগিয়ে চলবে অন্ধকার নরকের পথে—

অন্ধতমঃ প্রবিশন্তি ... ...

অন্ধতমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাঁ রতাঃ॥

[যজুর্বেদ অ ৪০. ম ৯,১]

অর্থাৎ, "যারা ব্রহ্মের স্থানে অসম্ভূতি অর্থাৎ অনুৎপন্ন, অনাদি প্রকৃতিরূপ কারণের উপাসনা করে, তারা অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞানতা এবং দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়। যারা ব্রহ্মের স্থানে সম্ভূতিকে অর্থাৎ কারণ হ'তে উৎপন্ন কার্য্যরূপ পাঞ্চভৌতিক কোন কিছু—পাষাণ বৃক্ষাদির অবয়ব এবং মানুষের শরীরের উপাসনা করে, তারা উক্ত অন্ধকার হতেও আরও অধিকতর অন্ধকারে নিপতিত হয়।"

পূজা ঔর সেবা কর ঘণ্টা বজাবে।
কর্ কর্ পাখণ্ড লোগ্ বহুৎ রিঝাবে॥
তন্ কে তত মন্দির কো দেখো জাই।
আতম সা দেব জাহি পূজো ভাই॥
পাহন (পাথর) কী মূরত কা খুঁট পসারা।
পূজেঁ মূরখ্ বেহোশ্ জনম বিগারা॥ [তুলসী সাহেব]

দ্বিতীয় পুষ্প

প্রাণকৃষ্ণ বেরা=আপনি মূর্ত্তি পূজা মানেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোক যা মেনে আসছে, তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন সারসত্য থাকে। চৈতন্যদেবের মত লোক মূর্ত্তিপূজা মেনে গেছেন। শ্রীবিগ্রহ ধড়াচূড়া অর্চ্চাসেবার অমূল্য গুণ আছে বলেই না তিনি মূর্ত্তিপূজার বিরোধী যারা, তাদেরকে লক্ষ্য করে বলে গেছেন—

> শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত পাষণ্ডী।
> অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী। (চৈ. চ)

এর পরেও আপনার আর কি বলবার থাকতে পারে?

উত্তর :—বলবার আমার অনেক কিছু আছে। অমুকের মত লোক এই বলে গেছেন, তমুকের মত মহামান্য লোক এই বলে গেছেন বলে, অন্ধের মত অনুসরণ আমি করি না। নিজের বিবেক বুদ্ধি এবং দাতা দয়াল শ্রীগুরু যে আলো আমায় দিয়েছেন, সেই আলোকের পথ ধরেই আমি চলি, সব কিছু বিচার করে গ্রহণ করি—তোমাদের মত শোনা কথায় নয়, অন্ধ স্তাবকের মত! চৈতন্যদেবেরই শ্রীমুখের উক্তি যে ঐটি, এ তুমি কি করে জানলে? চৈতন্য চরিতামৃত যিনি রচনা করেছেন তিনি কি চৈতন্যদেবের নিত্যসঙ্গী থেকে সব কিছুই অভ্রান্ত ভাবে লিখে গেছেন? আমি যদি বলি পাষাণপ্রিয় সম্প্রদায়ীদেরই ঐটি স্বকোপল কল্পিত রচনা, শ্রীচৈতন্যের উক্তি বলে চালানো হচ্ছে? আমি বড় দুঃখিত যে ঐ অসার এবং অশ্রদ্ধেয় উক্তিটিকে চৈতন্যের বাণী বলে ধরে নিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে আলোচনাটা তিক্ত হ'বে! তবে সে আলোচনা প্রকৃত চৈতন্যকে নয়, সম্প্রদায়ীদের সৃষ্ট চৈতন্যকে কিছুটা স্পর্শ করবে।

তুমি যেমন বলছো, "চৈতন্যদেবের মত লোক" মূর্ত্তিপূজা মেনে গেছেন, আমিও তেমনি বিশ্ববরেণ্য মাহাত্মা কবীর সাহেব, গুরু নানক, দাদূ দয়াল, পলটু সাহেব, তুলসী সাহেব, রাধাস্বামী সাহেব, হজরত মহম্মদ, যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ জরাথুষ্ট্র

কনফুসিয়াস আরও বহু লোকমান্য মহাপুরুষদের নাম করে বলতে পারি, তাঁরা কেউ মূর্ত্তিপূজা মানেন নি। চৈতন্যদেবেরও পরম পূজনীয় বৈদিক ঋষিরা এবং ব্যাস-বাল্মীকি বশিষ্ঠ অত্রি অগস্ত্য বিশ্বামিত্র অঙ্গিরা ভরদ্বাজ ঔর্ব্ব্য জামদগ্ন্য মধুচ্ছন্দা অশ্বলায়ণ প্রভৃতির "মত" লোকের বাণী বচন আচরণ ও তপস্যার প্রণালী দেখিয়ে দেখাতে পারি তাঁরা কেউ মূর্ত্তি পূজা করে যান নি। চৈতন্যদেবের যিনি পরম উপাস্য, ইষ্ট, প্রিয়, প্রাণ সেই কৃষ্ণকেও কোন মূর্ত্তির চরণতলে ধ্যান পরায়ণ বা দাস্যভাবে বন্দনা অর্চ্চনা ও পাদোদক পানে রত থাকতে দেখা যায় নি! যাঁর নাম কীর্ত্তন করতে করতে শ্রীচৈতন্য বাহ্যদশা হারিয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়তেন—সেই কৃষ্ণ থেকে আরম্ভ করে ঐ যে সমস্ত লোকপাবন মহাপুরুষদের নাম করলাম ওঁরা কি তাহলে তোমাদেব চৈতন্যের মত অনুযায়ী মূর্ত্তিপূজক ছিলেন না বলে, "অস্পৃশ্য অদৃশ্য পাষণ্ডী এবং যমদণ্ডী"? অবশ্য আমি যাঁদের নাম করলাম, ওঁদের মধ্যে কেউ নিয়ত ক্রন্দন, রোদন, মূর্চ্ছা, শ্রীমুখসংঘর্ষণসহ নর্ত্তন কুর্দ্দনাদি লীলা দেখাতে পারেন নি! কিংবা, 'সেই রাধাভাব লৈঞা চৈতন্য অবতার', নারীভাবাপন্ন রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে অপর দুই নারী লক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়ার লীলাচ্ছলে পানিগ্রহণ করেন নি!! 'গৃহে পতিভাবে পত্নীসহ প্রেমালাপ" আর বাইরে, 'কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবাদন' বলে অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে একই সময়ে 'অপ্রাকৃত চিন্ময় ধামে নিত্যলীলা' প্রকট করার কৌশল দেখাতে পারেন নি !!!

তুমি যে বলছো, 'অধিকাংশ লোক যা মেনে আসছে, তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন সারসত্য থাকে'—এ কথাও একেবারে অবাস্তব, যুক্তিহীন। প্রথমতঃ কোন সত্যের মূল্য হাত তোলা-ভোটের ভোঠাধিক্যের উপর নির্ভর করে না। আইনষ্টাইনের Theory of Relativity র তত্ত্ব ত পৃথিবীর মধ্যে মাত্র ১৩।১৪ জন ভাল ভাবে বোঝেন। ভোটে ফেলে Theory of Relativity র সারবত্তা নির্ণয় করতে চাইলে কেমন হবে? এক সময় ত সাবা পৃথিবীর শতকরা ৯৯½ জন বিশ্বাস করতো পৃথিবী স্থির, সূর্য্য তার চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে! তাই বলে কি ঐ মিথ্যা-ধারনার মধ্যে "সারসত্য" কিছু ছিল? তাছাড়া তোমার কথামত "অধিকাংশ লোক" মূর্ত্তিপূজা করে না!

সমগ্র ইউরোপ ও রাশিয়ার মধ্যে যাঁরা খ্রীষ্টান বা কমিউনিষ্ট তাঁরা মূর্ত্তি-

পূজক নন। চীন জাপান সিংহল ব্রহ্মদেশ নেপাল সিকিম ভূটান—যেখানে যত বৌদ্ধ জৈন বা কমিউনিষ্ট আছেন তাঁরাও কেউ মূর্ত্তিপূজা করেন না। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য আরব তুর্কী মিশর থেকে কাবুল কান্দাহার পাকিস্থান ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানরাও নিশ্চয়ই মূর্ত্তি পূজক নন! অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকাতে খ্রীষ্টান, আফ্রিকাতেও খ্রীষ্টান এবং মুসলমান বেশী। ভারতবর্ষের মধ্যেও মুসলমান খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ জৈন পারসী কবীর পন্থী নানকপন্থী দাদুপন্থী, রাধাস্বামী পন্থী, আর্য্য সমাজী দেব সমাজী ব্রাহ্ম প্রভৃতিও মূর্ত্তি পূজার বিরোধী। তাহ'লে বেশ বোঝা যাচ্ছে, পৃথিবীর শতকরা ৯৮ জন লোক প্রেমাবতারের মতে "পাষণ্ডী, অস্পৃশ্য, অদৃশ্য এবং যমদণ্ডী" !!! কি বল?

বেদে আছে—

(ক) ন তস্য প্রতিমা অস্তি। [যজু অ ৩২, ম৩]

(খ) অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ। যজু অ৪০, ম৯

বেদকে ত চৈতন্যদেবও অপৌরুষেয়, শ্রীভগবানের নিত্যজ্ঞান বলে স্বীকার করেছেন। তাহ'লে স্বয়ং ভগবান কি তাঁর মতে 'পাষণ্ডী', 'অস্পৃশ্য', 'অদৃশ্য' এবং 'যমদণ্ডী'?

যদি ঐ উক্তি তাঁরই হয়, তাহলে, "নিয়ত কৃষ্ণকীর্ত্তন, ক্রন্দন, নর্ত্তন, শ্রীমুখ সঙ্ঘর্ষণাদির" ফলে তাঁর যে কি রকম ভাবোন্মাদ অবস্থা হয়েছিলো—সেযুগে তাঁর সেই নিত্য লীলা দর্শনের সুযোগ না পেলেও বেশ অনুমান করতে পারা যায়!

কেনোপনিষদে ঋষি বলছেন—

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে ॥
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যন্তি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে ॥

অর্থাৎ যাঁকে মন মনন করতে পারে না, বরং মনই যাঁর দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাঁকেই ব্রহ্ম বলে জানবে। কিন্তু মনে কল্পনা করে যার উপাসনা করা হয়, তাহা ব্রহ্ম নহে। যিনি চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হ'ন না, কিন্তু যাঁর দ্বারা চক্ষু দেখতে পায়, তাঁকেই তুমি ব্রহ্ম বলে জান এবং উপাসনা কর। ব্রহ্ম হতে ভিন্ন সূর্য্য

বিদ্যুৎ অগ্নি আদি জড় পদার্থের উপাসনা করো না'। কাজেই কোন ভূতজাত জড়মূর্ত্তির পূজা তো দূরের কথা! এই ভাবে সকল প্রধান উপনিষদগুলি থেকে দেখানো যেতে পারে, তাঁরা একমাত্র ব্রহ্ম ছাড়া, মাটি কাঠ পাথরের পূজা করতেন না। তাহলে কি চৈতন্যদেবের মতে ঐ সব স্থিতপ্রজ্ঞ জীবন্মুক্ত ঋষিরাও 'পাষণ্ডী' 'অদৃশ্য' 'অস্পৃশ্য' 'যমদণ্ডী' ছিলেন?

তোমরা বৈষ্ণবরা তো জ্ঞানকে শতহস্ত দূরে পরিহার করে চল! বৃন্দাবনের এক বৈষ্ণবাচার্য্যের মুখে শুনেছিলাম, ভাগবত যে গৌড়ীয়দের এত পরম উপাদেয় গ্রন্থ তাও নাকি জ্ঞানীর মুখে শুনতে নেই!!

এখন যে ভাগবত গ্রন্থকে তোমরা একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ, 'শাশ্বতী শ্রুতি', বলে মান্য কর, এস ভাই দেখা যাক্, সেই তোমাদের "পরম-উপাদেয়" গ্রন্থ ভাগবত মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে কি বলে গেছেন, আলোচনা করি।

ভাগবতমতেই মূর্ত্তিপূজা টিকে না

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ে দেখা যাচ্ছে, ভাগবতকার মহর্ষি কর্দ্দমের পুত্র কোপিলদেবের মুখ দিয়ে তামসিক মূর্ত্তিপূজার নিন্দা করেছেন। মনে রাখবে তোমাদের ইষ্ট কৃষ্ণচন্দ্র গীতামুখে এই কপিলদেব সম্বন্ধে বলে গেছেন—"মুনীনাং কপিলো মুনিঃ, আমি মুনিদের মধ্যে কপিল"। এ হেন কপিল ঋষি মাতা দেবহুতিকে উপদেশ দিচ্ছেন—

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্॥
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥
অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতেঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥

"আমি সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ সর্ব্বভূতেই নিয়ত বিরাজমান। অজ্ঞানী মানব সেই আত্মাকেই অবজ্ঞা করে প্রতিমা অর্চ্চাদির পূজার বিড়ম্বনা করে। যে যে ব্যক্তি মূঢ়তা বশতঃ আমাকে (আত্মাকে) ত্যাগ করে প্রতিমা অর্চ্চনা করে, তা: কেবল ভস্মে আহুতি দেওয়া হয়। হে অনঘে! আমি (আত্মা) তো সর্ব্বভূতেই অবস্থিত, ইহা না দেখে সর্ব্বভূতকে অবমাননা করে, যে লোক নানা প্রকার দ্রব্য

এবং নানা দ্রব্যোৎপন্ন ক্রিয়া দ্বারা আমার প্রতিমাতে অর্থাৎ জড় মূর্ত্তিতে (আত্মবুদ্ধি ব্রহ্মবুদ্ধি) ঈশ্বর বুদ্ধিতে অর্চ্চনা করে, তার সেই অর্চ্চনাতে আমি প্রীত হই না।'

সমগ্র ভাগবতের মধ্যে আবার প্রভুপাদ বৈষ্ণবদের মতে দশমস্কন্ধ সবচেয়ে মধুরতম রসের খনি, 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে', চৈতন্যদেবও দশমস্কন্ধ শুনতে শুনতে রসাপ্লুত হ'য়ে উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্পা মহাভাবে ভাবোন্মাদ হ'য়ে যেতেন, সেই দশমস্কন্ধের ৮৪ অধ্যায়ে **মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে কৃষ্ণের মুখ দিয়ে কি রকম গালি ও নিন্দা বেরিয়েছে** দেখ—

গীতাতেও মূর্ত্তিপূজার নিন্দা

যস্যাত্মবুদ্ধি কুনপে ত্রিধাতুকে।
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ ।।
যত্তীর্থ বুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি—
—জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব <u>গোখরঃ</u> ।।১৩।।

"যার ত্রিধাতুক (কফ বায়ু পিত্ত) দেহে আত্মবুদ্ধি, কলত্রাদিতে আত্মীয়বুদ্ধি ভূবিকারে অর্থাৎ মৃন্ময় পাষাণ মূর্ত্তিতে দেবতাবুদ্ধি বা জলে তীর্থবুদ্ধি আছে, কিন্তু সাধুদিগকে যে ব্যক্তি সেরূপ অর্থাৎ দেবতাজ্ঞান করে না, সে ব্যক্তি গোতৃনবাহী গর্দ্দভ স্বরূপ অর্থাৎ গাধা যেমন নিজে পশু হয়ে, অন্য পশু গরুর জন্য ঘাস বয়ে মরে অথচ তার নিজের ভাগ্যে ঘাস জোটে না, সেই রকম যে লোক ভগবানের প্রত্যক্ষ জীবন্ত স্বরূপ সাধু মহাপুরুষকে অবজ্ঞা করে জড়মূর্ত্তির পূজার জন্য মন্দিরে এবং জলময় স্থানে তীর্থবোধে দৌড়ে বেড়ায়, সে লোকও ঠিক ঐ গাধার মতই কেবল পশুশ্রম করে মরে।"

বৈদিক ঋষি এবং পরমপূজ্য মহর্ষিরা এইভাবে মূর্ত্তিপূজায় বিরোধী হওয়ায় তোমাদের চৈতন্যের মতে 'পাষণ্ডী' 'যমদণ্ডী' রূপে অবজ্ঞার পাত্র হলেন! কি বল? তাতে সেই সব বিশালপ্রাণ ঋষিদের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই, কিন্তু স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র এবং ভক্তরাজ শ্রীচৈতন্য একই কালে বিরাজিত থাকলে ভক্ত ভগবানের কি রকম রসময় মধুর সম্পর্ক হ'তো একবার অনুমান করে নাও! শ্রীকৃষ্ণকে ঐ রকম "শ্রীবিগ্রহের" বিরোধী দেখে, নিশ্চয়ই চৈতন্যদেব, "কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী বাদন" বলে কান্না তো দূরের কথা, দর্শন স্পর্শনও করতেন না, কেন না "অদৃশ্য, অস্পৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী"!! কৃষ্ণও

ভক্তকে তাঁর পাষাণ প্রীতির জন্য "গোখরঃ" অর্থাৎ গাধা বলতেন, ভক্তবাৎসল্যে গদগদ হ'য়ে মনে হয়, বুকে জড়িয়ে ধরতেন না !!!

এইবার যে কৃষ্ণচন্দ্রকে, চৈতন্য এবং তাঁর সম্প্রদায়, 'নরাকারে পরব্রহ্ম' বলেন, ঔপনিষদ্ ব্রহ্ম নাকি যাঁর তনুর আভামাত্র, 'যদদ্বৈতং ব্রহ্মা-পনিষদি তদপ্যস্যতনুভা' ! এবং সেইজন্য যাঁর ধাতু পাষাণময় শ্রীবিগ্রহের তোমরা সেবা পূজা কর এইবারে সেই কৃষ্ণই গীতামুখে মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে কি বলছেন বিচার করে দেখি এস। গীতার ১৮শ অধ্যায়ে কৃষ্ণ সাত্ত্বিক রাজসিক এবং তামসিক জ্ঞানের বর্ণনা দিয়েছেন। "যে জ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূতসমূহে সর্ব্বত্র ব্যাপক অব্যয় সত্তারূপ অখণ্ড ভাবের উপলব্ধি হয়, তা হ'ল সাত্ত্বিক জ্ঞান"। সূর্য্যোদয়ে যেমন সমস্ত অন্ধকার কুহেলিকা দূরে যায়, তেমনি এই জ্ঞানোদয়ে সমস্ত ভেদ ভাব ও ভ্রম দূরে যায়, উপাস্য উপাসক সেব্য সেবক প্রভু ভৃত্য দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শন সমস্ত ভাবেরই অভাব ঘটে। **কাজেই সাত্ত্বিক জ্ঞানোদয়ে একটি মাত্র special মূর্ত্তিকেই নিত্যবিগ্রহ বলে পূজা করা সম্ভব নয় !**

"যে জ্ঞানে পৃথক পৃথক পদার্থ পৃথক বা ভিন্নভাবেই উপলব্ধ হয় তাকেই বলা হয় রাজস জ্ঞান",—অর্থাৎ প্রস্তরে প্রস্তর বোধ, কাষ্ঠে কাষ্ঠ বোধ মনুষ্যে মনুষ্য বোধ। কাজেই রাজস জ্ঞানোদয়ে কোন মানুষের পক্ষেই একটি পাষাণময় মূর্ত্তিকে পাষাণমূর্ত্তি না ভেবে একেবারে চিন্ময় বিগ্রহ বোধ বা কোনরূপ আরোপজ্ঞান সম্ভব নয়। কাজেই কৃষ্ণবাক্যে বোঝা গেল সাত্ত্বিক বা রাজস জ্ঞানে শ্রীবিগ্রহের পরব্রহ্মজ্ঞানে পূজা সম্ভব নয় ! এইবার তামসিক জ্ঞান কাকে বলে তা বলতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥২২॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য বলছেন, "একস্মিন্ কার্য্যে দেহে বহির্ব্বা প্রতিমাদৌ"। মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন—"একস্মিন্ কার্য্যে বিকারে ভূতদেহে প্রতিমাদৌ বা।"

একবার বৃন্দাবনের এক বৈষ্ণব সাধু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমাকে দেখে খুবই আনন্দ হ'ল বাবা। কিন্তু মায়াবাদীর বেশ এখনো

কেন ? মালা তিলকের সেবা করে ভক্তবেশ করনি ? বেদান্ত পড়েছ কি ? বেদান্ত পড়লে ভক্তিমত প্রতিপাদিত হয়েছে যাতে বলদেব বিদ্যাভূষণের সেই গোবিন্দভাষ্য পড়া উচিত।' আমি বললাম, "আজ্ঞে আমি বেদান্ত পড়েছি এবং যাবতীয় বেদান্ত ভাষ্যের মধ্যে শঙ্কর ভাষ্যই আমার কাছে যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয়।" ব্যস, আমার এই কথা শুনে তিনি মুখ ফিরিয়ে মালা জপে মন দিলেন, আর কথাই বললেন না! বৈষ্ণবরা বলেন "মায়াবাদং অসৎশাস্ত্রং প্রচ্ছন্নম্ বৌদ্ধমুচ্যতে"!! কাজেই কৃষ্ণের ঐ শ্লোকটির ব্যাখ্যা মায়াবাদী সন্ন্যাসী শঙ্কর এবং মধুসূদন যা করে গেছেন, কৃষ্ণভক্তদের হয়ত তা রুচিকর হবে না! কিন্তু শ্রীধর স্বামীর টীকাকে তো তোমরা অগ্রাহ্য করতে পারবে না, কারণ এই শ্রীধরস্বামীকে চৈতন্যদেব মেনে গেছেন। তিনি বল্লভ ভট্টের সঙ্গে শাস্ত্র বিচার কালে বলেছিলেন—

প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করয়ে গনন
শ্রীধর উপরে পর্ব যে কিছু লিখবে।
অর্থ ব্যর্থ লিখন সেই লোক না মানিবে॥ [চৈ, চ, অন্ত্যলীলা]

কাজেই শ্রীধর স্বামী ঐ শ্লোকটির টীকায় কি বলেছেন শোন—

"একস্মিন্ কার্য্যে দেহে বা প্রতিমাদৌ বা কৃৎস্নবৎ পরিপূর্ণবৎ সক্তম্ এতাবানেবাত্মা ঈশ্বরো বেত্যাভিনিবেশ যুক্তম্। অহৈতুকম্ নিরুপপত্তিকম্। অতত্ত্বার্থবৎ পরমার্থাবলম্বনশূন্যম্। অতএবাল্পম্ তুচ্ছম্। অল্পবিষয়ত্বাৎ। অল্পফল ত্বাচ্চ। যদেবম্ভূতম্ জ্ঞানম্ তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২

অর্থাৎ যে জ্ঞানে একমাত্র দেহে বা প্রতিমাদিতে পরিপূর্ণ ঈশ্বর অবস্থিত আছেন, এইরূপ অভিনিবেশ জন্মে, এক পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি পরিপূর্ণবৎ প্রতীয়মান হয় ('অপ্রাকৃত' 'নিত্য' 'চিন্ময়' বোধ ইত্যাদি) **সেই জ্ঞানে কোন পরমার্থ লাভ হয় না, অতএব অযথার্থ, যুক্তিহীন ও তুচ্ছ। এই জ্ঞানকে তামসিক জ্ঞান বলা হয়।**"

এখন শ্রীবিগ্রহ সেবাকে তামসিক বলার জন্য, বেদব্যাস, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীধর স্বামীও চৈতন্যদেবের ঐ বচনানুসারে 'পাষণ্ডী' 'অদৃশ্য' 'অস্পৃশ্য' এবং 'যমদণ্ডী' হলেন কি বল ? শ্রীধর স্বামীর টীকা না মানতে চাইলে চৈতন্যদেব কি বিশেষণে

ভূষিত হবেন ? মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের যে ধ্যান ধারণা তপস্যা এবং জীবনচর্য্যার পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে তাঁকে কোথাও তো শ্রীবিগ্রহ সেবায় মত্ত থাকতে দেখা যায়নি ! ভাগবত এবং গীতাতে এই 'নরাকৃতি পরব্রহ্মের' মুখ হ'তে শ্রীবিগ্রহের পূজা এবং জড়োপাসনা সম্বন্ধে যে ধিক্কার বাণী বেরিয়েছে, এজন্য ভক্ত-রাজের বিচারে নিশ্চয়ই তাঁর যমদণ্ডের ব্যবস্থা ? শঙ্কা জাগে—কৃষ্ণের অবর্ত্তমানে চৈতন্যদেব কৃষ্ণ বিরহে কেঁদে কেঁদে জীবন কাটিয়েছেন সত্য, তাঁর শ্রীমূর্ত্তির চরণ-তলে "ক্রন্দন, শ্রীমুখ সজ্ঘর্ষণাদি" সহ গৌর-অঙ্গ ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছেন সত্য. কিন্তু কৃষ্ণ ঐ সময়ে বেঁচে থাকলে তাঁর ঐ মূর্ত্তিপূজা বিদ্বেষের জন্য, মনে হয় 'প্রভু'কে 'মহাপ্রভুর' হস্তে গদা প্রহারে জর্জ্জরিত হ'তে হ'ত !! কেন না, শ্রীবিগ্রহ মানে না এমন 'পাষণ্ডীকে' (সম্প্রদায়ীদের বর্ণনানুযায়ী) শাসন ও প্রহার করায় তাঁর নিতান্ত অরুচি ছিল না !!!

"নৃসিংহ-আবেশে প্রভু হাতে গদা লৈয়া।
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া ॥" (চৈঃ চঃ)
"ঠেঙ্গা লৈয়া উঠিল প্রভু পড়ুয়া মারিবারে
ভয়ে পলায় পড়ুয়া প্রভু পিছে ধায়।
আস্তে ব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুকে রহায় ॥"

শ্রীউমা বসু :—আপনার মতবাদ অনুযায়ী মূর্ত্তি পূজা যদি মিথ্যাই হয় তাহলে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথদেবের মূর্ত্তির মধ্যে মিশে গেলেন কি করে ? মূর্ত্তি জাগ্রত অপ্রাকৃত এবং চৈতন্যময় বলেই ত মীরাবাঈএর গিরিধারীলালের মূর্ত্তির মধ্যে আর চৈতন্যদেবের জগন্নাথ-মূর্ত্তির মধ্যে লীন হওয়া সম্ভব হয়েছিল ? লোচনদাস তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে লিখেছেন, আষাঢ় মাসে শুক্লা সপ্তমী তিথিতে রবিবার বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় গুণ্ডিচা বাড়ীতে মহাপ্রভু জগন্নাথে লীন হলেন—

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে ॥ [চৈতন্যমঙ্গল, শেষখণ্ড]

উত্তর—আমার নিজস্ব কোন মতবাদ নেই—যা সত্য বলে বুঝেছি—তাই বলি। **একটা জড়মূর্ত্তির মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের মিলিয়ে যাওয়া, মিশে যাওয়া, লীন হওয়া একেবারে মিথ্যা রটনা।** মূর্ত্তিপ্রিয় স্বার্থান্ধ পুরোহিত এবং ভণ্ড সাধুদের ও সব বুজরুকী ! ঐ সব 'অপ্রাকৃত রটনায়' মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছে

অজ্ঞ জনসাধারণ পূজা, ভেট, তীর্থপ্রণামী দিয়ে তাদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করে এ জন্যই ঐ সমস্ত মিথ্যা কল্পিত কাহিনী প্রচার করা হয়েছে। তীর্থক্ষেত্রগুলিতে ভ্রমণ করে মহর্ষি দয়ানন্দ এবং শিবনারায়ণ পরমহংসজী তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকেই পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন, কেমন সুপরিকল্পিত উপায়ে ব্যবসার জন্যই অর্থনৈতিক কারণে তীর্থগুলি গড়ে উঠেছে—তীর্থক্ষেত্রগুলি এক একটি ধর্ম্মীয় ব্যবসা কেন্দ্র! অজ্ঞ জনসাধারণকে প্রলুব্ধ করবার জন্যই দুরভি-সন্ধিপরায়ণ লোকেরাই তীর্থদেবতা সম্বন্ধে অলৌকিক কাহিনী প্রচার করেছে। যথাসময়ে গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করে দুষ্ট লোকদের চক্রান্ত ভেঙ্গে দিয়েছিলেন বলে নতুবা নেপাল বাবা এক অবতার আর তার জন্মস্থান তো অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াতো !! আমিও ভারতবর্ষের তীর্থগুলি তিন চার বার ধরে পরিক্রমা করে করে সব কিছু অলৌকিক কাহিনী বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে বিচার করে ওগুলির অসারতা বুঝতে পেরেছি।

যাই হোক্, জগন্নাথমূর্ত্তিতে চৈতন্যের মিশে যাওয়ার প্রসঙ্গে আসা যাক্। ভক্তগণ ভক্তির আতিশয্যে নিজেদের গুরুর মৃত্যু সম্বন্ধে ঐ রকম নানা আজগুবি অলৌকিক গল্প রচনা করে রটনা করে থাকে। শুনেছি, এক সাধুমা পেটের অম্লরোগে দীর্ঘ দুই বৎসর শয্যাশায়ী থেকে গভীর রাত্রিতে মারা গেলে তাঁর দু-চার জন অতিভক্ত মৃতদেহটাকে সোজা করে পদ্মাসনে বসিয়ে, হাতের আঙ্গুলগুলোকে জ্ঞানমুদ্রার ঢংএ বাঁকিয়ে, মাথায় পেরেক পুঁতে দিয়ে, বাইরের অপেক্ষমান ভক্তমণ্ডলিকে জানিয়েছিল, ব্রহ্মময়ী মা দেহান্তের পূর্ব্বে যোগস্থ হ'য়ে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে চলে গেছেন। ঠিক যে Psychological কারণে, ঐ সব অতিভক্তরা তাঁদের গুরুমার 'অপ্রাকৃত দশা' দেখালেন, ঠিক ঐ কারণে, জন সমাজের মনে ভক্তিশ্রদ্ধার ভিত্তিদৃঢ় করবার জন্যই মহাপ্রভু বা মীরাবাঈ এর মৃত্যু সম্বন্ধে ঐ রকম মিথ্যা কাহিনী রটনা করা হয়েছে। একটু বিবেক বুদ্ধি সহ বিচার করলেই ঐ সব অলীক কাহিনীর অসারত্ব ধরা পড়ে যাবে।

আচ্ছা, তুমিই ভেবে দেখ, অসীম মল্লিক এখানে এসে হঠাৎ যদি মারা যায়, আর তুমি যদি ওর বাড়ীতে গিয়ে Report দাও Train accident হ'য়ে মারা গেছে, আমি যদি ওর মা বাবকে গিয়ে বলি 'অসীমের কলেরা হয়েছিল', নরেশ বাবু গিয়ে যদি বলেন, 'ষ্টেশন থেকে যাওয়ার সময় সর্পাঘাতে

মারা গেল'। আর ডাঃ চৌধুরী যদি রিপোর্ট দেন, 'মৌলীন্দ্র বাবুর বাড়ীতে এসে অসীমবাবুর ভাবাবেশ হল, তারপর হঠাৎ দেখা গেল তিনি শূন্যমার্গে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন', তাহলে অসীমের আত্মীয় স্বজনরা পরস্পর বিরোধী রিপোর্ট থেকে তার মৃত্যু সম্বন্ধে মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে সন্দেহ করবেন কিনা?

একই লোকেব মৃত্যু সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের যদি বিভিন্ন Report হয় শুধু মাত্র তারিখটা নিয়ে. অর্থাৎ কেউ যদি বলেন বৈশাখ মাসের দুপুর বেলা, আর কেউ যদি বলেন আষাঢ় মাসের সন্ধ্যাবেলা তাহলে মৃত্যু সম্বন্ধে মৃত্যুসম্বন্ধীয় ঘটনা ও রটনা সম্বন্ধে সন্দেহ হয় কি না বলতো?

চৈতন্যদেবের মৃত্যুসম্বন্ধে নানা লোকের যে ভাব নানা রকমের রটনা আছে, তাতে সহজেই সন্দেহ হয়, তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে ভক্তরা সঠিক সংবাদ প্রচার করেন নি। কোন প্রাকৃত কাবণে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল প্রকাশ করলে পাছে তাঁর মহিমা ক্ষুন্ন হয়, এজন্য ভক্তদের মধ্যে যিনি যেমনভাবে পেরেছেন তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে অপ্রাকৃত ঘটনা রটনা করে বসে আছেন!!

(১) লোচনদাসের মতহ ঈশান নাগর তাঁর "অদ্বৈত প্রকাশে" (একবিংশ অধ্যায়). উড়িয়া ভাষায় লিখিত দিবাকর দাস তাঁর "জগন্নাথ চরিতামৃতে", অচ্যুতানন্দ তাঁর "শূণ্যসংহিতায", ঈশ্বরদাস তাঁর "চৈতন্য ভাগবতে", চৈতন্যদেব যে জগন্নাথের মূর্ত্তিতে লীন হয়ে গেছলেন—একথা লিখে গেছেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুতিথি এবং তারিখ সম্বন্ধে **সকলে যে ভাবে ভিন্ন ভিন্ন তারিখ এবং তিথির উল্লেখ করেছেন** তাতে স্পষ্টই বোঝা যায়, জগন্নাথের মূর্ত্তিতে লীন হওয়ার কাহিনী প্রচারটি তাঁদের অতিভক্তির ফল। (ক) লোচন দাসের মতে, আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে রবিবার বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়, (খ) ঈশ্বর দাসের মতে, বৈশাখ মাসে শুক্লা তৃতীয়ার দিনে, আর (গ) অচ্যুতানন্দের মতে, বৈশাখ মাসের পূর্ণিমার দিনে চৈতন্যদেব জগন্নাথের মূর্ত্তিতে লীন হয়েছেন!!

(২) এদিকে নরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁর "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থে লিখেছেন, চৈতন্যদেব টোটা গোপীনাথের মূর্ত্তিতে (জগন্নাথের মূর্ত্তিতে নয়!) লীন হয়েছেন! আবার উড়িয়া ভাষায় লেখা 'প্রেমতরঙ্গিনী" নামক গ্রন্থে কবিসূর্য্য সদানন্দ লিখেছেন—চৈতন্যদেব নাকি টোটা গোপানাথ নামক স্থানে, (মূর্ত্তিতে নয়.) অন্তর্হিত হয়ে গেছেন!!

(৩) চৈতন্য-সম্প্রদায়ের প্রামানিক গ্রন্থ " চৈতন্য চরিতামৃতে " কৃষ্ণদাস কবিরাজ টোটা গোপীনাথ বা জগন্নাথের মূর্ত্তিতে মিশে যাওয়া কোন "অপ্রাকৃত" ঘটনার উল্লেখ করেন নি। বৃন্দাবনদাস ও তাঁর "চৈতন্যভাগবতে" এ সম্বন্ধে একেবারে নীরব

(৪) জয়ানন্দ "চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থে" লিখেছেন—

আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পাত্র আচম্বিতে॥
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে॥
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্ব কথা।
কালি দশদণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা॥
মায়াশরীর তথায় রহিল যে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি॥

ডাঃ দীনেশ চন্দ্রসেন [Ref. "Chaitanya & His Age"; "Chaitanya & His companions"] শ্রীরাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়, ডাঃ বিমান বিহারী মজুমদার [Ref. "চৈতন্য-চরিতের উপাদান"], শ্রীপ্রভাত কুমার মুখার্জ্জী এম, এ, [Ref. "The History of the Medieval Vaisnavism in Orissa"] প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং গবেষণাকারী পণ্ডিতগণ জয়ানন্দ বর্ণিত চৈতন্যদেবের মৃত্যু বরণ সম্বন্ধে "প্রাকৃত" কারণটাই (অর্থাৎ দূষিত ক্ষত হয়ে) স্বীকার করে নিয়েছেন। বিশেষ করে, ডাঃ বিমান বিহারী মজুমদার এবং আরও ২।৪ জন Research scholar এ কথা মনে করেন যে রাজা প্রতাপরুদ্র রাজকার্য্য ত্যা করে একান্তভাবে গৌরাঙ্গভজনে মেতে থাকায়, পাণ্ডা পুরোহিত এবং তাঁর অমাত্যগণ **চৈতন্যদেবকে গুপ্তহত্যা করেছিলেন**। যাই হোক-**গুপ্তহত্যা** কিংবা **Sceptic** ক্ষত-যেটাই তাঁর দেহান্তের কারণ হোক না কেন, তাতে চৈতন্য-দেবের মহিমা ক্ষুন্ন হওয়ার কথা নয়। তবে So-called ভক্ত সাধু বৈষ্ণবের দল-টোটাগোপীনাথ বা জগন্নাথের মূর্ত্তিতে লীন হওয়ার যে কাহিনী প্রচার করে থাকেন, তা সর্বৈব মিথ্যা। আর এই মিথ্যা ঘটনাকে ভিত্তি করে মূর্ত্তিপূজা support করা কিংবা মূর্ত্তিকে "জাগ্রত" বলা একেবারে যুক্তিহীন। অবাস্তব!! ছলনা মাত্র!!!

তৃতীয় পুষ্প

ডাঃ বঙ্কিমচৌধুরী ঃ—আপনি বাহ্যপূজা মানেন না, ফুল জল নৈবেদ্য দিয়ে পূজাকে 'অন্তঃসারশূন্য বহিরাচার বলছেন, কিন্তু গীতাতে ত কৃষ্ণ বলছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।

দেখুন কৃষ্ণ এই শ্লোকে পত্র পুষ্প ফল জল দিয়ে পূজাকে Support করে গেছেন কি না?

উত্তরঃ—Don't float upon the language. Please dive deep into its essence. শ্লোকটির মর্ম্মার্থ গ্রহণ করুন, বুঝতে পারবেন, কৃষ্ণ ওখানে কি বলতে চেয়েছেন; বিশেষ করে 'ভক্ত্যা' এবং প্রযতাত্মনঃ' ঐ দুটি সুপ্রযুক্ত শব্দের মর্ম্মার্থ বুঝতে চেষ্টা করুন, বুঝতে পারবেন, কৃষ্ণ শাকপাতা ফল মূল দিয়ে পূজা করতে বলছেন না!

ডাঃ চৌধুরীঃ—শ্লোকটির ত অর্থ আমরা এই বুঝি যে ভগবান বলছেন,—"যিনি আমাকে ভক্তি সহকারে পত্র পুষ্প ফল ও জল প্রদান করেন, আমি সেই প্রযতাত্ম ব্যক্তির ভক্তি প্রদত্ত পত্র পুষ্পাদি গ্রহণ করি।"

উত্তর ঃ—সুন্দর কথা, এবারে আসুন, ঐ 'ভক্ত্যা' এবং প্রযতাত্মনঃ'—এই দুইটি কথার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করা যাক্।

ডাঃ চৌধুরী ঃ—আপনিই বলুন, আমরা শুনি। আমরা তো মোটামুটি ভাবে ঐ ফল জল দিয়ে পূজাই বুঝে রেখেছি।

উত্তর ঃ—'ভক্তিবশঃ পুরুষঃ'—তিনি কেবল ভক্তিই গ্রহণ করেন, আর কোন বাহ্য বিষয় নয় বা বাহ্যিকবস্তুর কোন উপকরণেরও তিনি প্রত্যাশী ন'ন। তাই কৃষ্ণ বলছেন—**ভক্ত্যা**,—অর্থাৎ ভক্তি সহকারে যা দেওয়া হয়।

এই ভক্তি কাকে বলে? নারদ ভক্তিসূত্রে আছে, "সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা"—ভগবানের প্রতি যে পরম প্রেম (কোন emotion উচ্ছ্বাস বা আবেগ নয়)—তারই নাম ভক্তি! শাণ্ডিল্যসূত্রেও ভক্তির defination হ'চ্ছে—'সা পরমাণুরক্তিঃ ঈশ্বরে"। নারদ পঞ্চরাত্রেও এই ভক্তি জিনিষটি বোঝাতে গিয়ে বলছেন—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেম সঙ্গতা
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম্ প্রহ্লাদোদ্ধব নারদৈঃ।

অন্য কোন বিষয়ে মমতা না রেখে একমাত্র বিষ্ণুতে (সেই সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মচৈতন্যে যে প্রেমপূর্ণ মমতা, হৃদয়ের গাঢ়তম টান, তাকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি ভক্তি বলেছেন! **এই ভক্তি শুদ্ধ চিত্তে স্বপ্রকাশ** কলুষ কামনা বাসনায় যাদের হৃদয় ভরা, এমন কি বিভূতি স্বর্গভোগ ইন্দ্রত্বলাভাদির জন্য লালায়িত তাদের হৃদয়ে এই ভক্তির উদয় হ'তে পারে না। বিষয়ের প্রতি একেবারে মমতাশূন্য না হ'লে, সেই নির্ব্বিষয় পরমতত্ত্বের প্রতিকায় ও অনুরাগ জন্মায় না। তাই 'ভক্ত্যা' এই কথাটি যেমন কৃষ্ণ ঐ শ্লোকে ব্যবহার করছেন তেমনি আর একটি কথাও ব্যবহার করছেন—'প্রযতাত্মনঃ'। শঙ্করাচার্য্য প্রযতাত্মনের অর্থ করছেন, "প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধবুদ্ধেঃ"। [শঙ্কর ভাষ্য] শ্রীধরস্বামীও তাঁর টীকায় বলছেন—"প্রযতাত্মন শুদ্ধচিত্তস্য নিষ্কাম ভক্তস্য"। আবার ঐ সংযম সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য বলছেন—

সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাদিন্দ্রিয় গ্রাম-সংযমঃ
যমোঽয়মিতি সংপ্রোক্তোঽভ্যসনীয়ো মুহুর্মুহুঃ।

অর্থাৎ 'একমাত্র ইষ্টদেবতা বা ব্রহ্মই সর্ব্বময় এইরূপ জ্ঞান হ'লে, বিষয় সমূহের অভ্যাস জন্য ইন্দ্রিয়গণ আপনা হতেই সংযত হয়, এই ইন্দ্রিয় সংযমই 'যম' নামে প্রসিদ্ধ। এই সংযম দৃঢ় করবার নিমিত্তই পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করবে'। তাহলে এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, প্রযতাত্মনঃ অর্থাৎ সংযত, বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ইষ্টদেবতাই সর্ব্বময় এই জ্ঞান জন্মে; তার ফলে তাঁর যৎ যৎ বস্তুতে দৃষ্টি পড়ে তৎ তৎ বস্তুতে তিনি ভগবানেরই প্রকাশ দেখেন, এই সময় তাঁর শুদ্ধ অন্তঃকরণে 'পরম প্রেমরূপা' যে ভক্তি, সেই ভক্তিরই উদয় হয়; তখন তাঁর কোন বাহ্যিক বিষয়-পত্র পুষ্পফল জল ইত্যাদি—বিষয়ের অতীত যিনি, সেই পরম পুরুষকে দেওয়ার দরকার হয় না, ভক্ত তখন নিজেকেই—তার তন্ মন ধন সুরত

সব কিছুই—তাঁর প্রীতম্ প্রিয়তমের শ্রীচরণে "নমো নম, ন মম; ন মম" বলে ডালি দেন, ভাবগ্রাহী ভক্তবৎসল ভগবানও ঐ ভক্তি ঐ প্রেমই গ্রহণ করেন।

ভগবান ভক্তিইচান—ফল জল কলা মুলা নয়

কামনা বাসনায় যাদের হৃদয় ভরে রয়েছে, সেই অসংযতাত্ম ব্যক্তির চিত্ত কখনও ঐ 'পরানুরক্তি', 'পরমপ্রেমরূপা' বিশুদ্ধাভক্তির আশ্রয় হতে পারে না, আর ভগবানও ঐ বিশুদ্ধা ভক্তিছাড়া আর কোন কিছুরই কাঙ্গাল ন'ন। তাই কৃষ্ণ ঐ শ্লোকে সংযতাত্মাযুক্ত ভক্তির কথাই মুখ্য ভাবে বলতে চেয়েছেন। কারণ চিত্ত বিশুদ্ধা ভক্তিযুক্ত না হ'লে, অসংযমী ব্যক্তির প্রদত্ত পত্রপুষ্প— ফলজল কলামুলা দিয়ে পূজার ঘটা—ভগবৎপদে পৌঁছে না, তার অন্তরস্থ ভোগলালসার শ্রীপাদপদ্মেই সে তার বাহ্য পূজার পুষ্পাঞ্জলিটি দান করে !! কারণ, মুখে সে যতই বলুক ভগবানের পূজা করছে, আসলে কিন্তু সে ভগবৎ-পূজায় ঢং দেখিয়ে চায় অজস্র কামনা বাসনার পরিপূরণ। কাজেই কৃষ্ণ ঐ শ্লোকের মাধ্যমে আপনাদের কাছে পত্র পুষ্প ফল কলা মূলা পাওয়ার জন্য 'আর্জি' (আবেদন পত্র) জানাচ্ছেন না। ভগবান যে প্রযতাত্ম ভক্তের ভক্তিটুকুই আশা করেন, এইটে ভাল করে, বোঝানই তাঁর উদ্দেশ্য। শ্রীধর স্বামী ঐ শ্লোকের টীকায় স্পষ্টভাবেই বলেছেন —"ন হি মহাবিভূতিপতেঃ পরমেশ্বরস্য ক্ষুদ্র দেবতানামিব বহু চিত্তসাধ্য যাগাদিভিঃ পরিতোষঃ স্যাৎ, কিন্তু ভক্তিমাত্রেন।"

প্রশ্নঃ—'বিশুদ্ধ চিত্ত না হ'লে ভক্তির উদয় হয় না, ভগবান ভক্তির কাঙ্গাল,' এ সব ভাল কথা, ঠিক কথা। কিন্তু তাই বলে, কৃষ্ণ এখানে 'সংযতাত্মাযুক্ত ভক্তির কথাই মুখ্যভাবে বলেছেন, এ কথা কি করে সমীচীন বলে গ্রহণ করি? তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছেন, "পত্র পুষ্প ফল জল যে যা ভক্তিপূর্ব্বক দান করে আমি তা গ্রহণ করি'। 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং —আপনি একথা উড়িয়ে দিতে চান কোন্ যুক্তিতে? বাহ্যপূজা বহিরাচারকে খণ্ডন করবার জন্য আপনি যেন কোমর বেঁধে লেগেছেন, তাই ঐ সব টেনে বুনে অর্থ করেছেন!

উত্তর—দেখুন ভাই, সত্য স্বপ্রকাশ, স্বয়ং প্রকাশ, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য কোমর বেঁধে লাগবার প্রয়োজন নেই, টেনে বুনে অর্থ করারও দরকার হবে না। বরং যারা সত্যকে গোপন করে মিথ্যা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠা বজায়

রাখতে চায়, তারাই সত্য অর্থ গোপন করেছে, সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করবার জন্যই কোমর বেঁধে লেগে টেনে বুনে অর্থ করে গিয়েছে! তাই বেদ শ্রুতিবিরুদ্ধ, অনুভব সিদ্ধ মহাপুরুষদের উপলব্ধি বিরোধী বহিরাচারের চারিদিকে আজ ঘনঘটা !!

কোন কথার সব সময় যে Literal meaning নিতে হয়, তা নয়, Inner spirit টাই গ্রহণ করতে হয়, আশা করি, একথা আপনি মানেন। ধরুন আপনি যদি কাউকে কথা প্রসঙ্গে বলেন, "অহঙ্কারী জমিদার পূজার সময় নিজের ঐশ্বর্য্য দেখবার জন্য লুচি পোলাও খাওয়ার কিন্তু নিমন্ত্রিত কাউকে অভ্যর্থনা করে না। ওরকম লুচি পোলাও খাওয়ার চেয়ে গরীবের বাড়ীর খুদকুড়া ঢের—ঢের ভাল"। এখানে কি আপনি, গরীবের বাড়ীতে আদর আপ্যায়ণ আন্তরিকতা ভালবাসা পান বলে, সেইটেরই প্রশংসা করছেন, না—সত্য সত্যই তাঁর বাড়ীতে গিয়ে খুদকুঁড়া খেতে চান? মনে করুন, আপনার ঐ কথা শুনে কোন গরীব বন্ধু যদি সত্যসত্যই তাঁর বাড়ীতে ডেকে খুদকুঁড়া ভূষি খেতে দেন, তাহলে কেমন হয়? "গরীবের খুদকুঁড়া ঢের ঢের ভাল"—আপনার এই কথার Inner Spirit টা বোঝার পরিবর্তে Literal meaning নিয়ে আপনার সঙ্গে আচরণ করলে তা কি মধুর হবে?

জনশ্রুতি আছে, শ্রীকৃষ্ণ একবার ভক্তশ্রেষ্ঠ বিদুরের বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। বিদুর পত্নী তাঁদের আরাধ্য ইষ্টকে স্বয়ং উপস্থিত দেখে এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি কৃষ্ণকে কলা খাওয়ানোর সময়, কলাটা ফেলে দিয়ে কলার খোসাটাই তাঁর মুখে দিয়েছিলেন! প্রিয়তম ইষ্টের দর্শনে তাঁর স্থান কাল পাত্র জ্ঞান ছিলনা, দেহাত্মবোধই ছিল না, ভক্তবৎসল, তাঁর ভগবানও পরমপ্রেমভরে সেই খোসাটাই খেয়েছিলেন। এখানে কৃষ্ণ, ভক্তিমতী সাধ্বী বিদুর পত্নীর অন্তরের গাঢ় অনুরাগ, হৃদয়ভরা টানটাই গ্রহণ করেছিলেন, না, কলাচপার লোভে খোসা (চপা) গুলো খেয়ে ফেলেছিলেন? এই ঘটনার Inner Spirit টা না নিয়ে, কৃষ্ণ যেহেতু কলার খোসা শ্রেষ্ঠ ভক্তের বাড়ীতে খেয়েছিলেন, এজন্য কি আপনারা ধরে নিবেন, কলা চপা কৃষ্ণের বড় প্রিয়, শ্রেষ্ঠ ভক্ত হ'তে হলে, কলাচপার নৈবেদ্য, কৃষ্ণকে, মানে আপনাদের ভগবানকে দিতে হয়?

কৃষ্ণ যদি কোথাও বলেন, 'ঐশ্বর্য্য মদমত্ত দুর্য্যোধনের উপাদেয় নৈবেদ্য—সম্ভারের চেয়ে বিদুরের বাড়ীর খুদকুঁড়া এবং কলাচপা আমার ঢের-ঢের বেশী

প্রিয়', মলিন অহঙ্কারে কলুষিত ব্যক্তির পূজার চেয়ে শুদ্ধ হৃদয় প্রেমিক ভক্তের প্রেমটুকু চাচ্ছেন—কৃষ্ণকথার এই অর্থ গ্রহণ না করে, আপনারা কি ঐ কথার এই অর্থ বুঝবেন যে সত্য সত্যই কৃষ্ণ বিদুরের বাড়ীতে গিয়ে খুদকুঁড়া আর কলাচপা খেতে চাচ্ছেন!

এই শ্লোকে কৃষ্ণ বাহ্য পূজা সমর্থন করেছেন বোঝায় না

তেমনি, আলোচ্য শ্লোকে, 'বিশুদ্ধ হৃদয় আমাগত প্রাণভক্ত ভক্তিসহকারে পত্র পুষ্প ফলজল যা কিছু দেয়, আমি তা গ্রহণ করি', ঐ কথার তাৎপর্য্য, তিনি ভক্তের হৃদয়ভরা টানটুকুই চান, সত্য সত্যই শাকপাতা ফলমূল চাচ্ছেন না; যেমন, ধনীর বাড়ীর পোলাও এর চেয়ে খুদকুঁড়া ঢের প্রিয় বললে আন্তরিকতা এবং শ্রদ্ধার কথাটাই বোঝায়, actually খুদকুঁড়া চাওয়া খাওয়া বোঝায় না।

কোন গ্রন্থের কোন শ্লোক বা মহাপুরুষের কোন বাণীর মর্ম্মার্থ বুঝতে হ'লে তার উদ্দেশ্য এবং প্রসঙ্গ, পূর্ব্বাপর ভালকরে বিবেচনা করতে হয়। কোন অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে, মনোমত অর্থ যোজনা করে নেওয়া উচিত নয়। আলোচ্য শ্লোকটিও কৃষ্ণ **কী উদ্দেশ্যে কোন প্রসঙ্গে** বলছেন তা যদি পূর্ব্বাপর বিচার করে দেখেন, বুঝতে পারবেন আমি যা বলছি তাই ঠিক, এ কোন টেনে বুনে অর্থ করা নয়। 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং' উপদেশটি কৃষ্ণ বাহ্যপূজা বা বহিরাচার সমর্থন করতে গিয়ে বলেন নি। এটি নবম অধ্যায়ের ২৬ নং শ্লোক; ২০ নং শ্লোক থেকে ২৪ নং শ্লোক পর্য্যন্ত শ্লোকে, ভগবানের নানাবিধ উপাসকদের মধ্যে সকাম সাধকগণ কিরকম গতি লাভ করেন আর নিষ্কাম ভক্তগণ কিরকম ফল লাভ করেন, এই কথা বোঝাতে গিয়ে অর্জ্জুনকে বলছেন যে, "ভ্রমান্ধগণ বহু আয়াস এবং ব্যয়সাধ্য যাগযজ্ঞ ত্রিবেদোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান, অগ্নিষ্টোমাদি কাম্য কর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্র বসু রুদ্র আদিত্যাদির পূজা করে—ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে—,স্বর্গ কামনা করে এবং পরিণামে চরমফল মোক্ষলাভের পরিবর্ত্তে স্বর্গসুখ লাভ করে তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেব ভোগান্ (২০ নং), কিন্তু এই স্বর্গসুখ ক্ষণস্থায়ী, কাজেই তুচ্ছ; তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণেপুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি, সকাম কর্ম্মের দ্বারা দেবতা আরাধনার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় না, কাজেই জন্মমৃত্যু অতিক্রম করা যায় না, বরং এইরূপ স্বর্গ কামনায়, বেদোক্ত কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সংসারে

বারংবার গমনাগমন করতে হয়—এবং ধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে (২১ নং)। এই গতাগতি বন্ধের একমাত্র উপায় পরমেশ্বরকে পাওয়া, 'ভক্তিবলেই আমাকে লাভ করা যেতে পারে, আমাগত প্রাণ অনন্য চিত্ত ভক্তই আমাকে লাভ করে কৃতকৃত্য হয়'।

আলোচ্য শ্লোকের Immediate পূর্ব্বশ্লোকে আরও clearly বলছেন, 'যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ, ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা, যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ (২৫ নং), দেবতাগণের পূজা করে মরণান্তে সে সেই দেবতাদেরকেই পায়, পিতৃগণের পূজা করলে পিতৃগণকে আর যক্ষরক্ষ বিনায়ক মাতৃগণাদি ভূতগণের পূজা করলে ভূতগণকে পাবে, কিন্তু যে আমার (ভগবানের) পূজা করবে সে আমাকেই লাভ করবে"!

দেবগণ পিতৃগণ ভূতগণের পূজাদি কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান, অগ্নিষ্টোম যাগযজ্ঞাদির ফল যে অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ, Cycle of birth and death যে তাতে অতিক্রম করা যায় না, পরাশান্তি লাভ হয় না, এ সবের দ্বারা যে পরিণামে পরমসুখকর পরমেশ্বরকে পাওয়া যায় না, তা পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে পরিষ্কারভাবে বলার পর, এই শ্লোকে, তাঁর ভক্ত কেবলমাত্র তদ্‌গতপ্রাণ ভক্তই যে তাঁকে পাবে, সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের উপাসনা করে পরমানন্দ লাভ করবে, পুনরাবৃত্তি থেকে অব্যাহতি পাবে, তা স্পষ্ট করে বলছেন মদ্ যাজিনঃ অপি (আমার পূজকগণ, ভক্তগণ) মাং (আমাকে) যান্তি (লাভ করেন)।

ব্যয়বহুল যাগযজ্ঞ শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের দ্বারা দেবগণ পিতৃগণ তুষ্ট হ'ন একথা তো কৃষ্ণ পূর্বেই বলেছেন (ঐ, ২০), এইবার **স্বয়ং ভগবান্ কিসে তুষ্ট হ'ন** সে কথা বলতে গিয়ে, আমরা যেমন অহংকারের চেয়ে আন্তরিকতা এবং আদরের উৎকর্ষতা, শ্রেষ্ঠতা, প্রকাশ করতে গিয়ে বলি, 'অহংকারীর লুচিপলাওএর চেয়ে গরীবের খুদকুঁড়া ঢের ভাল', সেই রকম ব্যয়সাধ্য যাগযজ্ঞে দেবতারা তুষ্ট হলেও অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি দয়ালু ভক্তবৎসল ভগবান যে কেবলমাত্র ভক্তিটুকুই চান, ভক্তিই ভগবৎ-উপাসনার মূল উপাদান, সেইটে বোঝাতে গিয়ে, সকাম ভক্তদের আড়ম্বরময় যাগযজ্ঞের চেয়ে নিষ্কাম ভক্তের ভক্তিটুকুই ভগবানের অধিকতর প্রিয়, তা প্রকাশ করতে গিয়ে, আলোচ্য শ্লোকে কৃষ্ণ বলছেন, '(নিষ্কাম) ভক্ত পত্রপুষ্প ফল জল ভক্তিভরে যা দেয় তাই আমি গ্রহণ করি'; এখানে পত্র পুষ্প

ফল জল নয়, ঐ সব অকিঞ্চিৎকর বস্তুর মাধ্যমে ভক্তের যে ভালবাসার পরিচয় মেলে, ভগবান ঐ ভালবাসাটাই চান, ঐ ভালবাসাটুকুরই তিনি ভিখারী। তাই, শ্রীধরস্বামী কৃষ্ণবাক্যের ঐ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করে ঐ শ্লোকের টীকায় বলছেন, 'ন হি মহাবিভূতিপতেঃ পরমেশ্বরস্য মম ক্ষুদ্রদেবতানামিব বহুবিত্তসাধ্য যাগাদিভিঃ পরিতোষঃ স্যাৎ, কিন্তু ভক্তিমাত্রেন।'

ভক্তিই যে তিনি চান, পত্র পুষ্প ফল জলের বাহ্যাড়ম্বর নয় তা আপনি পরবর্ত্তী শ্লোকগুলি অর্থাৎ ২৭ থেকে ৩৪ পর্য্যন্ত, বাকী সমগ্র নবম অধ্যায়টি ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করলেই বুঝতে পারবেন। এরপর থেকে কৃষ্ণ সকল শ্লোকগুলিতেই ভক্তির মহাত্ম্য কীর্ত্তন করেছেন। ফুলজল কলা মূলার নৈবেদ্য দেওয়ার কোন আবেদন, ঢাকঢোলের কলরোল, বহিরাচারের কোন কথা, কোন ইঙ্গিত কৃষ্ণ করেন নি। কেবল তদ গতপ্রাণতায়, কেবল ভক্তিভরে সব কিছু তাঁকে সমর্পণ করলেই যে ভগবানকে লাভ করা যায় তা তিনি ব্যক্ত করেছেন—"হে কৌন্তেয়! যা কিছু কর সব আমাতেই অর্পণ কর— তৎকুরুষ মদর্পণম্, তাহলেই শুভাশুভ কর্ম্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে পাবে— মামুপৈষ্যসি (ঐ ২৭—২৮); যারা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে তারা আমাতেই অবস্থান করে—যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ (ঐ ২৯)"। ৩০ নং থেকে ৩৩ নং পর্য্যন্ত শ্লোকগুলিতে ভক্তি বলে যে,— অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মাং অনন্যভাক্ (ঐ ৩০), শুধু দুরাচার নয় সুদুরাচার, পাষণ্ড নয় মহাপাষণ্ডও মুক্ত হয় পরাশান্তি লাভ করে—ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বৎশান্তিং নিগচ্ছতি (ঐ ৩১), তারজন্য তাকে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত্য কিংবা কোন রকম যাগযজ্ঞাদি বহিরাচারের অনুষ্ঠান করতে হয় না, তা আরও স্পষ্টতর করে বলছেন—'ভগবতভক্ত যে, স্ত্রী শূদ্র বৈশ্য যা কিছু হোক না কেন, যে কোন পাপযোনিসম্ভূত হোক্ না কেন, তার হৃদয়ে যদি শুদ্ধাভক্তি থাকে, তাহলে সে পরাগতি লাভ করবে—স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং (ঐ ৩২), কাজেই তাকে কোন বহিরাচারের অনুষ্ঠান করতে হবে না, সব রকম কাম্য কর্ম্ম বাহ্যিক ধর্ম্মাচরণ দে-দেবতা থেকে মন তুলে নিয়ে কেবল তদ্‌গতপ্রাণ ভক্ত হ'তে হবে—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ ··মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণ"

(ঐ ৩৪ থেকে ৯ম অধ্যায়ের শেষ শ্লোক পর্য্যন্ত)

আশা করি পূর্ব্বাপর বিচার করে, উদ্দেশ্য এবং প্রসঙ্গ পর্য্যালোচনা করে বুঝতে পারছেন, আপনার ঐ শ্লোকটির আমি কোন টেনে বুনে অর্থ করি নি, যারা সত্যধর্ম্ম সত্যমর্ম্ম গোপন করে তামসপূজা বহিরাচারের দালালি ও বাণিজ্য করে গেছে তারাই মুখ্য উদ্দেশ্য মুখ্য অর্থের কদর্থ করে বহিরাচার Support করে গেছে, তদনুযায়ী ভাগবৎ - আরাধনার নামে একটা জড়মূর্ত্তির সামনে শাকপাতা কলামূলার নৈবেদ্য সাজিয়ে আপনারা বহিরাচারে "ভটকে" মরছেন ! বিভ্রান্ত হচ্ছেন !!!

শ্রীশরৎচন্দ্র রায় :—

যাক্, গীতাতে বহিরাচারের Support থাক্ বা না থাক্, কিন্তু মূর্ত্তি-পূজার কথা যে আছে, তাতো অস্বীকার করতে পারবেন না। গীতার ৭ম অধ্যায়ের ২১ নং শ্লোকটি বিচার করে দেখুন সেখানে কৃষ্ণ বলেছেন যে, যে দেবমূর্ত্তির শ্রদ্ধাভরে পূজা করে, আমি অন্তর্য্যামীরূপে সেই সেই ব্যক্তির তন্মূর্ত্তিতে ভক্তি দৃঢ় করে দিয়ে থাকি।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্ত শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্।　(ঐ ৭ ২১)

এইতো এখানে তনুং অর্থাৎ মূর্ত্তিকে পুজার কথা বলছেন !

উত্তর :—গুরু কৃপায় আমার ঐ শ্লোকটি বিচার করে দেখা আছে, কাজেই আমার আর পুনর্বিচারের প্রয়োজন নাই, দয়া করে তুমিই যদি ঐ শ্লোকটির **উদ্দেশ্য প্রসঙ্গ** এবং **পূর্ব্বাপর** বিচার করে, একটু সংস্কারমুক্ত বুদ্ধিতে বুঝে দেখতে চেষ্টা কর, তাহলে স্পষ্টই বুঝতে পারবে, তনুং বলতে ওখানে কৃষ্ণ তোমাদের অতি প্রিয় কাঠখড় মাটি পাথরের দ্বিভুজ চতুর্ভুজ ধড়াচুড়াধারী কোন জড়মূর্ত্তির পূজার কথা বলেন নি ! ১৬নং শ্লোক থেকে ১৯নং পর্য্যন্ত শ্লোকে, 'আর্ত্ত অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী—এই চারি প্রকারের ভক্ত ভগবানকে ডাকে, তারমধ্যে জ্ঞানীই হচ্ছে শ্রেষ্ঠভক্ত, নিত্যযুক্ত ভক্ত। বহু জন্মের পর সর্ব্বত্রই বাসুদেব যে বিরাজ করছেন, এই জ্ঞান জ্ঞানী ভক্তদের জন্মায়' ইত্যাদি বলে, ঐ শ্লোকটির Immediate পূর্ব্বশ্লোক ২০নম্বরে কৃষ্ণ কিভাবে জ্ঞানবান ভক্তেরা ছাড়া অন্যান্য সকলে কামনা বাসনার

অধীন হয়ে কিভাবে 'বাসুদেব সর্বমিতি' এই ভাবের পরিবর্তে, বাসুদেব অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের উপাসনার পরিবর্তে **জপ তপ উপাসনাদি নানা রকম নিয়মে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদেবতার পুজা** নিয়ে বৃথাই বিব্রত থাকে, সেই কথাই বোঝাতে গিয়ে কৃষ্ণ বলছেন—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তে অন্য দেবতাঃ
তং তং নিয়মাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়াঃ। (ঐ ২০)

অর্থাৎ 'কামনাদ্বারা যাদের তত্ত্বজ্ঞান বিনষ্ট হয়েছে, তারাই তাদের পূর্ব পূর্ব বাসনানুসারে জপ উপবাস নিয়মাদির আশ্রয় করে, (বাসুদেবকে বাদ দিয়ে) অন্য দেবতার উপাসনা করে'। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী বলছেন— "......যে তু তৈ স্তৈঃ পুত্রকীর্ত্তি শত্রু জয়াদিবিষয়ৈঃ কামৈরপহৃতবিবেকাঃ সন্তোঽন্যা ক্ষুদ্রা ভূতপ্রেতযক্ষাদ্যা দেবতা ভজন্তি, কিং কৃত্বা? তত্তদ্দেবতারাধনে যো যো নিয়ম উপবাসাদিলক্ষনস্তং তং নিয়মং স্বীকৃত্য...ইত্যাদি"। তাহলে কুড়ি নং শ্লোকে কৃষ্ণবাক্যের তাৎপর্য্যানুযায়ী স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, যারা পরমাত্মাকে বাদ দিয়ে, দেবতাদের আরাধনা করে, পরমদেবতার উপাসনা না করে উপদেবতার চরণে উপবাস জপাদি সহ ফল জল দেয়—তার কারণ—**কামনার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের বিনষ্টি**। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনা সিদ্ধির আশায় ভগবানকে না ভালবেসে তাঁরই অন্য অন্য তনু ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ শিবাদি "অন্যদেবতার" যে উপাসনা করে, সে তুচ্ছ ফল পায়, এ ফলও ঐ সব দেবতারা দেন না, তাঁদের মধ্যে অন্তর্য্যামীরূপে বিরাজমান থেকে শ্রীভগবানই তা দান করেন— এই কথাই বিষদভাবে বোঝাতে গিয়ে আলোচ্য শ্লোকে এবং তার পরের শ্লোকটিতে বলছেন—যো যো যাং যাং তনুং ভক্ত .... (ঐ, ৭-২১) অর্থাৎ, "যে যে সকামব্যক্তি ভক্তি যুক্ত হয়ে যে যে দেবমূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধা পূর্বক অর্চ্চনা করতে প্রবৃত্ত হয়, 'আমিই অন্তর্য্যামীরূপে সেই সেই ব্যক্তির ভক্তি তাতেই দৃঢ় করে দিই" যেমন কাশীতে এক সন্ন্যাসী এক বিশেষ মঠের তরফ থেকে অন্য মঠের সন্ন্যাসীদেরকে আমন্ত্রণ জানাতে এলে বলেন, "মুমুক্ষুভবনমেঁ কাল বিশ্ মূর্ত্তিকো ভিক্ষা হোগা", এ কথাতে 'মূর্ত্তি' বলতে যেমন কুড়িজন সন্ন্যাসীকেই বোঝায়, মাটি কাঠ পাথরের কোন জড়মূর্ত্তি নয়, **তেমনি এখানেও দেবমূর্ত্তি বলতে দেবতাকেই বোঝাচ্ছে; এখানে ঈশ্বরের দেবতারূপ তনু বা মূর্ত্তি এই অর্থ ই গ্রহনীয়।**

পূর্ব্ব শ্লোকে যে 'অন্যদেবতাঃ'র উল্লেখ আছে, এখানে "তনু" তারই substitute হিসেবে বসেছে। শঙ্করাচার্য্য তাই তাঁর ভাষ্যে "তনুং" বলতে "দেবতাতনুং" বলেছেন,—"যো যঃ কামী যাং যাং দেবতাতনুং শ্রদ্ধয়া সংযুক্তো ভক্তশ্চ পূজয়িতুমিচ্ছতি তস্য তস্য কামিনোঽচলাং স্থিরাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধামি স্থিরীকরোমি"। [শঙ্কর ভাষ্য ২১ শ্লোকের]

তনু বলতে এখানে মূর্ত্তি নয়, দেবতা।

তনু বলতে যে তোমাদের ধারণা অনুযায়ী কোন জড়মূর্ত্তি নয়, ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ বায়ু সূর্য্যাদি দেবতা উপদেবতা, শ্রীধরস্বামীর টীকা পড়লেও তা আরও স্পষ্ট করে বুঝতে পারবে,—"......যো যো ভক্ত যাং যাং **তনুং দেবতারূপাং** মদীয়ামেব মূর্ত্তিং শ্রদ্ধয়াঽর্চ্চিতুমিচ্ছতি প্রবর্ত্ততে তস্য তস্য ভক্তস্য তন্মূর্ত্তিবিষয়াং তামেব শ্রদ্ধামচলাং দৃঢ়মহমন্তর্য্যামী বিদধামী করোমি ;" অর্থাৎ, যে যে ভক্ত দেবতারূপা মদীয় যে যে তনুরূপী মূর্ত্তিকে অর্থাৎ ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বরুণ প্রভৃতি দেবতাকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চনা করতে প্রবৃত্ত হয়, আমি (পরমাত্মা) সেই সেই ভক্তের সেই সেই দেবতা বিষয়ক শ্রদ্ধাই সুদৃঢ় করে থাকি।

আলোচ্য শ্লোকের Immediate পূর্ব্বের শ্লোকে দৃষ্টিপাত করলেই যেমন বোঝা যায় 'অন্যদেবতার' পরিবর্ত্তে ঐ 'তনু' শব্দ use করা হয়েছে, তেমনি Immediate পরের শ্লোক (ঐ, ২২) আলোচনা করলে 'তনু' শব্দের অর্থ আরও স্পষ্টতর হয়।

'স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে, লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্'। (ঐ, ২২) এখানে "তস্যাঃ" বসেছে—কৃষ্ণ, 'তনু' বলতে দেবতা mean করেছেন বলে, সেই "দেবতা"'র substitute word হিসেবে ; কোন "জড়মূর্ত্তি"'র sense এ নয়। 'তনু' বলতে যে কৃষ্ণ 'দেবতা' বলতে চেয়েছেন, শ্রীধরস্বামী ঐ শ্লোকের টীকায় আরও খুলে লিখে দিয়েছেন—"......ততশ্চ যে সংকল্পিতা কামাস্তান্ কামাংস্ততো **দেবতা** বিশেষাল্লভতে। কিন্তু ময়ৈব **তত্তদ্দেব-তাম্ভ**র্য্যামিনা বিহিতান্ নির্ম্মিতান্ হি স্ফুটমেতৎ তত্তদেব তানামপি মদধীনত্বাম্মদর্ত্ত-ত্বাচ্চেত্যর্থঃ।" [ঐ,২২]

যারা পাপকর্ম্মা, মূঢ়, নরাধম এবং মায়াচ্ছন্ন, সেই অসুরভাবাপন্ন লোকেরাই ভগবানের ভজনা করে না [ঐ,১৫], আবার ধর্ম্মাচরণ করে যারা,

তাদের মধ্যেও যারা কামনা বাসনায় পিষ্ট, তারা নিঃশ্রেয়স লাভের কামনায় পরমাত্মার উপাসনার পরিবর্ত্তে প্রেয়োলাভের আশায় সামান্য দেবতা উপদেবতার আরাধনা করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিদ্ধিতে মুগ্ধ থাকে। দেবতা উপাসনা এবং সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের উপাসনাতে কি difference এই প্রসঙ্গই গীতার প্রবক্তা ১৫নং শ্লোক থেকে করে আসছেন এবং **এই প্রসঙ্গেই, এই সব দেবতাদের বিষয়েই আলোচ্য শ্লোকে 'তনু' শব্দ ব্যবহার করেছেন,** ২৩ নং শ্লোকে তা আরও স্পষ্টতর হয়েছে দেখ—

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ।।

কৃষ্ণ পুতুলপূজার নিন্দাই করেছেন

অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের আরাধনালব্ধ ফলবিনাশী হয়ে থাকে, কেন না তারা দেবার্চ্চনার দ্বারা দেবলোকই প্রাপ্ত হয় আর আমার ভক্তগণ পরিণামে আমাকেই অর্থাৎ মুক্তিপদ (ব্রহ্মপদ) লাভ করে থাকেন"। **লক্ষ্য করার বিষয়, দেবতাদের যারা পূজা করে তাদেরকে এই শ্লোকে তোমাদেরই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান 'অল্পমেধস" বলে ধিক্কৃত হয়েছেন, পরবর্ত্তী শ্লোকে [ঐ ২৪] "অবুদ্ধয়ঃ" অর্থাৎ অবিবেকী, নির্ব্বোধ বলে আরও নিন্দা করেছেন!** যেখানে দেবতা উপাসনাকে শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে **ধিক্কার দিচ্ছেন, তখন মাটি কাঠ পাথরের পুতুল পূজককে তিনি কী বলবেন তা আশা করা যায়!! কাজেই 'তনু' কথার দ্বারা তিনি যে জড়মূর্ত্তি পূজার পক্ষে কোন উপদেশ দেন নি, সামান্য ও যার** Common sense **আছে, সে এটা বুঝতে পারবে বলে মনে করি।**

যে সব পাষাণ প্রিয় বন্ধুগণ শ্রীবিগ্রহ সেবারত প্রভুপাদগণ —৭ম অধ্যায়ের ২১নং শ্লোকের "তনু" কথাটিতে উল্লসিত হয়ে মূর্ত্তিপূজার স্বপক্ষে যুক্তি দেখাতে চেষ্টা করেন, ২৪ নং শ্লোকটির তাৎপর্য্য এবং তার শ্রীধরস্বামীকৃত টিকা পড়লেই দেখা যাবে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁদেরকে সম্পূর্ণ নিরাশ করেছেন, পথে বসিয়েছেন—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ।।

"...... অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতম্। মাং ব্যক্তিং মনুষ্য মৎসকূর্ম্মাদিভাবং প্রাপ্তমবুদ্ধয়ো মন্যন্তে। তত্র হেতু মম পরং ভাবং স্বরূপমজানন্তঃ। কথং ভূতম্? অব্যয়ং নিত্যং। **অর্থাৎ মন্দমতি মূঢ়গণ আমার (পরমাত্মার) নিত্য ও সর্ব্বোত্তম পরমভাব বুঝতে না পেরে, প্রপঞ্চের অতীত আমাকে (পরমাত্মাকে) মানুষ, মৎস্য কূর্ম্ম, বরাহাদি অবতারভাব প্রাপ্ত বলে সাকার মনে করে** এবং আমাকে তুমি অনাদর করে, শাস্ত্র ফল লাভের আশায় শীঘ্র অথচ ক্ষুদ্র ফলদানকারী ঐ সমস্ত দেবতার ভজনা করে থাকে। [ঐ শ্রীধরস্বামীর টীকা সানুবাদ]

আশা করি, পূর্ব্বাপর, প্রসঙ্গ এবং উদ্দেশ্য Quote করে করে এই যে পর্য্যালোচনা করা হ'ল, তনু অর্থে যে জড়মূর্ত্তি নয়,—আশা করি, তোমার বোধগম্য হয়েছে। আমার এই analysis কে পাষাণপ্রিয় বন্ধুগণ যাতে টেনেবুনে অর্থ করা বা কষ্ট কল্পনা বলে মনে না করতে পারেন, এজন্য ঐ ২১ নং শ্লোকটির তাৎপর্য্য নির্ণয় করতে গিয়ে ১৫ নং থেকে ২৪ নং পর্য্যন্ত পূর্ব্বাপর সব কিছু সর্ব্বজনমান্য বিশেষ করে অর্চ্চাবিগ্রহের সেবাতে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ প্রভুপাদেরও বিশেষ মান্য শ্রীধরস্বামীর টীকাসহ আলোচনা করে দেখালুম।

চতুর্থ পুষ্প

ডাঃ বঙ্কিম চৌধুরী :—আপনি অবতারবাদ মানেন না, ঠাকুরের মূর্ত্তি মানেন না, কিন্তু গুরুবাদ ত বেশ মানেন দেখছি! মূর্ত্তিপূজা অনেক ভাল, মূর্ত্তি ঠকায় না, কিছু চায়ও না, কম বেশী দিলে আপত্তিও করে না, কিন্তু মানুষ গুরুর কাছে ত কোন নিজস্ব সত্ত্বা, Individuality বা Personality থাকে না! কবীর নানক রাধাস্বামী সাহেব প্রভৃতির যে সমস্ত সন্তবাণীর আপনি এমন সমর্থক আমারও কিছু কিছু সুযোগ হয়েছে ঐ সমস্ত সন্ত সাহিত্য চর্চ্চা করবার। দে-দেবতা জড়মূর্ত্তি পূজা প্রভৃতির প্রতি তাদের কি তীব্র আক্রমণ, কী বিদ্রূপ! কিন্তু গুরুস্তুতিতে একবারে পঞ্চমুখ!

নানক বলছেন—

(১) গুরু সমরথ গুরু নিরংকার, গুরু উচা অগম অপার,
গুরু কি মহিমা অগম হৈ, ক্যা কথে কথনহার।

... ...

গুরু কী ভগতী করহি ক্যা প্রাণী, ব্রহ্মে ইন্দর্ মহেশ ন জানী।

... ...

তেরা অন্ত ন যাই লখ্যা, অকথ ন যাই হর কথ্যা।
নানক জিনকো সতগুরু মিলিয়া। তিনকো লিখা নিবড়িয়া।

কবীর সাহেব বলছেন—

(২) গুরু কো কীজে দণ্ডবৎ কোটি কোটি পরনাম।
কীট ন জানে ভৃংগ কো, গুরু করলে আপ সমান।
গুরু কো মানুষ জানতে, চরণামৃতকো পান (পানি)।
তে নর নরক যায়েঙ্গে জনম জনম হোয় শ্বান (কুত্তা)।

... ...

জা খোজত ব্রহ্মা থকে সুর নর মুনি দেবা।
কহে শুন সাধবা কর সত গুরু সেবা॥

সাধ মিলে, সাহেব মিলে, অন্তর রহিন রেখ।
মনসা বাচা কর্ম্মনা সাধু-সাহেব এক।
অলখ পুরুষ কা আরসী সাধু হী—কী দেহ।
লখা জো চাহে অলখ কো উনহী ঁ লখ লেহ।

রাধাস্বামী সাহেবেরও দেখছি—ঠিক ঐ রকমই গুরুভক্তির বাড়াবাড়ি !! তিনি বলছেন—

(৩) গুরু কী কর হরদম পূজা, গুরু সমান কোই দেব ন দূজা॥
গুরুচরণ সেব নিত করিয়ে। তন্ মন্ গুর আগে ধরিয়ে॥
গুরু ব্রহ্মরূপ ধর আয়ে, গুরু পারব্রহ্ম গতি গায়ে॥
গুরু সত্‌নাম পদখোলা, গুরু অলখ্ অগম্ কো তোলা।
গুরু রূপ ধরা রাধাস্বামী, গুরু সে বড় নহী ঁ অনামী॥

এই দেখুন এঁদের গুরুভক্তির গোঁড়ামি এবং আতিশয্য টা! গুরুকে দণ্ডবৎ কোটি কোটি প্রণাম, তন্‌মন্ দিয়ে তাঁর সেবা করতে বলছেন! গুরুর মহিমা নাকি ব্রহ্মা ইন্দ্র শিবও জানেন না! ব্রহ্মা-সুর-নর-মুনিগণ গুরুর মহিমা জানতে গিয়ে নাকি কোন ইয়ত্তাই পান নি!! গুরুকে মানুষ ভাবলে, তাঁর চরণামৃতকে জল ভাবলে, নাকি নরকে পচতে হবে, জন্ম জন্ম কুত্তা হতে হবে!!! বলুন এ কি brain power আর Man-power এর Exploitation নয়? শিষ্যতো তাহলে গুরুর কাছে একেবারে গোলাম, ক্রীতদাসেরও অধম হ'য়ে পড়বে! একেবারে Loss of personality !! আমাদেরই মত একজন দেহধারী মানুষের কাছে এই রকম গোলামী এ যে মূর্ত্তিপূজা, দেবতাদের 'গোখরঃ' হওয়া এবং অবতারবাদের চেয়েও মারাত্মক !!!

উত্তর:—বড় আনন্দের কথা যে আপনি কবীর সাহেব, গুরু নানক এবং রাধাস্বামী সাহেবের মত মহাপুরুষদের, সন্তসদ্‌গুরুদের বাণী বচন পড়েছেন। কিন্তু তাঁদের কথাগুলি আমার মনে হয় ভাল করে মনন বা বিচার করে তার মর্ম্মগ্রহণ করেন নি! শুধু যে ওঁরাই শুধু, গুরুর স্তুতিতে ঐ রকম (আপনার ভাষায় 'বাড়াবাড়ি'!) ভাব-ভক্তি দেখিয়েছেন তা নয়, বেদ উপনিষদ, বাইবেল, কোরাণ্, জেন্দ অবেস্তা হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বৌদ্ধ প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই শাস্ত্র থেকেও আমি ঐ রকম গুরুস্তুতির "বাড়াবাড়ি", "আতিশয্যের" সহস্র সহস্র

প্রমাণ দিতে পারি। কেবল সন্তদের বাণীকেই "গোঁড়ামি" বলা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির পরিচয়। সন্তগণ যে টুকু গুরুস্তুতি করেছেন তা ন্যায়ভাবেই করেছেন—সুসঙ্গত কারণে; উপলব্ধ সত্যকে যথাযথভাবে বর্ণনা 'বাড়াবাড়ি' বা 'গোঁড়ামি' নয়।

হিন্দুশাস্ত্রে সদ্‌গুরু মহিমা

প্রথমতঃ হিন্দুশাস্ত্র থেকেই ঐরকম 'বাড়াবাড়ী'র (আপনার মতে), কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি।

(১) গুরুঃব্রহ্মা গুরুঃবিষ্ণুঃ গুরুদেবঃ মহেশ্বরঃ।
গুরুদেবঃ পরব্রহ্মঃ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।।

(২) "আপনি আসেন কৃষ্ণ গুরুচৈত্য রূপে" (চৈতন্য)

(৩) শিব রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরু রুষ্টে ন কশ্চনঃ।

(৪) গুরুঃ পিতা গুরুর্ম্মাতা গুরুর্দ্দেবো ন সংশয়ঃ।
কর্ম্মনা মনসা বাচা তস্মাৎ শিষ্যৈঃ প্রসেব্যতে ।।
গুরু প্রসাদতঃ সর্ব্বং লভ্যতে শুভমাত্মনঃ।
তস্মাৎ সেব্যো গুরুর্নিত্যমন্যথা ন শুভং ভবেৎ ।। (শিব সংহিতা)

কি ভাই! তন মন দিয়ে সেবা করার কথা কি কেবল সন্তদেরই?

(৫) ন চ বিদ্যা গুরোস্তুল্যং ন তীর্থং ন চ দেবতা।
গুরোস্তুল্যং ন বৈ কোঽপি যদ্দৃষ্টং পরমং পদম্ ॥
ন মিত্রং ন চ পুত্রাশ্চ ন পিতা ন চ বান্ধবাঃ।
ন স্বামী চ গুরোস্তুল্যং যদ্দৃষ্টং পরমং পদম্ ।।
একমেবাক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্ দ্রব্যং যদ্দত্ত্বা চানৃনী ভবেৎ ॥ (জ্ঞান-সংকলিনী)

(৬) তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরু মেবাভি গচ্ছেৎ সমিৎপানিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠঃ। তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক প্রশান্ত চিত্তায় শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ (মুণ্ডক)।

(৭) 'তদ্বিদ্ধি প্রনিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' এবং 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং 'ব্রজ' ইত্যাদি (গীতা)

(৮) ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা ॥

গুরুর মহিমা বর্ণনা সংস্কৃতে করেছেন বলে নিশ্চয়ই ঐ সমস্ত ঋষি-বচনকে আপনি "গোঁড়ামি" বা " আতিশয্য" বলতে পারবেন কি ?

(৯) উপসীদেৎ গুরুং প্রাজ্ঞং যস্মাৎ বন্ধ বিমোক্ষণম্।
শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥ (বেদান্ত)

(১০) শঙ্করাচার্য্য সর্ব্বত্র দ্বৈতদর্শন নিষেধ করলেও গুরুর সঙ্গে অদ্বৈত বোধ নিষেধ করেছেন—"সর্বত্র অদ্বৈতং কুর্বীত, না দ্বৈতং গুরুণাসহ"।

(১১) ইনিই দক্ষিণামূর্ত্তি স্তোত্রে গুরুকে লক্ষ্য করে বলেছেন—
ওঁ নমো প্রনবার্থায় শুদ্ধ জ্ঞানৈক মূর্ত্তয়ে।
নির্ম্মলায় প্রশান্তায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ ॥
নিধয়ে সর্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিনাম্।
গুরবে সর্বলোকানাং দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ ॥

(১২) "To carry out the Commands of the Guru without list shadow of doubt or hesitation, is the secret of success in life and there is no other way to follow"—(Vivekananda)

হিন্দীভাষায় রচিত ঐ সব সন্তবাণীতে গুরুস্তুতি দেখে 'বাড়াবাড়ি' ভাবতে পারেন, কটাক্ষও করতে পারেন কিন্তু বিশুদ্ধ সংস্কৃতে রচিত বেদান্তবাক্য শঙ্করবাক্য এবং বিবেকানন্দ-বাক্যেও গুরুস্তুতির 'বাড়াবাড়ী' দেখে নিশ্চয়ই আর নাসিকা কুঞ্চন করতে সাহস করবেন না ! আশাকরি, 'গোঁড়ামি' বলার ধৃষ্টতা আর হবে না !

(১৩) শুধু যে কবীর সাহেবই গুরু পাদোদক পান করতে বলেছেন তা নয়, গুরুগীতাতেও আছে—
গুরোঃ পাদোদকং পানং গুরোরুচ্ছিষ্ট ভোজনম্।
গুরোর্মূর্ত্তিঃ সদা ধ্যানং গুরুস্তোত্রং সদা জপঃ ॥

(১৪) অদ্বৈতবাদ প্রবর্ত্তক জ্ঞানাবতার শঙ্করাচার্য্যেরও ঐ কথা—
শরীরং সুরূপং ততো বা কলত্রং,
যশশ্চারুচিত্রং ধনং মেরুতুল্যং।
গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নম্।
ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্ ?

(১৫) বৌদ্ধদেরও ঐ কথা—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

(১৬) Come unto me all···and I will give you rest. I am the way and the truth and the Life. No one cometh unto the Father but by Me. (Bible)

মুস্লীম সাধকগণও গুরু-স্তুতিতে পঞ্চমুখ

এইবার মুস্লীম সাধক, ফকির, ঔলিয়া এবং পয়গম্বরও যে ঐ গুরুবাদ মানেন তার প্রমাণ দিচ্ছি :—

(১৭). গুপ্ত্ পয়গম্বর কি হক ফরমুদা অস্ত্, মন ন গুংজম হেচ দর বালা ব পস্ত্। দরজমিনো আস্ মানো অর্শ নীজ। মন ন গুংজম্ ইং যকীং দাঁ এ অজীজ্। দরদিলে মোমিন্ বিগুংজম্ ইং অজব। গরমরা রব্ বাহী অজ্ঁ। দিল হা তলব।

"খোদা তালা বলছেন যে—আমি কোন উঁচু বা নীচুস্থানে থাকি না, আকাশের উপরেও না, জমিনের উপরেও না। হে প্রিয়তম সন্তান, তুমি এই কথা সত্য বলে জান। মোমিন (ভক্ত) অর্থাৎ যে আমাকে জেনেছে, তার হৃদয়েই আমার সদা নিবাস। তুমি যদি আমার সঙ্গে মিলিত হ'তে চাও, তাহলে তার খোঁজ কর তার কাছে যাও, অর্থাৎ মুর্শিদ্ বা সদগুরু বরণ কর"।

(১৮) হেচ্ ন কুশদ্ ন ফস্ রা জুজ্ জিল্লে পীর। দামনে আঁ নফস্ কুশরা শখ্ত্ গীর। জিল্লে পীর অন্দর জমীং চুঁ কোহে কাফ্। রুহে উ সীমুর্গ্ ওয়্ বস্ আলী তোয়াফ্। পস্ বিরৌ খামোশ্ বাশ অজ অন্ কয়াদ্। জেরে জিল্লে অমরে শেখে ওস্তাদ্। "সদ্গুরু শক্তিছাড়া মনকে কোন মতেই নাশ করা যায় না। এইজন্য তোমার উচিৎ—মন মর্দ্দনকারী সদ্গুরুর শ্রীচরণ দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করা। পর্ব্বত যেমন মাটিতে থাকে, কিন্তু তার শীর্ষদেশ আকাশগামী—তেমনি সদ্গুরু মর্ত্ত্যভূমিতে থাকলেও তাঁর মন সবসময় দিব্যভূমির দিকে; উর্দ্ধচারী বিহঙ্গের মত সদ্গুরুর স্মরত সব সময় দিব্যধামে বিচরণ করে থাকে। ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে হ'লে তুমি এ হেন সদ্গুরুর আজ্ঞাকারী হও, তাঁর চরণে শরণ নাও।"

(১৯) পীর রা বিগুজি কি বে পীর ইং সফর।
হস্ত্ পুর অজ্ ফিত্না ওয়্ খৌফো খতর॥

"সদ্গুরুর শরণ গ্রহণ কর। সদ্গুরুর কৃপা এবং সাহায্য ছাড়া এই অমৃত যাত্রা পরিক্রমা অতি কঠিন, বাধাও অনেক।

একমাত্র গোঁড়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুসন্তান ভিন্ন মূর্ত্তিপূজা এবং অবতারবাদ আর কেউ মানেন না। কিন্তু গুরুবাদ অর্থাৎ গুরুর প্রয়োজন এবং গুরুর মহিমা সম্বন্ধে সকল ধর্ম্মমত সকল সম্প্রদায় একমত। মূর্ত্তিপূজা এবং অবতারবাদ মানুষের আধ্যাত্মিক প্রগতিকে করে রুদ্ধ আর গুরুবাদ অর্থাৎ **গুরুছাড়া অমৃততীর্থ পরিক্রমা আধ্যাত্মিক অনুভূতিলাভ একেবারে অসম্ভব।**

ঐ সব অমূল্য দিব্যস্তুতি থেকে সহজেই বুঝতে পারছেন গুরু কী বস্তু! পূর্ব্বেও বলেছি, এখনও বলছি, ঝুটা গুরুর কথা বাদ দিন— ভণ্ড গুরুদেরকে আমি ঘৃণা করি। সদ্‌গুরু সম্বন্ধেই সন্তরা ঐ সব মহিমা গেয়েছেন — সেইগুরু 'যদ্দৃষ্টং পরমং পদং', 'যস্মাৎ বন্ধ বিমোক্ষণম্‌" —সেই আনন্দঘন শুদ্ধ জ্ঞানৈক মূর্ত্তি সদ্‌গুরুকে সর্ব্ব যুগের সর্ব্বকালের সাধু মহাত্মা ফকীর সন্ত পরম সন্ত মেনে গেছেন তাঁকে নিয়েই সবাই আপনার ভাষায় 'বাড়াবাড়ি'টা করেছেন। আমি ও করি এবং তা শ্রেয় বলে মনে করি। কারণ প্রকৃত সদ্‌গুরু যিনি, তিনি নিয়ত তাঁর অতন্দ্র কল্যাণ দৃষ্টি দিয়ে শিষ্যকে করেন বোধিতে প্রতিষ্ঠিত—তিনি **আলোক স্বরূপ, অমৃতপথের দিশারী**; ত্রিতাপের জ্বালা, প্রারব্ধ কর্ম্মের দাবদাহ থেকে তিনিই ভক্তকে করেন রক্ষা। **মায়ের চেয়েও গভীরতর মমতা ও স্নেহ—সম্বেদনে, পিতার মত গভীর প্রজ্ঞাময় অনুশাসনে, তিনি আশ্রিতজনকে** কোলে করে রাখেন; ত্রাণ করেন যত কিছু অজ্ঞানতা কুসংস্কার আর দুঃখের বেড়াপাক থেকে—তাই তিনি পরমতীর্থ-আলোক-তীর্থ। তাঁরই কৃপায় লাভ হয় অমৃত আনন্দের দিব্য ধারা, **সত্যের স্বধামে তিনিই করেন শিষ্যকে প্রতিষ্ঠিত**। "দাসবোধ" গ্রন্থে শিবাজীর গুরু সমর্থ রামদাস স্বামী গুরুর মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, গুরুকে সূর্য্যের সঙ্গে তুলনা করা যায় না, কারণ সূর্য্য দিনেই আলো দেয়, রাত্রে নয়, অন্ধ-গিরি গুহাতে নয়, কিন্তু গুরুর দিব্যশক্তি সর্ব্বত্র সমভাবে সব দিকই করেন উদ্ভাসিত, জ্যোতির্দীপ্ত। গুরুর সঙ্গে পরশমণিরও তুলনা চলে না; কারণ পরশমণি কেবল লোহাকে সোনাই করতে পারে, পরশমনি তো করতে পারে না! কিন্তু গুরু শিষ্যকে আত্মস্বরূপ করে নেন। পুনরায় স্বীকার করছি আমি এ গুরুবাদ মানি। সদ্‌গুরুর মহিমা কীর্ত্তন যদি 'বাড়াবাড়ি' বা 'গোঁড়ামি' হয়—এ 'বাড়াবাড়ি' এবং 'গোঁড়ামি'—আমাদের থাকুক।

আপনি 'ক্রীতদাসত্ব' এবং 'গোলামির' কথা তুলেছেন! 'গোলামী' বলতে তো

আমরা বুঝি ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির অধীনতা—'The worst of slaves is he whom the passion rules",—সদ্‌গুরু বরং এই 'গোলামী' থেকে মুক্ত করেন।

সদ্‌গুরুর কাছে শিষ্য 'গোলাম' নয়—দিব্য আনন্দে বিভোর—মুক্ত আত্মা

গোলাম বা ক্রীতদাস ত থাকে বাধ্য বাধকতার বেড়াপাকে বাঁধা, তাদের ত জীবন দুঃসহ দুর্বিসহ! ব্যথাহত ব্যর্থ জীবনে তাদের প্রতি পদে পদে লাঞ্ছনা এবং নির্য্যাতন; কিন্তু সদ্‌গুরুর কাছে বাধ্য বাধকতা নেই, যন্ত্রনা নেই—আছে শুধু আনন্দ, শুধু আনন্দ, মুক্ত আত্মার অবাধ স্বাধীনতা। ঝুটা গুরুগিরির কথা বাদ দিন, **সদ্‌গুরু শিষ্যকে প্রতি মুহূর্ত্তে ভরে তোলেন, প্রতিটি মুহূর্ত্ত তার করে তোলেন দিব্য আনন্দে মুখর, সত্যজ্ঞান আর আনন্দের প্রকাশে বিকাশে করে তাঁকে পূর্ণ-পূর্ণতর-পূর্ণতম।** তমঃ থেকে জ্যোতির পথে, মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে নিয়ে গিয়ে শিষ্যকে আপ্তকাম করে তোলেন বলেই, শিষ্য অপরোক্ষানুভূতি পেয়ে ক্রীতদাসবৎ কৃতজ্ঞ হয় প্রেমে ভক্তিতে—ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে প্রণতি জানায় তাঁর মহিমার কাছে। এখানে তার সত্তা অধীনতার নাগপাশে বাঁধা হয়ে গতি থেকে বঞ্চিত হয় না, বরং **তার** Being **এবং** Becoming **প্রতি মুহূর্ত্তে** developed **হয়ে চেতনদীপ্ত হয়ে পরিশেষে হয়** Intune with the Infinite! **গুরুর দয়ায় মায়িক আবরণ খসে পড়ে, খুলে পড়ে তার ছদ্মবেশ, সে আপন দিব্যসত্তার পরিচয় পেয়ে পূর্ণত্ব অর্জ্জন করে।**

একখণ্ড লোহা যখন পরশমণির সংস্পর্শে এসে পরিণত হয় সোনাতে, একখণ্ড কয়লা যখন প্রজ্জলিত হুতাশনের সংস্পর্শে এসে হয়ে যায় জ্বলন্ত অগ্নি—তখন লোহার অসারত্ব, কয়লার কৃষ্ণত্ব ঘুচে যায় বটে, তাদের নামের রূপের ইতি হয় বটে, কিন্তু মহত্তর, অধিকতর মূল্যবান, সুন্দরতর জীবনলাভ করে; এতে লোহার So-called individuality, কয়লার Soc alled Personality যায় বটে-কিন্তু তাই বলে সেটা ক্ষোভের বা দুঃখের কি? গৌরবের নয় কি? সদ্‌গুরুর দিব্য সংস্পর্শে ও ঠিক এই রকম ভক্ত ধীরে ধীরে তার **জৈবী সত্তা ত্যাগ করে দৈবী সত্তায় হয় প্রতিষ্ঠিত, তার মধ্যে গুপ্ত এবং সুপ্ত অমূল্য ঐশীসত্তার ঘটে বোধন।**

আপনারা যাকে Individuality বা Personality বলেন, ওটা তো

ভুল পরিচয় ! আসলে মানুষ তার নির্মল চৈতন্যসত্তার পরিচয় জানে না বলেই একটা মিথ্যা নাম রূপ উপাধির মোহে 'Dignity' আর 'I-ness'এর কুহেলিময় বিভ্রান্তিতে মিথ্যা পরিচয় দেয়। সদ্‌গুরু ঐ মিথ্যা-আবরণ দূর করেন। বিভ্রান্তি এবং কুহেলী অপসারিত করে প্রকট করে দেন তার মধ্যে উজ্জ্বল শৈবতেজ, ঐশী সত্তার দিব্য দীপ্তি ! তিনি তাকে complete করেন, fulfil করেন। তখন সে তার মিথ্যা ব্যক্তিত্বের Illusion থেকে জেগেও ওঠে Dis-illusioned Truth-এ, মহাসত্যের দিব্যসত্তায় ! তখন সে বুঝতে পারে—'His individuality, the basis of all works, he has seen to be an Illusion.' (Deussen Pg 346)

আপনারা যে জিনিষটিকে লক্ষ্য করে 'Personality', 'Personality', বলে চীৎকার করেন, ওটি আসলে আবরণ মাত্র, প্রকৃত বস্তুর ছায়া মাত্র ! চিৎ নয় ওটা চিদাভাস —চিদাভাস লোপ পেলে ক্ষতি নেই, চিৎসত্তায় বোধিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। "Personality, in its elements, is something alien to our true essence. From this alien thing, we only need to free ourselves" [Grimm Pg 196]

'Personality'—Persona-এই ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে। Persona শব্দের অর্থ মুখোস (Mask)। এই মুখোস পরেই প্রাচীন রোমে এবং গ্রীসে অভিনেতারা অভিনয় করতেন। এখনও তিব্বতের নর্ত্তকেরা পাহাড়িয়া নৃত্য করে—আমি যখন মানস সরোবর যাই, তখন তাদের ঐ ছদ্ম আবরণ মুখোস পরে নৃত্য দেখবার সুযোগ হয়েছিল। বস্তুতঃ এই Personality —জীবের মুখ নয়—মুখোস্। জীব স্বরূপতঃ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার অংশ। কিন্তু সে তার এই ঐশী পরিচয় ভুলে গিয়ে—রাম শ্যাম রহিম আবদুল্লা Tom, Dick, ও Harry এই পরিচয়ের মুখোস পরে—এই সংসার-নাট্যমঞ্চে বিভিন্ন অভিনয় করে চলেছে। মহারাজার পুত্র 'সং' সেজে যাত্রাতে ভৃত্যের কাজ করছে। সদ্‌গুরু ভক্তের ঐ মুখোস খুলে দেন, তার স্বরূপের পরিচয় দেন। জীব যদি এটা বুঝতো প্রথম থেকে, তাহলে তার So-called Personality থাকছে না বলে ক্ষোভ করতো না। দার্শনিক সোপেন হায়ার ঠিকই বলেছেন—

"Every body knows himself only as an individual......
If he were able to be conscious of what he is besides and apart of this, he will willingly let go his individuality and smile at the tenacity of his adherence to it·"

সদ্‌গুরু শিষ্যের স্বরূপ চিনিয়ে দেন

সদ্‌গুরু কৃপা করে শিষ্যকে এই পরম অবস্থা দান করেন। জীবের মধ্যেই রয়েছে পরম সম্পদ, অথচ সে তার সন্ধান না পেয়ে ভিখিরির মত হাহাকার করে বেড়ায়; দয়ালগুরু তার ঐ দৈন্য দশা ঘুচিয়ে এমন ভূমিতে উন্নীত করে দেন, যেখানে গিয়ে সে দেখে, "কতো মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ দুয়ারে"। যে অবস্থায় এই ভূমার সন্ধান, অমৃতের সন্ধান লাভ হয়, স্বরূপোলব্ধি হয়, তাকে বলা হয় চৈতন্য-সমাধি। ঋষিরা এই সমাধির অবস্থাতে আত্ম সাক্ষাৎকার করে, দিব্য স্বরূপের পরিচয় পেয়ে, দিব্য আনন্দে বিভোর থাকতেন। তাই যাঁর কৃপায় এই পরম অবস্থা লাভ হতো, সেই শ্রীগুরুর অতভাবে মহিমা গেয়েছেন, দরবিগলিত শ্রদ্ধায়, তাই তাঁদের শ্রীগুরুচরণে এতখানি কুণ্ঠাহীন আনুগত্য! শ্রীগুরুকৃপায় প্রকৃত ঐশীসত্তার পরিচয় পেয়ে ঐ তুচ্ছ 'Loss of Personality' তে বরং তাঁরা কৃতার্থই বোধ করতেন, এখনও যাঁর জীবনে সদ্‌গুরুলাভের সৌভাগ্য হয়েছে--**তিনিও ঐ** Loss of Personality **এর বিনিময়ে দিব্যসত্তার পরিচয় পেয়ে ধন্য হ'ন, কৃতকৃত্য হ'ন**। সদ্‌গুরু-কৃপায় যে Loss of Personality হয়—তা তাঁর দ্বারা কোন Exploitation of brain power, Man power এবং Money power নয়—(যা ঝুটা গুরুরা করে থাকে)—এ হ'ল সঞ্জীবনী অমৃত পরশে মহাজীবন লাভ।

সেই একটা গল্প আছে না—যে, এক সিংহশাবক দৈবাৎ শিশুকাল থেকেই মেষদলে মিশে গিয়ে নিজেকেই মেষ বলে ভাবত? মেষের মত শব্দ করতো? একদিন অপর একটি সিংহ এসে তাকে চিনতে পেরে, জলের ধারে নিয়ে গিয়ে তার প্রতিবিম্ব দেখিয়ে তার স্বরূপের সন্ধান দিল; সে যে সিংহশাবক, মেষশাবক নয়—এই পরিচয় পেয়ে মহাবিক্রমে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো! সিংহশাবক যখন নিজের পরিচয় পেল, তখন তার ঐ Persona, মুখোস—মেষশাবকরূপে মিথ্যা পরিচয়দান ঘুচলো—সিংহের অনুসরণ করে—কায়ার পেছনে ছায়ার মত

ঘুরতে লাগলো ; এখানে তার Loss of self, ঘটলো, কিন্তু সিংহশাবকরূপে তার জাগরণ—চেতনালাভ এ কি মহত্তর জীবনের পরিচয় লাভ নয়? Tennyson তাঁর অনবদ্য ভাষায় ঐ সম্বন্ধে ঠিকই লিখেছেন—

And thro' loss of self,
The gain of such large life, as matched with ours,
Were Sun to Spark—unshadowable in words,
Themselves but shadows of a Shadow world.

["The Ancient Sage."]

সদ্‌গুরুর কাছে শিষ্যের আত্মসত্তার বিলুপ্তি নয়—মহাসমুত্থান

সদ্‌গুরুর কাছে ঐ Loss of self ঘটে, কিন্তু লাভ হয় Large life—এক দিব্যভব মহাজীবন! জীব স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দ, অমৃতের সন্তান—সিংহশাবক-মহাবিক্রম ও তেজের আধার। কিন্তু নিজের স্বরূপ ভুলে, মেষ শাবকের মত ভুলে থাকে। প্রকৃত সদ্‌গুরু যিনি—একমাত্র তিনিই পারেন মহাজীবনের সন্ধান দিয়ে অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে। **তাই কৃতকৃত্য, কৃতার্থ, কৃতজ্ঞ ভক্ত নিজেকে সদ্‌গুরু-চরণে বিলিয়ে দেয়, বিকিয়ে দেয় ; এ তার আত্ম-বিলুপ্তি নয়, এই তার আত্মসত্তার মহাসমুত্থান।**

তাই অনুভবী মহাপুরুষ সাধু সন্তগণ গুরুর মহিমা প্রকাশে পঞ্চমুখ! এ তাঁদের 'গোঁড়ামি' 'বাড়াবাড়ি' বা 'আতিশয্য' নয়।

আপনি বলছেন, 'মূর্তিপূজা অনেক ভাল, কারণ মূর্তি ঠকায় না', আপনার এ ধারণা একেবারেই ভুল। মনে রাখবেন, ঋষি মুনি মহাত্মা সন্তগণ যখন গুরু-প্রশস্তিতে এত আত্মহারা—সে গুরু সদ্‌গুরু-সন্তসদ্‌গুরু, কোন প্রবঞ্চক ঝুটাগুরুর কথা নয়। মূর্তি ঠকায় না কে বললো? মূর্তিপূজায় কোন স্বরূপোপলব্ধি হয় না, কোন আধ্যাত্মিক লাভ হয় না। পরন্তু, যেমন T. B. রোগীর সঙ্গ করলে যেমন T. B. হয়, তমোগুণীর সঙ্গে করলে আত্মায়, তমোগুণ হয় সঞ্চারিত, তেমনি জড়মূর্তি পূজার ফলে জড়গুণ আসে, মন জড় হয়, সত্যসন্ধানের চেষ্টা থাকে না—বুদ্ধিবৃত্তি হয় মন্থর ও শ্লথগতি! বিচার করে দেখুন, How can an inanimate object of Nature, lead you to that Land of Light? এজন্য চাই অনুভবী পুরুষ। গুরু হচ্ছেন Door of Light!

তিনি God-Man, God in Man! তিনি হচ্ছেন দয়া, প্রেম, প্রজ্ঞা ও আনন্দের মূর্ত্ত বিগ্রহ। সদ্‌গুরু জীবের নিত্যকালের সাথী। দাতাদয়াল আমাকে একটি চিঠিতে লিখেছেন, "The Moment, the Sat Guru accepts you, he sits in your Astral Body, regulates your every action and leads you to that Sanctum Sanctorum (Abode of Bliss)."

সদ্‌গুরু-শক্তি অমোঘ, এর গতি অপ্রতিহত, অমৃতময়, সর্ব্ববিঘ্ননাশী, তমোহর। প্রারব্ধ জন্মান্তরীন্ সংস্কার যখন সাধনপথে আনে বিড়ম্বনা, শত প্রলোভন যখন সাধকের প্রাণে আনে মোহমদিরা, ক্রোধ যখন জীবনকে করে প্রতপ্ত, কামের সর্ব্বগ্রাসী লেলিহান শিখা যখন তাকে করে বিব্রত, মোহধ্বান্তনাশী গুরু সঙ্গই তখন বিভ্রান্ত সাধকের একমাত্র সত্য পথের দিশারী; গভীর প্রজ্ঞা দৃষ্টির অনুশাসন এবং কল্যাণময় তত্ত্বাবধানের মধ্য দিয়ে সাধককে রক্ষা করে চলেন সকল মিথ্যাচার ও অপূর্ণতা থেকে। সাংসারিক দুঃখ ঝঞ্ঝার নির্ম্ম পেষণে ভীতিবিহ্বল ভক্ত যখন নিঝুম শ্মশান সার করে, হ্রীং এর মায়া, শ্রীং এর আপাতমাধুরীতে বিভ্রান্ত হ'য়ে জীবনের প্রকৃত হ্রী শ্রীকে যখন ভুলতে বসে তখন অমিতবীর্য্য মহাপুরুষ সদ্‌গুরুই দেন আলোকের সন্ধান; কুটীল হিংস্রতা, দুর্ব্বারলোভ, বিভূতির মোহ যখনই সাধককে বিপথে নিয়ে যেতে চায়, তখনই সদ্‌গুরুর অমৃত উপদেশ এবং কালজয়ী শক্তি ভক্তকে প্রকৃতস্থ করে তোলে; আর্ত্ত ও বিপন্ন হয়ে পড়লে সদ্‌গুরুর স্নেহ দৃষ্টি চপল তড়িতের মত চমকিত হ'য়ে হৃদয়ে তোলে আনন্দের লহর, হৃদয় হয় দীপ্ত এবং তৃপ্ত।

অগ্নি যেমন সর্ব্বত্র ব্যাপক হলেও কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণে প্রজ্বলিত হলে তবে তা যেমন প্রয়োজনে লাগে, তেমনি ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপক হলেও, তাঁকে প্রকট করেন, মূর্ত্ত করেন সদ্‌গুরু। বাতাস যেমন সর্ব্বব্যাপক এবং সর্ব্বসময়ে বিদ্যমান থাকলেও পাখার দ্বারা অনুভূতিতে তার ছোঁয়া লাগে—তেমনি সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মাকে অনুভব করিয়ে দেন যিনি, তিনিই সদ্‌গুরু। এ কখনও কোনও জড়মূর্ত্তি দ্বারা সম্ভব নয়! কোন অননুভবী পুরুষের দ্বারাও নয়!

(ক) "The aspirants must be initiated into the mysteries of spiritual life only by a Master who has realised God. It is

only a burning Lamp that can light other lamps. Initiation forms the first step in spiritual life."

[Maharastra Saints & their teachings]

নিভানো বাতি দিয়ে আর একটি বাতি জ্বালবার ব্যর্থ প্রয়াসের মতই প্রাণহীন, স্পন্দনহীন একটা জড়মূর্ত্তি দ্বারা বস্তু লাভের চিন্তা হাস্তকর। জলন্ত প্রদীপই যেমন আর একটি বাতি জ্বালিয়ে দিতে পারে, তেমনি অনুভবী মহাপুরুষ সদ্‌গুরুই দীক্ষা শিক্ষা দিয়ে, আপন দিব্যশক্তি শিষ্যে সঞ্চারিত করে তাকে করতে পারেন আপ্তকাম। তাই জীবন্ত সদ্‌গুরুর সেবা একান্ত প্রয়োজন।

(খ) "Worship the Great, Stick at no humiliation, be the limb of their body, the breath of their mouth, Compromise, they egotism," ['Use of Greatman'—Ralph walds Emerson.]

(গ) পরমসন্ত শাবন সিংজী তাই বলতেন—"Spiritualism can neither be taught, nor bought but can be caught like anyother infection from the Master soul." জড়মূর্ত্তির দ্বারা দিব্য চেতনা লাভ সম্ভব নয়! তাই কবীর সাহেব দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন—

সব হি ঘট্‌মে হরি বসে যেঁও গিরিমুতমে জ্যোতি।
জ্ঞানগুরু চকমক বিনা ক্যায়সে প্রকট হোতি॥

তাই সকল শাস্ত্র সকল ধর্ম্মমতই সদ্‌গুরু প্রশস্তিতে মুখর। কিন্তু সন্তরা সদ্‌গুরু বলতে যা বোঝেন, তাঁর গতি আরও উচ্চ, আরও মহত্তর। পূর্বে'ই বলেছি, সন্তদের মতে, সমগ্র দেবভূমি, বৈকুণ্ঠ, শিবলোক, ব্রহ্মলোকও শুদ্ধ মায়া দেশের অন্তর্গত; তাঁদের মতে এ পিণ্ডদেশ অতিক্রম করে, কেউ যদি ব্রহ্মভূমি পর্য্যন্ত গমন করেন, তবুও তাঁর Absolute truth উপলব্ধি হয় না। কারণ, ব্রহ্মভূমি পর্য্যন্ত লয় আছে, তার উপরে নির্ম্মল চৈতন্যের দেশ, এই নির্ম্মল চৈতন্য দেশের মধ্যেও আবার অলখ্‌ অগম্‌, অনামী, দয়াল দেশ প্রভৃতি কতগুলি দিব্যস্তর আছে, সর্ব্বোচ্চতম ধামে দয়াল কুলমালিক স্বমহিমায় বিরাজমান। মানুষ যে যার জ্ঞান ও অনুভূতি অনুযায়ী, কেউ দেবতাদর্শীকেই সদ্‌গুরু ভাবে, কেউ ব্রহ্ম বা পরব্রহ্মবিদ্‌কেই সদ্‌গুরু ভাবে কিন্তু সন্তগণ সদ্‌গুরু (=সন্তসদ্‌গুরু)

বলতে বোঝেন সেই মহান্ আত্মাকে যিনি পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অতীত, অলখ্ অগম, অনামী, দয়াল ধাম পর্য্যন্ত উপলব্ধি করেছেন, যাঁর মধ্যে সেই কুলমালিক পরমদয়ালের সত্যধার প্রকট। যে ব্রহ্ম পরব্রহ্ম কে লক্ষ্য করে হিন্দু ঋষিরা হরি, কৃষ্ণ, রাম ইত্যাদি বলেছেন, সন্তসদ্‌গুরুর গতি সেই ব্রহ্ম পরব্রহ্ম Region এরও উপর বলে, সন্তগণ নিজ নিজ সন্তসদ্‌গুরুকে লক্ষ্য করে বলেছেন, "গুরুর গতি ইন্দ্র ব্রহ্মা মহেশ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত জানেন না"; এ তাঁদের কোন অতিশয়োক্তি নয়—স্বরূপ বর্ণনা, তাঁদের নিজেদের উপলব্ধ প্রত্যক্ষ সত্য।

গুরুকে সম হরিকো ন নিহারু

আমি পূর্বেই বলেছি, সন্তদের এটি উপলব্ধ সত্য যে, ব্রহ্ম বা হরির দেশ শুদ্ধ মায়াদেশের (Materio-Spiritual Region) অন্তর্গত, অথচ নির্ম্মল চৈতন্য দেশে (Purely Spiritual Region), ব্রহ্মভূমির উপরে না গেলে সাচ্চামুক্তি হয় না। সন্তসদ্‌গুরুই কেবল সমর্থ, তাঁর অনুগত ভক্তকে, সেই দয়ালদেশে নিয়ে গিয়ে সাচ্চা মুক্তি দিতে। তাই কবীর সাহেব বলেছেন,

গুরু বড়ে গোবিন্দ তে মন মেঁ দেখ বিচার।
হরি সুমিরে সো বার হৈ গুরু সুমিরে সোপার॥

চরণদাসজীর শিষ্যা সহজবাঈ হরি বা ব্রহ্মতত্ত্বের উপরে এই সন্তসদ্‌গুরু-তত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন বলেই সন্তসদ্‌গুরুর মহিমা বর্ণন করতে গিয়ে বলছেন :—

(দোহা)

হরি কিরপা (দয়া) জো হোয় তো, নহীঁ হোয় তো নাহিঁ।
পৈ গুরু কিরপা দয়া বিন্, সকল বুদ্ধি বহি জাহিঁ॥

(চৌপাই)

রাম তজুঁ পৈ গুরু ন বিসারু, গুরুকে সম হরিকো ন নিহারুঁ।
হরিনে জনম বিয়ো জগ মাহিঁ। গুরুণে আবাগমন ছুটাহীঁ।
হরিনে পাঁচ চোর দিয়া সাথা, গুরুনে লই ছুটায়ে অনাথা।
হরিনে কুটুম্ব জাল মেঁ গেরি, গুরু নে কাটি মমতা বেড়ী।
হরি নে রোগ ভোগ উরঝায়ো, গুরু যোগী কর সবৈ ছুটায়ো।
হরি নে করম ভরম ভরমায়ো, গুরুনে আতমরূপলখায়ো।

হরি নে মো সূঁ আপ্ ছিপায়ো, গুরু দীপক দৈ তাহিঁ দিখায়ো।
ফির হরি বন্ধ মুক্তি গতি লায়ে। গুরুণে সব হী ভরম মিটায়ে।
চরণদাসপর তনমন বারুঁ। গুরু ন তজুঁ হরিকো তজ ডারুঁ।
চরণদাস মহিমা অধিকাই—সর্বস বারৈ সহজো বাঈ॥

সন্তগণ গুরুর (=সন্তসদ্ গুরুর) ঐ মহত্তম গতি, মহত্তম দয়া ও প্রেম উপলব্ধি করেই গুরুমহিমা বর্ণনায় এত পঞ্চমুখ হয়েছেন। যে কেউ দাতা দয়াল সন্তসদ্ গুরুর দয়ায় সেই সত্য উপলব্ধি করবে, সেই কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁর চরণে হবে ধূল্যবলুণ্ঠিত। তবুও সন্তরা সন্তসদ্গুরুকে প্রথম থেকেই ঐ দৃষ্টিতে দেখতে বলেন নি। "যব্ তক্ না দেখো নিজ নয়নি, তব তক্ না মানো গুরুকা বাণী", এই যাঁদের উপদেশ, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ছাড়া যাঁরা ভক্তকে এক পদও অগ্রসর হতে নিষেধ করেছেন, তাঁরা প্রথমেই ভক্তের কাছে ঐ রকম অন্ধবিশ্বাস বা ভক্তির আতিশয্য Demand করেন নি! পরমসন্ত শাবন সিংজী বলতেন, " তুমী পহ্লে তো দোস্ত্ সমঝ লিজিয়ে। যব্ উপর যাওগে, রুহাণী মণ্ডলমেঁ য্যায়সা যব্দেখোগে, তব কহোগে"। তিনি কাউকে দীক্ষা দিয়েই বলতেন. "মেরে পাশ জো থা আপ্কো দে দিয়া। কিসীকা পাশ ইস্সে কোঈ উঁচি দৌলৎ মিলজায়, জরুর লে লেনা, মুঝে ভি বাতানা।" আর একজন সন্তও এইভাবে বলেছেন—"সন্তমত মেঁ আজ্ঞা হৈ উহ্ পহলে পহল্ সত্গুরু-বখত্ (Contemporary Living Adept) কো কেবল বড়া ভাই সমঝে, ঔর উনকে চরণোঁ মেঁ কেবল ইস্ তরহ্ বিনীত ভাবসে বর্ত্তে, জৈ সে সংসারমেঁ এক ছোটা ভাই অপ্নে বড়ে ভাইকে সাথ বর্ত্ততা হৈ ঔর জোঁ। জোঁ উসে অন্তরীঅনুভব প্রাপ্ত হোনে পর সদ্গুরুকী আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা ঔর অন্তরী-গতি কী পরখ্ আতী জাবে, উনকে চরণোঁ মে অপনী শ্রদ্ধা ঔর প্রেম বড়তাযাবে, ঔর জিস দিন্ উসে অপ্না চৈতন্য স্বরূপ, সদ্গুরুকা চৈতন্য স্বরূপ ঔর মালিককা নিজ স্বরূপ এক দৃষ্টিগত হোঁ, উস্ দিন উনকে চরণো মেঁ পূর্ণশ্রদ্ধা ঔর প্রেম স্থির করেঁ।"

সন্তরা এইভাবে প্রথমে দাদা বা বন্ধু ভাবতে বললেও ভক্ত যখন তাঁর কৃপা শক্তিকে প্রজ্ঞাচক্ষু লাভ করে, জন্ম জন্মান্তরের অন্ধ কুসংস্কারের আবর্ত্ত থেকে মুক্ত হয়, নামের ধারা ধরে, অভয়-অমৃত ধামে পৌঁছে, তখন ঐ সহজ বাঈএর মতই নিজেকে সে শ্রীগুরু চরণে বিলিয়ে দেয়। এখানে তার Loss of Self হয় না,

সন্ত সদ্‌গুরুর কাছে Loss of Self নয়—Gain of true Self !

True Self, Divine Self এর পরিচয় পেয়ে সে কৃতকৃত্য হয়। এখানে গুরুর কাছে 'ক্রীতদাসত্ব' বা "গোলামীর" প্রশ্ন ওঠে না— সে মুক্ত হয়, আপ্তকাম হয়; আনন্দ এবং অমৃতলাভ করে সে ভক্তি গদগদ চিত্তে বলে ওঠে—

"ধন্যোঽহহং কৃতকৃতোঽহহং সফলং জনমং মম।"

পঞ্চম পুষ্প

প্রশ্ন :—আচ্ছা, আপনি যে বলছেন সচ্চিদানন্দময় ঈশ্বরকে জানতে পারলে পরম আনন্দ, পূর্ণ আনন্দ লাভ হয়, সে আনন্দটা কি রকম? আমরা যদি তাঁকে না ডাকি, তাতে ক্ষতিটা কি? আপেক্ষিক ভাবে (Relatively) আমরা এক রকমের আনন্দকে অন্য রকমের আনন্দের চেয়ে বেশী মনে করি; আপনি যে সারা বই এ 'দয়াল' 'দয়াল' করছেন, আপনার সেই 'দয়ালকে' জানতে পারলে যে আনন্দ হয়, সেটা কিরূপ? একটু উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে পারবেন? না, 'বাক্য মনের অগোচর', 'অনির্ব্বচনীয়', ইত্যাদি রহস্যজনক ভাষা বলে, 'রসগোল্লা খেলে বুঝতে পারবে রসগোল্লা কি রকম!' 'বন্ধ্যাকে বাৎসল্যরস বোঝাবো কি করে'? ইত্যাদি যে সমস্ত মামুলী patent কথা সাধুদের আছে—তাই বলে—আসল প্রশ্ন এড়িয়ে যাবেন?

উত্তর :—দেখ ভাই, একজন দয়ালকে ডাকুক আর না ডাকুক, তাঁকে জানতে চাক্ আর না চাক্, তাতে তাঁর ক্ষতি নেই। কিন্তু যে তাঁকে জেনে চিনে সচ্চিদানন্দময়ত্ব লাভ করতে না চাইবে তারই 'মহতী বিনষ্টিঃ'! একজন মূর্খ তার আত্মঘাতী চিন্তার ফলে ভাবতে পারে, "ঐ লোকটা বিদ্বান হয়েছে—আমি লেখা পড়া শিখি নি, তাতে তো আমার আর খাওয়া পরা আটকাচ্ছে না, কাজেই আমার ক্ষতি কি? আমাকে নিজের ভাইও মানতে চায় না, আর, ওঁকে পৃথিবীর সব লোকে সম্মান করে,—তাতে ওঁর লাভ হ'তে পারে, আমার আর তেমন কিই বা ক্ষতি হচ্ছে'?—কিন্তু এধরণের চিন্তা সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ নয়!

একজন ভগবদ্-বিশ্বাসী হ'তে পারে আর নাও হ'তে পারে, কিন্তু সবাই যে সুখ চায়, শান্তি চায়, আনন্দ চায়—তাতে তো আর কারও সন্দেহ নেই! শোক, জ্বালা, তাপ, রোগ—সব রকমের দুঃখ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে সবাই

যে পরমানন্দে দিনগুলো কাটাতে চায়- এতে কি তোমার কোন সন্দেহ আছে? প্রত্যেকের জীবন analy.is করে দেখ, সবাই অশান্তির আগুনে জ্বলছে। সুখে শান্তিতে আনন্দে থাকবার জন্যেই-না-মানুষের এত অধ্যবসায় সাধনা, পরিশ্রম—বিদ্যা, জ্ঞান, প্রচুর ঐশ্বর্য্য নাম যশ সুখ্যাতি লাভের জন্য এত অবিরাম সংগ্রাম চল্‌ছে? আমি পূর্বেই বলেছি-তার এই আনন্দের প্রতি তার আকর্ষণ স্বাভাবিক, সম ও স্বতঃসিদ্ধ; এটা হ'ল Hunger of the Soul for his Beloved! ব্রহ্মক্ষুধা!

ভগবানকে পেলে Blissful Tranquility!

কিন্তু যে পরমপুরুষকে জানলে চিনলে ক্ষুধা মেটে—স্বরূপে স্থিতি হয় কেন্দ্রাভিমুখীন্ গতিলাভ করে উৎসে মিলিত হওয়া যায়—সেই বস্তুলাভের অন্তরায় কি? অন্তঃরায় হ'ল কতকগুলো কর্ম্মজাত মায়িক আবরণ! জন্মমৃত্যুর চক্রে যতই আবর্ত্তিত হতে থাকে—কর্ম্ম হ'তে কর্ম্মের বৃদ্ধি হয়ে আবরণ বাড়তে থাকে—কিন্তু এই কর্ম্মের সৃষ্টি করে কি? কোন্ জিনিষটা জীবকে একজন্ম হ'তে আর একটা জন্মে আবর্ত্তিত হ'তে Momentum দেয়? আনন্দলাভের আকুতির কারণ তার 'ব্রহ্মক্ষুধা' হ'তে পারে, অশান্তির আগুনে যে জ্বলছে তার কারণটা কি? ঋষিগণ বলেছেন, বাসনা, তৃষ্ণা, বুদ্ধদেবও এই 'তন্‌হা' (তৃষ্ণা) জয়ের কথা বলেছেন,—'তন্‌হা' জয় হলে নির্বান লাভ হয়; এ নির্বান কোন State of Extinction, একটা Negative অবস্থা নয়, এ হ'ল এক Positive, পরম সুখ এবং পরম আনন্দের অবস্থা।

নির্ব্বাণং পরমং সুখম্—[সুখবগ্‌গো, ৮]
পস্‌সে চ বিপুলং সুখং—[পকিন্নক বগ্‌গো, ১]

তৃষ্ণা জয় হলে কি রূপ আনন্দ হয়? বুদ্ধদেবের ভাষায়—"এতং সন্তং এতং পণিতং যদিদং সব্ব সঙ্‌খার সমথে সব্বুপধিপটি নিস্‌সগ্‌গো তন্‌হক্‌খায়ো বিরাগো নিব্বানংতি" [মজ্ঝিমণিকায়]

একটা অপূর্ব্ব শান্ত অবস্থা—মহত্তম অবস্থা—সকল উপাধি হ'তে মুক্তি! সর্বইন্দ্রিয়ের উপরম—এক অনবদ্য পরম প্রশান্তি! নির্ব্বাণ সব অশান্তির সমূলে বিনাশ,— নিত্য-নিরবচ্ছিন্ন-আনন্দের মন্দাকিনী ধারায় অবগাহন! 'Blissful tranquility,' 'Stainless Bliss of Eternal peace'!

এই জগতে প্রায়ই দেখা যায়, একজন শতগুণ পরিশ্রম করেও পেটের ভাত জোটাতে পারে না, আর একজন কিছু না করেও দুগ্ধফেননিভ শয্যায় গড়াগড়ি দেয়, সমাজ জীবনের নানাক্ষেত্রে শিক্ষাদীক্ষা বুদ্ধি এবং সামর্থ্যগত বৈষম্য দেখে তাই অনেকে অভিযোগ করেন দয়াময় বুঝি পক্ষপাতদুষ্ট! কিন্তু ঋষিরা বলেন, মানুষে মানুষে ঐ যে বৈষম্য, বৈচিত্র্য, ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য-তার কারণ দয়ালের একদেশদর্শিতা নয়, সূর্য্যের কিরণ এবং বর্ষার বারিধারা যেমন সর্ব্বত্র সমভাবে পড়ে তাঁরও দয়া দৃষ্টি সকলেরই উপর সমান— ঐ বৈষম্যের মূলীভূত কারণ সুকৃত-দুষ্কৃত কর্ম্মবিপাক; এই কর্ম্ম বিপাকের ফলেই হয় সুখ দুঃখের তারতম্য, হ্লাদ, পরিতাপ—"তে হ্লাদ-পরিতাপ ফলাঃ পুণ্যাঃপুণ্যহেতুত্বাৎ

[যোগসূত্র, ২, ১৪]

দয়ালকে যিনি এই জীবনে দর্শন করেন সেই মুক্ত পুরুষ এই কর্ম্মবিপাক, সুকৃত—দুষ্কৃত, অনিত্য সাফল্য ও বৈফল্যের বেড়াপাক থেকে রক্ষা পান।

বিসুকৃতঃ বিদুষ্কৃতো ব্রহ্মবিদ্বান্—[কৌষীতিকি ১,৪]
তদাবিদ্বান্ পুণ্য পাপে বিধয়।
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যং উপৈতি ॥ [মুণ্ডক ৩, ১, ৩]

বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন— ব্রহ্মকে যিনি লাভ করেন, তাঁকে—"এবম্ উ হৈব এতে ন তরতঃ, ইত্যতঃ পাপং অকরবম্ ইত্যতঃ কল্যাণম্ অকরবম্ ইত্যুভে উ হৈব এষ এতে তরতি। নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ... আত্মন্যেব আত্মানং পশ্যতি, নৈনং পাপ্মা তরতি, সর্বং পাপ্মানং তরতি। নৈনং পাপ্মা তপতি সর্বং পাপমানং তপতি। বিপাপো বিরজো বিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি"

—[বৃহদারণ্যক ৪,৪,২২]

"ইঁহাকে, আমি কি পাপ করেছি বা কি পুণ্য করেছি, এ চিন্তা পীড়িত করে না। এই উভয় চিন্তাই তিনি অতিক্রম করেন। কৃত বা অকৃত এঁকে সন্তপ্ত করে না।... যিনি আত্মাতে আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি আত্মরতি, আত্মক্রীড়, তিনি পাপকে উত্তীর্ণ হন। পাপ তাঁকে তাপিত করে না, তিনি পাপকে তাপিত করেন। তিনি বিপাপ, বিমল, বিচিকিৎস হয়ে ব্রাহ্মণ হ'ন।"

এখন বল দেখি ভাই, যাঁকে পেলে এই আত্মারাম, আপ্তকাম, আত্মক্রীড়, বিপাপ, বিমল, বিচিকিৎস, পূর্ণ আনন্দময় অবস্থা লাভ হয়, তাঁকে জানা চেনা

বোঝার জন্য সাধনা কি বাঞ্ছনীয় নয় ? নিজেই ভেবে দেখ, যাকে পেলে পূর্ণ প্রজ্ঞা, পূর্ণ আনন্দলাভ হয়, তাঁকে না জানতে চাওয়ায় ক্ষতিটা কি এবং কার। মানুষের মধ্যে কমবেশী 'বেনিয়া বুদ্ধি' অর্থাৎ Commercial হিসেবি বুদ্ধি লুকিয়ে আছে ; সে যা কিছু করে তার মধ্য দিয়ে কতটা Loss and Gain হ'ল তার একটা হিসাব বুদ্ধির দাঁড়ি-পাল্লায়, নিক্তির ওজনে কষে মেজে দেখে। এবং যাতে সে সব দিক দিয়ে-সব বিষয়ে-সব চেয়ে বেশী লাভবান্ হবে বলে মনে করে, সেইটে সে করতে প্রলুব্ধ হয়। এদিক দিয়ে বিচার করলেও সকলেরই উচিত সেই পরম বস্তুটি লাভ করা, যাতে সে সব চেয়ে বেশী লাভ করতে পারে।

তন্, ধন, মন, বুদ্ধি, আত্মা (সুরত) এই চারিটির মধ্যে—

তাঁকে পেলে আত্মারাম ! আপ্তকাম !

(১) যে শরীর চর্চ্চা নীরোগ বলিষ্ঠ দেহ লাভ করে, সে অপরাপর রুগ্ন জীর্ণ চিররোগী লোকদের চেয়ে বেশী সুখ পায়— গামা গোবর মনোতোষ রায় প্রভৃতি যাঁরা শরীর চর্চ্চা করেছেন তাঁরা শুধু নীরোগ দেহ নয়, সাংসারিক অনেক সুখ-সম্মানও পেয়েছেন।

(২) যারা ধনের চর্চা করে ধনী হয়েছেন, তাঁরা ওঁদের চেয়েও অধিকতর ভোগ সুখের অধিকারী। ধনী, রাজা মহারাজারা অনেক সর্বশ্রেষ্ঠ পালোয়ান, বলিষ্ঠ দেহী, Mr Universe, Mrs. Universe যে ধনদৌলত উপঢৌকন দিয়ে কিংবা বেতনভোগী করে অনুগত করে রাখতে পারেন ! কেনা জানে—ধনিক গোষ্ঠীর সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে কী অতুলনীয় মারাত্মক প্রভাব !!

(৩) উত্তম, বলিষ্ঠ, কন্দর্পকান্তি দেহবান এবং ধনবানদের চেয়েও অধিকতর সুখ সম্মান ও গৌরবের অধিকারী —যারা মননশীল, বুদ্ধিমান, মেধা ও প্রতিভার অধিকারী। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, কবি, গ্রন্থকাররা এবং মনস্বী বুদ্ধিমান লোকেরা পালোয়ান এবং ধনীনন্দনদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারেন।

(৪) যাঁরা হৃদয়বান—পরার্থে সর্ব্বস্বত্যাগী মানবপ্রেমিক-সেই সমস্ত দেশপ্রাণ পরার্থপরগণ আরও অধিকতর গৌরব ও শ্রদ্ধার অধিকারী ; জনগণের হৃদয়ে এঁদের আসন পাতা থাকে। (৫) কিন্তু এঁদের চেয়েও অধিকতর সম্মান, গৌরব, শ্রদ্ধা, পূজা এবং প্রেমের পাত্র তাঁরা, যারা সুরতশক্তি অর্থাৎ আত্মশক্তির চর্চ্চা করে আত্মসাক্ষাৎ করেছেন—নির্ম্মল চৈতন্যদেশের অনুভূতি লাভ করে এই জীবনেই দয়ালকে লাভ

করে পূর্ণকাম হয়েছেন। ঐ আত্মশক্তির চর্চায় "Harmonious development of body, Mind Intellect and Spirit" হয়। এই আত্মশক্তির পরম উৎকর্ষ যাঁদের মধ্যে প্রকাশ, সেই ঋষিরা-বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, ভাস্করানন্দ, ত্রৈলঙ্গ স্বামী বিবেকানন্দ—অরবিন্দ—আরও সমুন্নত অধ্যাত্ম সম্পদের অধিকারী সন্তগণ—কবীর নানক দাদূ রাধাস্বামী সাহেব প্রভৃতি সত্যদ্রষ্টা ঈশ্বরদর্শী পুরুষগণ—সকল শ্রেণীর সকল মানুষেরই সর্বযুগে পূজ্য, প্রণম্য এবং প্রাতঃস্মরণীয়। তন্ মন ধন বুদ্ধি হৃদয়বত্তার উৎকর্ষসাধন যাঁদের মধ্যে হয়েছে, তাঁদের সকলকেই সুরতশক্তির অধিকারী ঐ সব অমিতবীর্য্য সত্যদ্রষ্টা, বিপুল প্রজ্ঞা এবং পরম আনন্দ অমৃতের উৎস মহাপুরুষগণের চরণে শ্রদ্ধাবনত। এঁদের মহিমা কালজয়ী, যুগ যুগ ধরে এঁদের আলোক বাণী রোগ শোক জরাক্লিষ্ট, দুঃখতপ্ত জীবগণকে দিচ্ছে জ্ঞান, আলোক, অমৃত ও আনন্দের সন্ধান। পরার্থপর মানবপ্রেমিকগণের ও প্রেরণার উৎস এঁদের অভেদ সাম্য ও প্রেমের বাণী।

কাজেই ইহ জগতে অভ্যুদয় এবং পরজগতে নিঃশ্রেয়স লাভ করতে হলে, শাশ্বত কীর্ত্তি এবং শাশ্বত আনন্দলাভ করতে হলে— ইহ জীবনেই দাতাদয়ালকে জানতে হবে, বুঝতে হবে, দেখতে হবে ; নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়। **আনন্দ এবং শান্তি যখন সকলেই চায়, তখন সেই আনন্দ-সিন্ধু, শান্তি পারাবারকে জানতেই হবে—এই হ'ল আমার কথা।**

ব্রহ্মানন্দ লাভে কিরকম আনন্দ ?

'অনির্ব্বচনীয়' কথা শুনে তুমি ভাই বিরক্তি বোধ করলেও, আমিও ভাই বলতে বাধ্য হচ্ছি—দয়ালকে লাভ করলে যে কী পরিমাণ আনন্দ হয় তা মনুষ্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না — কাজেই অনির্ব্বচনীয়! সুরথকে নামের ধারার সঙ্গে (সন্ত সদ্‌গুরুর কৃপায়) যুক্ত করে, পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড দেবলোক ব্রহ্মলোকের অতীত ভূমি নির্ম্মল চৈতন্য দেশে নিয়ে গিয়ে তাঁর (সন্তরা যাঁকে দয়াল, কুলমালিক বলেন) দর্শন পেলে কী যে অসীম অনন্ত অপার আনন্দ-লাভ হয় — তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ জগতে কোন উপমা নেই যে, সে আনন্দের, উপমা দিয়ে Relatively তুলনা করে, তা প্রকাশ করবো। সে আনন্দ যে তাই beyond Relativity, beyond Time and Space, beyond description!

তবুও করুণা পারাবার ঋষিগণ, ব্রহ্মানন্দটি কি রকম আনন্দ, তার

যৎকিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়ার জন্য উপনিষদে যা বর্ণনা দিয়ে গেছেন—তুলনা মূলকভাবে—তারই কিছুটা description দিচ্ছি।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলেছেন—যুবা স্যাৎ সাধু যুবা অধ্যায়কঃ আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণাস্যাৎ স একো মানুষ আনন্দঃ (ঐ ২, ৮)। "যুবা যদি সাধু হন, অধ্যায়ক হন, আশিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হন এবং এই সর্ব্ববিত্তপূর্ণা পৃথিবী যদি তাঁর করতলগত হয় তবে সেটী মনুষ্য--আনন্দের চরম"। One fine Morning তুমি জেগে উঠে দেখতে পেলে পৃথিবীর উপর কর্ত্তৃত্বলাভ হয়েছে, সকল ভাষার সকল পত্রিকা তোমার প্রশস্তিতে পূর্ণ—এই অবস্থায় তোমার যে আনন্দলাভ হয় তার কোটিগুণ আনন্দ ধ্যানানন্দ; ধ্যানানন্দেরও কোটি গুণ আনন্দ ব্রহ্মানন্দ! যা আত্মসংবেদ্য একরস-আস্বাদ্য, প্রকাশ্য নয়, তাকে ভাষায় প্রকাশ কি করে সম্ভব? তবুও, বৃহদারন্যক উপনিষদে দেখি, যাজ্ঞবল্ক্য ঐ ভূমানন্দের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন — স যো মনুষ্যানাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধোভবতি, অন্যেষাম্ অধিপতিঃ সর্ব্বৈ র্মানুষ্যকৈ র্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ, স মনুষ্যানাং পরম আনন্দ [বৃহ ৪, ৩, ৩৩]। 'মানুষের মধ্যে যে ব্যক্তি বিশেষ সৌভাগ্যবান্ সমৃদ্ধিমান্ সকলের অধিপতি, সর্ব্ববিধ মনুষ্য-ভোগের অধিকারী, ঐ ব্যক্তির যে আনন্দ তাহাই মনুষ্যলোকের চরম আনন্দ; এই আনন্দের শতগুণ পিতৃলোকের আনন্দ; আবার পিতৃলোকের আনন্দ × ১০০ = গন্ধর্বলোকেরআনন্দ। গন্ধর্বলোকের আনন্দ × ১০০ = দেবলোকে কর্ম্মদেবগণের আনন্দ। [যাঁরা বৈদিক কর্ম্মবিশেষের অনুষ্ঠান করে, দেবত্ব প্রাপক সাধনার দ্বারা দেবতা হয়েছেন—তাঁরাই কর্ম্মদেব, 'যে কর্ম্মনা দেবানপিযন্তি' (তৈত্তিরীয় আরণ্যক)। আর যাঁরা মনুষ্যাদির উৎপত্তির আদিতেই দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন—যাঁরা কর্ম্মদেবগণ হতেও সুক্ষ্মমূর্ত্তি, তাঁরাকেই আজানদেব বলা হয়—'সর্গস্তু জননাদৌ দেবত্বং যে প্রপেদিরে। আজানদেবাস্তেহত্র স্যুঃ পূর্বেভ্যঃ সূক্ষ্মমূর্ত্তয়ঃ'--সুরেশ্বরাচার্য্য কৃত বৃহদারণ্যক ভাষ্য বার্ত্তিক]।

ঐ কর্ম্মদেবগণের আনন্দ × ১০০ = আজান দেবগণের আনন্দ।

আজান দেবগণের আনন্দ × ১০০ = প্রজাপতিলোকের আনন্দ।

অথ—যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দঃ।

প্রজাপতিলোকের আনন্দ × ১০০ = ব্রহ্মলোকের আনন্দ।

ব্রহ্মানন্দ হ'ল মনুষ্যলোকের চরম আনন্দের ১০.......................... গুণ

অর্থাৎ One hundred trillion times, উপনিষদের মতে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষরা—যাঁরা শ্রোত্রিয়, অবৃজিন, অকামহত, তাঁরা এই পরম আনন্দলাভ করে থাকেন। যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতঃ অথ এষ এব পরম আনন্দঃ।

[বৃহদারণ্যক ৪,৩,৩৩]

সন্তদের মতে ঐ ব্রহ্মানন্দও চরম আনন্দ নয়, ব্রহ্মভূমিও পরমধাম নয়; সন্তগণ যাঁকে কুলমালিক পরম দয়াল বলেন, তাঁকে লাভ করলে ঐ ব্রহ্মানন্দেরও কোটি কোটি গুণ আনন্দলাভ হয়। এ আনন্দ ভাষার অতীত, সত্যই প্রকাশের অতীত; গুড়ের চেয়ে সন্দেশ উপাদেয়, সন্দেশের চেয়ে রসগোল্লা, রসগোল্লার চেয়ে রসমালাই বা রাজভোগ—এ ধরণের আপেক্ষিক ভাবে একটা উপমা টানা যায় কিন্তু যখন এমন কোন মধুর দ্রব্যের স্বাদসম্বন্ধে তোমাকে ধারণা দিতে হবে—যা এ জগতে সহজ লভ্য নয়—তুমি চোখেও দেখ নি, আস্বাদনও করনি—তখন মধু, মধুর ও মিষ্ট বলতে তুমি যেটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে কর—তুলনাটা আপেক্ষিক ভাবে সেই পর্য্যন্ত টানা যেতে পারে—তারপরে, তার চেয়েও কোটিগুণ, কোটি কোটিগুণ বললে তোমাকেই অনুমান করতে হবে—মাধুর্য্যের পরিমাণটা! যদিও সেটা অনুমান মাত্র, আস্বাদন নয়! তবে যদি তাই থেকে আস্বাদনের ইচ্ছা—তীব্র ইচ্ছা জাগে—তাহলেই ঐ Relatively তুলনা টানার প্রয়াস (দুঃসাহসও বলা যায়!) সার্থক হয়! সত্যই ভাই, কুলমালিককে লাভ করলে যে কত আনন্দ হয়—তা প্রকাশ করা যায় না। তাই তুলসী সাহেব বলছেন—

গান পঢ়ন বুঝন সে ন্যারা।
সন্তভেদ মত অগম অপারা॥
নিতপ্রতি উঠে মহল ঝন্‌কারা।
নিরখা তুলসী বস্ত অপারা॥

গান করে, পড়ে বা বুঝে তা পাওয়া যায় না। সে ভেদ দুর্গম ও অপার। তবে নিয়তই ঝঙ্কৃত হচ্ছে তার ধ্বনি নিজের ভেতরে—তুলসী সেই অপার বস্তুকে দেখেছে।

সন্তসদ্‌গুরুর কৃপায় কেউ যদি নির্ম্মল চৈতন্য দেশের সেই লোকোত্তর দিব্য সঙ্গীত—নামের ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে—শুনতে পায়—তার আনন্দের সীমা থাকে না।

সুন্ সুন্ হংসা মগন হোঁয়, পিয় অমীরস ধূর ॥
রংগমহল সতপুরুষকা, শোভা আগম অপার।
হংস জহাঁ আনন্দ করেঁ, দেখে বিমল বাহার ॥

"তা শুনতে শুনতে হংসগতি প্রাপ্ত সাধক মগ্ন হয়ে গেছেন—ডগমগ হয়ে অমৃত রস পান করছেন। সত্যপুরুষের যে ধাম, তার শোভা কি বর্ণনা হয়? হংস দেখছেন ঐ বিমল বাহার আর আনন্দে বিভোর রয়েছেন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে।"

শ্রীশঙ্কর হড়ঃ—আমরা যদি ভগবানকে না ডাকি তাতে ক্ষতি কি? তিনি যদি দয়াময় হ'ন, তাহলে নাস্তিককেও তো কৃপা করে থাকেন।

উত্তরঃ—তোমার এ প্রশ্ন একেবারে স্থূলবুদ্ধির কথা। **জীব ঈশ্বরকে না ডেকে একটা নিমেষও থাকতে পারে না।** যা তার সত্তার গভীরে পরম-সত্তারূপে প্রেমরূপে বিরাজিত, তার প্রতি টান, আকুতি স্বাভাবিক, সহজাত, স্বতঃসিদ্ধ। মায়িক আবরণে মানুষের দৃষ্টি আচ্ছন্ন থাকে বলে সে বুঝতে পারে না যে সে এক **সম, সাক্ষাৎ এবং দুর্নিবার আকর্ষণে প্রতিনিয়তই তার উৎসের দিকে টানা হয়ে চলেছে।**

একটি বীজ মাটিতে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আলো বাতাস আর রসের সাহায্যে উজ্জীবিত এবং সম্পূটিত হয়ে সে যেমন ঊর্দ্ধ দিকে বেড়ে উঠতে থাকে, তার খোসাগুলি (Refuse) ধীরে ধীরে absorbed হয়ে সে যেমন অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত ও সম্বর্ধিত হয়, সূর্য্যের দিকে এগিয়ে চলে, তেমনি জীবও তার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এগিয়ে চলেছে তাঁর দিকে; **ঊর্দ্ধের প্রতি তার এই অভীপ্সা, তার এই উৎসর্পিনী গতি স্বাভাবিক।**

বিভিন্ন জন্মের মধ্য দিয়েও তার কেবল Refuse-গুলি, আসার আবরণ-গুলি absorbed হয় মাত্র! এগিয়ে কিন্তু সে চলেছেই। লোহা এবং চুম্বকের মধ্যে এমন এক আকর্ষণ আছে যে লোহা যদি মনে করে যে আমি চুম্বকের সঙ্গে মিলিত হ'তে চাই না—(তা সে মনে করতেও পারে!) তবুও কিন্তু চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, তেমনি জীব বলতে পারে যে আমি ঈশ্বরকে ডাকবো না, কিন্তু তার এই বলা এবং ভাবা একেবারে নিরর্থক।

সাধারণতঃ মানুষ অজ্ঞতাবশে এবং ভণ্ড সাধু-পুরোহিত-পুরাণকারদের

প্রচারের ফলে, ধর্ম্ম বলতে শান্তি স্বস্ত্যয়ন বারব্রত, দে-দেবতার মূর্ত্তিপূজাকে বা কতকগুলো যৌগিক ক্রিয়া কলাপকে বুঝে রেখেছে বলে, কেউ যদি সেগুলো না করে তো, সে নিজেকে নাস্তিক ভেবে নেয়, অপরেও (যারা তিলকসেবা, মালাজপ, দেবমন্দিরে মাথাঠোকা এবং ফুলবেলপাতা নিয়ে কৌতুক করে!) তাকে নাস্তিক ভাবে, কিন্তু বাস্তবিক সে নাস্তিক নয়, ওগুলো করা না—করায়, তার ভগবদ্-বিশ্বাসের হানি ঘটায় না, চুম্বকের আকর্ষণের মত ঈশ্বর-আকর্ষণ উৎসের দিকে তার গতি একমুহূর্ত্তও আটকায় না। পরাবর দৃষ্টিতে বিচার করলে বেশ বুঝতে পারা যায়, **বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যেন সবই ঊর্দ্ধের পানে এগিয়ে চলেছে**; এক অনাহত নাদ, অচ্যুত আকর্ষণী শক্তি, এক সব-উজাড়-করা ডাক সবাইকে ডেকে চলেছে—সবাই সেই অপ্রতিরোধ্য টানে এগিয়ে চলেছে।

একটা অং বং শং. রাম, কৃষ্ণ মন্ত্র একজন না জপলে সাধারণে তাকে নাস্তিক ভাবতে পারে, নিজেও সে 'ভগবানকে ডাকি না, মানি না', ভাবতে পারে, কিন্তু একমুহূর্ত্তও সে তাঁকে না ডেকে থাকতে পারে না। জীব নিত্যই 'সোঽহং' মন্ত্র জপ করে চলেছে, অনুলোম গতিতে হংসঃ, হংসঃ,—অহং সঃ। এই মহামন্ত্র জপ করতে করতেই জীব—সেই আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে, শুক্রকীটরূপে পিতা কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হয় মাতৃজঠরের অন্ধগুহায়, মায়ের সুষুম্না-নাড়ীর সঙ্গে যুক্ত থেকে, এই মহামন্ত্রের মাধ্যমেই সে সঞ্জীবিত থাকে—**সুষুম্নাবাহী বিমল জ্যোতির স্ফুরণ ও দীপন তাকে টানতে থাকে ঊর্দ্ধের দিকে, সে পুষ্ট হয় ভূমিষ্ঠ এবং কেঁদে ওঠে ওঁয়া—ওভা—ওঁ—ওঁ**! গর্ভ যন্ত্রনা সইতে সইতে মাতৃজরায়ুর এক একটা অপ্রত্যাশিত আক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তার সেই আকুতি ফুটে ওঠে, মুক্তির জন্য, আনন্দের জন্য, মুক্ত আলো-বাতাসের জন্য; **সারাজীবন ব্যেপে চলে তার এই আনন্দেরই সন্ধান।**

প্রত্যেকেরই জীবন study করে দেখ সে 'ভগবান ভগবান' করুক আর না করুক, তার প্রতিটি চলা বলা করা ভাবা এমন কি মলমূত্রত্যাগ, হাঁসি-কাশি, ফুৎকার-থুৎকার, নাচ-গান, হাস্য লাস্য, কলহ-কোলাহল সংঘাত ও সংগ্রাম—প্রত্যেকটার মধ্যেই ফুটে উঠেছে তার একটা Hankering এবং Hunger—Hunger for peace and bliss, সেই একটি মাত্র শাশ্বতী

আকাঙ্ক্ষা—আনন্দম্—পূর্ণ আনন্দম্ ; যে আনন্দে চ্যুতি নেই ক্ষয় নেই, স্খলন নেই, পতন নেই।

সবাই চায় আনন্দ—সবাই খুঁজছে তাঁকে

মানুষ চায় বিপুল প্রতিষ্ঠা ও যশ—কারণ এতে তার আত্মার পরিতৃপ্তি হবে, কিন্তু তাতে Continuity থাকে না, আজকের বিজয়মাল্য কাল তার কণ্টকমাল্য হয়ে যায়, একটু প্রতিকূল বাতাসেই যশ-সৌরভ মিলিয়ে যায় শূন্যে। মানুষ আকাঙ্ক্ষা করে রূপলাবণ্যবতী সুন্দরী স্ত্রী কারণ সে আনন্দ পাবে, কিন্তু সেই স্ত্রী রোগভোগে কুৎসিত হলে বা ব্যভিচারিণী হলে আর তার আনন্দ থাকে না ; চায় সৎপুত্র, কিন্তু এত আশা, সাধ ও সোহাগের ধন পিতৃদ্রোহী হলে কিংবা তার অকালমৃত্যু ঘটলে জীবনে বিষাদের ঘনান্ধকার নেমে আসে! মানুষ কত কঠোর পরিশ্রম করে এমন কি প্রবঞ্চনা প্রতারণার ও আশ্রয় নেয় টাকার জন্য, কিন্তু সে টাকাও তাকে আনন্দ দেয় না, তৃপ্তি দেয় না, দেয় নানা কারণে জ্বালা। যার টাকা নেই সে ভাবে টাকা থাকলে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দকে মুঠোয় ভরে রাখা যায় আর যার বিপুল টাকা আছে—সে হয়তো রোগে জীর্ণ, নিরন্তর উদ্বেগে দীর্ণ শীর্ণ! তাহলেই বুঝে দেখ মানুষ directly ভগবানকে চাক্ আর না চাক্, কিন্তু সে যে সুখ চায়, আনন্দ চায়, শান্তি চায়, তাতে কোন সন্দেহই নেই। এমন কি, কেউ আছে যে বলবে, "আমি আনন্দ চাই না"? এক বস্তু থেকে আর একটা বস্তুকে যে সে আঁকড়ে ধরে, সে শুধু ঐ আনন্দ পাওয়ার জন্য। কিন্তু পরিণামে দেখে কোন বস্তুই তাকে আনন্দ দেয় না, যৎকিঞ্চিৎ যা সুখ পায়, তাও টস্ খেয়ে যায়, তাতে কোন Continuity থাকে না। অথচ সে চায় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ।

সারাজীবনই তার এই আনন্দের সন্ধান—জন্ম হতে জন্মান্তরও আর কিছু নয়—সেই কেন্দ্রের দিকে, সেই সৎ-চিৎ-আনন্দের দিকে এগিয়ে যাওয়া, এগিয়ে যাওয়া পূর্ণতার পথে, পূর্ণ প্রজ্ঞা এবং পূর্ণ আনন্দের দিকে।

ধর্ম্ম বলতে সাধারণ মানুষে যা বোঝে—একটা মানুষ তা করুক আর না করুক, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম বলতে যদি তাঁর দিকে এগিয়ে যাওয়া হয়, সেই পরমানন্দ যিনি, তাঁর সঙ্গে মিলন বোঝায়,

তাহলে একজন কুষ্ঠি হোক সুন্দর হোক, গরীব ভিখিরি হোক কিংবা রাজা-বাদশা হোক, মূর্খ কিংবা বিদ্বান হোক—যে, যে Levelএ (ভূমিতে) আছে, সে সেই Level থেকে ধীরে ধীরে পরোক্ষভাবে তাঁর দিকে এগিয়ে চলেছে। Religion কথাটি Religio থেকে এসেছে :—Religio— To bind back; অতএব Religion হচ্ছে তাই, which binds back the soul with his Supreme Creator; which attracts him inwardly towards the Source-to the Sanctum-Sanctorum—Abode of Eternal peace and Bliss !

দুঃখী, ধনী, গুণী, মানী, রোগী ভোগী—সবারই জীবন প্রবাহ ঐ একই টানে চলেছে – সবাই ধেয়ে বেড়াচ্ছে—আনন্দকে —ধ্যান করছে তাঁরই—to be united, to be reconciled with Him; to attain that Eternal peace and Bliss !

'আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তি সংবিশন্তীতি'—সবাই এসেছে, তাঁর কাছ থেকে, তাঁকে বলা হয় সচ্চিদানন্দ, সৎ-চিৎ-আনন্দ। বিচার করে দেখ, সবাই বেঁচে থাকতে চায়, সৎ থেকে এসেছে বলে তার সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, কিন্তু কেউ কি মূর্খ বোবা বোকা হয়ে বেঁচে থাকতে চায় ? না। সে চায় জ্ঞানসহ, চৈতন্যসহ বেঁচে থাকতে। মনে কর, একজন জ্ঞানীলোক যার মধ্যে জ্ঞান চৈতন্য সবই আছে— সে যদি কুষ্ঠ পক্ষাঘাত বা কোন দুরারোগ্য রোগে ভোগে কিংবা কারাগারে বা খাঁচায় পুরে তাকে অহরহ যন্ত্রণা দেওয়া হয়, তাহলে তা কি সে চাইবে ? না—কখনই চাইবে না। সে চাইবে আনন্দ, মুক্ত আলো স্বচ্ছন্দ গতি, তাহলে বোঝা যাচ্ছে, **জীব মাত্রেই চায় তার সত্তাকে টিকিয়ে রাখতে চেতনাসহ, আনন্দ সহ**; কারণ প্রত্যেকেই যে সচ্চিদানন্দের অংশ ! প্রত্যেকেরই সত্তার গভীরে যে ঐ সচ্চিদানন্দময়ত্ব রয়েছে !

সত্তাকে শাশ্বত কাল বাঁচিয়ে রাখবার জন্য, পূর্ণ জ্ঞান আর পূর্ণ আনন্দ পাওয়ার জন্য কাজেই তার অভিলাষ স্বাভাবিক। কিন্তু এই সচ্চিদানন্দময়ত্ব ততক্ষণ পর্য্যন্ত লাভ হয় না, যতক্ষণ না সে সচ্চিদানন্দের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। সুতরাং সে বিভিন্ন জন্ম কর্ম্মের ভিতর দিয়ে ঐ সৎ-চিৎ আনন্দের দিকে এগিয়ে চলেছে। মৈত্রেয়ী যেমন যাজ্ঞবল্ক্যকে বলেছিলেন, 'যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিম্

অহং তেন কুর্য্যাম্, যা: দিয়ে অমৃতত্ব লাভ হ'বে না, তা নিয়ে আমি কি করবো' ? **প্রত্যেকেরই সত্তার গভীরে ঐ আকুতি ঐ ঘোষণা ঐ ক্রন্দবাণাই ধ্বনিত হচ্ছে !**

প্রত্যেকেরই সত্তার গভীরে তাঁর জন্ম আকুতি ফুটে উঠছে !

মানুষ এক এক জন্মে এক এক রকম অবস্থা লাভ করছে—তাতে তৃপ্ত হ'তে না পেরে বলছে, 'চাই চাই আর-ও ;' তার এই চাওয়া পাওয়ার বাসনা-সংঘাত এগিয়ে দিচ্ছে-দিকে আর একটি জন্মের দিকে ; সাধনা, প্রয়াস, কঠোর অধ্যবসায় এবং সংগ্রাম করে চলেছে সে সব পাওয়ার জন্য, সকল কিছুর উপর আধিপত্যের জন্য, পৃথিবীব্যাপী মান যশ-ইন্দ্রত্ব পেয়েও সে তৃপ্ত নয় ! কারণ তার সত্তার গভীরে সেই সুর অনুরনিত হ'চ্ছে—সেই অনুযোগ —"কৈ অমৃত তো পেলাম না ! যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিম অহং তেন কুর্য্যাম্ ? পুনরায় প্রত্যাখান ! পুনরায় কামনা ও সংগ্রাম ! বিভিন্ন জন্ম কর্ম্মের মধ্য দিয়ে তাই পুনরায় গতায়াত, ক্রম বিবর্ত্তন এবং আবর্ত্তন !! কোথায় সেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ? কি করলে থাকবে Continuous flow of Perpetual joy ? 'বন্ধু বিহীন বন্ধুর পথে' সেই "বন্ধুটিকে" চাই ; তা নাহলে যে তৃপ্তি নেই, দীপ্তি নেই, নেই নিত্য স্থিতি ! ঐ **"বন্ধুটি" হলেন,** All-Bliss ! All-Peace ! All-Light ! All-Love !

মানুষ অমৃতের পুত্র, আনন্দ-দুলাল ; মর্ত্ত্যমানুষ হলেও তাই তার প্রাণে প্রতিক্ষণ এই আনন্দের অভিলাষ—এই 'ব্রহ্মক্ষুধা', Hunger for tl.e Absolute, সংস্ফুটিত হ'চ্ছে। অমৃতকে না পেলে, মৃত্যুকে জয় করতে না পারলে, এই 'আবাগমন' না রুখ্‌তে পারলে, 'মৃত্যু' 'পুনর্মৃত্যু,' 'অতিমৃত্যুর' অতীত সেই অমৃতম্‌কে না পেলে যে মানুষের চলে না ভাই ! মেঘ হ'তে এক বিন্দু জল না পাওয়া পর্য্যন্ত চাতকের যেমন তৃপ্তি নেই, তেমনি মানুষ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না অমৃতত্ব লাভ করতে পারে, ততক্ষণ তার স্বস্তি নেই। মানুষ বুঝুক আর না বুঝুক, জানুক আর না জানুক, প্রতক্ষ্যভাবে হোক, পরোক্ষভাবেই হোক, সে সেই অমৃতম্ আনন্দম্‌কেই খুঁজছে. হাটবাজার করা থেকে আরম্ভ করে কোর্ট কাছারি মামলা, মোকদ্দমা, প্রফেসারি, জজীয়তি, ব্যবসা বানিজ্য, প্রবঞ্চনা পরোপকার, সৎকাজ, জপতপ যোগ তপস্যা—সকলটার ভিতরদিয়েই চাচ্ছে সে প্রতিষ্ঠা, আনন্দলাভ অর্থাৎ সৎ-চিৎ-আনন্দে স্থিতিলাভের জন্যই তার এটা সেটা এদিক সেদিকের

প্রয়াস-পরিশ্রম-আকুতিমাত্র—কোথায় সেই আনন্দরূপম্ অমৃতম্ যদ্ বিভাতি ?

গোমুখীর উৎস থেকে বেরিয়ে গঙ্গা যেমন উঁচু, নিচু, নোংরা, সুন্দর, সমতল, বন্ধুর কতো দেশের উপর দিয়ে, কতো অবস্থার মধ্য দিয়ে, কতো রূপে—কোথাও স্বচ্ছ কোথাও মলিন, কোথাও মৃদুগতি, কোথাও সর্বপ্লাবী, মহাগর্জ্জনে বেগবতী হয়ে, গঙ্গা ভাগীরথী অলকানন্দা কতো নাম নিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে—সেই সমুদ্রের দিকে, সমুদ্রের সাথেই মিলিত হওয়ার জন্য, তেমনি, ঠিক ঐ রকমই, মানুষের জীবনও একটি অখণ্ডপ্রবাহরূপে উত্থান-পতন—কখনও সমৃদ্ধির সমুন্নত শিখরে, কখনও বা অবনতির অন্ধগুহায়—অতলস্পর্শী খাতের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে—সেই অখণ্ড সাগরের দিকে—সচ্চিদানন্দ-সাগরে মিলিত হয়ওার জন্য।

কাজেই তাঁকে মানা না মানা, মেনে আস্তিক, না মেনে নাস্তিক সাজা ভ্রম মাত্র! ভগবানকে ডাকা, তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার চেষ্টা জীবের স্বভাবগত ধর্ম্ম।

মহাভারতে পাই, অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্রে উত্তরার গর্ভ নষ্ট করে দিতে উদ্যম করলে শ্রীকৃষ্ণ নাকি যোগবলে উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করে শিশুকে রক্ষা করেছিলেন। শিশু মাতৃজঠরে থাকা কালেই দেখেছিল তাঁর শ্যামল কিশোর আনন্দঘনমূর্ত্তি, ভূমিষ্ঠ হয়ে তাই যাঁকেই শিশু দেখতো, তাঁরই দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে শিশু খুঁজতো, মাতৃ জঠরে যাঁকে দেখতো ইনি সেই কিনা! কৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে তারপর শিশু আনন্দিত হ'ল, সকলকে জন্মের পর পরীক্ষা করে করে দেখতো বলেই শিশুর নাম হয়েছিল পরীক্ষিৎ। কাহিনীটির মূলে যাই থাক্, মানুষের জীবনেও দেখি ঐ পরীক্ষিতের মতই খোঁজ! মানুষ সচ্চিদানন্দ থেকে এসেছে বলেই, সচ্চিদানন্দকে না পাওয়া পর্য্যন্ত তার কান্না থামে না, পূর্ণ আনন্দ সে পায় না। তার বিভিন্ন জন্ম ও জীবন, বৈচিত্র্যময় কর্ম্ম এবং প্রতিবস্তুর মধ্য দিয়ে সুখ অন্বেষণ—আর কিছু নয়—ঐ পরীক্ষিতের মতই সেই পরম সুখময় পরমানন্দ পুরুষকে খোঁজা আনন্দে নিত্য স্থিতিলাভের সাধনা বিশেষ। **কাজেই প্রত্যেকেরই জীবন একটি সমগ্র-ধ্যান।** চোখ বন্ধ করে একটা মূর্ত্তি বা রূপ চিন্তা করলেই তাকে ধ্যান বলে না, ধ্যান হ'লো তাঁকে খেয়ে বেড়ানো। জীব যখন জ্ঞাতসারে হোক, অজ্ঞাতসারে হোক, প্রত্যক্ষতঃ বা পরোক্ষতঃ, **আনন্দই চাচ্ছে**, সেধে বেড়াচ্ছে, খেয়ে বেড়াচ্ছে—কোথায় আনন্দ,

প্রত্যেকেরই জীবনে একটী সমগ্র ধ্যান

কোথায় অমৃত, কোথায় আছে পরম শান্তি,—তখন তার জীবন একটি তাঁর অখণ্ড ধ্যান ছাড়া আর কিছু কি? তার সত্তার গভীরে যে আনন্দ-সুধা অনির্ব্বাণ রয়েছে, তারই ফলে বিভিন্ন জন্ম-জীবনের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠছে তার আত্মার ঐকান্তিক প্রার্থনা—

তমসো মা জ্যোতির্গময়।
অসতো মা সদ্গময়।
মৃত্যোঃ মা অমৃতংগময়।

তমঃ থেকে জ্যোতির পথে, অসত্য থেকে সত্যের পথে, মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে, মানুষের এই অমৃতগতি এক মুহূর্ত্তও আটকে নেই; 'চরৈবতি! চরৈবতি'!—এগিয়ে চলার সেই মহামন্ত্রকে সে রূপ দিয়ে চলেছে, যতক্ষণ না তার অমৃতে নিত্য স্থিতি হয়, অমৃতময় হয়, ঘটে তার মহাচেতন সমুত্থান! "তং সং প্রশ্নং ভুবনং যন্তি সর্বা" [অথর্ববেদ ২, ১, ৩]—**বিশ্বজগৎ চির অতৃপ্ত পরিপ্রশ্নে—নিরবধি জিজ্ঞাসায়, তাঁরই সন্ধান করছে!**

সমাপ্ত

শুদ্ধিপত্র

—০—

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১৭	কচলা	অচলা
১৪	৭	"নৌ ব কোঈ বরতে	"নৌদ্বারনমেঁ সবকোঈ বরতে,
১৫	১৬	গ্রন্থকে	গ্রন্থকে
২১	৭	Reguiate	Regulate
২৩	১১	উদ্ধত	উদ্ধৃতি
৩৪	১৪	নর	নয়
৪৮	৯	বিরার	বিচার
৬৬	১৮	মর্গেষু	সর্গেষু
”	২৮	তাহল	তা হলে
১১৪	১৭	বৃহদারণ্যক ৪৩. ৩৬	৪. ৩. ৩৬
১২৮	৭	মূল বাল্মীকি যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন আমরা কি তারই উপর ভিত্তি করে পূজা করে চলেছি ?	মূল বাল্মীকি রামায়ণে যে ঘটনার উল্লেখ নাই অথচ আমরা তারই উপর ভিত্তি করে পূজা করে চলেছি ?
১৩৪	১০	নামগুলি	নামগুলি
১৪৪	১	চক্ষুচর্ম্ম	চর্ম্মচক্ষু
১৫১	২৭	দিবচক্ষু	দিব্যচক্ষু
১৬৪	১৮	প্রণাম রে	প্রণাম করে
”	২০	-াগবত	ভাগবত
১৬৬	২৬	কিন্তু	কিন্তু
১৬৭	১৪	মুক্তিই	যুক্তিই
১৮০	২৮	কালিাপুরাণ	কালিকাপুরাণ
১৮৩	২২	হনুর্বিনতঃ	হনুবর্ণিত
১৮৬	২৬	স্ত্রী শূদ্র নিন্দিত ও দ্বিজগণের	স্ত্রী শূদ্র ও নিন্দিত দ্বিজগণের
১৮৭	২	মহয়সী	মহীয়সী
”	১৯	বেদব্যাস	বেদব্যাস

১৯৩	২১	পতি পুবব্রতী	পতিপুত্রবতী
১৯৭	৫	দযামময়	দয়াময়
”	২৪	ন	নয়
”	”	তধু	শুধু
১৯৮	৭	দৃষ্টে	মৃষ্টে
১৯৮	৯	উপবীয়মানো	উপগীয় মানে
২০০	২১	সময়	সমস্ত
”	২২	একটা সত্য	বাদ যাইবে (অতিরিক্ত)
২০২	৫	মুক্তি	যুক্তি
২০২	২৬	যোগৈশ্চর্য্যে	যোগৈশ্বর্য্যে
২০৫	১৫	ঐ ই	এই
২১৬	২৮	সর্বনিতি	সব মিতি
২২০	২৭	রাম সীতা	রামগীতা
২২৩	৫	বৃহদারণ্যক ৪. ৩. ১২	৪. ৩. ২২
২২৫	হেড্‌লাইনে	শব	শিব
২২৭	১১	আ ার	আচার
২২৯	২৮	পরমাংস	শবমাংস
২৩২	২৭	শক্তি	শাক্ত
২৪৬	৭	ল্পগ	গল্প
২৫১	২০	তিনি	তাই তিনি
২৬৪	৩	দুষ্কতাম	দুষ্কৃতাম
২৮৫	৫	রচিত	চরিত
৩২১	৭	তপোবন	তপোবল
৩২২	১১	ভারত	ভরত
৩২৫	৫	কুলটি	ফুলটি
৩৩৭	২	যমুমার	যমুনার
৩৪০	৪	শ্রেষ্ঠ যা	শ্রেষ্ঠ জন যা
৩৪১	৫	করতে	থাকতে
”	৮	প্রতিষ্ঠাকেই	প্রতিষ্ঠাতাকেই

প্রাপ্তিস্থান ঃ

মৌলিন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল

সন্তধাম, পোঃ জনার্দ্দনপুর—মেদিনীপুর।

ডাঃ বঙ্কিমবিহারী চৌধুরী

সন্তধাম, কর্ণেলগোলা—সহর মেদিনীপুর।